

# মহাশ্মশান

কায়কোবাদ



ইউ.ডে.ব্লি.ওয়েজ

বাংলা বাজার, ঢাকা

**প্রকাশক :**

**মোহাম্মদ জিনাতউল্লাহ**

**স্টুডেন্ট ওয়েল**

**বাংলা বাজার, ঢাকা-১**

**ষষ্ঠ সংস্করণ — ১৯৬৭**

**প্রচ্ছদপট : মোহাম্মদ ইদ্রিস**

**রক : রূপসেখা**

**এই গ্রন্থের সর্বস্বত্ব**

**প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত**

**মুদ্রাকর :**

**আবুল কালাম ফিরোজ এম. এ.**

**সারওয়ার প্রিন্টিং হাউস**

**১৬/২, পাঁচ ভাই ঘাট লেন**

**ঢাকা-১**

## উৎসর্গ পত্র

আমার বহু পরিশ্রমের এই কাব্যখানি আমাদের জাতীয় গৌরবের মহাস্মাশান। আমি ইহা শেষ করিয়া অনেক ভাবিয়াছি, অনেক চিন্তা করিয়াছি কাহার করে ইহা সমর্পণ করিয়া আমি শাস্তি লাভ করিতে পারিব। কে আমার এই মর্মভেদী করুণ উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া পরের হিতার্থে আত্মবলিদান করিতে সমর্থ হইবে। এই সুবিশাল বঙ্গভূমির যে দিকেই চক্ষু সঞ্চালন করি, সেই দিকে সেই একই দৃশ্য।—সকলেই নিজকে নিজে লইয়া বাস্তব; কেহই পরের দিকে—পরের অশ্রুসিক্ত মলিন মুখের দিকে একবার ফিরিয়াও চাহে না, দেখিয়াও দেখে না, সেই হাহতাপ-পূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনিয়াও শোনে না। হায়, দেখিয়া দেখিয়া আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়খানি নিরাশার তীব্র নিষ্পেষণে শতধা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল; কিন্তু একটি লোকও আমার মনের মত মিলিল না। ছঃখ হইল, ঘৃণা জন্মিল; বাঙ্গালী জাতি দিকার দিয়া আমার এই ভগ্ন হৃদয় শাস্তি লাভ করিল। আবার ভাবিলাম তবে কি এই কাব্যখানা ছিঁড়িয়া ফেলিব? না গঙ্গার এই অতল জলে ডুবাইয়া মহাবিসর্জনের অমুষ্ঠান করিব? হায় হৃদয়ের আশা হৃদয়েই ঘুমাইয়া পড়িল; নয়নের অশ্রু নয়নেই শুকাইয়া রহিল; কেবল গভীর মর্ম যাতনা ও হাহতাপ লইয়া এই দরিদ্র বঙ্গকবি ভীষণ মনোগুণে দগ্ধ হইতে লাগিল। এক দিন গেল; দুই দিন গেল, দিনের পর কত দিন আসিল যাইল, আমার হৃদয়ের সেই ঘুমন্ত আশাটি ধীরে ধীরে আবার লাগিয়া উঠিল। আবার ভাবিলাম, আবার সেই চিন্তার কল্লোলময় সাগর তরঙ্গের সঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া ডুবিতে ডুবিতে ভাসিয়া চলিলাম; এবার কিছু উর্দ্ধে উঠিলাম। মানব জগৎ পশ্চাতে রহিল,—দেখিলাম, এক অদ্বিতীয় জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ এই সৌর জগতের প্রত্যেক পদার্থকেই তাঁহার পবিত্র প্রেমায়তন দান করিতেছেন; মুহূর্তের জগৎ বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই; এ দান অনন্ত, অশ্রান্ত। প্রতি মুহূর্তেই এই অনন্ত দান লইয়া এই অনন্ত সৌরজগৎ নীরবে নীরবে তাঁহারই জয়ধ্বনি ঘোষণা করিতেছে, আর বদির মানব তাহা শুনিয়াও শুনিতেছেন না। এই সৌরজগতের প্রত্যেক পদার্থই তাঁহার সেই অনন্ত দানের মহাসাক্ষী। আমি আত্মহারা হইয়া তাঁহারই পবিত্র চরণ প্রান্তে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার সেই পবিত্র ও উজ্জল জ্যোতিতে আমার নয়ন বলসিয়া গেল। তিনি আমাকে তাঁহার পবিত্র সিংহাসনের নিম্নদেশ দর্শন করিতে ইচ্ছিত করিলেন। আমি মস্তমুগ্ধ স্বায় অনিমেষ নয়নে সেই দিকেই চাহিলাম,—দেখিলাম, তাঁহার সেই

পবিত্র সিংহাসনের নিম্নদেশে এক জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ একটি হীরক খচিত স্বর্ণামানে উপবিষ্ট। তাঁহার পবিত্র কর-কমলে পবিত্র “কোরাণ” তাঁহার পবিত্র ললাট ফলকে “মোহাম্মদ” ও পবিত্র শিরদ্বাণে “লায়েলাহা ইল্লেলাহ” অঙ্কিত রহিয়াছে। আমি আশ্চর্য হইয়া তাঁহারই পবিত্র চরণের দিকে অগ্রসর হইলাম। তিনিও আমাকে তাঁহার সেই পবিত্র সিংহাসনের নিম্নদেশে দর্শন করিতে ইচ্ছিত করিলেন। আমি ভীত হৃদয়ে দেখিলাম, তাঁহার সেই পবিত্র সিংহাসনের নিম্নদেশে দুইটি পুরুষসিংহ ও একটি জ্যোতির্ময়ী দেবীমূর্তি। তাঁহাদের মস্তকের হীরক খচিত স্মরণ উন্মেষে “লায়েলাহা ইল্লেলাহ মোহাম্মদ-রজুলোলাহ” অঙ্কিত রহিয়াছে। আমি এই পবিত্র দৃশ্য দেখিয়া আশ্চর্য হৃদয়ে তাঁহাদের এক জনের পবিত্র কর-কমলে আমার এই “মহাম্মদ” প্রথম খণ্ড উৎসর্গ করিলাম। তিনি যত্নের সহিত উহা গ্রহণ করিলেন, অমনি তাঁহার করস্থ মুদ্রাগুলি ভূতলে ছড়াইয়া পড়িল। আমি বিস্মিত হৃদয়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম; দেখিলাম ইনি আমার বহু পরিচিত সেই মনবাড়ীর প্রসিদ্ধ জমিদার সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী। আমি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে আমার “মহাম্মদ” দ্বিতীয় খণ্ড অপর মহাপুরুষের হস্তে ও তৃতীয় খণ্ড তাঁহার বাম পার্শ্বে সেই জ্যোতির্ময়ী দেবীমূর্তির হস্তে উৎসর্গ করিলাম। তাঁহারা উভয়ে উহা গ্রহণ করিয়া আমাকে আশীর্বাদ করিলেন। তাঁহাদের সেই আশীর্বাদগুলিকে পুষ্পরূপ ধারণ করিয়া আমার উপরে বর্ষিত হইতে লাগিল। আমি বিস্মিত হইয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিলাম,—দেখিলাম সেই পুরুষসিংহ আমার সেই পরম পূজনীয় প্রকৃষ্ট স্বর্গীয় পিতৃদেব শাহামত উল্লা আল কোরেশী ওরফে মোলবী এমদাদ আলী এবং সেই দেবীমূর্তি আমার সেই স্নেহময়ী জননী স্বর্গীয়া জামরতউন্নিসা ওরফে জরিফুনিসা খাতুন। তাঁহারা সকলেই ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে আমার সেই “মহাম্মদ” তিন খণ্ড তাঁহাদের উপরস্থ মহাপুরুষ হযরত মোহাম্মদের (দ:) চরণ প্রান্তে স্থাপন করিলেন। তিনিও সর্বোপরি মহাপুরুষ পরম কারুণিক বিশ্বনিয়ন্তার চরণ প্রান্তে স্থাপন করিয়া আমাদের আশীর্বাদ করিলেন। আমি তখন সমগ্র জগৎ ভুলিয়া গেলাম। আমার এই কীণ কণ্ঠ সমগ্র মোসলিম লগতের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া মধুর স্বরে গাইয়া উঠিল—

এক ভিন্ন অস্ত্র নাই উপাস্ত এ ভবে

হযরত মোহাম্মদ প্রেরিত তাঁহার

ভরসা আমার তিনি এ মহা-অর্পবে,

পাপী আমি, চরণের ধূলি-কণা তার।



ଆମି ତখন ଯୁହିତ ହଇয়া ପଡ଼ିଲ୍ୟା ।—ସখন ଯୁହୀ ଡାକିଲ, ଦେଖିଲ୍ୟା ବନ୍ଧେର ଏକଟି  
 ଡଗ କୁଟୀରେ ପଡ଼ିୟା ଆମି ଆମାର ଅନ୍ତର କଥା ଭାବିତେছি, ଆର କତକଶୁଳି ଅପୋଗଣ  
 ନୀର୍ବକାୟ ଶିଶୁ କୁଧାର ଆଳାୟ ଅନ୍ଧିର ହଇୟା ଆମାର ଚାରିଦିକେ କାନ୍ଦିତେছে । ତାହାମିଶେର  
 ସେହି ଛରବନ୍ଧା ଦେଖିୟା ଆମାର ଏହି କାତର ନୟନେ ହୁଇ ବିନ୍ଦୁ ଅଞ୍ଚ ଦେଖା ଦିଲ । ହାୟ, ସେହି  
 ହୁଇ ବିନ୍ଦୁ ଅଞ୍ଚ ଶୁଦ୍ଧ ନା ହୁଇତେ ହୁଇତେଇ ଆମାର କଣ୍ଠେର ହୁଇଟି ଉଞ୍ଚଳ ଝରୁ ଧସିୟା ପଡ଼ିଲ ।  
 ଆମାର ହୃଦୟେଓ ଏକ “ମହାନ୍ୟାଶାନ” ଅଲିୟା ଉଠିଲ ॥

କୁଦ୍ରାଦପି କୁଦ୍ରା ବିଧାରୀ

କାୟକୋବାଦ

ଓରଫ

ମୋହାନ୍ନଦ କାଞ୍ଜେୟ ଆଲକୋରେନୀ ।

অমর কবি মধুসূদনের পর হইতে অনেকেই অমিত্র ছন্দে কাব্য লিখিয়াছেন। কিন্তু মহাকবি নবীনচন্দ্রের কাব্য ব্যতীত অমিত্র ছন্দের সেই আবেগময়ী ওজস্বিতা ও তটিনীর স্নায় সেই তরঙ্গায়িত অথচ জীবন্ত মধুরতা কয়জন কবির কাব্যে আছে? সাহিত্যের বাজারে আজকাল কবিতার বড়ই ছড়াছড়ি। কিন্তু হৃৎকের বিষয়, বঙ্গ-সাহিত্যে মহাকাব্যের জন্ম অতি বিরল। মধুসূদনের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত মহাকবি নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্র ব্যতীত কয়জন কবি মহাকাব্য লিখিয়াছেন? এখনকার কবিগণ কেবল “নদীর জল,” “আকাশের তারা,” “ফুলের হাসি” “মলয় পবন” ও “প্রিয়তমার কটাক্ষ” লইয়াই পাগল। প্রেমের ললিত বন্ধারে তাহাদের কব্ধা একরূপ বধির যে, অস্ত্রের ঝগ্‌ঝগি ও বীরবৃন্দের ভীষণ হুকার তাহাদিগের কর্ণে প্রবেশ করিতে অবসর পায় না। তাহারা কেবল প্রেম-পূর্ণ খণ্ড কবিতা লিখিয়া নিজকে গৌরবান্বিত মনে করেন। খণ্ড কবিতা কেবল কতকগুলি চরণের সমষ্টি, সামান্য একটি ভাব ব্যতীত তাহার বিশেষ কোন লক্ষ্য নাই, কিন্তু মহাকাব্য তাহা নহে; তাহাতে বিশেষ একটি লক্ষ্য আছে,—কেন্দ্র আছে। কবি কোন একটি বিশেষ লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া ও ভিন্ন ভিন্ন গঠন প্রণালীর অনুসরণ করিয়া নানারূপ মাল মসলার যোগে বহু কক্ষ সমন্বিত একটি সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করেন। ইহার প্রত্যেক কক্ষের সহিত প্রত্যেক কক্ষেরই ঘনিষ্ঠ সংস্ক, অথচ সকলগুলিই পৃথক, সেই পৃথকত্বের মধ্যেই আবার একত্ব, ইহাই কবির নূতন সৃষ্টি ও রচনা কৌশল।—ইহাই মহাকাব্য।

সকল হৃদয় কবিতার উপযোগী নয়। যে হৃদয়ে নাকি আপনাকে ভুলিয়া পরের অস্তিত্বে ডুবিয়া যাইবার একটি গুণ আছে, সেই হৃদয়ই স্বভাব কবির সজীব কবিতার মধুময় বন্ধারে আপনার অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে; সেই হৃদয়ই সজীব কবিতার মোহময় আকর্ষণে আত্মবিস্মৃতির মদিরায় ডুবিয়া পড়ে। মানব মাত্রেই কবি; যাহারা মনের কথা প্রকাশ করিয়া অপরকে আপনার সুখ-দুঃখের ভাগী করিতে সমর্থ, তাহারাই কবি; কবিদের মধ্যেও আবার ত্রৈণীবিভাগ আছে, কেহ কষ্টকবি, কেহ স্বভাব কবি। স্বভাব কবির কবিতাতে একরূপ মানকতা আছে, উহাই কবিতার প্রাণ—উহাই কবিতার ওজস্বিতা—উহাই কবিতার আকর্ষণী শক্তি। কষ্ট কবির কবিতাতে উহার সম্পূর্ণ অভাব, উহা প্রাণহীন কবিতা, স্বভাব কবির হৃদয় সৃষ্টি, কবিতা মুক্ত।

কবির শক্তি ও প্রতিভা অনুসারে তাহার কাব্যের আদর হইয়া থাকে; কিন্তু সকল সময়ে তাহা হয় না, কোন কোন স্থলে ইহার ব্যতিচারও ঘটিয়া থাকে, দোষ কবির নহে, দোষ তাহার অনুরক্তের; কারণ আমাদের দেশের সমালোচক ও সম্পাদকদের মধ্যে একরূপ অনেক মহাশয় আছেন, যাহারা স্বার্থের বশীভূত হইয়া ভালকে মন্দ, মন্দকে ভাল বলিয়া

থাকেন, এবং মুসলমান প্রণীত কোন কাব্যের সমালোচনা করা দূরে থাকুক, সম্পূর্ণ কাব্যখানা পাঠ করিতেও তাঁহারা অপমান বোধ করেন। আবার কেহ কেহ সমালোচ্য গ্রন্থখানির বাহ্যিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া, কি ছ'চার পাতা উন্টাইয়া, কি গ্রন্থকারের নাম শুনিয়া এক তরফা ডিক্রী বা ডিসমিস করিয়া দেন। এ জন্ত কোন কোন গ্রন্থকার ও কোন প্রসিদ্ধ লেখকের দ্বারা একটি ভূমিকা ওরফে প্রশংসাপত্র লিখাইয়া সেই ভূমিকাটি প্রশংসার মার্ক। স্বরূপ তাঁহার গ্রন্থের কপালে আঁটিয়া দেন। উদ্দেশ্য, ঐ মার্ক। দেখিয়া গ্রন্থখানা সুখী সমাজে সমাদৃত হইবে।

গ্রন্থকারদিগের মধ্যেও একরূপ অনেক মহাত্মা আছেন, যাঁহারা কেবল সাহিত্য-কুজ কাননের আগাছার সংখ্যাই বৃদ্ধি করেন। অবশ্য, সকল সমালোচক কি সকল সম্পাদকই যে স্বার্থপর ও পর-নিন্দুক, এ কথা আমি বলি না; ভাল মন্দ সকলের মধ্যেই আছে। যাঁহারা ভাল, তাঁহাদের আসন অনেক উচ্চ, যাঁহারা বহুভাবে গ্রন্থকারদের ত্রুটি দেখাইয়া সংশোধনের জন্ত অনুরোধ করেন, আমরা তাঁহাদিগকে হৃদয়ের সহিত আশীর্ব্বাদ করি ও বহু বলিয়া সম্মান করি। আর যাঁহারা নরকের কীট, পরনিন্দাই যাঁহাদের ব্যবসা, পরকে গালি দিতে পারিলেই যাঁহারা মনে করেন খুব বড় এক জন সাহিত্যিক হইতে পারিবেন তাহাদিগকে আমরা অন্তরের সহিত ঘৃণা করি।

“সজ্জনা গুণমিচ্ছন্তি দোষমিচ্ছন্তি পামরাঃ।

মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি মধুমিচ্ছন্তি ষট্পদাঃ।”

‘যাহা হউক সকল মহাত্মার নিকটেই আমার বিনীত নিবেদন যে, কেহ যেন আমার এই কাব্যখানার ছ'চার পাতা উন্টাইয়া কি বাহ্যিক আকৃতি দেখিয়া কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ না করেন। আমার এই কাব্যখানা আড়োপাস্ত্র পাঠ করিয়া যাহার যত ইচ্ছা আমার উপরে গালি বর্ষণ করুন, আমি তাহা অগ্নান-বদনে ও অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত আছি।

আমার এই কাব্যে আমি কোন সম্প্রদায়ের লোককেই আক্রমণ করি নাই; হিন্দু লেখকগণ যেমন মুসলমানদিগকে অযথা আক্রমণ করিয়া পিয়ন চাপরাণী কুলি মজুর রূপে রঙ্গমঞ্চে আনয়ন করিয়া বাহবা লইয়াছেন। ভুঝুচাচা, নে'ড়েমামা ইত্যাদি মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া মনের কোভ ঝুটাইয়াছেন, আমি হিন্দুদিগের প্রতি তেমন ব্যবহার করি নাই, তবে যুদ্ধপ্রার্থী হিন্দু মুসলমান পরস্পর গালাগালি করিয়া “কাফের, কুকুর, নরাধম, পাষাণ, বর্ব্বর” ইত্যাদি মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া শেষে হৃদয়ের উষ্ণ শোণিতে প্রাণের আলা মিটাইয়াছেন, যে স্থানে যেটুকু হওয়া দরকার এবং যাহা না হইলে কাব্যের অঙ্গহানি হইত, আমি কেবল তাহাই চিত্রিত করিয়া উহার প্রকৃত বর্ণ ফুটাইয়া দিয়াছি। আমি এই চিত্র নিরপেক্ষ ভাবেই অঙ্কিত করিয়াছি। হিন্দুদিগকে হীন বর্ণে চিত্রিত করি নাই বলিয়া

আমার স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণ আমাকে মন্দ বলিতে পারেন। কিন্তু সত্যের অপলাপ করিবার অধিকার ত আমার নাই। তবে আমি মুসলমান, মুসলমানদিগের প্রতি আমার সহানুভূতি ও হৃদয়ের টান আছে কি না, তাহা যিনি কাব্য বিশ্লেষণ করিয়া কবি হৃদয়ে প্রবেশ করিতে সক্ষম, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, অস্তুর পক্ষে চূরাশা।

বিশেষতঃ হিন্দুদিগকে কাপুরুষ সাজাইয়া, ভীকৃতার বর্ণে রঞ্জিত করিয়া মুসলমানদিগের কি লাভ ? কাপুরুষ বধে মুসলমানদিগের কি বীরত্ব ? শৃগাল বধ করিতে রমণীও পারে, সিংহ বধ করিতে বীরেরই দরকার ; তাই হিন্দুদিগের বীরত্ব প্রদর্শন করিতে আমি কুপণতা করি নাই। আমি তাহাদিগের সেই ভীষণ বীরত্ব যথাযথ ভাবে চিত্রিত করিয়া বিজয়ী মুসলমান বীর পুরুষদিগের বীরত্বের মাত্রা আরও অধিক বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছি। মুসলমানগণ বীর পুরুষ, হিন্দুগণও বীর পুরুষ, এই দুই বীরজাতি হৃদয়ের উষ্ণ শোণিতে আপনাদিগের জাতীয় গৌরব ও ভীষণ বীরত্ব কালের অক্ষয় পটে লিখিয়া গিয়াছেন ; যতদিন পৃথিবী থাকিবে, ইতিহাস থাকিবে, ইহাদের বীরত্ব ও জাতীয় গৌরবের কথা ততদিন, তাহারা সাক্ষ্য প্রদান করিবে। ইহা উভয় জাতির পক্ষে গৌরবের কথা, তবে হিন্দুগণ নিভিত ও বিধ্বস্ত, মুসলমানগণ জয়দৃপ্ত ও বিজয়-গৌরবে সম্মানিত। একজাতি দেশের জন্ত, ধর্মের জন্ত হৃদয়ের পবিত্র শোণিতে স্বদেশ রঞ্জিত করিয়া আত্মপ্রাণ বলি দান করিয়াছেন ; অশ্রু জাতিও দেশের জন্ত, ধর্মের জন্ত—স্বজাতির কল্যাণের জন্ত, হৃদয়ের পবিত্র শোণিতে স্বদেশ প্রাবিত করিয়া বিজয়-গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছেন ; কম'কে ? উভয় জাতির বীরত্বই প্রশংসার সাই।

হিন্দুগণ উত্তেজনার চরম সীমাতে উপনীত হইয়া মুসলমানদিগকে পাষাণ বর্ষের কুকুর বলিয়া গালি দিয়াছেন, মুসলমানগণও ছাড়িয়া কথা ক'ন নাই, কড়ায় গণ্ডায় তাহার প্রতিশোধ দিয়াছেন। তথাপি যদি মুসলমান ভ্রাতৃগণ বলেন যে, এই কাব্যে হিন্দুদের চিত্র এত উজ্জল করিয়া অঙ্কিত করা মুসলমান লেখকের উচিত হয় নাই, হিন্দু মহারথীগণ যে নীতির অনুসরণ করিয়া মুসলমানদের চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন, মুসলমান লেখকেরও সেই নীতির অনুসরণ করিয়া লিখা উচিত ছিল। সে নীতির অনুসরণ করিয়া লিখিলে এই কাব্যের সৌন্দর্য্য ও স্বাভাবিকতা অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইত, এবং পক্ষপাতিত্বের ঘৃণনীয় কলঙ্ক-কালিমায় ইহা কলুষিত হইয়া পড়িত।

কাব্য এবং চিত্র একই জাতীয় পদার্থ, সুতরাং কবি এবং চিত্রকরও একই শ্রেণীর ব্যক্তি, ইহা বোধ হয় চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। চিত্রকর যদি ইচ্ছা করিয়া তাহার চিত্রের কোন অংশ ভাল ও কোন অংশ মন্দ করেন, তবে কি তাহার চিত্রটি সর্ব্বাঙ্গ



সুন্দর হইতে পারে ? সেইরূপ কবিও যদি তাহার কাব্যে কোন এক পক্ষকে হীন বর্ণে রঞ্জিত করেন, ইচ্ছা করিয়া সেই পক্ষের চরিত্রগুলির প্রকৃত বর্ণ না ফুটান, তবে কি তাহার কাব্যটি সর্বোৎকৃষ্ট সুন্দর হইতে পারে ? চিত্রের যে স্থানে যে বর্ণটুকু, যে শেড়টুকু দরকার, তাহা না দিলেই চিত্র খারাপ হয় ; তদ্রূপ কাব্যেও যেখানে যে রসটুকু—যে ভাবটুকু—যে অলঙ্কারটি প্রয়োজন, তাহা না দিলে কাব্যও খারাপ হয় । ছঃষের বিষয় আমাদের সমাজে কবিতা বৃদ্ধিবার, কাব্যের গুণাগুণ বিচার করিবার লোক অতি বিরল ।

উপসংহারে আমার বিনীত নিবেদন এই—বহুদিন হইল আমি “অশ্রুমালা” লিখিয়া সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলাম । বঙ্গীয় হিন্দু মুসলমান সাহিত্যিকগণ উহা খুব আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন । “অশ্রুমালা” যখন লিখি, তখন আমার হৃদয়টি নন্দন কাননের মত ফুলে ফুলে মঞ্জরী মুকুলে সুশোভিত ছিল । মলয় মারুতের স্নিগ্ধ কোমল স্পর্শে নানাবিধ কুসুমগুলি ফুটিয়া ফুটিয়া আমার হৃদয় কাননের নিভৃত নিকুঞ্জে এক সৌন্দর্য্যের উৎস ফুটাইয়া রাখিত । সংসার চক্রের ঘোর নিষ্পেষণে আজ সেই হৃদয় শ্মশান । সেই ফুল নাই, সে মুকুল নাই, সে সৌন্দর্য্য নাই, সে হৃদয় মাতানো প্রেমের করুণ উচ্ছ্বাস নাই । —আছে কেবল হা হতাশ ও দীর্ঘশ্বাস, আছে কেবল নিরাশ প্রাণের কাতর আর্তনাদ । পাঠক, তাই আজ অতি ভয়ে ভয়ে “মহাশ্মশান” লইয়া তোমাদের দ্বারে উপস্থিত । ইহা কেমন হইয়াছে জানি না, তোমাদের উপরেই সে পরীক্ষার ভার অপিত হইল । তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, মহাশ্মশানের সহিত অশ্রুমালার তুলনা হয় না । “মহাশ্মশান” স্বর্গ, “অশ্রুমালা” মর্ত্য । এই দুইখানি কাব্যে স্বর্গ মর্ত্য প্রভেদ । “অশ্রুমালাতে” কেবল কবির অশ্রুজল, আর “মহাশ্মশানে” হিন্দু ও মুসলমান সাম্রাজ্যের অতীত স্মৃতির চিত্তাভয়া ॥

কৃত্তাদপি কৃত্ত ভিখারী

কায়কোবাদ

গুরু

মোগলদ কান্নের আলকোরেণী ।

## দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বাঙালি ভাষার কাব্যগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আমার বড়ই দুঃখ হয়। বঙ্গের অনেক মহাকবি মহাকাব্য লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু মৌলিক মহাকাব্য লিখিতে ত কেহই যত্নবান হ'ন নাই। সকলেই রামায়ণ ও মহাভারতের ছায়া লইয়া কেবল চর্চিত চর্চন করিয়াছেন মাত্র। কেন যে বঙ্গীয় কবিগণ মৌলিক মহাকাব্য লিখিতে একরূপ উদাসীন, তাহা জগদীশ্বরই জানেন।

আমার এই “মহাশ্মশান কাব্য” কোন গ্রন্থের অনুকরণ বা কাহারও চর্চিত চর্চন নহে। ইহা আমার নিজস্ব নূতন জিনিষ। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের মাজ সরঞ্জামই ইহার মালমসলা।

আজকাল অনেকেই কবিতা লিখিতে বসিয়া অভিধান খুঁজিয়া মোটা মোটা শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন; আমি উহার একান্ত বিরোধী। যাহারা সহজ ও কোমল শব্দের দ্বারা অতি প্রোঞ্চল ভাষায় কবিতায় গাঢ় ভাব অঙ্কিত করিতে অসমর্থ, তাহাদের কবিতা লিখা বিড়ম্বনা মাত্র। নকল কবি ও স্বভাব কবির কবিতাতে এইটুকুই পার্থক্য। স্বভাব কবির কবিতা অতি প্রোঞ্চল—অতি মধুর—অতি প্রাণস্পর্শী, অথচ উন্নীত ভাব অতি গভীর। সে কবিতা ভাবুক হৃদয়-রূপ কষ্টি পাথর বাতীত অস্ত্রের পক্ষে চিনিয়া লওয়া দুঃসাধ্য। আর নকল কবির কবিতা কেবল কতকগুলি বাছা বাছা শব্দ সমষ্টি, না আছে তাহাতে ভাব—না আছে তাহাতে প্রাণ—না আছে তাহাতে ওজস্বিতা; আছে কেবল অর্থহীন-ভাবহীন কতকগুলি বাছা বাছা শব্দ সমষ্টির সুবিশুদ্ধ শিল্প-কলা।

আমার এই কাব্যখানা পাঠ করিয়া কেহ আমাকে ভালই বলুন, আর মন্দই বলুন, সে জন্ত আমি কৃতজ্ঞ নহি। কাহারও নিন্দা বা প্রশংসায় আমার হৃদয়ে কোনরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইবে না, আমি অচল হৃদয়ে সকলি সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি। কোন সমালোচকেরই ক্ষুণ্ণ দর্শনে আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়খানি মুহূর্তের জন্তও ভীত, দমিত বা বিচলিত হইবার নহে।

আমি বহুদিন যাবৎ মনে মনে এই আশাটি পোষণ করিতেছিলাম যে, ভারতীয় মুসলমানদের শৌর্যনীষাসংবলিত এমন একটি যুদ্ধ কাব্য লিখিয়া যাইব, যাহা পাঠ করিয়া বঙ্গীয় মুসলমানগণ স্পর্ধা করিয়া বলিতে পারেন যে এক সময়ে ভারতীয় মুসলমানগণও অদ্বিতীয় মহাবীর ছিলেন; শৌর্য্যে বীর্য্যে ও গৌরবে কোন অংশেই তাহারা জগতের অন্য কোন জাতি অপেক্ষা হীনবীর্য্য বা নিকৃষ্ট ছিলেন না; তাই তাহাদের অতীত গৌরবের

নিদর্শন স্বরূপ যেখানে যে কীর্তিটুকু, যেখানে যে স্মৃতিটুকু পাইয়াছি, তাহাই কবি-তুলিকায় অঙ্কিত করিয়া পাঠকদের চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি, এবং তাঁহাদের সেই অতীত গৌরবের ক্ষীণ স্মৃতিটুকু জাগাইয়া দিতে বহু চেষ্টা করিয়াছি। আমার সে আশা পূর্ণ হইয়াছে। এ কথা স্থির নিশ্চয় যে, আজই হউক কি দুই শত বৎসর পরেই হউক, বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে যখন বাগলা ভাষার বহুল প্রচার আরম্ভ হইবে তখন তাঁহারা এই “মহাশ্মশান” পাঠ করিয়া অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে, পানিপথের এই তৃতীয় যুদ্ধ তাঁহাদেরই পূর্ব পুরুষদের অসাধারণ শৌর্য বীর্যের শেষ অগ্নি-ফুলিঙ্গ। ইতি—

১লা মার্চ, সন ১৯১৭  
গ্রাম—পূর্বপাড়া,  
পোঃ আঃ—আগলা  
জিলা—ঢাকা।

}

ফুদ্দাদপি ফুদ্দ ভিখারী  
কায়কোবাদ  
ওরফে  
মোহাম্মদ কাজেম আলকোরেণী।



## তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

( অবশ্য পাঠ্য )

মঙ্গলময় বিধাতার ইচ্ছায় --সমুদয় পাঠকদের অনুরোধে আমার দ্বিতীয় সংস্করণের মহাশ্মশান কাব্য দুই বৎসরের মধ্যেই একেবারে নিঃশেষিত রূপে বিক্রয় হইয়াছিল। ভারত গবর্নমেন্টে (Vide the Inspector General Bengal letter No.  $\frac{B.R.4}{255}$  dated the 20th March 1918 addressed to the District Magistrate Dacca ) ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের যোগে ইহার দুই কপি নিয়া লন্ডনের India Office লাইব্রেরীতে রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া আমি গৌরব বোধ করিতেছি। নানা কারণে আমার হিন্দু-মুসলমান ভ্রাতাদের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে আমি ইহার তৃতীয় সংস্করণ করিতে সমর্থ হই নাই। এমন কি বহিষ্ঠলি ফুরাইয়া যাওয়ার পর কোন কোন গ্রাহক ইহার মূল্য অপেক্ষা দেড়গুন মূল্য বেশী দিয়াও ইহা লইতে ইচ্ছুক হইয়া ভিঃ পিঃ যোগে পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঘটিয়া উঠে নাই। দয়াময় জগদীশ্বরের অপার করুণায় এত দিনের পর ইহার তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইতে চলিল।

দ্বিতীয় সংস্করণের সময় বহু বন্ধু বাকবের অনুরোধে “হিরণবালা বাঈ” ও “জোহরা” বেগমের চিত্র দুইটি ইহাতে খুব তাড়াতাড়ি সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলাম বলিয়া আটের হিসাবে ইহাতে অনেক ক্রটি রহিয়া গিয়াছিল। কাজেই এবার “মহাশ্মশান” ভাঙ্গিয়া চুরিয়া উহার ভিত্তি হইতেই “হিরণবালা” ও “জোহরা” বেগমের চরিত্র-রূপ দুইটি কক্ষ এক সঙ্গে গঠিত করিয়া তুলিয়াছি। সুতরাং একত্র ইহার অনেক স্থানে পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতে হইয়াছে ; কিন্তু মূলের উপরে কোন রূপ হস্তক্ষেপ করি নাই।

পানিপথের এই তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কিছুকাল পূর্বে মহারাষ্ট্রগণ অত্যন্ত প্রবল ও হৃদ্বাঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের শক্তির সম্মুখে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে ভারতে এমন কেহই ছিলেন না। তাহাদের এক একটি ছন্ধারে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত সমগ্র ভারতভূমি কম্পিত হইয়া উঠিত ; যদি কাবুলের অধিপতি মহাবীর আহম্মদ শাহ আব্দালী সৈন্যে ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ না করিতেন তবে ইতিহাসের পৃষ্ঠা ও ভারতের মানচিত্র অল্প বর্ষে রঞ্জিত হইয়া যাইত।

যদিও এই পানিপথের মহাযুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানদেরই জয় হইয়াছিল বটে,—কিন্তু ইহার ফল ভোগ করিবার শক্তি তখন তাঁহাদের আদৌ ছিল না। কারণ এই মহাযুদ্ধে উভয় শক্তিই একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। কাহারও তখন উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তি ছিল

না। যুদ্ধ জয়ের কিছুকাল পরেই মহাবীর আহম্মদ সাহ আকালী নিজ দেশে চলিয়া যান, ঠিক সেই সময়ে—সেই সঙ্কটময় হুদ্দিনে ভারতীয় মুসলমানদের সৌভাগ্য বশতঃই ইংরেজগণ ভারতে আগমন করিয়া তাঁহাদের সাম্রাজ্যের ভিত্তি পত্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং এই মহা যুদ্ধই তাঁহাদের সেই ভিত্তি পত্তনের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল।

ইংরাজ রাজত্বের ভিত্তি পত্তনের মাল মসলাগুলি যদি হিন্দু মুসলমানের এই তপ্ত ও পবিত্র শোণিতে মিলিত ও অম্লরঞ্জিত না হইত, তবে তাঁহাদের রাজত্বের ভিত্তি মূল এত সুদৃঢ় ও সুগঠিত হইত না। ভারতীয় মুসলমানদের উপরে জগদীশ্বরের অপার করুণা বলিয়াই ভারতে ইংরাজগণের আগমন হইয়াছিল। নচেৎ আহম্মদ সাহ আকালী চলিয়া যাওয়ার অব্যবহিত পরেই ভারতীয় কোনও না কোন হিন্দু সম্প্রদায়ের তীক্ষ্ণধার অমির আঘাতে ভারতের নগরে নগরে—পল্লীতে পল্লীতে আবার সেই ভারতীয় মুসলমান নর-নারীর প্রাণের পবিত্র শোণিতে রক্ত-প্রবাহিনী বহিয়া যাইত, এবং চির দিনের জন্ত এই সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা ভারত ভূমি পরিত্যাগ করিয়া ভারতীয় মুসলমানদিগকে গিরি গুহায় ও বনে জঙ্গলে আশ্রয় লইতে হইত। তাই বলিতেছি, ভারতে ইংরেজগণের আগমানে ও তাঁহাদের রাজত্বের ভিত্তি পত্তনে মুসলমানদের উপকার বই অপকার হয় নাই।

আমার চতুর্থ জামাতা কলিকাতায় পুলিশ ইনস্পেক্টর খান সাহেব মোলবী আবদুল গফুর বি-এ. এই পুস্তক মুদ্রণার্থে আমাকে নিস্বার্থভাবে একশত টাকা সাহায্য করিয়া বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন। একজ্ঞ তাঁহাকে শত সহস্র ধন্যবাদ। ইতি—

পূর্বপাড়া—কবি-কুটার  
পোঃ আঃ—আগলা  
জিলা—ঢাকা।

বিনীত—

কায়কোবাদ  
গুরফে

মোহাম্মদ কাজেম আলকোরেশী।

## প্রকাশিকার নিবেদন

( চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা )

[ পাঠকগণ এই কাব্যখানা পাঠ করিবার পূর্বে আমার এই নিবেদনটি পাঠ করিয়া লইলে আমি বিশেষ অমুগৃহীত হইব ]

বহু বাধাবিশ্ব অতিক্রম করিয়া এবার আমি “মহাশ্মশান” কাব্যের চতুর্থ সংস্করণ বাহির করিলাম। আশাকরি বঙ্গভাবাবিজ্ঞ সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের নিকট ইহা পূর্বের মতই সমাদৃত হইবে। এবারও ইহার কোন কোন স্থান সামান্য একটুকু পরিবর্তিত পরিবর্তিত হইয়াছে। কবির কোন সম্পর্কিত ব্যক্তি শত্রুতা ও ঈর্ষা বশতঃ কবিকে মুসলমান সমাজে ছোট ও ছেয় করিবার উদ্দেশ্যে কবির কতগুলি নিন্দা ও অযথা দোষালোচনা করিয়াছিলেন। উজ্জ্বল কোন কোন হিন্দু-মুসলমান সাহিত্যিকদের সহিত তাঁহার বহুদিন পর্যন্ত দাদামুবাদ চলিয়াছিল। পাঠকগণ, তাহা আমার এই নিবেদনটি পাঠ করিলেই সমাক্রমে অবগত হইতে পারিবেন। তৎসম্বন্ধে ছ'চারটি কথা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আশাকরি সুদী সমাজ এজ্ঞ আমাকে ক্ষমা করিয়া উদারতার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। “মহাশ্মশানের” মত একরূপ বৃহদাকারের ও উচ্চদের একটি মহাকাব্য বোধ হয় বঙ্গভাষার সাহিত্য-ভাণ্ডার খুঁজিলে বড় বেশী বাহির হইবে না। আমরা স্পর্ধার সহিত বলিতে পারি যে, মুসলমান কেন, হিন্দুদের “রামায়ণ” ও “মহাভারত” ছাড়া এতবড় মহাকাব্য আর নাই। তবে যে কয়টি মহাকাব্য আছে, সেগুলি আকারে অনেক ছোট, এবং তাহা মৌলিক মতে। “রামায়ণ” ও “মহাভারতে”র আখ্যান ভাগ লইয়াই লিখিত। মহাশ্মশানের কবির সম্মুখে তেমন কোন সরস মহাকাব্য ছিল না, যাহা দেখিয়া কি যাহার কোন অংশ লইয়া তিনি তাহার এই মহাকাব্য রচনা করিতে সমর্থ হইবেন। তিনি নীরস ঈতিহাস ঘাটিয়া যে তথ্যটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহারই কাঠাম লইয়া তিনি এই ভিত্তি সংস্থাপন করেন এবং সেই ভিত্তির উপরই তাঁহার কল্পনা দেবীর সাহায্যে নানা রকমের মাল মশলা দিয়া বঙ্গভাষার কুলকুল সুশোভিত—শ্রামল বিটপী পুষ্প পরিবৃত—দোয়েল কোয়েল বঙ্কত নিভৃত নিকুঞ্জ কাননে মুসলমান গৌরবের অতীত স্মৃতি সংজড়িত এই মহাকাব্য রূপ বৃহৎ অট্টালিকা নিৰ্মাণ করেন এবং উহার কক্ষে কক্ষে—প্রাচীরে প্রাচীরে—অলিন্দে কাণিসে বিবিধ বর্ণের লতাপাতা ফুল ও অলঙ্কারাদি দ্বারা সজ্জিত করিয়া তাঁহার স্বদেশবাসীকে উপহার প্রদান করেন। হিন্দু সমালোচকও এই কাব্যখানা সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু শত্রুতা বশতঃ তাঁহার স্বজাতি ও আত্মীয় কোন এক ব্যক্তি এই মহাকাব্যখানা সম্বন্ধে বহুদিন পর্যন্ত এই অগ্রিয় আন্দোলন চালাইয়াছিলেন, তাহার কারণ

বোধ হয় অনেকেই জানেন না। ধৈর্যের সহিত এই মহাকাব্যখানার আদ্যোপান্ত ও আমার নিবেদনটি পাঠ করিলেই নিরপেক্ষতা ও আমার কথার সত্যতা সঙ্গদয় পাঠকগণ অবশ্যই উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং ইহাও বুঝিতে পারিবেন যে, ইহার মূলে শত্রুতা ও পরজী-  
কাতরতা বই আর কিছুই নহে। সুতরাং আজ আমি এ সম্বন্ধে কিছু বিস্তৃতভাবে আন্দোলন  
করিতে ইচ্ছা করি, পাঠকগণ একটুকু ধৈর্যের সহিত আমার এই নিবেদনটি পাঠ করিলে  
আমার এই শ্রম আমি সার্থক মনে করিব। শুধু শত্রুতা ও পরজীকাতরতার জগুই যে কবির  
স্বজাতি ও আত্মীয় সেই শত্রু এই অযথা কুৎসা ও নিন্দা করিয়া তাঁহাকে মুসলমান সমাজে  
অপদস্থ ও হেয় করিতে এতটা চেষ্টা ও আন্দোলন করিয়াছিলেন তাহা আমার এই ভূমিকাটি  
পাঠ করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে। নচেৎ সাহিত্যের বাজারে অসংখ্য আগাছা ও  
ভূরি ভূরি রাবিশ বাহির হইতেছে, সেজন্য ত কেহকে কোন দিন কোন উচ্চ বাক্য প্রয়োগ  
করিতে শুনি নাই। অবশ্য প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন যে, যেগুলি খারাপ ও নিকৃষ্ট,  
সেগুলির সমালোচনা করিতে যাইয়া মাথা ঘামাইবার দরকার কি? যেগুলি ভাল ও উৎকৃষ্ট,  
সেগুলির মধ্যে কোন দোষ ক্রটি পরিলক্ষিত হইলে অনেকের দৃষ্টি সেই দিকেই ধাবিত হইয়া  
থাকে; যদি তাহাই হয়, তবে প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, “মহাশ্মশান”  
কাব্য ভাল ও উৎকৃষ্ট জিনিষ। সে অবস্থায় করিব কোন দোষ ক্রটি পরিলক্ষিত হইলে  
এরূপভাবে গালাগালি না করিয়া বন্ধুভাবে তাঁহাকে তাঁহার দোষ ক্রটি দেখাইয়া ও বুঝাইয়া  
দেওয়া উচিত ছিল নাকি?

যেগুলির জগু এত নিন্দা—এত আন্দোলন—এত গালাগালি, সেগুলি হিন্দু মুসলমান  
বহু সাহিত্যিকই একবাক্যে প্রশংসা করিয়াছিলেন। তর্কস্থলে মানিয়া লইলাম কবির  
কোন শত্রু ঈর্ষাবশতঃ কবিকে জনসমাজে হেয় ও খাটো করিবার জগুই এতটা আন্দোলন  
চালাইয়াছিলেন, কিন্তু অসংখ্য সাহিত্যিক তাহাতে যোগ দিলেন কেন? তবে কি না  
সাধারণতঃ বাঙ্গালী মাঝেই হুজুগপ্রিয়, তাহারা কোন একটা হুজুগ পাইলেই শ্রায় অশ্রায় না  
মানিয়া—ভালমন্দ বিচার না করিয়া তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাস বশতঃ ঐ হুজুগে মাতিয়া  
উঠেন এবং বাঙ্গালার আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তুলেন, এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল।  
“মহাশ্মশান” যে কিরূপ দরের মহাকাব্য, তাহা তাহারা আদৌ তলাইয়া দেখেন নাই।  
বিশেষতঃ এতবড় একটা মহাকাব্য পাঠ করিবার ধৈর্য্য ও অবসর তাঁহাদের নাই। সেই  
ধৈর্য্যটুকুর অভাবেই তাঁহারা ঐ কাব্যখানার আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে পারেন নাই, পরের  
মুখেই ঝাল খাইয়াছেন। হিন্দুসমাজ রবীন্দ্রনাথকে বাড়াইবার জগু তাঁহাদের সমাজের  
ছোট বড় সকলেই প্রপাগণ্ডা করিতেছেন—ক্যানভাস করিতেছেন, আর আমাদের সমাজের  
এতবড় একটা মহাকাব্যের কবিকে কিরূপে ছোট ও খাটো করা যায় সেজন্য আমাদের

সমাজের অনেকেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। হায়রে মুসলমান জাতির স্বাভাবিক বাৎসল্য। ইহার বিচারের ভার আমি আধুনিক সমাজের উপর না দিয়া দুইশত বৎসর পর আমাদের উত্তরাধিকারী সাহিত্যিকগণ যখন বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইবেন তাহাদের উপরেই স্তম্ভ করিলাম।

এই সম্বন্ধে পূর্বের নানারূপ বাদানুবাদ হইয়া শেষে মুসলিম সাহিত্যিকদের মধ্যে দুইটি দলের সৃষ্টি হইয়াছিল। একদল কবির পক্ষে—অন্যদল কবির বিপক্ষে, তাহা দেখাইবার জন্য আমি কয়েকটি সাহিত্যিকের লেখার কিয়দংশ এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, ইহা পাঠ করিলেই মহাশ্মশানের কবির প্রতি যে অবিচার হইয়াছিল, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে, ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। পাঠক দেখুন :—

ভূতপূর্ব “মোস্তেম জগৎ” ও আজাদ পত্রের সম্পাদক ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক মোলভী আবুল কালাম মোহাম্মদ সামছুদ্দীন সাহেব ঐ দোষালোচনা পাঠ করিয়া লিখিয়াছিলেন “মহাশ্মশান” কাব্য বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যে একটি উজ্জল রত্ন। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যে যাহা কিছু গৌরবের জিনিষ আছে, তন্মধ্যে মহাশ্মশানের স্থান বোধ হয় সকলের উপরে। কেবল বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য কেন, সমগ্র বঙ্গ সাহিত্যের ভিতরে মহাশ্মশান একটা গৌরবের আসন দাবী করিতে পারে। \* \* \* মহাশ্মশানের স্মারক বৃন্দাকার কাব্য বোধ হয় বঙ্গ সাহিত্যে আর নাই। কেবল বৃহত্তই ইহার শ্রেষ্ঠতা নহে, কাব্য হিসাবেও ইহা আমাদের গৌরবের জিনিষ। \* \* \* বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যে ইহার স্থান এত উপরে যে, ইহাকে প্রথম স্থান দিলে দ্বিতীয় স্থান দিবার উপযোগী কাব্য বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে এখনও জন্মগ্রহণ করে নাই বলিয়াই আমরা মনে করি। একত্র এতগুলি রসের সমাবেশ বাঙ্গলা অল্প কাব্যেই দেখিয়াছি। \* \* \* এই কাব্যখানা ‘এতই উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, বঙ্গ সাহিত্য ইহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া গৌরবিত হইতে পারে, এরূপ কথা বলিলে কবিকে বেশী বাড়াইয়া তোলা হয় না। \* \* \* প্রকৃত সমালোচনার অভাবে এই কাব্যখানির গুণ এখনো জনসমাজে প্রচারিত হয় নাই। ইহা যে আমাদের কত বড় গৌরবের জিনিষ, এ জ্ঞান অল্প সংখ্যক সাহিত্যিকই লাভ করিয়াছেন। কাব্য কি, কাব্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, ইহা বুঝিবার মত সাহিত্যিক জ্ঞান এখনও অধিকাংশ মুসলমান সাহিত্যিকের হয় নাই। এখনো কাব্য বলিতে অধিকাংশ সাহিত্যিকই ছন্দোবন্দোময় কতকগুলি নীতি-কথা বা ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে কতক উচ্কাস বুলিয়া থাকেন। কাব্যের লক্ষণ যে ইহা হইতে স্বতন্ত্র, তাহা যে বুঝিতে না পারিয়াছে, তাহার পক্ষে কাব্যালোচনা বিড়ম্বনা মাত্র। কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি এই মোটী কথাটা না জানিয়া কয়েকজন অনধিকারী কাব্য সমালোচক উৎকৃষ্ট কাব্যকে মন্দ এবং মন্দ কাব্যকে উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠিত



হইতেছেন না। ইহাদের কাব্য সমালোচনার প্রধান মানদণ্ডই হইতেছে নৈতিকতা ও ধর্ম :— কাব্যের কাব্যিক বিচার সম্বন্ধে ইহাদের কোনরূপ মাথা ব্যথা নাই। এইরূপ কাণা ও ধোঁড়া সমালোচনা হইতে যে সমালোচনা একেবারে না হওয়া মঙ্গলজনক, সে সম্বন্ধে বোধ হয় অনেকের দ্বিমত হইবে না। মহাশ্মশানের সমালোচনা যে একেবারে না হইয়াছে, এমন কথাও বলা যায় না। কিন্তু সে সমালোচনাকে কাণা বা ধোঁড়া সমালোচনা নাম দিলে বোধ হয় কিছুমাত্রও অশ্রায় হইবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, গত বৈশাখের বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার প্রথম পাতে স্থানপ্রাপ্ত ‘মহাশ্মশান কাব্যে অনৈসলামিক অশ্লীল ভাব’ শীর্ষক প্রবন্ধের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রবন্ধটি একাধারে কবি ও সমালোচক সৈয়দ এমদাদ আলী কর্তৃক লিখিত। প্রবন্ধটিতে তিনি যেরূপ সমালোচন-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আমরা বাস্তবিকই স্তম্ভিত হইয়াছি। আমরা ক্রমে ইহার আলোচনা করিব।

মহাশ্মশানের সর্বপ্রধান গুণ ইহার সরল প্রকাশ ক্ষমতায়। ঘোরানো প্যাচানো ভাবের অস্তিত্ব এ কাব্যে নাই। কোথাও জটিলতা বা হৃর্কোষাতার নাম গন্ধ আমরা সমগ্র কাব্যখানা খুঁজিয়া পাই নাই। সহজ নদী-স্রোতের মত ইহা মুহূর্ত্তময় গতিতে অত্যন্ত মনোহর ভাবে চলিয়াছে, কোথাও বা বীর রসাবতারণার ঝড়ে স্রোতবেগ তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, কোথাও বা আদি রসাবতারণার আনন্দ রশ্মিতে তরঙ্গ যুক্ত স্রোতবেগে চিকমিক করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কোথাও ইহার সহজ সরল গতি জটিলতা বা হৃর্কোষাতার বাধায় বাহত হয় নাই। ইহা কবির সামান্য কৃতিত্ব ও প্রতিভার পরিচায়ক নহে। যুদ্ধ বর্ণনায় কায়কোবাদ সাহেব কিরূপ অদ্বুত শক্তিশালী তাহাই সম্যক দেখাইবার জন্য আমরা এই বর্ণনাটুকু উদ্ধৃত করিয়াছি।...কোন মুসলমান কবির বঙ্গ সাহিত্যে এ বিষয় কায়কোবাদ সাহেবের সহিত তুলনা হয় না। কায়কোবাদের উপমার গুণ এই, তাঁহার প্রায় সমস্ত উপমাই সুনির্বাচিত এবং উহা আমাদের মনে তাঁহার বর্ণনীয় বিষয়ের এমন একটি সূচক ছবি আঁকিয়া দেয় যে, কবির বক্তব্য আমরা অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া ফেলিতে পারি। মাইকেলের জায় তিনি ভূরি ভূরি উপমা আনিয়া পাঠক হৃদয়কে বিভ্রান্ত করিয়া তুলেন না।

কায়কোবাদ সাহেব “মহাশ্মশান কাব্য” রচনার মৌলিকতার দাবী করিতে পারেন। শত সহস্র গুণ সম্বোধ ‘মেঘনাদ বধ’ ও ‘বৃত্র সংহার’ কাব্যদ্বয়কে মৌলিক সৃষ্টি বলা যাইতে পারে না ; কারণ এ কাব্যদ্বয়ের plot “রামায়ণ” ও “মহাভারত” এই দুই মহাকাব্যের অংশ বিশেষ হইতে গৃহীত। কিন্তু “মহাশ্মশান” রচয়িতার সম্মুখে তেমন কোন সরস মহাকাব্য উপস্থাপিত ছিল না ; মহাশ্মশানের plot নীরস ঐতিহাসিক ঘটনা হইতে সংগ্রহ করিয়া কাব্যের সরস তুলিকায় একরূপ নূতন করিয়া কবিকে আঁকিতে হইয়াছে। ইহাই মহাশ্মশান কাব্যের মৌলিকতা। ... এ সব সঙ্গীত কি কখনো ভুলিবার ? কবি মিঠা হাতে প্রাণের

ভাষায় যে সঙ্গীত উৎস খুলিয়া দিয়াছেন, তাহা চিরকাল গুণগ্রাহী ভাবুক পাঠক অন্তরে অন্তরে রস সিকন করিবে। নিম্নোক্ত নিন্দায় তাহার সৌন্দর্য কখনো ম্লান হইবে না ... কাব্যের যেখানে সেখানে উৎকৃষ্ট ভাব রাজি মনিষ্যের মত কলমল করিতেছে। ... মহাশয়শানের ভাষা সবুজ ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহার ভাষা এতই সরল, সহজ, মধুর কবিত্বপূর্ণ ও অনায়াসগামিনী যে, একমাত্র মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন ব্যতীত বঙ্গ সাহিত্যে আর ইহার তুলনা নাই। কোথাও একটুকু কষ্ট কল্পনা বা ভাষার জড়তার আভাষ পাওয়া যায় না। স্বচাের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে যেন তাঁহার ভাষা-স্রোত আপনা আপনি অত্যন্ত সহজ গতিতে বিনির্গত হইয়াছে। ... কিন্তু আজকালকার অধিকাংশ কাব্য পড়িয়া এ বিষয়ে হতাশ হইতে হয়। সহজে মনে গাঢ় ভাব অঙ্কিত হওয়া দূরে থাকুক, যখন আমরা দেখি যে একটা সামান্য ভাবের কবিতার অর্থ বুঝিবার জন্য ভাষার গোলক ধাঁধাঁ ভেদ করিতেই দারুণ শীতেও আমরা গলদ-ঘর্ম্ম হইয়া পড়ি, তখন স্বভাবতঃই আমাদের মন কবিতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। কায়কোবাদ সাহেব কিন্তু এই দোষ অথবা গুণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁহার কবিতার শ্রায় এমন কর করে প্রাঞ্জল কবিতা আমার বিশ্বাস বঙ্গ সাহিত্যে খুব কমই আছে। ... তিনি সুমধুর বর্ণনার তুলিকায় যে মনোরম চিত্র অঙ্কিত করেন, তাহা বাস্তবিকই বঙ্গ সাহিত্যের গৌরবের জিনিষ। বর্ণনার তুলিকায় মনোরম চিত্র অঙ্কিত করিয়া পাঠকের মনে তাহার একটা সজীব ছবি প্রতিফলিত করিয়া দেওয়াই স্বভাব কবির কার্য। এ কার্যে তিনি যতটা পটুতা ও সুদক্ষতা প্রদর্শন করিতে পারেন, তিনিই তত বড় কবি। কায়কোবাদ সাহেব যে এ বিষয়ে বিলক্ষণ পটু, তাহা মহাশয়শানের পাঠকগণ নিশ্চয়ই সম্যক অবগত আছেন। তাঁহার দিল্লী বর্ণনা মহাশয়শানের একটি রমণীয় অধ্যায়। দিল্লী বর্ণনা পড়িতে পড়িতে মনে হয়, দিল্লী বুঝি আমাদের চক্ষের সম্মুখে বিরাজমান। \* \* \* কায়কোবাদ সাহেব মহাশয়শান কাব্যে ইসলামিক ভাব রক্ষা করিতে পারেন নাই, পরন্তু মোসলেম বিশেষের পরিচয় দিয়াছেন, এইরূপ একটা অত্যন্ত উদ্ভট ও উৎকট কথা সম্প্রতি শোনা যাইতেছে। এ কথাটা জোরের সহিত প্রচার করিয়াছেন লক প্রতীষ্ঠ সাহিত্যিক ভূতপূর্ব 'নবনূর' সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী সাহেব। ঢাকা বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য আমাদের ঘটিয়াছিল। 'তখন আমরা কল্পনাও করিতে পারি নাই যে, তাঁহার হাত হইতে এমন একটা জঘন্য ও নিরর্থক রচনা বাহির হইবে। এখন বাস্তবিক এমন রচনা বাহির হইতে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত লজ্জিত ও হুঃখিত হইয়াছি। \* \* \* সম্প্রতি 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়' প্রকাশিত তাঁহার 'মহাশয়শান কাব্যে অনৈসলামিক ও অশ্রীল ভাব' শীর্ষক প্রবন্ধে যে কাব্য রসজ্ঞতার পরিচয় পাইলাম তাহা নিশ্চয়ই নিতান্ত শোচনীয়। এই প্রবন্ধ পড়িয়া আমাদের বিশ্বাস হইতেছে, হয় তিনি কোন



গুপ্ত ঈশা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য কায়কোবাদ সাহেবের প্রতি এমন অশ্লায় ও অশোভন আক্রমণ করিয়া নিজের সূক্ষ্মচির পরিচয় দিতে পারেন নাই, নতুবা তাহার কাব্য রসজ্ঞতা সন্দেহের কবল হইতে মুক্ত নহে।

প্রথমেই সমালোচক সাহেব এব্রাহিম কাদ্দি ও জোহরা বেগমের বালা জীবনের এক অধ্যায় হইতে কয়েক পংক্তি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া বালক এব্রাহিম ও বালিকা জোহরাকে কল্পনা বলে যুবক ও যুবতী ধরিয়া লইয়া প্রাণপণে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এব্রাহিম কাদ্দি ও জোহরা বেগমের প্রণয় Antinuptial রূপে অঙ্কিত করিয়া কবি ঘোরতর অশ্লায় করিয়াছেন। ইহা বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, কাব্যখানিকে অনৈসলামিক ও ঘোরতর মোসলেম বিদ্বেষপূর্ণ বলিয়া ঘোষণা করিয়া তবে শান্ত হইয়াছেন। কবি এব্রাহিম ও জোহরার মুখে প্রেমের কথা স্থাপন করায় সমালোচক ভয়ানক মাথা গরম করিয়াছেন।

এব্রাহিম ও জোহরাকে যুবক যুবতী ধরিয়া লওয়ার হেতু আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বিবাহের পূর্বে যুবক-যুবতীর মুখে প্রেমের কথা স্থাপন করা অশোভন, ইহা প্রমাণ করিবার এবং তাহাতে কায়কোবাদ সাহেবকে গালাগালি করিবার সুবিধা হইবে, তাহার জন্যই কি সমালোচক এই খোদার উপর খোদকারী করিয়াছেন? \* \* \* বালক বালিকার মধ্যে বাল্য-সুলভ ভালবাসার কথা না আনিয়া ইসলাম ধর্মের বড় বড় বাণী আনিলেই কি কাব্যরসের খুব উৎকর্ষ সাধিত হইত? 'আরব্য উপাখ্যান' নিশ্চয়ই মুসলমান কবি লিখিত, 'লায়লী মজনু'ও নিশ্চয়ই মুসলমান কবির রচিত। ইহাদের মধ্যে Antinuptial love আছে এবং ইহাদের নায়ক নায়িকার মুখে বড় বড় ইসলামের বাণী স্থাপন করা হয় নাই, এই অপরাধে কই ইহাদের বিরুদ্ধে ত কখনো ইসলামের পক্ষ হইতে কোন ঘোরতর দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হয় নাই? মহাশয়শান রচয়িতার দুর্ভাগ্যবশত: আজ সমালোচক সৈয়দ সাহেব কতৃক তাহার কাব্যকে অনৈসলামিক বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। \* \* \* কবি জোহরা চিত্রে যে স্বজাতি প্রেম ফুটাইয়াছেন, তাহা নাকি নিতান্ত অস্বাভাবিক ও অশোভন বলিয়া তাহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থতার আতিশয্যে অভিশপ্ত হইয়াছে।" বটে? তাহা হইলে নিশ্চয়ই বীরাজনা খাণ্ডলা ও বীরবালা চাঁদ সুলতানার কীর্তিসমূহ ইতিহাস অজ্ঞতাবশত: বক্ষে ধারণ করিয়াছে। কারণ তাহা কতকটা অস্বাভাবিক ও অশোভন। \* \* \* জোহরা চরিত্র সৃষ্টি মহাশয়শানের এক অপূর্ব ও অতি সুন্দর সৃষ্টি। ইহা ব্যঙ্গের বস্তু নহে। আমরা কিন্তু বলি, সমালোচক সাহেব পণ্ডিত্য সহকারে মহাশয়শানের অস্বাভাবিকতা ও অশোভন আবিষ্কার করিবার জন্য যে অস্বাভাবিক ও অশোভন চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাই ব্যর্থতার আতিশয্যে অভিশপ্ত হইয়াছে।

তারপর সমালোচক সাহেব মহাশয়শান হইতে হিন্দু ভৈরবী দ্বারা গীত একটি গলা শুব ও একটি কালী সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন যে, কায়কোবাদ সাহেব মুসলমান হইয়াও

মোসলেম বিশেষের পরিচয় দিয়াছেন।.....সমালোচক সাহেব কি বাস্তবিকই এ মত পোষণ করেন? না আর কিছু? ইহাই কি তাঁহার কাব্য রসজ্ঞতার পরিচয়? শ্রেষ্ঠ ইংরেজ উপন্যাসকার Scott তাঁহার Talisman গ্রন্থে মুসলমান সম্রাট সালাহউদ্দীনের মহত্ব ও উদারতা উজ্জলতরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন এবং সালাহউদ্দীনের মুখ হইতে মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে অনেক উচ্চ কথা বাহির করিয়া খ্রীষ্টান ধর্মকেও কলসাইয়া দিয়াছেন, তাতে কই ইংরেজ সমালোচক ত তাঁহাকে জাতি বিদ্বেষী বলিয়া প্রমাণ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যান নাই? ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবি মিল্টন ত তাঁহার L'Allegro Ilpenseroso কাব্যে Greek Mythology হইতে অনেক বুলি প্রাণের ভাষায় আঁড়াইয়াছেন, তাহাতে তিনি অখ্রীষ্টান বলিয়া কখনো ঘোষিত হন নাই। মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণ রাধা-কৃষ্ণের প্রেম লইয়া পদাবলী রচনা করিয়াছেন। মুন্সী আবদুল করিম সাহেব তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহারাই তাই বলিয়া অমুসলমান হইয়া যান নাই। জীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া 'সেখ আবদুল' উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। তিনি এই উপন্যাসে মুসলমান যুবক সেখ. অনূর চরিত্রের মহত্ব ও উদারতা অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, পক্ষান্তরে হিন্দুবালা ললিতা ও জোৎস্নার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে গিয়া তাহাদের কত অধস্ত বৃত্তি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে হিন্দু সমালোচক ত তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন নাই? কায়কোবাদ সাহেব এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হন নাই। তিনি অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই হিন্দুর গৌরবগাথা হিন্দুদের মুখ হইতে বাহির করিয়াছেন। ইহাতে বরং কাব্যের স্বাভাবিকতা রক্ষিত হইয়া কাব্যের সৌন্দর্য্য উজ্জলতর রূপেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা কায়কোবাদের অগৌরবের পরিচায়ক নহে, বরং ইহা তাঁহার উচ্চতর কাব্য প্রতিভা প্রকাশক, অপ্রচ জানিনা, কেন সমালোচক সাহেব কবির এই কৃতিত্বটুকুর উপর কলঙ্কের কালি লেপিয়া দিতে এতটা পণ্ডিত্য করিয়াছেন। কবির দুর্ভাগ্য বটে!!

হিন্দুর 'গঙ্গার স্তব' ও 'কালী-কীর্তন' বর্ণনা মুসলমান কবি কায়কোবাদের অসামান্য কবি-প্রতিভার পরিচায়ক। মুসলমান হইয়াও 'গঙ্গার স্তব' ও 'কালী-কীর্তন' এমন স্বাভাবিক ও কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বর্ণনা করা একমাত্র কায়কোবাদ সাহেবের স্তায় অসামান্য প্রতিভাশালী কবির পক্ষেই সম্ভব। কোন নকল কবির পক্ষে ইহা অসম্ভব। একমাত্র কায়কোবাদ নিন্দার পাত্র নহেন। পরন্তু অসামান্য প্রতিভামান বলিয়া আমাদের গৌরবের পাত্র।.....

সমালোচক সাহেব অনেক আবল ভাবল বকিয়াছেন বটে, কিন্তু আমরা তাঁহার এই ১১ পৃষ্ঠাব্যাপী সমালোচনার মধ্যে তাঁহার কাব্য-রসজ্ঞতার পরিচয়ের নাম গন্ধও খুঁজিয়া পাইলাম না।.....কাব্য-সমালোচনার কাব্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া 'ধর্ম ও নৈতিকতা' লইয়া চীৎকার করিয়া উদ্ভট সমালোচন-জ্ঞানের পরিচয় প্রদান, কাব্য সমালোচনায় তাঁহার অনধি-

কারিকের পরিচয় প্রদান করে মাত্র।...কায়কোবাদ ভারতীয় মুসলমানকে তাঁহাদের কত বড় গৌরবের জিনিষ প্রদান করিলেন, তাহা যে বাঙ্গালী মুসলমান বুঝিতে পারিতেছেন না, ইহা কবির হৃৎস্পর্শ নহে, সমগ্র বাঙ্গালী মুসলমানের হৃৎস্পর্শ।

বাঙ্গালী মুসলমানের হৃৎস্পর্শ যে, তাঁহারা এমন সুন্দর কাব্যের সমাদর করিতে পারিতেছেন না। হিন্দু সমাজে এমন একখানা কাব্য প্রকাশিত হইলে, তাহা যে কিরূপ সমাদর লাভ করিত, তাহা অধুনা প্রকাশিত ‘পৃথ্বীরাজ’ কাব্যের সমাদর দৃষ্টেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। আর আমাদের এই মহাকবির জন্ম ? হায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সেবিকগণ ! কত দিন আর তোমরা এইরূপ হিংসা ও দলাদলির মোহে কাটাইবে ? কত দিন তোমরা যোগ্য জীবনের সম্মান করিতে শিখিবে ? যোগ্য জীবনের সম্মান করিতে না শিখিলে কি অপরের কাছে কখনো সম্মানিত হইতে পারিবে ? সপ্তগাত ১ম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩২৬।

‘সাধনা’ সম্পাদক বলিতেছেন :—বিগত কার্তিক সংখ্যা ‘সপ্তগাত’ পত্রে ভূতপূর্ব “নবনূর” সম্পাদক জনাব মোলবী সৈয়দ এমদাদ আলী সাহেব “আমার উত্তর” শীর্ষক প্রতিবাদে জনাব মোলভী আবুল কালাম মোহাম্মদ সামছুদ্দীন সাহেবের “মহাশ্মশান” কাব্যের সমালোচনার উত্তর দিতে গিয়া অনেক জায়গায় স্বীয় ভ্রান্ত মত ও অযৌক্তিক প্রমাণের অবতারণা করিয়া পদে পদে কেবল মহাকবি কায়কোবাদ সাহেবকেই অপদস্থ ও অপমানিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি “বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়” মহাশ্মশান কাব্যের দোষালোচনা (সমালোচনা নহে, কারণ দোষ গুণ সমানভাবে আলোচনা করার অর্থে সমালোচনা, কিন্তু যেখানে গুণের ভাগ একেবারে বর্জন করিয়া দোষের ভাগই গ্রহণ করা হইয়াছে, আমরা তাহা দোষালোচনা বই আর কিছুই বলিতে পারি না) করিয়া মহাকবি কায়কোবাদ সাহেবকে একেবারে কুৎকারে উড়াইয়া দিয়াছেন। বিগত আষাঢ় সংখ্যা ‘সপ্তগাতে’ আবুল কালাম সাহেব যুক্তিমূলক প্রমাণ প্রয়োগে তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া সৈয়দ সাহেবের ভ্রান্ত মতের অপনোদন করিতে প্রয়াস পান। সৈয়দ সাহেব কার্তিক সংখ্যা ‘সপ্তগাতে’ এই প্রতিবাদের উত্তরে যে কতকগুলি মারাত্মক ভ্রান্ত মতের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার কতকংশ নিজের স্বীকারানুসারে অবাস্তবে পরিণত হইয়াছে। ....সৈয়দ সাহেব ‘মহাশ্মশান’ কাব্যের সমালোচনা করিতে গিয়া কাব্যের দোষের ভাগই (তাহার মতে) কেবল গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি গুণের দিকে ভুলেও একবার দৃষ্টিপাত করেন নাই। এ তিনি নিজেই স্বীকার করিয়া এক জায়গায় লিখিয়াছেন “বাহিরের বাহারের দিকে আমাদের চোখ না পড়িয়া ভিতরের কুৎসিত কঙ্কালটার দিকেই আমাদের দৃষ্টি পতিত হয়।” সুতরাং ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, তিনি পরজীকাতর ও দোষানুসন্ধিৎসু ; এবং প্রতিবাদ মূলে বাহা লিখিয়াছেন, কোন গুণ স্বীকার বশবর্তী হইয়াই লিখিয়াছেন। নতুবা

লোক চক্ষুতে প্রথম বাহিরের দিকটাই পতিত হয়, ভিতরের দিকটা অবশ্য পরে পরে দৃষ্ট হইতে পারে। তিনি (নিজের উক্তি অনুসারে) লোক বা লোক কার্যের ভালর দিকটা দেখেন না, কেবল মনের দিকটাই দেখেন, কাজেই দোষানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি যে লোকের গুণটাকেও দোষরূপে দেখিবেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

সজ্জনা গুণ মিচ্ছন্তি মধু মিচ্ছন্তি যটপদাঃ

মক্ষিকা ত্রণ মিচ্ছন্তি, দোষ মিচ্ছন্তি পামরাঃ

কাজেই স্মারিতঃ কার্যকলাপে লোকের গুণ গ্রহণই সম্ভব।

সৈয়দ সাহেব প্রথম সমালোচনায় দেখাইয়াছিলেন যে, কায়কোবাদ সাহেব কাব্যে হিন্দু শান সৌকর্য্য হিন্দু শৌর্য্য, বীৰ্য্য, হিন্দু জ্ঞান-বুদ্ধি যতদূর ফুটাইয়াছেন, মোছলমানদের বেলায় তিনি তাহা ফুটাইতে পারেন নাই। ইহা সৈয়দ সাহেবের ভুল ধারণা। কবির কবিত্ব চাতুর্য্যো সৈয়দ সাহেব প্রবেশ করিতে পারেন নাই। একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিলেই সহজে উপলব্ধি হইবে যে, হিন্দু শৌর্য্য-বীৰ্য্যের বর্ণনা করিয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কবি মোসলমান শৌর্য্যবীৰ্য্যকেই অধিকতর ফুটাইয়াছেন। যদি কেহ বলে যে “অসাধারণ শৌর্য্য বীৰ্য্যশালী, মহাপরাক্রমশালী “কস্তুর” সেই দিন এক শৃগাল বধ করিয়া স্বীয় বাহুবলের পরিচয় দিয়াছেন” এখানে শৃগাল বধে কস্তুরের শৌর্য্য বীৰ্য্যের কোনই মূল্য নাই। আর যদি বলে যে “কস্তুর পরাক্রমশালী পশুরাজ সিংহ বধ করিয়া বাহুবলের পরিচয় দিয়াছেন” এ স্থলে প্রত্যক্ষভাবে কস্তুরের শৌর্য্য বীৰ্য্যের বর্ণনা না করিলেও পরোক্ষভাবে তাহারই শৌর্য্য বীৰ্য্যের কি প্রকাশ পাইতেছে না? এমতাবস্থায় কায়কোবাদ সাহেব হিন্দু জাতির অসাধারণ শৌর্য্য বীৰ্য্য ও প্রতিভা দেখাইয়া পরিণামে মোসলমানের হাতে পরাজয় করাইয়াছেন। তখন হিন্দু শৌর্য্য বীৰ্য্য অপেক্ষা মোসলমানের শৌর্য্য বীৰ্য্য যে আরও অধিক, তাহা কি ধরিয়া লইতে হইবে না?

আমার বিশ্বাস, তিনি কায়কোবাদ সাহেবের ‘মহাশ্মশান’ কাব্যকে অতীব পবিত্রতার চক্ষে দেখিতেন, কবিকেও প্রাণের সহিত ভক্তি করিতেন, এ সম্বন্ধে তিনি প্রবন্ধে নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—“আমি তাহার (কায়কোবাদের) কবিত্ব প্রতিভার সম্মান করি” আর এক জায়গায় লিখিয়াছেন “তাহারই আদর্শের অনুসরণ করিয়া আমি প্রথম সাহিত্য সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।”

কতকগুলি শব্দের একত্র যোজনায় কবিদের কবিত্ব শক্তি হইতে পারে না। যে শক্তি নূতন নূতন নীতিপূর্ণ সন্দর্ভের সৃষ্টি করিয়া সাহিত্যের অঙ্গপূর্ণ ও সৌন্দর্য্য বর্ধন করে, তাহাই কবিত্ব শক্তি, সুতরাং এ শক্তি কায়কোবাদের নিশ্চয়ই আছে, নতুবা সৈয়দ সাহেব এ কবিত্ব-শক্তির সম্মান করিবেন কেন? তাই বলি আধুনিক কোন আন্তরিক মনোবাদের কারণেই



সৈয়দ সাহেব অথবা সমালোচনার বহর ছুটাছুটিয়া কায়কোবাদ সাহেবকে অপদস্থ করিতে প্রয়াসী হইয়া থাকিবেন।

সৈয়দ সাহেব কেবল কায়কোবাদ সাহেবের কবিত্ব শক্তিকে সম্মান করিতেন এমন নহে, তিনি সেই “মহাশ্মশান” কাব্যের প্রতি ছত্রে, প্রতি শব্দে বাক্যে বাক্যে ভাব মাধুর্য্যো, নীতি ও উপদেশ লাভে মুগ্ধ হইতেন, তাই তিনি মহাশ্মশান কাব্য অবসর-সহচর রূপে নিত্য পাঠ করিতেন। কারণ তিনি নিজেই এক জায়গায় লিখিয়াছেন “আবুল কালাম সাহেব যে “মহাশ্মশান” কাব্য দশবার পড়িয়াছেন, তাহার লক্ষণ তাহার রচনায় না দেখিয়া বিনিমিত হইলাম। “সুতরাং আবুল কালাম সাহেব দশবার পড়েন নাই, তিনি দশাধিকবার নিশ্চয়ই পড়িয়াছেন। যেই গ্রন্থ ভাব, ভাষা, অর্থ ও নীতিপূর্ণ না হইবে, তাহা কেহই একাধিকবার পড়ে না; তাহা হইলে “মহাশ্মশান কাব্য” সবই আছে, সৈয়দ সাহেবের প্রাণের কথাও আছে, নতুবা তিনি মোসলমানের কোরান তেলাওতের (পাঠের) মত, হিন্দুদের “রামায়ণ, মহাভারত” প্রভৃতি ধর্ম গ্রন্থের মত “মহাশ্মশান” কাব্যের তেলাওত করিবেন কেন? অথবা সৈয়দ সাহেব কাব্যের দোষ বাহির করিবার মানসে বার বার ইহা পাঠ করিয়া থাকিবেন। ছাফের জলীয়াংশ বাহির করিয়া ফেলিতে হইলে অনেকক্ষণ ধরিয়া সিদ্ধ করিতে হয় কি না? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ধরিতে হইবে যে, নিশ্চয়ই কায়কোবাদ সাহেবের সহিত সৈয়দ সাহেবের কোনও প্রকার মনোমালিঙ্গ ঘটিয়াছে। নতুবা বাজারে অসংখ্য নাটক, নভেল, উপন্যাস, নবন্যাস, বাহির হইতেছে, যাহার দোষালোচনা করিতে গেলে প্রতি বর্ণেরই করা যায়, কই, সৈয়দ সাহেব এইগুলির প্রতিবাদ বা দোষালোচনা ত করিতেছেন না?

সৈয়দ সাহেব নিজেই স্বীকার করিতেছেন যে, তিনি কায়কোবাদ সাহেবের আদর্শেই নিজেকে গঠন করিয়াছেন, সুতরাং স্বীকারোক্তি মূলে কায়কোবাদ সাহেব সৈয়দ সাহেবের গুরু। কায়কোবাদ সাহেব আদর্শ, সৈয়দ সাহেব নকল, এমতাবস্থায় নকল আদর্শকে, শিষ্য গুরুকে অনুচিতভাবে অন্তায় আক্রমণ করা কতদূর সমীচীন, তাহা সৈয়দ সাহেব নিজেই একবার চিন্তা করিবেন। এইজন্য সেখ সাদী বলিয়াছেন—“আয় সাদীয়া সিরাজীয়া, পন্দে মদেহ” ইত্যাদি।

সৈয়দ সাহেবের প্রবন্ধের প্রায়শই যে হিংসাদ্বৈষপূর্ণ তাহা অস্বীকার করিবার কোনও উপায় নাই। তিনি প্রবন্ধের অনেক স্থানে কায়কোবাদ সাহেবের কবিত্ব শক্তির প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে মহাকবি বলিয়াও স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু কাজের বেলায় কায়কোবাদ সাহেবের সম্মান দেখিয়া ইর্ষায় একেবারে ভুল্লয় হইয়া গিয়াছেন। বাগ্মীবর সিরাজী সাহেব মহাকবি কায়কোবাদ সাহেবকে তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির সম্মান করনোদ্দেশ্যে তাঁহাকে জরির টুপি ও সোনার দোয়াত কলম উপহার দেওয়ার উদ্যোগ করিতে দেখিয়া সৈয়দ

সাহেব একেবারে অস্থির হয়ে পড়িয়াছেন। তাই তিনি সুর বদলাইয়া এবার শান্তিপুরের মোজাম্মল হক সাহেবকেই এই উপহারের উপযুক্ত কবি বলিয়া নির্বাচন করিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য ভ্রান্তি। ইহার কি ভয়ানক মারাত্মক প্রভাব ॥

কায়কোবাদ সাহেব মহাকাব্য রচয়িতা মহাকবি, মোসলমান সমাজের গৌরব রবি, আজ হিন্দু সমাজে কায়কোবাদের জন্ম হইলে তাঁহার স্থান কতই উপরে থাকিত। কবিশ্রু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্য্যন্ত কায়কোবাদের আসনে সমাসীন হইতে পারিতেন না। মোজাম্মল হক কবিশ্রের হিসাবে কায়কোবাদের কাছ দিয়াও যাইতে পারেন না। তিনিই আজ সৈয়দ সাহেবের মতে কায়কোবাদের পরিবর্তে কবিশ্রের উপহার পাওয়ার যোগ্য। ভ্রান্তির সীমা ইহা অপেক্ষা যে আর কতদূর গড়াইতে পারে, তাহা আমরা জানি না। কায়কোবাদ সাহেব যে মহাকবি, খাঁটি কবি, প্রতিভাশালী কবি ইহা সৈয়দ সাহেব নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি এ সম্বন্ধে ১৩০৩ সালের ৭ম সংখ্যা “মিহির ও সুধাকর” পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন— “অশ্রুমালা কবির মত প্রতিভাশালী কবিকে পাইয়া আমরা আশাবিহীন ও গৌরবাহীন হইয়াছি। \* \* \* তিনি মুসলমান সমাজের বর্তমান সর্বশ্রেষ্ঠ কবি”। সর্বশ্রেষ্ঠের উপর আর কি কথা হইতে পারে? Best এর পর Better বসিতে পারে না। Better এর পরে Best বসিতে পারে। মহাকবি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কবির উপাধি ত তিনি কায়কোবাদ সাহেবকেই দিয়া ফেলিয়াছেন, এখন মোজাম্মল হক সাহেবকে ইহার উপর কোন্ উপাধিতে তিনি ভূষিত করিয়া উপহারের উপযুক্ত করিয়া নিবেন বলিতে পারেন কি? \* \* \*

সকলেই বোধ হয় এখন নিঃসন্দেহে স্বীকার করিতে পারিবেন যে, সৈয়দ সাহেব কোন গুণে ইহার বশবর্তী হইয়াই “মহান্মশান” কাব্যের অযৌক্তিকতা দোষালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা আশা করি এখন হইতে এ সম্বন্ধে আর কোন বাদ প্রতিবাদই হইবে না। ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে বর্তমান সময়ে সমগ্র বঙ্গ দেশেই কায়কোবাদ সাহেব মহাকবি। সাধনা ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩২৬।

সংগাত লিখিয়াছেন :—ইনি বঙ্গীয় মুসলমান কবি কুলের গৌরব। “মহান্মশান” ইহার অমর কীর্তি। সংগাত ১ম বর্ষ—১ম খণ্ড—১ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

বঙ্গের অদ্বিতীয় বাগ্মী কবির সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী সাহেব মোহান্মদী পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন :—

মহাকবি কায়কোবাদ। কবি প্রকৃতির অষ্ট সৃষ্টি। কবি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, স্বভাব বৈচিত্র্যপূর্ণ মাধুর্য্য এবং সমাজের অবস্থার চিত্রকর। তাহার সুনিপুণ করাঙ্কিত চিত্রপটে বিশ্ব শিল্পের অপকল্প ক্ষমতা চাতুর্য্য এবং সংসার জীবন ও সমাজনীতির সত্য স্বরূপ উজ্জলরূপে ফুটিয়া উঠে। কোন জাতি যখন মরণ সাগরের তলে নিমজ্জিত হইয়া পড়ে, তখন কবির

স্বর্গীয় বীণা-ধ্বনিই সে জাতিকে যত্নের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া জীবন তটে উপস্থাপিত করিয়া থাকে। জাতীয় উত্থান চিন্তা বিভোর কবির জীবন-সঙ্গীত জাতির প্রাণে প্রাণে মন্মেষ মন্মেষ নবীন আশার তরুণ অরুণ কিরণে নবীন জীবন, নবীন আনন্দ ও নবীন পুলক ছড়াইয়া দেয়। \* \* \*

বর্তমানে বঙ্গদেশে যে কয়েকজন কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মহাকাব্য, কাব্য ও সঙ্গীতাদি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে মাইকেল মধুসূদন, নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্র সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বরণীয় এবং স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। ইঁহারা তিন জনেই মহাকাব্য প্রণেতা। জীবিত কবিদিগের মধ্যে হিন্দু ও মোছলমান নির্বিশেষে কায়কোবাদ সাহেবই একমাত্র মহাকবি। হিন্দু সমাজেও মহাকাব্যের কবি একজনও নাই।

যে রবীন্দ্রনাথের গৌরবে আজ বাংলাদেশ আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছে; তিনিও মহাকবি নহেন। তিনি শুধু গীতি কবি (Lyric poet)। তিনি বহু সংখ্যক সঙ্গীত, গাথা ও কবিতা রচনা করিয়াছেন বটে; কিন্তু একখানিও মহাকাব্য লেখেন নাই। সঙ্গীত গাথা ও কবিতা বসন্তের ফুলের স্থায়, উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। অনেকগুলিই কবির যত্নের সঙ্গে সঙ্গেই ঝরিয়া পড়ে। তবে বিশেষ বিশেষ কবিতা অবশ্য দীর্ঘকালও স্থায়ী হয়। কিন্তু মহাকাব্য 'হিমাচলের মত জিনিষ, যতদিন মানব সমাজ থাকিবে, ততদিন উহাও থাকিবে। আজ কত কাল হইল বাস বাসিকী হোমার ও ফেরদৌসী পরলোক গমন করিয়াছেন, কিন্তু নিখিল জগতের সুখী মণ্ডলী তাঁহাদের কাব্য-রসায়িত পানে আজও সরস ও উৎকুল হইতেছেন। কিন্তু তাহাদের সম সময়ে কত কত গীতি-কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশীধ্বনিতে একদিন কত নগর ও জনপদ সুখা-লহরীতে ভাসমান ও প্রাবিত হইয়াছিল; কিন্তু আজ তাহার সমস্তই নীরব ও নিষ্পন্দ।

মহাকবি কায়কোবাদের লেখা যেমন সরল ও সরস, ভাবও তেমনি পবিত্র এবং উদার। তাঁহার মহাকাব্য বঙ্গভাষার “রাণীর কহিনুরে”র স্থায় জল জল করিয়া জলিতেছে। তাঁহার “মহাশ্মশান” বাস্তবিকই বিশ্ববিজয়ী বিপুল গৌরবশালী মোসলমানের অনন্ত কীর্তির মহা গোরস্থান। এই মহাকাব্যের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে কবির অমৃতলহরী ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে। সঙ্কদয় ভাবুক পাঠকের অন্ত ইহাতে রসান্বাদনের অনেক জিনিষ আছে। এই কাব্যের সমালোচনা করিতে হইলে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লেখার আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু যে কাব্যের প্রায় দুই সংস্করণ শেষ হইয়া গিয়াছে; যাহা শিক্ষিত হিন্দু মুসলমানের ঘরে ঘরে পঠিত হইতেছে, যাহার নানা অংশ অনেক পাঠ্য বহিতে উদ্ধৃত হইয়াছে; যাহার এক অংশ লইয়া ‘নজীউদ্দৌলা’ নামক নটক (মৌলভী আবদুল গণি মালদহী সঙ্কলিত) পর্যন্ত রচিত হইয়া গিয়াছে, সেই সুপ্রতিষ্ঠিত এবং লক্ষণঃ মহাকাব্যের সমালোচনা করিতে যাওয়া



নিভাস্ত নিশ্চয়োজন। সে কাব্যখানির জন্ত এ অধম এক বৎসর পূর্ব হইতে কবিকে অভিনন্দন ও উপহার দানের সম্বন্ধে বহু বহু বাক্যব এবং লোকের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছি ; তাহার সমালোচনা করিবার কোন দিনও মনে হয় নাই। যে কায়কোবাদের অশ্রমালা পাঠ করিতে পাষণ্ড ব্যক্তির চোখেও ধারা বহিয়া থাকে, যে অশ্রমালার কতকগুলি গীতি কবিতা বঙ্গভাষায় অতুলনীয় ; সেই কায়কোবাদের কাব্যের সমালোচনা কি করিব ? কায়কোবাদ বঙ্গীয় মুসলমানের গৌরবের উন্নত পতাকা। কায়কোবাদ অন্ধ তমসচ্ছন্ন আকাশে উজ্জ্বল নব শশিকলা। আজি বাংলার নব্য মোহলেম যুবকদিগকে ডাকিয়া বলিতেছি কায়কোবাদের “মহাশ্মদানের”র—মহাগৌরবস্থানের পবিত্র ধূলিতে ভাল করিয়া তোমরা পবিত্র হও। কায়কোবাদের প্রতিভা এবং কবির অতুলনীয় ও অসাধারণ। বঙ্গের কাব্যাকাশে তিনি পূর্ণচন্দ্র।

উপসংহারে আমরা মহাকবি কায়কোবাদ সাহেবকে অভিনন্দন ও উপহার দিবার জন্ত বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট বিশেষতঃ কবির অনুরক্ত, ভক্ত, হিতৈষী ব্যক্তিদিগের নিকট আমি ৩০০ টাকা সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। আগামী পূজার বন্ধে তাঁহাকে একটি অভিনন্দন পত্র ও তৎসঙ্গে জরির টুপী এবং সোণার দোয়াত কলম উপহার দেওয়া হইবে। এ অধম ৫০ টাকা দিতে প্রস্তুত আছে। সাহিত্য ও কাব্যের ভক্তদিগের নিকট বাকী মাত্র ২৫০ টাকা চাই। \* মোহাম্মদী ১৩শ বর্ষ, ২৩শে শ্রাবণ, ১৩২৬।

এই যুগে—অর্থাৎ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যিকদের এই দলাদলির যুগে মহাকবি কায়কোবাদের প্রধান ভক্ত কবির সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী সাহেবের অকাল মৃত্যুতে তাঁহার যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা আর পূরণ হইবার নহে। মহাকবি যুক্তাগাছা থাকাকালীন সিরাজী সাহেব তাঁহার বাসায় যাইয়া তাঁহার ছেলেমেয়েদিগের হস্তে টাকা পর্যাশ্র দিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার জন্ত তিনি তাঁহার নিজের টাকা ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। কেহ তাঁহার (কবি কায়কোবাদের) নিন্দা করিলে তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহার প্রতিবাদ করিতেন। তাঁহার অর্ভাঙ্গিত কার্য তিনি সমাধা করিয়া যাইতে পারেন নাই। শুধু টাকা দিতে স্বীকৃত ছইজন সাহিত্য সেবীর অমনোযোগিতার দরুণ, তিনি দুঃখ

● বাঁহারা সাহায্য দিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম :—মহাম্মদী সম্পাদক মোলানা মহাম্মদ আকবর খাঁ সাহেব ৫০ টাকা, মোলানা এছলামাবাদী সাহেব ৫০ টাকা, মোলভী নাজির আহমদ সাহেব ২০, মোলভী ছোলেমান খাঁ সাহেব ২০, মিঃ মোহাম্মদ ইউসা খাঁ সাহেব ৫০, মোলভী আশরফ আলী খাঁ সাহেব ২০, মোলভী ফররোখ আহমদ নেজামপুরী সাহেব ২০, মোলভী আলী আহমদ গুনি সাহেব ২০, মুন্সী আবদুর রহিম সওদাগর সাহেব সাতকানিয়া ২০, মোলভী তমিজর রহমান সাহেব ২০, মোখদুমী নাইশ্রেণী ১০। “মহাকবি কায়কোবাদ” শীঘ্র প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। সাপ্তাহিক মোহাম্মদী ১৩শ বর্ষ, ২৩শে শ্রাবণ, ১৩২৬।

করিয়া কবিকে তাঁহাদের নাম জানাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে আর লজ্জা দিতে ইচ্ছা করি না। বর্তমানে মহাশ্মশানের কবির যে ছ'চারিজন ভক্ত আছেন, সিরাজীর মত তাঁহাদের সাহসও নাই—শক্তিও নাই। কাজেই যাহার যা' ইচ্ছা, তাহাই বলিতেছে, প্রতিবাদ করার ত কেহ নাই।

রাজসাহী Girls স্কুলের Class X এর একজন ছাত্রী (কুমারী) মোহাম্মদী পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন:—প্রবীণ কবি কায়কোবাদের সম্বর্ধনার আয়োজন সংবাদের পরম আশ্লাদিত হইয়াছি। বাঙ্গলার মুছলমান মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে যখন অধঃপতনের দিকে পা বাড়াচ্ছিল, ঠিক সেই সময় মহাশ্মশানের কবি কায়কোবাদ শ্মশানের ভগ্নস্বপে দাঁড়িয়ে নও জীবনের জাগরণ সঙ্গীত শুনালেন। তাঁর হাতের আলোক বক্তিকার রশ্মিই আমাদের প্রাণে ভাষার অন্ধুর রোপণ করেছে। তাই বাঙ্গালা ভাষায় মুসলমানের ফুলের ফসল দিয়াছে। সম্বর্ধনা কায়কোবাদকে সম্মান দেখাবার জন্য নয়, সাধনা গত প্রাণ কায়কোবাদের চরণপ্রান্তে আমাদের মানবতার অর্ঘ্য নিবেদন মাত্র। আপনাদের উৎসবে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি। আহুমা খাতুন। মোহাম্মদী ২৫শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ২৭ জৈষ্ঠ ১৩৩৯।

“নূরনবী” “শান্তিধাবা” প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী বি. এ. লিখিয়াছেন:—কোথায় সেই মোস্তেম কবিকুল কেশরী কায়কোবাদ? যাহার “অশ্রুমালা” মুক্তাবলক দেখিয়া সমবেদনার অশ্রু মুছিতে মুছিতে বিষ্ময়ে ও আনন্দে নয়ন বিক্ষারিত করিয়াছিলাম, যাহার মহাশ্মশানের গভীরা-গভীর বিরাট ভাব বন্ধারে অপক্লপ ভক্তি রসে মস্তক অবনত করিয়াছিলাম। যাহার “আল্লাহো আকবরের” আস্থানে জাগরিত হইয়া পানিপথের বিজয় মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলাম। দিল্লী ও আগ্রার বৃকে মোস্তেম গৌরবের সমাধি-শর্যা দর্শন করিয়া অশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলাম, তাঁহার স্বর্গীয় বীণা নীরব হইল কেন? “কোহিনূর” ও “নবনূরের” প্রভাত আলোকে জাগরিত হইয়া যাহার সাদা গলার মোহন বন্ধারে বাঁশরীর বিচিত্র মধুর রাগিণী শুনিয়া পাঠককুল অপূর্ব রসভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, মোসলমানের সেই চির প্রিয় কায়কোবাদ অজ্ঞাতবাসে প্রস্থান করিলেন কেন?

লক্ষ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক মোলভী মুকল হোসেন কাসিমপুরী সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক কেদারনাথ মজুমদারকে লক্ষ্য করিয়া ১৯১৩ সনের ১৮ই জুলাই তারিখের ৫ম বর্ষের ১৪শ সংখ্যা “ইসলাম রবি” পত্রিকায় “একচোখে” ঐতিহাসিক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন:—..... ঢাকার বিবরণে সাহিত্য ও সাহিত্যিকগণের একটা লম্বা চোড়া তালিকা দিয়াছেন। সেই তালিকায় তাঁহার স্বজাতি স্বধর্মাবলম্বীগণের মধ্যে বড় বড় কই কাতলা হইতে চুনো পুঁজি

পর্যন্ত বাদ যায় নাই। কিন্তু মুসলমানের বেলায় তিনি অন্ধ, কিছুই দেখিতে পাইলেন না। মহাকবি কায়কোবাদের “অশ্রুমালা” ও “মহাশ্মশানের” জায় মহাকাব্যখানিও কি তাঁহার চোখে পড়িল না? যে কায়কোবাদের কাব্যসুধা পানে বর্জায় হিন্দু মুসলমান ও ব্রাহ্ম খৃষ্টিয়ান বিমোহিত বিভোর, যে কাব্যখানি বাহির হইলে সাহিত্যের বাজারে ছলছল পড়িয়া গিয়াছিল, মুসলমানের বাজালা ভাষায় অভাবনীয় অধিকার দর্শন করিয়া হিন্দু সহযোগী-গণও ধস্তাধস্ত করিয়াছিলেন, সেই “মহাশ্মশান” কাব্যের কায়কোবাদও কি কেদার বাবুর চক্ষে পড়িল না? ইহা হইতে একদেশদর্শিতা আর কি হইতে পারে? বলি গুরুদেব! কায়কোবাদের মত একজন উচ্চদরের কবি পূর্ববঙ্গের হিন্দু সমাজে বর্তমানে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে কি? কায়কোবাদের কবিত্বের রসাস্বাদন করা গুরুদেবের ভাগ্যে ঘটয়াছিল কি? আমরা এ সমস্ত কথার উত্তর চাই। উল্লেখ্য রবি, ৫ম বর্ষ, ১৪শ সংখ্যা, ১৮ই জুলাই, ১৯১৩ সন।

রাজসাহী নগরীও হইতে মহাশ্মশানের কবির একান্ত ভক্ত “টাননীচক” কাব্যের উদীয়মান কবি মোহাম্মদ কাজী মোজাফ্ফর হোসেন খাকী সাহেব লিখিয়াছিলেন :— আপনি বর্তমানে মোসলমান সমাজের সর্বাশ্রিত কবি, তাই আপনাকে আমি আন্তরিক ভক্তি করিয়া থাকি। আমাদের এখানকার অনেকেই আপনার স্মৃতি অমর করিয়া রাখিতে ইচ্ছুক এবং আপনার হস্তাক্ষর দেখিতে বিশেষ আগ্রহাশিত।

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মোলভী আবদুল গফুর জালালী লিখিয়াছিলেন :—বঙ্গের দ্বিতীয় মাষ্টার মহাকবি কায়কোবাদ সাহেবের অমৃতময়ী লেখনীপ্রসূত মহাশ্মশানের সুমধুর বীণা-বজ্র ও প্রচণ্ড ছন্দুভি ধ্বনির আশ্বাদ মর্মে মর্মে অমৃতব করিবার মৌভাগ্য এ দীনের হইয়াছে।\*\*\* কায়কোবাদ সাহেবের “মহাশ্মশান” ত দূরের কথা, খণ্ড কবিতাগুলিও ভালবাসিয়া থাকি।

মুর্শিদাবাদ—বেলডাঙ্গা—বেগুনবাড়ী হইতে মোলভী মেথ আবদুল্লা সাহেব লিখিয়াছেন :—“অশ্রু-মালা” ও “মহাশ্মশান” কাব্য পাঠ করিয়া এরূপ মুগ্ধ হইয়াছি যে, আর কোন কবিতা বা কাব্য পাঠ করিয়া তেমন মুগ্ধ হই নাই। তাই আপনার পুস্তক দুইখানি কণ্ঠ মালা করিয়া রাখিয়াছি; সর্বদা ঐ পুস্তকদ্বয়ের কবিতাগুলি পড়িয়া থাকি; এমন কি রাত্রেও আমার বিরাম নাই। জনাবের কবিতাগুলির এমন একটি মোহিনী শক্তি আছে যে, যে পাঠক তাহা পড়ে, সে মোহিত না হইয়া থাকিতে পারে না।\*\*\*

সুসাহিত্যিক আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী M. L. A. বার্ষিক সঙগাতে লিখিয়াছিলেন :  
..... কায়কোবাদ স্বভাব কবি, তাঁহার রচনার ভাষা প্রোজল ও মধুর। বাল্যে ও যৌবনে তাঁহার উপর মাইকেল ও হেমচন্দ্রের কাব্যাবলীর প্রভাব বিস্তৃত হইলেও তিনি কাব্য রচনায়

কবির নবীন চম্পেরই অনুসরণ করিয়াছেন। ...এমনকি তিনি নবীনচন্দ্র অপেক্ষাও সহজ সরল ভাষা ও কোমল শব্দাবলী ব্যবহার করিয়াছেন। অধুনা জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির আন্দোলনের দিনে “মহাশ্মশান” প্রভৃতি কাব্যসমূহের জায় উদার ও উন্নত আদর্শের কাব্য লাভ করা কম গৌরব ও প্রশংসার বিষয় নহে।

এ যাবৎ কায়কোবাদ সাহেব “মহাশ্মশান” “অশ্রুমালা” “শিব-মন্দির” ‘অমিয় ধারা’ ‘আত্ম-বিসর্জন’ কাব্য লিখিয়াছেন। ইহা বাতীত “সুধাকর” “কোহিনূর” “নবনূর” পত্রিকা হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত মুসলমান সমাজে যত সাময়িক পত্রিকা বাহির হইয়াছে, তাহাদের প্রায় সবগুলিতেই কায়কোবাদ সাহেবের ভাব সৌন্দর্যপূর্ণ সরস কবিতাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। বিগত অর্ধ শতাব্দী কাল বলিতে গেলে একমাত্র কায়কোবাদের কবিতাই বিবিধ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের গৌরব রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

কায়কোবাদ যে সময় কাব্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন, তখন মুসলমান বাঙ্গলা সাহিত্যের নিতান্ত শৈশব অবস্থা। সেই অবস্থার মধ্যে কায়কোবাদের জায় একজন শক্তিমান কবি প্রতিভার আবির্ভাব বাঙ্গলার মুসলমান কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে একটা চিরস্মরণীয় ঘটনা। বার্ষিক সঙ্গাত, ১৩৩৩ সন।

বহুদিন হইল এই সমালোচক সৈয়দ সাহেব “মিহির ও সুধাকর” পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন “অশ্রু-মালার” কবির মত প্রতিভাশালী কবিকে পাইয়া আমরা আশাবিহীন ও গৌরবাহীন হইয়াছি। অশ্রুমালা পাঠ করিয়া আমরা এই বুঝিয়াছি, তিনি মুসলমান সমাজের বর্তমান সম্বন্ধে কবি।.... মুসলমান সমাজে এমন কবির যদি আদর না হয় তবে বুঝিব আমাদের এখনও উন্নতি হয় নাই। ... কবিতা পাঠ করিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই। এমন কবিতা যিনি লিখিতে পারেন তিনিও ধন্য আর আমরাও ধন্য। ... অশ্রু মালার সমালোচনা করিতে বসিয়া আমরা মহাগণ্ডগোলে পড়িয়াছি, কোন্ স্থান ছাড়িয়া কোন্ স্থান উদ্ধৃত করিব? সকলি যে মনোরম, সকলি যে হৃদয় উদ্গাদক। ... এমন সুন্দর, এমন সরল কবিতা মুসলমান বাঙ্গলা সাহিত্যে আছে কি?” মিহির ও সুধাকর ৭ম খণ্ড, ভাদ্র ১৩০৩।

তিনি তাঁহার “নবনূর” পত্রিকায়ও লিখিয়াছিলেন :—আমরা এ কাব্য পাঠ করিয়া আরপরনাই প্রীতি লাভ করিয়াছি। কবি কায়কোবাদ নব্য মুসলমান কবিদের মধ্যে অতি আসন পাইবার উপযুক্ত। তাঁহার ভাষা বিস্তৃত, প্রাঞ্জল ও মর্ম্মস্পর্শী, ভাব পবিত্র, হৃদয় নাহর। এমন বিস্তৃত ভাষায় এমন সুন্দর কবিতা আমাদের অত্যন্ত মুসলমান কবিই লিখিতে পারেন।.....

কায়কোবাদের রচনা কি তীব্র মাদকতাপূর্ণ ও করুণ, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অপেক্ষা  
অসম্ভব করাই সহজ ।.....

কায়কোবাদের মত পূজ্যজনের উপযুক্ত সমাদর না ঘটিলে মুসলমান সমাজের আয়ো  
লাভ আজও সুদূরপরাহত বলিয়াই বৃদ্ধিতে হইবে । নবনূর, ৪র্থ সংখ্যা, দ্বিতীয় বর্ষ ।

এই সমালোচক সাহেব এক সময়ে ঢাকা রহমতগঞ্জের বাসায় কবি কায়কোবাদের সহিত  
“মহান্মশান” কাব্য সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়া বৃদ্ধিয়াছিলেন যে, মহান্মশান কাব্য  
মুসলমানদের অতি গৌরবের জিনিষ, তাই তিনি হিন্দুর সাহায্য না লইয়া কেবল মুসলমানদের  
অর্থেই ইহা মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন । \* একান্ত “মিহির ও সুধাকর” পত্রিকায়  
তাঁহার প্রবন্ধ ধারাবাহিকরূপে বাহির হইয়াছিল । “মহান্মশান” ভারতীয় মুসলমানদের  
গৌরবের জিনিষ ; সুতরাং ইহা মুসলমানদের সাহায্য লইয়াই বাহির করা উচিত, ইহা  
মুসলমানদিগকে জানাইয়া সৈয়দ সাহেব তাঁহাদের সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু এত  
করিয়াও তিনি তখনকার নিম্নিত মুসলমানদের নিজা ভগ্ন করিতে পারিয়াছিলেন না । অগত্যা  
কবি তখন হিন্দুদের সাহায্য লইয়া মহান্মশান ছাপাইতে সঙ্কল্প করেন । সেই সময় ধনবাড়ীর  
স্বনামধন্য জমিদার ও মিনিষ্টার নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, কবির কনিষ্ঠ ভ্রাতা খান  
সাহেব ডাক্তার এম, আবদুল বারি এসিসট্যান্ট সার্জেন ও কবির কনিষ্ঠা ভগ্নীপতি মৌলভী  
আকতাবদ্দীন আহমদ † কবিকে কিছু অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন । আরও পাঁচজন হিন্দু  
ভদ্রলোক ‡ ও কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন । অতঃপর হিন্দু মুসলমানের মিলিত  
অর্থে মহান্মশান প্রেসে দেওয়া হয় । ইহার কিছু পূর্বে কোন একটা পারিবারিক ঘটনা লইয়া  
কবির সহিত সৈয়দ সাহেবের মনোমালিন্য ঘটে । সৈয়দ সাহেব কোন একটি কার্যের জন্য  
আগ্রহাধিত ছিলেন, এবং তাঁহার পিতা-মাতা ও মাতামহ সেই কার্যের জন্য বিশেষ চেষ্টাও  
করিয়াছিলেন । তাঁহাদের সেই মিলিত কার্যটি সমাধা করিতে না পারিয়া সৈয়দ সাহেব  
বৃদ্ধিয়াছিলেন যে, মহান্মশানের কবির প্রতিকূলতাই সফল না হওয়ার একমাত্র কারণ,  
অর্থাৎ তাঁহার বিরুদ্ধ আচরণেই তাহারা বিকল মনোরথ হইয়াছেন । ইহাই সমালোচক  
সাহেবের মনের ধারণা ও দৃঢ় বিশ্বাস ; এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই তিনি মহান্মশানের  
কবির ভয়ানক শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন । যে মহান্মশান ছাপানোর জন্য তিনি মুসলমানদের  
নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া “মিহির ও সুধাকর” পত্রিকায় লেখা-লেখি করিয়াছিলেন,

\* সেই সময় কয়েকজন হিন্দু ভদ্রলোক “মহান্মশান” মুদ্রিত করিতে চাহিয়াছিলেন ।

† ইনি সমালোচক সৈয়দ এমদাদ আলীর সাক্ষতি বাবা ; সৈয়দ এমদাদ আলী আকতাবদ্দীন  
সাহেবের সহোদর ভগ্নী ছিলেন ।

‡ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল বসু ; রজনীকান্ত কবিরাজ প্রভৃতি ।



সেই মহাশয়শানকে ধ্বংস করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্ত এখন তিনি বহু পরিকল্পনা করিয়াছেন, এবং মহাশয়শান প্রেস হইতে বাহির হইয়া জনসমাজে প্রচারিত হওয়া মাত্রই তিনি ঐ শত্রুতা উদ্ধারের জন্ত তাঁহার “নবনূর” পত্রিকায় নিজ নাম গোপন করিয়া ডাক্তার ফজলুর রহমানের নাম দিয়া মহাশয়শানের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ দোষালোচনা বাহির করেন। মহাশয়শানের কবি ডাক্তার ফজলুর রহমানকে তাঁহার ঢাকা চক বাজারের বাসায় একদিন এসম্মুখে জিজ্ঞাসা করায় তিনি সমুদয় কথা প্রকাশ করিয়া বলেন, তখন আসল কথা বাহির হইয়া পড়ে এবং সৈয়দ এমদাদ আলীই যে ইহার প্রকৃত লেখক, তাহা অবগত হইয়া কবির ভগ্নীপতি\* ও তাঁহার ছেলেরা সকলেই এ জন্ত নিতান্ত বিরক্ত হ'ন! আজ পর্য্যন্তও তাহাদের সহিত সৈয়দ এমদাদ আলীর মৌখিক মিলন হইলেও অন্তরের সেই বিরক্তির ভাব দূর হয় নাই।

এই কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণের সময় কবি সমালোচক সৈয়দ এমদাদ আলীকে লক্ষ্য করিয়া ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন “কাহারও নিন্দা বা প্রশংসায় আমার হৃদয়ে কোনরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইবে না। আমি অচল হৃদয়ে সকলি সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি। কোন সমালোচকের ত্রুটি দর্শনে আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়খানি যুহূর্তের জন্তও ভীত দমিত বা বিচলিত হইবার নহে।” ইহা পাঠ করিয়া সমালোচক সাহেব একেবারে তেলে বেগুনে জলিয়া উঠেন এবং “বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়” ধারাবাহিকরূপে প্রবন্ধ লিখিয়া মহাশয়শানের দোষালোচনা করিয়া কবিকে যথেষ্ট গালাগালি দিয়া ও শাসাইয়া দস্তুর সহিত লিখিয়াছিলেন :—তিনি (মহাশয়শানের কবি) ভাবিয়াছেন “নবনূর” যখন নিবিয়া গিয়াছে, তখন তাহার সমালোচক দলেরও পঞ্চদশ প্রাপ্তি ঘটিয়াছে, এখন তিনি দেখিতে পাইবেন ‘মরিয়া না মরে রাম এ কৈমন বৈরী।’ কি হিংসা, জিঘাংসা, ধূটতা ও দাস্তিকতাপূর্ণ উক্তি; পাঠকগণ, এখন নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখুন, তিনি মহাশয়শানের কবির বৈরী হইলেন? অবশ্যই কোন একটা কারণ আছে, সে কারণটা কি? খুঁজিয়া দেখা কি উচিত নহে?

তিনি জোহরা বেগম ও এব্রাহিম কার্দির শৈশবকালের ধূলি খেলার কথা লইয়া আবল তাবল বকিয়াছেন। তাহার বুঝা উচিত ছিল যে, জোহরা তখন নয় বৎসরের অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালিকা। সে তখন সমালোচক সাহেবের Postnuptia কি antinuptial এর কি জানে? বীর বংশে জন্ম বলিয়া বাল্য স্বভাব সুলভ অভ্যাস বশতঃ খেলার সঙ্গীর সাথে তাঁর ধনুক লইয়া খেলা করিয়াছিলেন মাত্র। কি আশ্চর্য্য। কবি যাহাদিগকে বালক বালিকা বলিয়া তাঁহার কাব্যে বর্ণনা করিয়াছিলেন, তিনি সেই বালক বালিকাকে কল্পনা বলে যুবক যুবতী ধরিয়া লইয়া কবিকে গালি দেওয়ার বেশ একটা সুযোগ ও পন্থা বাহির করিয়া নিয়াছিলেন

\* বোনভী আকতারুদ্দীন আহমদ, ইনি সমালোচক সৈয়দ এমদাদ আলীর মামা।

এবং তাঁহার কাব্যখানাকেও অনৈসলামিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। এমন সমালোচকের বালাই লইয়া মরি ;—কি জিঘাংসা বৃদ্ধি।

সৈয়দ সাহেবকে “মহাশ্মশানে”র সমালোচনা করিতে কেহই অনুরোধ করে নাই, তবু কেন যে তিনি অনাহুত অবস্থায় এই দোষালোচনা করিতে গেলেন, ইহা আর কেহকে বলিয়া দিতে হইবে না। সাহিত্যের বাজারে ভূরি ভূরি রাবিশ বাহির হইতেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত ত তিনি ঐ সব রাবিশ সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করিছেন না। তিনি মহাশ্মশানের বিরুদ্ধে যাহাই লিখুন না কেন, তাহা যে পরজীকাতরতা ও শত্রুতামূলক, তাহা আর কাহারও জানিবার বাকী নাই। শত্রুতার কারণও যে কি, তাহাও এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে নিবেদন করিয়াছি। সমালোচক মোলভী আবদুল বারি সাহেব মহাশ্মশানের কবি সম্বন্ধে সে দিন মাসিক “মোহাম্মদী” পত্রিকায় বড় হুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, মুসলমান সমাজ তাঁহার প্রতিভার যোগ্য সমাদর করেন নাই, সেই জন্য আজ আমরা এ সম্বন্ধে কয়েকটা কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম, নচেৎ সেই দুর্গন্ধ ক্রোধ পূর্ণ পুরাতন কাশন্দি আর ঘাটিতে আমাদের ইচ্ছা ছিল না। বড় হুঃখ সেই পারিবারিক কথাগুলি আজ জন সমাজে প্রকাশ করিলাম। মহাশ্মশানের কবি সেই অজস্র গালি খাইয়াও হজম করিয়াছেন। কারণ ইহাদের এই অজ্ঞায় ব্যবহার তিনি নিত্যান্ত তাক্কলোর চক্ষে দৃষ্টি করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার ভক্তের প্রাণে ত সস্থ হয় না।

সমালোচক সাহেব তাহার সমালোচনার এক স্থানে লিখিয়াছেন ‘ভাব দ্বারা ভাষা পুষ্ট হইয়া কবির লেখনীতে এষ্ট পুষ্প বৃষ্টি হইতেছে।’ আর এক স্থানে লিখিয়াছেন “নিতম্বের প্রতি এষ্ট কবির আকোশ দেখা যায়, কারণ নিতম্বকে তিনি নানা ভাবে সর্বসাধারণের গোচরীভূত না করিয়া ক্ষান্ত হ’ন নাই। সম্ভবতঃ উহা না করিলে তাহার নিজের ব্যাঘাত হইত। মহাশ্মশানের কবি সম্ভবতঃ ‘হুই রসের ভাণ্ড’ ইত্যাদি। \*

এই সব উক্তির প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম. এ. মহাশ্মশানে হিরণবালা ও আত্মার্থীর প্রেম বিষয়ক চিত্রগুলি দর্শন করিয়া কবির উপরে খড়াহস্ত হইলেও সত্যের অনুরোধে তিনি লিখিয়াছিলেন :— ..... তিনি (সৈয়দ এমদাদ আলী) কবি কায়কোবাদের মহাশ্মশান কাবোর সমালোচনা করিয়াছেন। ... ... সমালোচনার সহিত মত্তের মিল হইতেছিল না। তিনি যে সমস্ত স্থান উদ্ধৃত করিয়া বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন, তাহারই হুই একটা স্থান আমার বড়ই মিষ্ট লাগিল। ... ... সৈয়দ

\* মহাশ্মশানের কবির কনিষ্ঠা ভগ্নীপতি মোলভী আফতাবদ্দীন সাহেবের সহোদরা ভগ্নীর ছেলে এই সমালোচক সৈয়দ এমদাদ আলী অর্থাৎ তাঁহার ভাগিনেয়, সুতরাং সৈয়দ এমদাদ আলীর পূজনীয় বাবা মোলভী আফতাবদ্দীন সাহেবেরও পূজ্য ব্যক্তি এই মহাশ্মশানের কবি—সেই গুরুজনের প্রতি তিনি কেমন গুণ্ড ও সম্মানসূচক ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখিবেন।



সাহেবের সহিত এই সমালোচনা লইয়া দুই দিন বাদামুবাদও হইয়া গিয়াছে। শেষ দিন বেশ একটু গরম রকমেরই হইয়াছিল। ... এ স্থলে সৈয়দ সাহেবের অভিযোগগুলি বিচার্য। তাহার প্রথম অভিযোগ মহাশয়শান অনৈসলামিক ও হিন্দু দেব-দেবীর কথায় পূর্ণ, হিন্দু পক্ষপাত দোষভূত। ইহার উত্তরে এই মাত্র বলিতে পারি যে, এই সমস্ত অভিযোগের ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল। এই মাত্র বলা যায় যে, অনৈসলামিক কিছু আমি এই কাব্যে খুঁজিয়া পাই নাই। হিন্দু ধর্মের ভাব স্থানে স্থানে হিন্দুরই মত প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন, ইহা তাহার “গৌরবের” বিষয়, ইহা তাঁহার কবি ক্ষমতারই পরিচয় প্রদান করে। মুসলমান সভ্যতা, মুসলমান ধর্মের মূল তত্ত্ব বুঝিতে এবং মুসলমানের মত তাহা বুঝাইতে এইরূপ সক্ষম একজন হিন্দু কবির আবির্ভাব দেশে হউক, ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা। ... মহাশয়শান মহারাষ্ট্র পক্ষপাত দোষ ভূত বলিয়া যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সর্বৈব কল্পনা। ... নিতম্ব অথবা কুচ অথবা কবরীর উল্লেখ মাত্রই শিহরিলে চলিবে কেন? স্রীদেহের সৌন্দর্য্য যৌবন যেখানে যেখানে ফুলের মত ফুটাইয়া তোলে তাহাদের যে ধরনের বর্ণনা মনে আনন্দের উদ্ভেক না করিয়া লালসার উদ্ভেক করে, তাহাকেই অশ্লীল বর্ণনা বলা যায়।

বাঁদীলা কবরী

উঠাইয়া ভূজদয় বাঁকিয়া পশ্চাতে

‘অনঙ্গের ধনু প্রায়—ভ্রুটি পুষ্প-কলি

শোভিল সে মনোহর অনঙ্গ-ধনুকে

ভ্রুটি সুবর্ণের শর নয়ন রঞ্জন।\*

এইরূপ আদ্যিঙ্গপূর্ণ সুন্দর উপমা আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যে কম পাঠেছি বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই রকম সুন্দর উপমার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারায় সৈয়দ সাহেবের সাহিত্য-রসজ্ঞতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া আমার ধারণা। সঙ্গীত : ২য় বর্গ—সপ্তম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭।

পরম রূপবতী ও লাবণ্যময়ী বালিকার এইরূপ অতুলনীয় সৌন্দর্য্য কবি তাঁহার শক্তিশালী তুলিকায় যে রূপ নিপুণভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অসামান্য কবি-প্রতিভার পরিচয়, তাহা অনুভব করিবার শক্তি যে সব সাহিত্যিকের নাই, তাঁহারা যে কিরূপ সাহিত্য রসজ্ঞ, তাহা আমার মত অশিক্ষিতা নারী বুঝিতে অক্ষম। তবে আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, তাহারা যত বড় সাহিত্যিকই হউন না কেন, তাহাদের সাহিত্য-রস উপলব্ধি করিবার শক্তি আছে বলিয়া আমি স্বীকার করিতে পারি না। বাঙ্গালা সাহিত্যে এইরূপ আদি রসপূর্ণ সুন্দর উপমা অতি বিরল।

\* এই কয় পংক্তি কবিতার জন্য সমালোচক সৈয়দ সাহেব লিপিয়াছিলেন “লাবণ্যের ভাষা পঠি হইয়া কবির লেখনীতে পুষ্প বৃষ্টি হইতেছে” ইত্যাদি।

“মহাশ্মশান” কাব্যের এইরূপ অন্ত্যায় সমালোচনা করিয়া কবিকে এইরূপ যথেষ্ট গালাগালি করাতে তাহার অনেক ভক্ত ও হিতৈষী মুসলমান সাহিত্যিক বন্ধু এই সমালোচক সৈয়দ সাহেবকে অনেক কষ্টক্লিষ্ট করিয়া কবির নিকট অনেক সাক্ষনাসূচক পত্র লিখিয়াছিলেন, সেগুলি প্রকাশ করিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর অনেক বৃদ্ধি হইয়া পড়ে, কাজেই সে বিষয়ে ক্ষান্ত হইয়া মাত্র একজনের চিঠির কিয়দংশ এ স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। কুমিল্লা টাঁদপুর হইতে এম, উদ্দিহ বি. এ. সাহেব লিখিয়াছেন “বর্তমানে সংবাদপত্র মহলে আপনার মহাকাব্য ‘মহাশ্মশানের’ যে হিংসাপ্রসূত কুৎসিত সমালোচনা চলিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে আপনার কিছু বলা উচিত নয় কি? আপনি তাহা কর্তব্য বলিয়া মনে নাও করিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাহা মহাকর্তব্য বলিয়াই মনে করি। যেহেতু হিংস্রকের হিংসা বাণে আহত ব্যক্তির মনে কষ্ট নাও হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার ভক্তের প্রাণে যে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভূত হইবে, তাহার সন্দেহ কোথায়?”

বড়ই আশ্চর্যের বিষয় আপনার কবিতার অনুকরণও নকল করিয়া যিনি সাহিত্য-আসরে পদার্পণ করিবার সৌভাগ্য অর্জনে ভাগ্যবান হইয়াছেন, তাঁহারই আপনার বিরুদ্ধে এত লাফালাফি?”

সংগাত লিখিয়াছেন :—“স্বল্পভাবে বিচার করিলে বাঙ্গালার মুসলমান সমাজে অতি অল্পসংখ্যক খাঁটি সাহিত্যিক পাওয়া যাইবে।” “মহাশ্মশানের” মতামত লইয়া দেখিতেছি দুইটি দল গঠিত হইয়াছে। একদল “মহাশ্মশান”কে বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ কাব্যের আসনে স্থান দিতেছেন, আর একদল কবিকে ও তাঁহার কাব্যকে সে আসনের উপযুক্ত নয় বলিয়া তথা হইতে নামাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। “মহাশ্মশান” সম্বন্ধে যে সমস্ত আলোচনা হইতেছে, সবগুলিরই লেখার ভঙ্গী সাহিত্যের গণ্ডী ছাড়াইয়া যাইতেছে। “এ সম্বন্ধে আর কোন লেখা আমরা পত্রস্থ করিব না।” সংগাত ১ম বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৬।

সমালোচক সৈয়দ সাহেব তাঁহার প্রতিবাদে একস্থানে লিখিয়াছেন “যাহাদিগকে আমরা খাঁটি ইসলাম ভক্ত বলিয়া জানি, যাহাদের স্বধর্ম প্রণেতা কোনও রূপেই বিচারাধীন নয়, তাঁহারা—মাননীয় মাওলানা আকরম খাঁ সাহেব ও সিরাজী সাহেব—এই মোহে পড়িলেন কেমন করিয়া? ইসলাম প্রচারই যাহাদের জীবনের ব্রত, তাহারা এই অনৈসলামিক ভাবাপন্ন কবিকে কেমন করিয়া জরীর টুপী এবং সোণার দোয়াত কলম দিতে অগ্রসর হইয়াছেন?” ইত্যাদি। সংগাত, ১ম বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৬।

পাঠকগণ দেখুন, যে সব সাহিত্যিক কবিকে এবং কবির “মহাশ্মশান” কাব্যকে ভাল বলিয়া জানেন, তাহাদিগকে সপক্ষে টানিয়া আনিবার নিমিত্ত সমালোচক সৈয়দ সাহেব কেমন কৌশলপূর্ণ বাক চাতুরীর জাল বিস্তৃত করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও বহু গ্রন্থ

প্রণেতা “মোহাম্মদী” সম্পাদক মোলানা আকরম খাঁ সাহেব স্বয়ং একদিন তাহার আপার সারকিউলার বোডস্থিত মোহাম্মদী আফিসে বসিয়া কথা প্রসঙ্গে মহাম্মদশানের কবিকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আমার পর “মহাম্মদশান” কাব্য পাঠ করিয়াই বাঙ্গালা ভাষার দিকে তাহার মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহার ‘মোহাম্মদী’ পত্রিকায় ‘মহাম্মদশান’ সম্বন্ধেও নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সমালোচনা বাহির হইয়াছিল \* \* \*

“বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে কায়কোবাদ নামক একজন কবি আছেন। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে ইনিই প্রধান কবি। কেহ কেহ ইহাকে মাইকেল দি সেকেণ্ড বলিয়া থাকেন।” \* \* \*

মোহাম্মদী, ৩২শ সংখ্যা ৩য় বর্ষ, ১৭ই ভাদ্র ১৩১৭ সন।

সমালোচক সৈয়দ সাহেব কি জানিতেন না যে বঙ্গের সেই অদ্বিতীয় বাগ্মী “নূর” পত্রিকার সম্পাদক ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা কবির সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী স্বয়ংই যে মহাম্মদশানের কবির একান্ত ভক্ত, তিনি কি আর তাঁহার বাক চাতুরীতে ভুলিয়া মহাম্মদশানের কবির বিরুদ্ধে যাইতে পারেন? এ আশা নিতান্ত দুরাশা। বরং সিরাজী সাহেব ঐ সমালোচনা পাঠ করিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ চিত্তে বিরক্তির সহিত সমালোচক সাহেবকে অনেক কটুক্তি করিয়া কবি সাহেবকে অনেক সাঙ্ঘনা সূচক পত্র লিখিয়াছিলেন এবং নিম্নলিখিত শ্লেষপূর্ণ কবিতাটি তাঁহার “নূর” পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

## টেকি অবতার

চোখের কোনার গুরুগিরি

‘গেল যখন খ’সে।

বড় সাধের মাসিকখানি

লুপ্ত কপাল দোষে।

আশা ক’রে ছট্লেম তখন

মাথায় নিয়ে ডালি।

ভে’বেছিলাম যশঃ হবে

পা’ব করতালি।

সে ভর্সাও ক’র্সা হল

ফিরে চায়না কেউ।

মনের ছঃখে পেটের আলায়

করি ফেউ ফেউ।

অন্ন চিন্তা চমৎকার

উপায় কিবা করি।

ভাগ্য গুণে যুটল একটা

গুপ্ত পেয়াদগিরি।

টো-টো ক’রে দিনরাত

ঘুরি লোকের পাছে।

খুঁজে বেড়াই কোথায় কোন্

দেশ ভক্তটি আছে।

জন্মগত রীতি আমার

পর নিন্দা করা।

হিংসা ঘোষে কি জানি এই

ছাই দেলটি ভরা।

সাহিত্যের ঘাড়ে তাইতে

মাকে মাকে বসি!

চেঁটে ক'রে পর যশ

ঢেঁলে দিতে মসি!

যত কবি কাব্য লেখে

হগ্গলগুলি বুঝে।

অশ্লীলতা দিয়ে তারা

কাব্য করে পুরা।

আমি কবি কাব্য লেখি

হগ্গলের সার!।

কবিত্ত সমাজে আমি

ঢেঁকি অবতার।

হক দোস্ত

নূর, ফাভ্রন-চৈত্র ১৩২৬ ১ম বর্ষ ২য় ৩য় সংখ্যা। মহাশ্মশানের কবির প্রতি তাঁহার শত্রু কর্তৃক এইরূপ অশ্রদ্ধা আক্রমণ করিতে দেখিয়া সুসাহিত্যিক মৌলভী তরিকুল আলম তাঁহার “নারী” প্রবন্ধের প্রথম ভাগেই লিখিয়াছেন :—এ প্রবন্ধ লিখিতে বসে ভয় হচ্চে পাছে কায়কোবাদের মহাশ্মশান কাব্যের সমালোচনা নিয়ে যেমন একটা লাঠা লাঠির ব্যাপারের সূচনা হয়ে উঠেছিল, তেমন না হয়। সপ্তমাত, ১য় বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৭।

মহাশ্মশানের কবির প্রতি যে অদ্বিচার হইয়াছিল, এবং তিনি যে তাঁহার প্রতিভার অশ্রুপ সমাদর পান নাই এ কথা শুধু আমরা বলি না, অনেকেই বলিয়া থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক মৌলভী মোহাম্মদ আবদুল বারি সাহেব মাসিক মোহাম্মদীতে “বাঙালা কাব্য সাহিত্যের ক্রম বিকাশ” প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—“মাইকেল সর্বপ্রথম বাংলায় মহাকাব্য রচনা করেন। ‘রামায়ণ-মহাভারত’ ও মহাকাব্য স্থানীয়। কিন্তু এগুলি সংস্কৃত মহাকাব্যের অনুবাদ মাত্র। ... ... সংস্কৃতে মহাকাব্যের যে সমস্ত লক্ষণ বর্ণিত আছে, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে ‘মেঘনাদ বধে’ হয়ত না মিলিতে পারে, তথাপি ‘মেঘনাদ বধ’ যে বাংলার মহাকাব্য তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ... ... মাইকেলের ‘মেঘনাদ বধে’র অনুকরণে কবি হেমচন্দ্র ‘বৃহৎ-সংহার’ রচনা করেন। আমরা ইহাকে বাংলার দ্বিতীয় মহাকাব্য বলিতে পারি। ‘বৃহৎ-সংহারে’ মিত্রাকর, অমিত্রাকর উভয়বিধ ছন্দই ব্যবহৃত হইয়াছে। কেহ কেহ ছন্দের লালিত্যে ‘বৃহৎ-সংহার’কে ‘মেঘনাদ বধে’র উপরে স্থান দিয়া থাকেন। কিন্তু ‘মেঘনাদ-বধে’র সেই গুরু গভীর স্মৃতি ‘বৃহৎ-সংহারের কবি রক্ষা করিতে পারেন নাই।”

পরবর্তী কালেও মহাকাব্য রচনার চেষ্টা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সম সাময়িক কবি যোগীন্দ্রনাথ বসুর “পৃথ্বীরাজ” ও “শিবাজী” কাব্য এবং কবি কায়কোবাদের মহাশ্মশানকে মহাকাব্যের পর্যায়ভুক্ত করা যায়। ইহাই খুব সম্ভব মহাকাব্য রচনার শেষ চেষ্টা। “পৃথ্বীরাজ” ও “শিবাজী” কাব্য পাঠক সমাজে তেমন আদর পায় নাই। ইহার প্রথম কারণ রবীন্দ্র যুগের অভাব। দ্বিতীয়তঃ কাব্য হিসাবে গ্রন্থ হইখানা তেমন সার্থকতা প্রাপ্ত হয়

নাই। এই দিক দিয়া বরং “মহাশ্মশানের” সৃষ্টি সার্থক হইয়াছে। ছন্দের মাধুর্য্যে, বর্ণনার পারিপাট্যে “মহাশ্মশান” “শিবাজী” ও “পৃথ্বীরাজ” অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। কবি কায়কোবাদের ‘শিব-মন্দির’ করুণ রসাত্মক একখানা সুন্দর খণ্ড কাব্য। স্বচ্ছ সাবলীল বর্ণনা ভক্তি ও প্রসাদ গুণে কাব্যখানা সহজেই পাঠকের মন হরণ করে। \* \* \* এই সময় কাব্য সাহিত্যে মুসলমানের দান যৎসামান্য হইলেও উপেক্ষার যোগ্য নয়। কবি কায়কোবাদের ‘মহাশ্মশান’ ও “শিব-মন্দির” কাব্যের নাম পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে। “অশ্রুমালা” ও “অমিয়-ধারা” কবির বিভিন্ন বয়সের রচনা। “রমণী” শীর্ষক কবিতা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি। \* \* \* উদ্ধৃতাংশ পাঠে কবি বিহারীলাল ও সুরেন্দ্র নাথকে পাঠকের মনে পড়িবে। কাব্য সাহিত্যে কায়কোবাদের দান অকিঞ্চিৎকর নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মুসলমান সমাজ তাহার প্রতিভার যোগ্য সমাদর করে নাই। কয়েক বৎসর পূর্বে কবিকে সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি পদে বরণ করিয়া অপরাধ জ্ঞানের কিঞ্চিৎ চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র। পরে হয়ত সুযোগ পাইত না। মাসিক মোহাম্মদী, ১২শ বর্ষ ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৪৫ সাল।

সুপ্রসিদ্ধ হিন্দু সাহিত্যিক ও সমালোচক পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞাবিনোদ “আনন্দ বাজার” পত্রিকায় “উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালার মহাকাব্য” শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, আনন্দ মিত্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি মহাকবিদের সহিত মহাকবি কায়কোবাদের তুলনা করিয়া লিখিয়াছেন “মহাশ্মশান” বাঙ্গালার মহাকবি কায়কোবাদ এই অপূর্ব মহাকাব্য রচনা করিয়া দেশবাসীকে উপহার প্রদান করিয়াছেন, রচনা ভঙ্গির সহিত পূর্বোক্ত কবিগণের রচনার তুলনায় কায়কোবাদের গৌরব অগ্নি হইবে না। যদিও “মহাশ্মশান” নাম দেওয়ায় কায়কোবাদকে কোন কোন মুসলমান লেখক আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাকবি কায়কোবাদ পরবর্তী সংস্করণেও নাম পরিবর্তন করেন নাই।” পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, আনন্দবাজার পত্রিকা।

বঙ্গীয় পাঠকগণ বোধ হয় এখন অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সমালোচক সৈয়দ সাহেব তাঁহার সেই ইঙ্গিত কার্য্যে বিফল ননোরথ হইয়া মনে করিয়াছিলেন যে, মহাশ্মশানের কবির বিরুদ্ধাচরণেই তিনি অপদস্থ ও অপমানিত হইয়াছেন, ইহাই তাঁহার বিদ্বেষ ও ক্রোড়ের একমাত্র কারণ, তাই তিনি মহাশ্মশানের কবির বিরুদ্ধে এতটা লেখা লেখি করিয়াছিলেন, নচেৎ যে মহাশ্মশান কাব্য হিন্দুর অর্থে না ছাপাইয়া শুধু মুসলমানের অর্থে ছাপাইবার জন্য তিনি “মিহির বা সুধাকর” পত্রিকায় ধারা বাহিক রূপে লিখিয়া ভিক্টর সুলি কাঁধে লইয়াছিলেন, সেই সৈয়দ সাহেবই আবার সেই মহাশ্মশানকে ধ্বংস করিয়া উহার রচয়িতার মৃত্যুপাত করিবার জন্য এতটা চেষ্টা ও এতটা আন্দোলন চালাইয়া বাঙ্গালার আকাশ বাতাস



মুখরিত করিয়াছিলেন কেন ? ভাল চিত্রগুলিরও কুৎসিত ব্যাখ্যা করিয়া সমালোচনার বহর ছুটাইয়া ছিলেন কেন ? ইহার কারণ কি ? কারণ আর কিছুই নহে ; শুধু সেই যুগপাত গুপ্ত ঈর্ষা ও শত্রুতা ।

এই জন্ত আমরা পূর্বেও বলিয়াছি – এখনও বলিতেছি যে, মহাশ্মশানের সমালোচনার ভার আমরা আধুনিক সাহিত্যিকদের উপরে না দিয়া ছইলত বৎসর পর আমাদের উত্তরাধিকারী সাহিত্যিকগণ যখন বঙ্গ সাহিত্য ক্ষেত্রে আসিয়া দণ্ডায়মান হইবেন, তাহাদের উপরেই এই ভার স্থাপ্ত করিলাম । কেননা, আজকাল নিরপেক্ষ সমালোচকের বড়ই অভাব । সকলেই নিজের দলের কবিকে বড় করিতে চাহেন । মহাশ্মশানের কবির বিরুদ্ধে শত্রুদের এত লেখালেখি সত্ত্বেও জগদীশ্বরের অপার করুণায় ও কবির হিতৈষী বন্ধু-বান্ধবদের অনুগ্রহে আজ মহাশ্মশানের চতুর্থ সংস্করণ বাহির হইয়া সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের সমীপে উপস্থিত হইল । আশা করি বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ ইহার প্রতি পূর্বের মত একটুকু কৃপা দৃষ্টি রাখিবেন । কেননা মহাশ্মশান তাহাদেরই স্বজাতি লিখিত এবং তাহাদেরই নিজস্ব সম্পত্তি তাহাদেরই পূর্ব পুরুষদের বীরত্ব ধীরত্ব ও গৌরব সংবলিত এই মহাশ্মশান তাহাদেরই গৌরবের জিনিষ । তাহাদের সেই অতীত কালের শৌর্যবীর্যের জন্ত সমগ্র জগদ্ধাসীর নিকট তাহার একটা গৌরবের আসন দাবী করিতে পারেন ।

মহাশ্মশানের আকার পূর্বাপেক্ষা এবার কিছু বৃদ্ধি হইল । যুদ্ধের গতিকে ধরচও বেশী পড়িয়া গেল । কিন্তু মুসলমান ভ্রাতাদের দরিদ্র অবস্থা দেখিয়া ইহার মূল্য আর বেশী বৃদ্ধি না করিয়া মাত্র দুই আনা পয়সা বৃদ্ধি করা হইল । নচেৎ ধরচ পোষাইয়া উঠেনা । কেননা যুদ্ধের বাজারে সব জিনিষের মূল্যই খুব চড়া ।

প্রেমের অমনোযোগীতা ও অসতর্কতা নিবন্ধন যে সব ভুল ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে, সহৃদয় পাঠকগণ তাহা সংশোধন করিয়া পাঠ করিলে বিশেষ অনুগ্রহীত হইব । সাংঘাতিক ভুলগুলির মধ্যে যেগুলি আমাদের চক্ষে পরিয়াছে, সেগুলি আমরা শুদ্ধিপত্রে দিয়া দিলাম । প্রেমের কম্পোজিটার মহাশয় ১৯২ পৃষ্ঠায় ২০ পংক্তিতে একটি মারাত্মক ভুল করিয়াছেন এবং ঐ পংক্তির নাঁচের একটি লাইনও ছাড়িয়া দিয়াছেন, পাঠকগণ উহা শুদ্ধিপত্র দেখিয়া লইবেন ।

নিখিল ভারত সাহিত্য সঙ্ঘ ( The Nekhil Bharat Sahitya Songha ) ২১৯২৫ তারিখে মহাশ্মশানের কবিকে তিনটি honorary titles প্রদান করিয়াছেন । তিনি এ যাবৎ ঐ উপাধিগুলি ব্যবহার করেন নাই, তিনি বলেন আমার কাব্যগুলিই আমার পরিচয় দিবে । এই উপাধিগুলি ব্যবহার করিলে বেশী কি হইবে ? আমি কিন্তু সে কথা না শুনিয়া তাহার নামের সহিত এই উপাধিগুলি সংযোগ করিয়া দিলাম এবং নিজে ঐ উপাধি পত্রের নকলও দেওয়া হইল ।

“The undersigned on behalf of the members of the Sangha do hereby confer upon munshi Kaikobad author of মহাশ্মশান ও অশ্রু-মালা the honorary titles of Kabyabhushan, Vidyabinode & Sahityaratna ( কাব্য-ভূষণ, বিজ্ঞা-বিনোদ এবং সাহিত্য-রত্ন ) in recognition on his profound scholarship, vast Erudition and Valuable services rendered to enrich Bengali language and literature.”

আমাদের আর অধিক লিখিবার কিছুই নাই। তবে নিতান্ত দুঃখের সহিত এইটুকু মাত্র লিখিতেছি—মহাশ্মশানের কবির সেই শত্রু পক্ষীয় লোকেরা, যাহারা শত্রুতা বশতঃ চিরকাল কবির নিন্দা করিয়া আসিতেছেন, কবিকে ভাল করিয়া জানেন না, শত্রু বলিয়া মনে করেন, এবং যাহাদের হৃদয় পরশ্রী কাতরতার কলঙ্ক কালিমায় অনুলিপ্ত, তাহারা যেন অনুগ্রহ পূর্বক কবির এই কাব্যখানা পাঠ না করেন; ইহাই তাহাদের নিকট আমাদের ঐকান্তিক অনুরোধ। করুণাময় খোদাতা'লার অপার অরুণা ও কৃপায়, তাহাতে এখন আর কবির কোন ক্ষতি হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। যে ক্ষতি হওয়ার আগেই হইয়া গিয়াছে, সেজন্য আমরা সেই পরশ্রী কাতর ও মহাশ্মশানের কবির বিদ্রোহী দলভুক্ত ও অহিতাকামক্ষী স্বার্থপর মুসলিম সাহিত্যিকদিগকে অন্তরের সহিত আশীর্বাদ করিতেছি—জগদীশ্বর তাহাদের মঙ্গল করুন।

আমার লিখিত অনুমতি ব্যতীত কেহ এই কাব্য ছাপিতে পারিবেন না। ছাপিলে ক্ষতি পূরণের দায়ী হইতে হইবে। ইতি ১৩ই আষাঢ়, ১৩৪৭ সন।

পূর্বপাড়া—কবি-কুটীর  
পোঃ আঃ—আগলা.  
জিলা—ঢাকা

}

বিনীত  
বেগম তাহেরউন্নিসা খাতুন।

## নূতন সংস্করণের ভূমিকা

কায়কোবাদ ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার অন্তর্গত আগলা গ্রামে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

বয়সের দিক থেকে কায়কোবাদ রবীন্দ্রনাথের তিন বছরের বড়ো। ১২৪১ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেও তিনি এগার বছর জীবিত ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ—এ সুদীর্ঘ শতাব্দীকাল আধুনিক বাংলা কাব্য ও সাহিত্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবোজ্জ্বল সময়। এ যুগটিতে বাংলা সাহিত্যে যাবতীয় পশ্চাত্য ভাবধারা প্রতিফলিত হয় এবং আধুনিকতার বিশিষ্ট লক্ষণসমূহ ক্রমবিকাশ ও পরিণতি লাভ করে।

বাংলা কাব্য সাহিত্যে এ কালটিতে দু'তিনটি ধারার উন্মোচন ও পরিণতি ঘটে। মহাকাব্যের ধারায় মধুসূদন সার্ক মহাকাব্য রচনা করেন। তাঁর পরে হেমচন্দ্র, নবীন সেন, কায়কোবাদ, গোপীন্দ্রনাথ বসু এবং হামিদ আলী প্রমুখ কবি বিংশ শতকের প্রথম দু'তিন দশক পর্যন্ত মহাকাব্যের ধারটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।

বিহারীলালকে দিয়ে আধুনিক গীতি-কবিতার সূত্রপাত হয়। রবীন্দ্রনাথ আজীবন সাধনায় বাংলা গীতিকাব্যের তুঙ্গতম আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেন।

তৃতীয় ধারায় রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের ফলে বাংলা কাব্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয় এবং তাঁর সমসাময়িক কালে রবীন্দ্র-বিজ্রোহী তিরিশোক্ত কবিদলকে বাংলা কাব্যের অন্তর্গত প্রবেশ করতে দেখি।

তখনও কায়কোবাদ জীবিত। বাংলা কাব্যের আদিকে ও বিষয়বস্তুতে তাঁর জীবৎ-কালেই যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে—তথাপি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই ব'লে আশ্রয় করেছেন যে, 'রবীন্দ্রনাথ একটিও মহাকাব্য লেখেননি।' বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পদক্ষেপ করেও কায়কোবাদ ঊনবিংশ শতাব্দীর আদর্শবাহী কবি ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশাতে দেশ ও জাতির জীবনে নানাবিধ পরিবর্তন ঘটেছে, কাব্যের ইতিহাসে নানা বৈচিত্র্য সাধিত হয়েছে, কিন্তু কায়কোবাদ যেখানে শুরু করেছিলেন, জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে সেখানেই শেষ করেছেন।

তবু বাঙালী মুসলমানদের আত্মপ্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারায় কায়কোবাদের দান অপরিণীত। ঈশ্বরগুপ্তের আবির্ভাবের সঙ্গে বাঙালী হিন্দুর কাব্য সাধনার ইতিহাসে মধ্যযুগের ধারাটি নিঃশেষিত হ'য়ে যায় এবং ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পরে

রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেম, নবীন, বিহারী লাল প্রমুখ কবি নতুন ইউরোপীয় চিন্তা, ভাব ও কাব্যাদর্শের সূত্রপাত করেন। মুসলমানদের জীবনে পলাশীর যুদ্ধের পর যে দুঃখ-হর্দশা নেমে আসে, তার ফলে তারা ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পর পর্যন্ত অতীত সুখস্মৃতির রোমন্থনে ব্যস্ত আর হিন্দুদের মঙ্গলকাব্যের অনুকরণে দোভাষী পুঁথি সাহিত্য সৃষ্টিতে বিভোর ছিল। ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে অপারগতা এবং পরিবর্তিত রাজনৈতিক জীবনকে গ্রহণ করার অক্ষমতায় বাংলা সাহিত্যের আধুনিক সমৃদ্ধ ধারার সঙ্গে তাদের যোগসূত্র স্থাপিত হলো না। আধুনিক বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে এভাবে বাঙালী হিন্দুরা মুসলমানদের তুলনায় দীর্ঘ পৌনে এক শতাব্দী কাল অগ্রগামী রয়ে গেল।

এ-পরিপ্রেক্ষিতে কায়কোবাদের শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য ‘অশ্রুমালা’ (১৮৯৪ খ্রীঃ) এবং ‘মহাশ্মশান’ মহাকাব্য (১৯০৪ খ্রীঃ) প্রকাশ বাঙালী মুসলমানদের আধুনিক সাহিত্য সাধনার ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

কায়কোবাদের আরেকটি অবদান বাংলা কাহিনী-কাব্য ইতিহাসাঙ্কিত কাহিনী অবলম্বনে মহাকাব্য রচনার প্রয়াস এবং অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী ও চেতনাকে প্রাধান্য দান।

এক মধুসূদন ছাড়া রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীন সেন এবং যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ সকল কাহিনী কাব্যকারই অথবা ভারত রাষ্ট্রে হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন; জাতি বলতে ভারতীয় হিন্দু জাতির কথাই ভেবেছেন এবং হিন্দু পৌরাণিক ও রাজপুতদের সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত রোমাটিক কাহিনী অবলম্বনে মহাকাব্যের কাহিনী অংশ নির্মাণ করেছেন। কায়কোবাদ সেখানে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের একটি ঐতিহাসিক সংগ্রামকে তার কাহিনীর প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করে এ দুই বীর জাতির বীরত্বের কাহিনী সমান সহানুভূতি ও বেদনাবোধে উদ্ভুদ্ধ হ’য়ে বর্ণনা করেছেন। তাঁর কথায়—

‘মুসলমানগণ বীরপুরুষ, হিন্দুগণও বীরপুরুষ এই দুই বীর জাতি হৃদয়ের উষ্ণ শোণিতে আপনাদিগের জাতীয় গৌরব ও ভীষণ বীরত্ব কালের অক্ষয়পটে লিখিয়া গিয়াছেন।...তবে হিন্দুগণ বিজিত ও বিধ্বস্ত, মুসলমানগণ জয়দৃপ্ত ও বিজয় গৌরবে সম্মানিত। এক জাতি দেশের জন্তে, ধর্মের জন্তে হৃদয়ের পবিত্র শোণিতে স্বদেশ রঞ্জিত করিয়া আত্মপ্রাণ বলিদান করিয়াছেন, অন্য জাতিও দেশের জন্ত, ধর্মের জন্ত, স্বজাতির কল্যানের জন্ত হৃদয়ের পবিত্র শোণিতে স্বদেশ প্রাবিত করিয়া বিজয় গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছেন।’

উভয় জাতির নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গিতে এই বিজয় আদতে কারুরই বিজয় ছিল না। উভয় জাতির রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে উভয়েই বিধ্বস্ত হ’য়ে যায়। পাক-ভারত উপমহাদেশ যে সেদিন শ্মশানে পরিণত হয়েছিল, তারই রূপায়ণে কবির চেতনায় উদ্ভুদ্ধ কায়কোবাদ তাঁর

মুহম্মদ মহাকাব্য 'মহাম্মদান' রচনা করেছিলেন। 'মহাম্মদান' তদানীন্তন ভারতের মহারাষ্ট্র ও মুসলিম শক্তির ট্রাজেডির কাহিনী। এত বড় সত্য প্রকাশের মানসিকতা এবং সে মানসিকতার প্রকাশে অনন্ত অম ও ত্যাগের হুল্লুত আদর্শবাদ কায়কোবাদকে বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে অমর ক'রে রাখবে। সেটিই আমাদের পরম লাভ।

কায়কোবাদের 'মহাম্মদান' কাব্য এতদিন হুম্রাপ্য ছিল। ঢাকার স্টুডেন্ট ওয়েজ প্রেস প্রকাশ সংস্থা এ কাব্যটি প্রকাশের একটি মহৎ দায়িত্ব পালন ক'রে বাঙালী মুসলমানদেরকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ ক'রে রাখলেন।

০৪ বি, বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক ভবন,

নব্বী বাজার রোড, ঢাকা।

২০শে নভেম্বর, ১৯৬৭

—মুহম্মদ আবদুল হাই



## কবি-সংবর্ধনা

[ বঙ্গের “মাইকেল দি সেকেন্ড” কবিকুল কেশরী লক্ষ্যণাঃ মহাকবি, কবি সত্ৰাট কায়কোবাদ সাহেবের প্রতি দেশবাসিগণের সোণার দোয়াত-কলম ও একসেট বহুমূল্য পোষাক ও জরীর টুপি উপহার দেওয়ার প্রস্তাব শুনিয়া লিখিত ।]

১

এ'স মহাকবি, এ'স হে সাধক, সামাবাদী,  
এ'স ভক্ত-কুটীর ধারে ।  
এ'স নব বসন্ত-মঞ্জরী-মৌলি-বিকশিত  
বিভূষিত হারে ।  
এ'স বাঙ্গালীর “আমীর খসরু”  
এ'স মোস্তেমের কবি-কুল গুরু  
এ'স কায়কোবাদ, পুরাইতে সাধ,  
এ'স সত্ৰাট কবি—  
তুমি ভারতের মোস্তেম-সাহিত্যে  
উজ্জল প্রাহু রবি ।

২

বন্দনা-গীতি গায় চরাচর ওই শোনা যায়  
হলুধনি—  
নিখিল বঙ্গে পড়িয়াছে সাড়া তোমারে  
বরিতে, গুণি ।  
এ'স মোস্তেমের মুকুট রতন,  
এ'স জগতের শীর্ষ ভূষণ,  
এ'স বাঙ্গালীর কাব্য-তানসেন,  
পরি সুবর্ণ-তাজ  
আজি—অভিনন্দন মাল্য হস্তে, হের  
জগতের কিবা সাজ ।

৩

বসন্ত মলয়বাহী পুষ্প পরাগ ঢালা  
এ কি মহানন্দ !  
উদয় অচল অরুণ প্রথম প্রভাতে আনে  
কি স্বরগ ছন্দঃ ।  
এ'স এ'স কায়কোবাদ  
প্রচারিয়া সামাবাদ,  
যুগ সঞ্চিত হৃদয়ের আশা  
মিটা'তে এসেছি আজি ।  
দীপক ভৈরবে ললিত গুঞ্জে এ'স  
কাব্য বীণায় যুগ্ধ স্বরকার বাজি' ।

৪

এ'স পণ্ডিত সমাজ জাগাতে হে কবি,  
এ'স বঙ্গ-মোস্তেম মানিক ।  
নিঃস্বার্থ ত্যাগ, প্রেমের বার্তা,  
মুক্তির বাণী বিলাইয়া দেও ধানিক ।  
কে বলে জগতে আমরা তীন ?—  
—তুমি যার মাঝে বাজাইছ বীণ,  
তাহারা কি কহু রহিবে পড়িয়া  
জগতের এত নীচ ?  
অসম্ভব তাহা, ছু'টে যাবে তারা  
রবেনা কাহারও পিছে ।

৫

তব হৃদয়-চিতার বহিঃ বলকে  
 দীপ্ত, জাতীর “মহান্মশান”  
 উত্থান পরে পতনের গীতি  
 তুলিছে বিষাদ-তান।  
 তাই সে তপ্ত হৃদয়-আলা,  
 জুড়াইতে শুই “অক্ষ-মালা”।  
 হৃদ তপ্ত বাধিতের প্রাণে  
 সান্তনা দিতে আসি’  
 “শিব-মন্দির” প্রাণিয়া দিয়াছে  
 করুণ রসেতে ভাসি’।

৬

তাই হে মহান, উদার হৃদয়  
 চির অজ্ঞাত কবি।  
 এ’ম বরেন্য বঙ্গ-গৌরব  
 জ্যোতির্মণ্ডিত ছবি।  
 কি দিয়ে পূজিব নাহি জানি স্তুতি,  
 শুধু আছে প্রীতি, শুধুই ভকতি,  
 তাই দিয়ে আজি সম্ভাষণ করি  
 লহ চন্দন হার—  
 চিরঞ্জীবি তুমি জগতে বিলাস  
 কাব্য কুসুম সার।

কাজী মোহাম্মদ মোজাফ্ফর হোসেন খান।

কহিনুর হল, নগগাও

রাজশাহী

—

## কবির বীণা ও কল্পনা

আয়রে সাধের বীণে, আয় একবার  
গাই আজি মন খুলে দীপকের গান ।  
ভাঙ্গা গলা মম, ওরে তুই ছিন্ন তার  
পারিবি কি মাতাইতে বশুধার আশ ?  
তুইও কল্পনে সখি, সাথে সাথে আয়  
দেখিস্ এ গর্ব যেন নাহি হয় চূর ।  
তুই বিনে ভিখারীর কে আছে সহায়,  
তুই সখি সাথে সাথে দিয়ে যাবি সুর ।  
প্রতি তানে সঙ্ঘীবনী মদিরা ঢালিয়া  
দে লো বীণে শুনি সেই সকল গান !  
ঘুমন্ত বশুধা যেন, উঠেরে মাতিয়া,  
নীরবে জাগিয়া উঠে মোহন সন্তান ।  
যে গানে মাতিয়া উঠে প্রকৃতি রঞ্জিনী—  
যে গানে ঘুমন্ত নিশি জে'গে উঠে হায় ।—  
যে গানে সরসী-জলে ফুটে কুমুদিনী  
সেই গান গাব আজি, আয় বীণে আয় ।  
কে সে জানে আশা মম হ'বে কি পূরণ,  
পঞ্চমে বাধিলু সুর, বড় সাধে হায় ।  
সে'ধেছি অনেক, আজি পরীক্ষা প্রথম  
তুইও কল্পনে সখি সাথে সাথে আয় ।

---

## আল্লাহ্ আকবর

“বক্ষলে খোদাওন্দ ছুনিয়া ও দীন,  
তোফেলে নবী ছাইয়াদেন মোরছালীন।”

দেহ শক্তি জগদীশ,

পতিত পাবন তুমি।

অতি তুচ্ছ, অতি হেয়, ক্ষীণজীব

নরকের কীট আমি।

তোমারে নমি।

তুমি গন্ধে, তুমি ফুলে

তুমি পথে, তুমি মূলে

তুমি বিশ্বে, নভোমণ্ডলে

বিশ্বরূপী তুমি।

বিশ্ব তব রূপ তুমি তার ভূপ

এ সৌর জগতে

যা আছে—সকলি তুমি।

তোমা ভিন্ন নহি আমি।

তোমারে নমি।

জলে তুমি, স্থলে তুমি,

অনল অনিলে তুমি,

বিশে তুমি অমৃতে তুমি

জীবে তুমি, উদ্ভিদে তুমি,

জড়ে তুমি অজড়ে তুমি,

চন্দ্রে তুমি সূর্যো তুমি,

তধু তুমি—তুমি—তুমি।

তোমা ভিন্ন নহি আমি

তোমারে নমি।

যেই দিকে চাই, তোমারে পাই,

অন্তরে বাহিরে তুমি।

এ জৈব জগতে, মরণের পথে

তধু তুমি—তুমি—তুমি।

তোমা ভিন্ন নহি আমি।

তোমারে নমি।

মহাপাতকী—কায়কোবাদ

# মহাশ্মশান

লাহোর

[ এব্রাহিম কাফি ও জোহরা বেগমের বাল্য জীবনের এক অধ্যায় ]\*

আনার কলির শোক স্মৃতি বিজড়িত  
এই সে লাহোর, হায় হেরিলে যাহারে  
অতীতের কত স্মৃতি জে'গে উঠে মনে ।  
দুঃখিনী আনার কলি কত না আনন্দে  
যৌবনের মধুমাখা বসন্ত প্রভাতে  
ভালবেসে জাহাঙ্গীরে—প্রতিদান তার  
ল'ভেছে যা' ভাবিলে তা' শিহরে পরাণ ।  
এই স্থানে—অই উচ্চ সমাধি ভবনে  
জনমের মত সে যে রয়েছে শয়ান ।  
সংসারের শোক দুঃখ স্নেহ ভালবাসা  
অবিচার অত্যাচার এড়াইয়া হায়  
আত্মা তার এই স্থানে লভেছে নির্বাণ ।  
অই উদ্ভানের মাঝে ঘুরিয়া ফিরিয়া  
বালক বালিকা ছুটি খেলিছে সানন্দে  
তার ধনু হাতে লয়ে এখানে ওখানে ।  
উভয়ের হাসি মুখ হেরিলে মুহূর্ত্ত  
কুটম্ব গোলাপ ব'লে ভ্রম হয় মনে ।  
বালিকা মধুর স্বরে কহিলা বালকে  
“এব্রাহিম পারিবে না তুমি মোর স্মাথে ।”  
“কেন পারিব না আমি ?” কহিলা বালক  
বালিকার পানে চে'য়ে মধুর বচনে  
“রমণী হইয়া তুমি পরাজিবে রণে  
পুরুষে ! এ কথা তুমি বলিলে কেমনে

জোহরা ?” বালিকা পুনঃ কহিলা হাসিয়া  
“পিতা মম মহাবীর, তার যশো গাথা  
শোননি কি কভু তুমি ? ভীষণ মাতঙ্গে  
কুপাণের একাঘাতে বধেছিল। তিনি ।  
মেহেদি বেগের নাম শুনিলে মুহূর্ত্ত  
আতঙ্কে কাহার প্রাণ উঠেনা শিহরি ?  
তার কন্যা হ'য়ে আমি তোমার নিকটে  
হারিব ? এ কথা হৃদে ভাবিলে বারেক  
ইচ্ছা হয় এই দণ্ডে বিষ খে'য়ে মরি ।  
এব্রাহিম সাধ মম নিজ বাহু বলে  
একটি সাম্রাজ্য আমি সহতনে গঠি,  
রানী হ'য়ে বসি তার রত্ন সিংহাসনে ।”  
হাসিয়া বালক পুনঃ কহিলা মধুরে  
‘রাজা ভিন্ন রানী তুমি হইবে কেমনে  
জোহরা ? বিধির বরে রানী হও যদি,  
কাহারে করিবে রাজা ?’ লজ্জায় বালিকা  
মুখ খানি নত করে রহিলা নীরবে ।  
বালক তখনি ছুটে চিবুক ভাঙার  
তুলিয়া সাদরে, পুনঃ কহিলা হাসিয়া  
“আমি হ'ব রাজা আর তুমি হ'বে রানী ।  
জোহরা, শোননি তুমি রম্জানের চাঁদে  
আমাদের উভয়ের হ'বে পরিণয়,  
তুমি ভার্যা আমি স্বামী হই জনে মিলি

\* এই ঘটনাটি পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পনের বৎসর পূর্বে অর্থাৎ এব্রাহিম কাফির মগন পনের বৎসর ও জোহরা বেগমের নয় বৎসর বয়স্ক তখন সংঘটিত হইরাছিল।



একটি নূতন রাজ্য করিয়া গঠন  
 আমি হ'ব রাজা তুমি হ'বে রানী।”  
 যুদ্ধিকার পানে চেয়ে রহিল নীরবে  
 জোহরা, সরমে তার স্থিত মুখ খানি  
 ঈষদ রক্তিম আভা করিল ধারণ।  
 এতাহিম হে'সে হে'সে কর তালি দিয়া  
 “এত লক্ষ্য !” ব'লে হস্ত ধরিল তাহার।  
 হেন কালে ঘুঘু এক তরু শাখে বসি  
 গাইতে লাগিল এক উদাস সঙ্গীত  
 কানন স্নানিত করি “ঘু-ঘু ঘু-ঘু” রবে।  
 বালক কহিল হে'সে “এস দেখি রানী  
 জোহরা, দেখাও তব অব্যর্থ সন্ধান।  
 অষ্ট ডাকে ঘুঘু, দেখি কে পারে বধিতে  
 উহারে”, নয়ন তুলি দেখিল চাহিয়া  
 জোহরা নীরবে সেই পাখীটির পানে।  
 তীর ধনু হস্তে লয়ে ছুটিলা বালক  
 সবেগে ঘুঘুর নিকে, পশ্চাতে তাহার  
 ছুটিলা বালিকা ক্ষত তীর ধনু লয়ে  
 বধিতে সে অসহায় কানন-কপোতে।  
 চতুর চঞ্চল ঘুঘু এ গাছে ও গাছে  
 ঘুরিতেছে,—নহে স্থির মুহূর্তের তরে।  
 হইবার ভীকু শর সজোরে বালক  
 নিক্ষেপিল। ঘুঘু উড়ে গেল অস্ত্র ডালে।  
 বালিকা কহিল হে'সে উপহাস করি  
 “এতাহিম, তব কাজ নহে ঘুঘু মারা,  
 তীর ধনু নৈলে দিয়ে যাও গৃহ মাঝে,  
 এই দেখ এক ভীরে মারিব উহারে।”  
 বালিকা তখনি শর করিলা ক্ষেপণ,  
 অব্যর্থ সন্ধান তার, চক্ষুর নিমেষে  
 আহত ঘুঘুটি হার পড়িল ভূতলে।  
 নিরখি এ শোক দৃশ্য সজিনী উহার

এ ডালে ও ডালে উড়ি কাদিতে লাগিল  
 শোকাবেগে। এতাহিম তখনি আবার  
 নিক্ষেপিল। ভীকু শর, বৃথা সে সন্ধান,  
 পাখীটি উড়ি পুনঃ গেল অস্ত্র ডালে।  
 “হো হো” করি পুনর্বার উঠিল হাসিয়া  
 চতুরা বালিকা, কোধে কহিল বালক  
 “জোহরা, হে'সনা তুমি উপহাস করি  
 এই ভাবে, তব হাসি দেখিলে আমার  
 অস্ত্র জ্বলে” পুনর্বার হাসিয়া বালিকা  
 কহিল “কাদিব তবে ? কণ্ঠ দেখি মোরে  
 সন্তুষ্ট হ'বে কি তুমি যদি কাদি আমি ?”  
 এইবার এতাহিম মলিন বদনে  
 কহিল “জোহরা, আমি ভালবাসি তোমা  
 প্রাণ সম, কিন্তু তুমি উপহাস-বাক্যে  
 কেন কর জর্জরিত হৃদয়ে আমার ?”  
 এতাহিম পুনঃ শর করিলা নিক্ষেপ  
 ক্ষুণ্ণ প্রাণে, লক্ষ্য করি পাখীটির পানে ;  
 কিন্তু তা'ও হ'ল ব্যর্থ, জোহরা আবার  
 তাড়াতাড়ি ক্রিপ্রহস্তে নিক্ষেপিল শর ;  
 চক্ষুর নিমেষে করি ঘোর হাহাকার  
 পড়িল ভূতলে সেই বন-কপোতিনী।  
 তুষিতে সে ভগ্নোৎসাহ ক্ষুণ্ণ এতাহিমে  
 জোহরা আদরে তার চিবুক ধরিয়া  
 কহিল মধুর স্বরে “এই নেও ভাই  
 এবার তোমারি জয়,—অব্যর্থ সন্ধান  
 প'ড়েছে এ ঘুঘু তব ; একটি পড়েছে  
 মম শরে, তব শরে প'ড়েছে অশ্রুটি,  
 তার জন্ত কেন ভাই ক্ষুণ্ণ তুমি এত ?”  
 এতাহিম চাপা স্বরে কহিল তাহারে  
 “না ভাই তোমারি শরে প'ড়েছে এ ঘুঘু।”  
 হেন কালে ক্ষতবেগে কানন হইতে

উন্নত সন্ন্যাসী এক আসিয়া সেখানে  
 কহিল। গজিয়া “তুই পাষণ হৃদয়  
 জোহরা, বালিকা হ’য়ে এমন কঠোর  
 হৃদি তোর, প্রায়শ্চিত্ত ভুগিবি নিশ্চয়,  
 কোন্ দোষে বধিলি এ বিহগ-দম্পতী ?  
 এ জনমে তুই আর স্বামীর মোহাগ  
 পাইবিনে, স্বামী সনে সুখে গৃহেবাস  
 করিতে নারিবি তুই আর এ জনমে ।  
 কাঁদিতে কাঁদিতে তোর যাইবে জীবন ;  
 কঠিন হৃদয় তোর, যে কাল কবিলি

আজি তুই, সেই কাজ হ’বে তোর ব্রত ।  
 সহস্র সহস্র লোক হইবে নিধন  
 তোর হাতে—তোর সেই উলঙ্গ কপাণে ।  
 অদৃশ্য হইল। সেই তপস্বী প্রবর  
 মুহূর্ত্তে—বায়ুর সনে গেলা যেন মিলি ।  
 জোহরা বিস্মিত হৃদে রহিল। দাঁড়ায়ে  
 নিরখিয়া যেন এই ভীষণ স্বপন ।  
 জোহরার মুখপানে চাহিয়া নীরবে  
 বালক স্তম্ভিত ভীত সজ্জল নয়ন ।

# সূচীপত্র

## প্রথম খণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠা
১ম সর্গ—সেতারা ; রাজোচ্চান	৩
২য় সর্গ—মলয় গিরি ; সমুদ্র তীর ; মহারাষ্ট্র-গুরু ও ভৈরবীর যোগাশ্রম	৮
৩য় সর্গ—সেতারা ; রত্নজীর গৃহ ; বিবাহ উৎসব	১০
৪র্থ সর্গ—মলয় গিরির অধিত্যকা	১৩
৫ম সর্গ—সেতারা ; রাজোচ্চান	১৫
৬ষ্ঠ সর্গ—মলয় গিরি ; সমুদ্র তীর ; মহারাষ্ট্র-গুরু ও ভৈরবীর যোগাশ্রম	২০
৭ম সর্গ—কৃকা নদী-তীর	২৪
৮ম সর্গ—মলয় গিরি ; সমুদ্র তীর ; দোল পূর্ণিমার মেলা	২৭
৯ম সর্গ—মলয় গিরি ; যোগাশ্রম ; মহাদেবের গৃহা-চার	২৯
১০ম সর্গ—কোলাপুর ; কৃকা নদী-তীর, বসন্ত রঞ্জনের গৃহ	৩১
১১শ সর্গ—মলয় গিরি, যোগাশ্রমের নিকটস্থ পুষ্প-বন	৩৩
১২শ সর্গ—মলয় গিরি ; সমুদ্র-তীর ; যোগাশ্রম	৩৬
১৩শ সর্গ—মলয় গিরি ; অবত সাগরের নিকটস্থ গভীর কানন, ছিন্নমস্তা দেবীর মন্দির...	৩৯
১৪শ সর্গ—লাহোরের প্রান্তদেশ ; জোহরা বেগমের কুঞ্জ-কুটার	৪৬
১৫শ সর্গ—সুরাট নগর ; তাপ্তী নদী-তীর, বিপ্রদাসের কুটার	৪৯
১৬শ সর্গ—সেতারা ; রত্নজীর গৃহ	৫১
১৭শ সর্গ—দিল্লীর প্রান্তদেশ ; যমুনা-তীর, জোহরা বেগমের গৃহ	৫৪
১৮শ সর্গ—দিল্লীর প্রান্তদেশ ; যমুনা-তীর ; জোহরা বেগমের গৃহ ; আতর্ষার দীক্ষা...	৫৮
১৯শ সর্গ—যমুনা-তীর ; জোহরা বেগমের গৃহ, নজীবদৌলার দীক্ষা	৬১
২০শ সর্গ—সাজাহানাবাদ, রাজ-প্রাসাদ	৬৬
২১শ সর্গ—সেতারা ; রত্নজীর গৃহ	৭৬
২২শ সর্গ—সেতারা, রাজ-প্রাসাদ	৮৪
২৩শ সর্গ—সুরাট নগর ; তাপ্তী নদী-তীর, বিপ্রদাসের কুটার	৯৪
২৪শ সর্গ—ফতেপুর সিক্রি, একটি ভয়বাড়ী	৯৭
২৫শ সর্গ—সেতারা ; রাজোচ্চান ; কোমুদী বাঈ ও মহারাষ্ট্র-গুরু	১০৫
২৬শ সর্গ—নর্মদা নদী-তীর, বিদ্যাচল ; মুনিদের আশ্রম	১০৮
২৭শ সর্গ—সেতারা ; রত্নজীর গৃহ	১১৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
২৮শ সর্গ—বিছাচল ; মুনিদের আশ্রম ...	১১৮
২৯শ সর্গ—নরদা নদী-তীর ; তপস্বিনীর আশ্রম ...	১২২

---

### দ্বিতীয় খণ্ড

১ম সর্গ—সেতারা ; বিন্ধনাথের প্রমোদ-কানন ...	১৩১
২য় সর্গ—মোমেন শিবির ; অনুপ সহর ; গঙ্গা-তীর ...	১৩৭
৩য় সর্গ—দিল্লীর প্রান্তদেশ ; মহারাষ্ট্র শিবির ...	১৪৪
৪র্থ সর্গ—অযোধ্যা নগরীর প্রান্তদেশ ; সরযু নদীর-তীর ; সুজাউদৌলার প্রমোদ-কানন ...	১৪৭
৫ম সর্গ—লখনৌ ; সুজাউদৌলার প্রমোদ-কানন ...	১৫৩
৬ষ্ঠ সর্গ—লখনৌ, সুজাউদৌলার প্রমোদ-ভবন ...	১৫৫
৭ম সর্গ—দিল্লী ; মহারাষ্ট্র-শিবির ...	১৫৮
৮ম সর্গ—বিছাচল ; ভৈরবী মন্দির ...	১৭০
৯ম সর্গ—আগ্রা ; যমুনা-তীর, নজীবদৌলার প্রমোদ-কানন ...	১৭৯
১০ম সর্গ—কুঞ্জপুর দুর্গ ; যুদ্ধ ...	১৮৮
১১শ সর্গ—পুরাতন দিল্লী ; তপস্বীর আশ্রম ...	১৯৩
১২শ সর্গ—ফতেপুর সিক্রি ; একটি ভয়বাড়ী ...	২০৬
১৩শ সর্গ—দিল্লী ; যমুনা-তীর ; নজীবদৌলার আবাস-ভবন ...	২০৮
১৪শ সর্গ—আগ্রা, যমুনা-তীর ; মাহেক বেগমের গৃহ ...	২১৫
১৫শ সর্গ—পুরাতন দিল্লী ; কুতুব মিনার ...	২২১
১৬শ সর্গ—আগ্রা নগরী ; আদিনা বেগের বৈমাত্রেয় ভ্রাতার গৃহ ...	২২৯
১৭শ সর্গ—আগ্রার নিকটস্থ বনভূমি ; একটি পুরাতন বাড়ী ...	২৩৮
১৮শ সর্গ—পানিপথের নিকটস্থ বনভূমি ; সরস্বতী নদী-তীর ; কালিকা-মন্দির ...	২৪৫
১৯শ সর্গ—আগ্রার নিকটস্থ বনভূমি ; একটি পুরাতন বাড়ী ...	২৫১
২০শ সর্গ—সাহাডেরা ; মুসলমান শিবির ...	২৫৬
২১শ সর্গ—কুঞ্জপুর ; মহারাষ্ট্র শিবির, সদাশিবের ভীষণ আদেশ ...	২৬৮
২২শ সর্গ—কুঞ্জপুর ; শশান-কালীর ঘাট ; যমুনা-তীর ...	২৭৩
২৩শ সর্গ—খানেশ্বর ; ইল্লাম শক্তিকে উষোমন ও তপস্বীর প্রতি বন্দোবস্ত ...	২৭৭
২৪শ সর্গ—শোনপথ অঞ্চলের বনভূমি ; কুম্ভ নদী-তীর ...	২৮৪

৩।০  
তৃতীয় খণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠা
১ম সর্গ—পানিপথ প্রান্তর ; মহারাষ্ট্র ও মুসলমান শিবির ... ..	২১০
২য় সর্গ—পানিপথ—যুদ্ধক্ষেত্র ; মহারাষ্ট্র ও মুসলমানদের মহাসমর ; মহাস্মশান ...	৩০০
৩য় সর্গ—পানিপথ ; মুসলমান শিবির ... ..	৩২২
৪র্থ সর্গ—পানিপথ ; দুরাণী শিবির ... ..	৩৩০
৫ম সর্গ—কারাগৃহ ; পানিপথ ; মুসলমান শিবির ... ..	৩৩৩
৬ষ্ঠ সর্গ—পানিপথ ; মুসলমানদের গোরস্থান ; সরস্বতী নদী-তীর ; পুষ্পবন ; আতাবী, মেলিনা, এগ্রাহিম কাফি ও জোহরা বেগমের সমাধি-মন্দির ...	৩৩৮
৭ম সর্গ—বিখ্যাতের স্মশান ; পানিপথ ; সরস্বতী নদী-তীর ; যোগিনী মূর্তি ...	৩৪২



মহাশয়

মহাশয়

প্রথম পৃষ্ঠা



## প্রথম সর্গ

[ সেতারা—বাগ্যোদ্যান ]

এ কোন্ অমরাবতী কহ লো করনে  
সুধামুখি, কহ তুনি এ কার উদ্যান  
মঠাভূমে ? ত্রিদিবের নন্দন-কানন  
নহে সমতুল ; দেবি, কোন্ ভাগ্যবান  
গড়িয়াছে এ উদ্যান এত সুশ্রী করি  
এই স্থানে ?—অই দেখ নয়ন রঞ্জন  
কত পুষ্প তরু, কত কুসুম-বল্লরী  
শোভিতেছে শ্রেণীমত ; তরু শাখে বসি  
কত জাতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখী মনোহর  
আলাপিছে সুধারবে সঙ্গীত মধুর ।  
স্থানে স্থানে কত মঞ্জু নিকুঞ্জ বীথিকা  
শোভিতেছে নানাবর্ণ কুসুমের হারে  
অমৃগম, কোন স্থানে মর্ম্মর-নির্ম্মিত  
উচ্চ নাট্যশালা, নিম্নে অতি বক্রভাবে  
হেলিয়া, সোপান-পাংক্তি চূষিছে সরসী  
কোথা বা কৃত্রিম উৎস বর্ষ বর্ষ রবে  
বরিছে ; প্রকৃষ্ট জল সূর্য্যের কিরণে  
হীরকের পুষ্পসম বলবল করি

কি এক অপূর্ব শোভা ক'রোছে ধারণ !  
অই দেখ কি সুন্দর ঘুরিয়া ফিরিয়া  
রক্ততের হার সম কৃত্রিম তটিনী  
শোভিছে এ কুঞ্জবন করিয়া বেটন ।  
জলচর পক্ষীগুলি শোভিছে সুন্দর  
চক্রাকারে দলে দলে জলের উপরে ।  
অসংখ্য কলের বৃক্ষ সমুন্নত শিরে  
বিস্তারিয়া মহাবাহু স্নেহ আলিঙ্গনে  
চির বন্ধ, নিম্নে স্নিগ্ধ সমতল ভূমি  
ছায়াময়ী, সুশোভিত প্রস্তর আসনে ।

অপরূহ ; প্রভাকর পশ্চিম গগনে  
প'ড়েছে হেলিয়া, ধীরে স্নিগ্ধ সমীরণ  
সঞ্চরিছে, কাঁপাইয়া নব মুকুলিত  
পুষ্প-কলি, কচি কচি পল্লব সুন্দর ।  
উদ্যানের পূর্ব্বপ্রান্তে নিকুঞ্জ-বিড়ানে  
বসিয়া বৃক্ষ এক প্রস্তর আসনে  
চিন্তা ভারে বিমলিন, থাকিয়া থাকিয়া

সতৃষ্ণ নয়নে মল্ল নিকুঞ্জের দিকে  
নিরখিছে,—যুদ্ধ মনে রয়েছে বসিয়া  
কার অপেক্ষায় তানি এ কুঞ্জ কাননে ।

কণ পরে কিছু দূরে দেখিলা যুবক  
অকুটস্থ পুষ্প সম একটি বালিকা  
সজ্জিত কুসুম হারে—বন দেবী প্রায়  
আসিছে তাহার দিকে মন্তর গমনে ;  
আনন্দে যুবার হৃদি উঠিল নাচিয়া,  
নাচে যথা সিদ্ধবক্ষে কুঞ্জ বীচিমালা  
সুধাংশু-কিরণ-তলে যুগ সমীরণে ।  
আঁটলা বালিকা ধীরে যুবকের কাছে ;  
নিমুদ্র বিহ্বল যুবা, পৃথিবীর সীমা  
অতিক্রমি, উপনীত স্বপ্নরাজ্যে যেন,  
নাহি সংজ্ঞা, স্পন্দহীন ঘোর অচেতন,  
পার্শ্বদেশে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর আসনে  
বসিলা বালিকা, মরি, শোভিল সুন্দর  
স্থিরা সৌদামিনী যেন কাদস্থিনী-কোলে ।  
কহিলা বালিকা ধীরে সুধামাধা স্বরে  
ধরিয়া যুবার কর,—“কহ প্রাণেশ্বর ।  
কেন আজি চিন্তাকুল বিষণ্ণ বদন ?  
কোন্ দোষে দোষী আমি তোমার চরণে  
প্রাণনাথ ? হেরি তব এ মলিন মুখ  
শেল সম বিধিভেদে হৃদয়ে আমার ।”  
বালিকার এ করুণ মধুমাধা স্বরে  
লভিলা চেতনা যুবা, কহিলা কাতরে—  
“যে অগ্নি প্রাণের মাঝে সদা প্রধুমিত,  
কেমনে নিবাই তাহা ? হায় শ্রিয়তমে ।  
হৃৎকল মানব আমি, অবস্থার শ্রোতে  
চলেছি ভাসিয়া, ভাসে যথা তক তৃণ

তটিনী-তরঙ্গোপরে উঠিয়া পড়িয়া ।  
নাহি অর্থ, পিতৃবোর চক্রান্তে পড়িয়া  
হারিয়েছি সব আমি, জনমের মত ।  
পথের ভিখারী আমি, নাহি পিতা ভ্রাতা,  
নাহি কোন স্নেহময় আত্মীয় স্বজন  
রক্ষিতে আমারে এই ভীষণ বিপদে ।  
আছে সেই একমাত্র জননী হৃঃখিনী  
মুছাইতে শুধু এই নয়নের জল ;  
কি করিব ?—ভেবে ভেবে অস্থির হৃদয়,  
উচ্ছা করে তেয়োগিতে এ পাপ জীবন  
গরলে, অথবা কৃষ্ণা তটিনীর জলে ।”  
অকস্মাৎ বাধা দিয়া কহিলা বালিকা  
“কি হৃঃখে রত্নজী ! তুমি ত্যজিবে জীবন ?  
বলিব মায়েরে, ধরি চরণে তাঁহার  
ফিরাইতে কোন মতে জনকের মতি,—  
রক্ষিতে তাহার এই হৃঃখিনী কস্তারে ।”  
“নির্বোধ বালিকা তুমি” কহিলা রত্নজী  
সুগম্ভীর স্বরে “বল বুঝিবে কেমনে  
‘বিশুদ্ধ পয়োমুখ’ বিমাতা তোমার ?  
বহ যত্ন করিয়াছি, সকলি নিফল ;  
তোমার সৌন্দর্য্য হেরি লভিতে তোমায়ে  
বিষম উন্মত্ত আজি সিদ্ধজী পামর ।  
অনেক কোণে ধূর্ত গোপনে গোপনে  
বহ অর্থ প্রদানিয়া বিমাতায় তব  
ক’রেছে বিবাহ স্থির ; বল দেখি প্রিয়ে,  
সে কি কভু এ বিবাহ ফিরাইতে পারে ?  
কি কব হৃঃখের কথা লবঙ্গ লভিকে ।  
অভাগা বাদব\* তাহে সিদ্ধজীর সনে  
মিশ্রিয়াছে, সে আমারে দিবস শরীরী  
ভুলিতে তোমার সদা করে উদ্বেজিত ।

লবঙ্গ, তোমারে আমি পাব না নিশ্চয়  
বুঝিয়াছি, কিন্তু হৃদে পাইবু যে ব্যথা  
যুচিবে না তাহা আর এ মর-জীবনে ।  
কে জানিত শৈশবের সেই ভালবাসা  
এই ভাবে অবশেষে বধিবে আমারে ।  
ভেবে দেখ, ভাবিতেও বিদরে হৃদয়,  
শৈশবে অদৃষ্ট যবে ছিল অমুকুল,  
কত সুখে ধূলাখেলা খেলেছি হু'জন ।  
একত্র হু'জনে বসি তটিনীর তীরে  
কত তরী গণিয়াছি সায়াহ্ন প্রভাতে ।  
মধ্যাহ্নে অশ্বখ মূলে শীতল ছায়ায়  
বসিয়া আনন্দে কত স্নিগ্ধ সমীরণ  
সেবিয়াছি, গণিয়াছি গগনের ভালে  
কুটম্ব তারকাগুলি এক হুই করি  
বসিয়া সায়াহ্নে সেই প্রাসাদের পরে ।  
উভয়ের পিতা মাতা নিরখি এ ভাব  
বলিত বাঁধিবে দোহে বিবাহ-বন্ধনে ।  
কোথায় সে দিন আজি ? অদৃষ্টের দোষে  
আমার সে পিতৃদেব নাহি এ ভুবনে !  
অদৃষ্টের দোষে সেই জননী তোমার  
গিয়াছেন স্বর্গধামে জনমের ভরে ।  
বল দেখি কে শুনিবে তোমার রোদন  
প্রিয়তমে ! কে মুছাবে নয়নের জল  
সাদরে তুষিয়া তোমা স্নেহ-সম্ভাষণে ?  
বা'ক প্রিয়ে, সে কথায় নাহি প্রয়োজন ;  
ভুলে যাও অভাগারে জনমের মত ;  
সুখে থাক, এই দেখা শেষ দরশন !  
যাব দূর বিজ্ঞাচলে তাপস-আশ্রমে,  
গৃহাশ্রমে প্রাণমরি, নাহি তিষ্ঠে মন ।"  
যুগ্মে এ কথাগুলি বালিকার প্রাণে

বিঁধিল শেলের মত, সজল নয়নে  
ফেলিলা নিশ্বাস বালা, প্রাণ-বায়ু যেন  
বাহিরিল সেই দণ্ডে সে নিশ্বাস সহ  
হৃদয় পিঞ্জর ছাড়ি মরি বসুধার  
নিষ্ঠুরতা ; মহাঝড়ে বুঝি বায়ু সনে  
পড়ে যথা বন-লতা বসুধার বুকে,  
অভাগিনী ভয় প্রাণে পড়িয়া তেমতি  
রক্তজীর পদযুগলে, তখনি সাদরে  
রক্তজী তুলিয়া তারে পরম যতনে  
প্রবোধিলা কতরূপ স্নেহ সম্ভাষণে ।  
হুই বিন্দু অক্ষরবারি নামিতে লাগিল  
রক্তজীর গণ্ড বাহি, পড়িল ঝরিয়া  
লবঙ্গের স্বর্ণ মুখে—মরি কি সুন্দর  
শোভিল শিশির বিন্দু মুকুতার মত  
প্রভাতের অর্ধশুট স্বর্ণ-শত দলে,  
অথবা প্রেমিক প্রাণ করিয়া মোহিত  
শোভে যথা বৈশাখের প্রথম বর্ষণে  
সামান্য হুঁচারি বিন্দু নব-যন-বারি  
অর্ধশুট গোলাপের কোমল কোরকে ।  
কহিলা লবঙ্গ, “নাথ, কেন কাঁদাইছ  
হুঃখিনীরে ? অভাগীর কোমল পরাণে  
কেন বর্ষিতেছ হেন স্মৃতির অনল ?  
হৃদয়ের অন্তঃস্থলে যে যুগ্মি স্থাপিয়া  
পূজিয়াছি এতদিন, হৃদয় নিভাতে  
জঁপেছি যে নাম আমি দিবস রজনী ।  
যার সুখময়-স্মৃতি হৃদয়ে আমার  
বরষে অমৃত-ধারা, তুলিয়া সে জনে  
অস্ত্রে বিবাহ আমি করিব কেমনে ?  
এ কুজ হৃদয় মম সঁপেছি তোমারে  
বহু দিন, কেমনে তা প্রদানি অপরে ?



কোন অধিকার মম আছে সেই ধনে  
 প্রাণ-নাথ ? এ রাজ্যের অধীশ্বর তুমি ;  
 তুমি ধর্ম, তুমি কর্ম, তুমি মতি গতি ;  
 তব প্রীতি বিনা দাসী এ মর-জীবনে  
 কিছুই চাহেনা আর ; এ ঘোর আধারে  
 স্বর্গের দেবতা তুমি, সংসার-সাগরে  
 তোমারি চরণ ছুটি পবিত্র তরলী ।”  
 কাঁদিলো বালিকা, নেত্রের ঝর ঝর করি  
 ঝরিল প্রেমাক্ষ, হায় কত মূল্যবান  
 এক বিন্দু অক্ষরারি, বুঝিবে কেমনে  
 মুখ নর, স্বাধপর কুটিল সংসারে ?—  
 —তুচ্ছ শত কোটিমুদ্র এ বিন্দুর কাছে ।  
 লবঙ্গের অক্ষর জল মুছিয়া যতনে  
 কহিলো রত্নজী, নেত্র নত অক্ষর ভোরে,  
 “লবঙ্গ, আমার এই প্রত্যেক নিশ্বাসে  
 প্রতি ব্যবহারে, তুমি পারনি বুঝিতে  
 আজিও তোমারে আমি কত ভালবাসি ?  
 আমি কত পূজা করি অশনে বসনে  
 তোমার মোচিনী যুক্তি স্থাপিয়া যতনে  
 যদি মাঝে ? এ সংসার পরীক্ষার জল ;  
 অবস্থার দাস নর, কে জানে কখন  
 কাহার অন্তরে ফলে কি ভাবন ফল ?  
 কি হ’বে সে স্নেহে মম, মানব চেষ্টায়  
 কি ফল হ’য়েছে কবে ? লবঙ্গলতিকে ।  
 হ’বে না আমার তুমি ; এ কত ক্ষণে  
 এক মাত্র মহৌষধি নয়নের জল ।”

নীরখিলো যুবা, বালা কহিলো কাঁদিয়া  
 সুমধুর বীণা যেন পূরবীর স্বরে  
 উঠিল বাজিয়া, মুগ্ধ করিয়া যুবারে,

“প্রাণনাথ, বল তুমি যাবেনা ত্যজিয়া  
 এ দাসীরে, গেলে তুমি দিবস রজনী  
 স্মরি তোমা এ হুঃখিনী মরিবে কাঁদিয়া ।”  
 কাতরে করুণ কণ্ঠে কহিলো রত্নজী  
 “যাইব না, কিন্তু প্রিয়ে এ প্রতিজ্ঞা মম  
 যে দিন সিদ্ধুজী সনে বিবাহ-যজ্ঞে  
 হ’বে বদ্ধ, সেই দিন দেখিবে না আর  
 অভাগারে, সেইদিন যাইবে ভাসিয়া  
 সকলি, সংসার-পাশ করিয়া ছেদন  
 যাইব সে দিন আমি গহণ কাননে ।”  
 “আবার ?—আবার নাথ সেই এক কথা ?”  
 কাতরে অড়িত কণ্ঠে কহিলো লবঙ্গ,  
 “ছুঁইয়া চরণ তব করিহু প্রতিজ্ঞা  
 প্রাণেশ্বর, অভাগীর অন্তরে দোষে  
 এ বিপদ সংঘটিলে কৃষ্ণার সলিলে  
 নিশ্চয় সে দিন আমি ত্যজিব জীবন ।”  
 হেনকালে ধীরে ধীরে প্রাবিয়া গগন  
 সুধাশ্বরে প্রণয়ের করুণ উচ্ছ্বাস  
 কে জানি গাইল মুগ্ধ করিয়া ধরারে ।  
 তরঙ্গে তরঙ্গে স্বর উঠিয়া পড়িয়া  
 কি যেন অমৃত এক দিল ছড়াইয়া  
 ভাবময়ী প্রকৃতির প্রাণের ভিতরে ।  
 দিল ছড়াইয়া এক অতৃপ্তির সুরা  
 ধীরে ধীরে, উত্তরের আকুল অন্তরে—  
 তুমি—যেওনা—আবারে ছেঁড়ে ।  
 আরি—জনমে জনমে, তোমারি চরণে  
 থাকিব প’ড়ে ।

তুমি—আবার জীবনে, জেগাছনা ছড়া’য়ে  
 হৃদয়-বলিরে কুসুম বিছারে  
 স্বপনের মোহ হৃদয়ে আগারে  
 সুখ পাতি যোর

নিওনা কে'ড়ে ।

আমি—জনমে জনমে, তোমারি চরণে  
ধাকিব প'ড়ে ।

আমি—নয়নের জলে দিবস যামিনী,  
মুছাব তোমার চরণ দুখানি,  
সারাটি জীবন ভ'রে ।

তুমি—পাখাবী হইয়া হৃদয় ছিঁড়িয়া  
প্রাণটি আমার চরণে দলিয়া  
যেওনা যেওনা ছে'ড়ে ।

আমি—জনমে জনমে, তোমারি চরণে ।  
ধাকিব প'ড়ে ।

সঙ্গীতের প্রতি ডানে প্রত্যেক হিলোলে  
উভয়ের প্রাণ যেন উখাও হইয়া  
চলি গেল কোন্ দূরে ; লহরে লহরে  
উঠিল পড়িল স্বর, লবঙ্গ-নয়নে  
নীরবে ঝরিল অশ্রু-সর্গীর রতন ।  
মুহূর্তে অমনি যুবা সতৃষ্ণ নয়নে  
চাহিল। লবঙ্গ পানে, দেখিল। সে মুখ  
মেঘে ঢাকা শশী যেন, অথবা সরসে

প্রভাতের অর্ধফুট স্বর্ণ-সরোজিনী  
নিশির নিশিরে স্নাত, ডাকিল। যুবক  
সাদরে চিবুক ধরি, তুলিয়া নয়ন  
বীণা-বিনিমিত্ত স্বরে কহিল। লবঙ্গ  
“রত্নজী”—মুখের কথা ফুটিল না আর ।  
অনিমেঘ নেত্র বাল। রহিল চাহিয়া  
রত্নজীর মুখ'পানে, স্বর স্বর করি  
বিন্দু বিন্দু অশ্রুবারি পড়িল গড়ায়ে  
সুবর্ণ-কপোল বহি মুকুতার মত ।  
সাদরে টানিয়া ছদে কহিল। রত্নজী  
‘কঁদ কেন ?’ কীণ হাসি হাসিয়া বালিকা  
সরমে আনত মুখে উত্তরিল। ধীরে  
“তুমি কঁদ কেন ?” যুবা কহিল। আবার  
“জান না তা' ?—এস তবে বলিব এখনি ।  
যুবকের বক্ষে শির রাখিয়া বালিকা  
কঁদিল। ; আকুল ছদে বিমুক্ত যুবক  
অশ্রুসিক্ত মুখখানি করিল। চুম্বন,  
চুম্ব যথা মুক্ত অলি নিশি অবসানে  
শিশিরাক্ত অর্ধফুট কমল-আনন ।

## দ্বিতীয় সর্গ

[ মলয় গিরী ; সমুদ্রতীর ; মহারাষ্ট্র গুরু ও ভৈরবীর যোগাশ্রম ]

অশ্রুচ্ছ মলয় গিরিঃ সজ্জিত সুন্দর  
ভ্রামল বিটপী-কুঞ্জে—কুসুমের হারে ।  
তরঙ্গিত শৃঙ্গগুলি চুখিছে অশ্রব,  
মেঘপুঞ্জ প্রধাবিত এ ধারে ও ধারে ।  
তরুলতা সমাচ্ছন্ন এ সুরমা গিরি  
নিরখিলে কণমাত্র জুড়ায় নয়ন ;  
স্থানে স্থানে নিখরিনী গাইছে মধুরে  
আরণ্য সঙ্গীত কত বর বর হবে  
তরুর মর্ম্মর সনে ; কোথা-পুষ্প-বীধি,  
কোথা ফল তরু, কোথা নিবুজ বিতান,  
সুশোভিত মনোহর বিবিধ বর্ণের  
মুকুলে—ফুটফুলে ; প্রকৃতি সুন্দরী  
সাজায়ে রেখেছে যেন এ নির্ভূত বনে  
অরূপতি বসন্তের বিলাস ভবন ।  
ফুলের সৌরভ নিয়া মধুর ত্রিলোকে  
বহিতেছে বসন্তের স্নিগ্ধ সমীরণ ।  
দয়েলা কোয়েলা শাশা সুকণ্ঠ গায়ক  
কত জাতি বন-পাখী গাইছে মধুরে  
ছড়ায়ে অমৃত ধারা প্রকৃতির প্রাণে,  
চারিদিক মুখরিত আরণ্য সঙ্গীতে—  
—বিহগের কলকণ্ঠ নিখরীর তানে ।

অধূরে নীলাশু রাশি—ফেনিল সাগর  
সীমান্ত, তীরে তার খাউ তরুল

শ্রেণীমত, জলচর পক্ষীগুলি তাহে  
উড়িছে বসিছে, কভু ডুবিয়া সাগরে  
করিতেছে জলকেলি মনের উল্লাসে  
থেকে থেকে ; কিছু দূরে বিশাল প্রান্তরে  
অগণিত বৃক্ষ শ্রেণী—চন্দন শাল্মলী  
তমাল পিয়াল শাল শাখা প্রশাখায়  
আলিঙ্গিয়া পরস্পর শোভিছে সুন্দর ।  
সূর্য্যের কিরণ নাহি অবশেষে সেখানে  
মধ্যাহ্নে, বিটপীগুলি এত ঘনতর ।  
বহনূর ব্যাপী এই আরণ্যানী ঘোর  
সমুদ্রের তীরে তীরে গিয়াছে চলিয়া  
শৈল-গাত্রে, বেষ্টি এই মলয় শেখর ;  
কোথাও বা তাল তরু—প্রকৃতি-প্রহর  
উর্দ্ধশির, বহু বাহু করিয়া বিস্তার ।  
গিরি-মূলে গুহাগুলি,—গাত্র ভূধরের  
কাটি যেন কোন শিল্পী করেছে নিষ্কাশ  
বহু কক্ষ—এ নির্ভূত নির্জন কাননে  
যোগীদের যোগাশ্রম অতুল সুন্দর ।  
একটি কক্ষের মাঝে চামুণ্ডা মুরতি,  
পদতলে বিরূপাক্ষ, ডাকিনী যোগিনী  
হুই পার্শ্বে, অস্ত কক্ষে দেবী অন্নপূর্ণা,  
হরগৌরী, রাধাকৃষ্ণ যুগল মুরতি ।  
পার্শ্বের একটি কক্ষে সশিখা ভৈরবী  
নিবসিছে, অস্ত কক্ষে মহারাষ্ট্র-গুরু ।

\* মালব্যের হিমকেই কবিগণ "মলয় পর্বত" বলিয়া থাকেন ।

তিনজন শিষ্য তার—দিলীপ\* সমর†  
 অমরেন্দ্র‡ নিবসিছে কক্ষের ভিতরে  
 ভিন্ন ভিন্ন, শাস্ত্র শিক্ষা করিছে তাহারা  
 সতত নিবিষ্ট চিত্তে, কভুবা শিখিছে  
 অল্প বিদ্যা, সে প্রবীণ সন্ন্যাসীর কাছে।  
 শিষ্যত্রয় প্রতিদিন তুলি ফুল রাশি  
 দিতেছে পূজার তরে সন্ন্যাসী প্রবরে।  
 অঙ্গরা-নন্দিনী প্রায় শিষ্যা চারিজন  
 হিরণ§ চঞ্চলমতী(১) জ্যোৎস্না(২) কালীভারা(৩)  
 পাঠান্তে পূজার ফুল করিছে চয়ন  
 ছুটে মনে, মা ভৈরবী প্রদোষ প্রভাতে  
 প্রতাহ করিছে পূজা সেই ফুল দলে।  
 একটি গুহার মাঝে বসিয়া হিরণ  
 সুগভীর চিন্তা মগ্না, হেনকালে তথা  
 প্রবেশিয়া হাসিমুখে কহিল জ্যোৎস্না  
 “তুলিতে পূজার ফুল গেলি নে হিরণ ?  
 মা ভৈরবী গিয়াছেন সাগর সলিলে  
 বহুকণ, স্নানশেষে আসিয়া এখনি  
 পূজিতে যাবেন তিনি ঈষ্ট দেবতারে।  
 এখনো যে ফুল তুই গেলিনে তুলিতে ?  
 কার কথা বসে বসে ভাবিস একাকী  
 দিন রাত ? আমরা যে হ’য়েছি অবাক  
 দেখে তোর লীলা খেলা, আশ্রমে থাকিয়া  
 এমন উন্মনা ভাব ভাল নহে দিদি ?  
 আজি পালা তোর, তাও গিয়াছিস্ তুলে ?”  
 “না দিদি তুলিনি আমি” বলিয়া হিরণ

তখনি উঠিয়া গেল। ফুল তুলিবারে।  
 হিরণ একাগ্র মনে তুলিতে লাগিল।  
 ফুলরাশি, ভৈরবীর পূজার লাগিয়া।  
 কণপরে সেইস্থানে অমরেন্দ্র এ’সে  
 দিল। তুলে বহু ফুল হিরণ বালারে।  
 কহিল। সে “তুই আর যাসনে হিরণ  
 দিলীপের কাছে, সে যে ছুটে ভয়ঙ্কর।  
 আর এক কথা আমি কত দিন তোরে  
 সুধা’ব সুধা’ব বলে ভাবি মনে মনে,  
 কিন্তু তুলে যাই তাহা জিজ্ঞাসিতে তোরে,  
 সত্য ক’রে বল দেখি, দিলীপ কি কভু  
 আমার সম্বন্ধে কিছু বলেছিল তোরে ?  
 সে কেন সর্বদা তোর পাছে পাছে ঘুরে ?”  
 “হাঁ অমর” উত্তরিল। হিরণ তাহারে,  
 “সে আমাদের বহুদিন করেছে নিষেধ  
 যেতে তব কাছে, আমি বলেছি তাহারে  
 কেন যাইব না আমি তব কথা মত  
 তার কাছে ? দাসী আমি নহি ত তোমার ?  
 তোমার ও সব কথা চাহিনা শুনিতে,  
 কেন মোরে কর ত্যাক্ত, করেছি নিষেধ  
 আসিতে আমার কাছে কতদিন তারে ?  
 কিন্তু সে আমার কথা নাহি গ্রাহ্য করে।”  
 “আচ্ছা তবে দেখা যাবে” কহিল। অমর,  
 “যাও তুমি, অই দেখ আসিছে জ্যোৎস্না।”  
 হিরণ সে ফুলগুলি লইয়া তখন  
 গেল। চলি দ্রুত বেগে ভৈরবীর কাছে।

\* দিলীপ রাত। † সমরেন্দ্র রাত। ‡ অমরেন্দ্র রাত। § হিরণ বালা বাদী,

(১) চঞ্চলমতি বাদী, (২) জ্যোৎস্নামতী বাদী, (৩) কালীভারা বাদী।

## তৃতীয় সর্গ

[ সেতারা ; রঘুজীর গৃহ ; বিবাহ উৎসব ]

বাজিছে উৎসব-বাদ্য ঋণু ঋণু রবে  
রঘুজী-ভবনে, কত রাগিণী সুল্লর  
আলাপিয়া, বিমোহিয়া দর্শকের মন  
অগণিত, বিকম্পিত পুরী মনোহর  
আনন্দের মধুমাখা উচ্চ হাস্য-রবে ।  
সুসজ্জিত প্রতি কক্ষ আলোকের হারে ,  
কুসুম স্তবকে ; কত শ্যামল পল্লবে ।  
চারিদিকে কত দৃশ্য, কত অভিনয়  
বিমোহিছে শত শত দর্শকের মন ।  
অন্তঃপুরে বামাদল বিবিধ ভূষণে  
সাজাইছে লবঙ্গেরে, কিন্তু অভাগিনী  
বিষাদে মলিন মুখে বসিয়া নীরবে  
কাঁদিতেছে, অজ্ঞানল বর বর করি  
ধরিতেছে, অবিরল মুকুতার মত ।  
কত জন লবঙ্গেরে উপহাস করি  
কহিতেছে কত কথা, সে বিক্রম আঁহা  
বিধিতোছে খেল সম বালিকার প্রাণে :  
গৃহস্থানী কতবার অঙ্গর বাহিরে  
ঘুরিতেছে, কত কথা গৃহিনী তাহারে  
জিজ্ঞাসিছে কাণে কাণে, কি উত্তর তার  
কেমনে জানিবে কবি, তাও কাণে কাণে ।  
বর আগমন আশে ভূষিত জনয়ে  
সকলেই পথপানে রয়েছে চাহিয়া !

তিল তিল করি নিশা চলিল বহিয়া ।  
শশধর ধীরে ধীরে পশ্চিম গগনে  
ডুবিল, প্রকৃতি দেবী মলিন বদনে  
কাঁদিল বিষাদে, বিশ্ব ডুবিল আঁধারে ।  
হেন কালে শত কণ্ঠে মহা কোলাহলে  
উঠিল আনন্দ ধ্বনি, উর্ধ্ব-শ্বাসে মরি  
ছুটিল যুবক বৃদ্ধ বালক বালিকা  
যে ছিল বেখানে, বেগে উঠিয়া পড়িয়া  
সেই দিকে, সেই সঙ্গে উঠিল বাজিয়া  
আনন্দে মজল-বাদ্য মধুর সুবরে  
মূর্ছভঞ্জে মাতাইয়া দিক্ দিগন্তর ।  
দেখিতে দেখিতে বর আইলা সেখানে ।  
রঘুজী পরম যত্নে বসাইলা সবে  
নির্দিষ্ট আসনে : মরি তরঙ্গে তরঙ্গে  
কত যে রহস্য গল্প চলিতে লাগিল  
পরস্পরে ; আনন্দের প্রবল উজ্জ্বল  
বহিতে লাগিল সেই সন্তা-পারাবারে,  
ফুটন্ত কমল-মুখী নর্তকী নিচর  
প্রবেশিল সভাঙ্গলে, রূপের কিরণে  
উদ্ভাসিল গৃহ, শত সুবর্ণ-ভূষণে  
সজ্জিত রমণী বৃন্দ ; কেহ বা বোড়ী  
কেহ বালা, কেহ গৌরী, কেহ বা সুবতী  
বসনে ভূষণে পুষ্পে রমণী-সৌন্দর্য্যে



কি শোভা ধরিল গৃহ ; উৎসব ভবনে  
 কুটিয়া উঠিল যেন পুষ্প রাশি রাশি  
 মালতী-মতিরা-বেলী গোলাপ-পাছিনী,—  
 —অথবা নক্স রাঙ্গি সুনীল গগনে ।  
 সুবাসিত কুসুমের মধুর সৌরভে  
 আমোদিল সন্তানুল ; মরি কি মাধুরী,—  
 —সৌন্দর্যের স্বর্ণোজ্জ্বল কুটুম্ব কিরণে  
 আলোকিত গৃহাঙ্গন, রমণীর হাস্তে  
 মধুর কটাক্ষে, আর কুসুম সৌরভে  
 কি এক মদিরাময় জীবন্ত সৌন্দর্য্য  
 হ'ল সংগঠিত সেই উৎসব ভবনে ।  
 একটি একটি করি নর্তকী নিচয়  
 নাচিতে লাগিল, প্রতি চরণ বিক্রেপে  
 সুবর্ণ-লতিকা প্রায় চারু দেহ খানি  
 তুলিতে লাগিল সাক্ষা সমীর-হিরোলে  
 দোলে যথা সরোবরে কুল কুমুদিনী ।  
 আরম্ভিল গীত, কণ্ঠে পীযুষের ধারা  
 করিতে লাগিল, ক্রমে উঠিল পঞ্চমে  
 সুষাধর, কত শত মধুর সঙ্গীত  
 গাইল, রাগিনী কত তরঙ্গে তরঙ্গে  
 আলাপিল, বিমোহিয়া সে নৈশ প্রকৃতি ;—  
 পরজ কানেড়া গৌরী উঠিল ভাসিয়া  
 নৈশ-সমীরণ-স্তরে নিখর গগনে,  
 তরঙ্গে তরঙ্গে বর উঠিল সপ্তমে ।\*

• নিখিল কবরী পড়েছে এলা'য়ে  
 ধূমে ঢুলু ঢুলু আঁধি ।  
 গোলাপের বস সে বুধ কোবল,  
 ইচ্ছা হয় হৃদে রাখি ।

\* বেঙ্গাল রাগিনীতে সের

ডাগর নরনে চঞ্চল চাহনি প্রেমের মদিরা ভরা,  
 সুগোল সে বাহ সৌন্দর্য্যের ধনি সুরভি কসুমে গড়া  
 অধর কুসুমে রেখেছে বিধাতা  
 প্রেমের অমিয় মাখি ।  
 সে যে—ধূমে ঢুলু ঢুলু আঁধি ।  
 গোলাপী কপোল গঠিত পরাগে নিশ্বাসে ফুলের গন্ধ,  
 বক্ষে ফোটো ফোটো কমলের কলি ভরা তাহে মকরল  
 কণ্ঠে বাজে ললিত ভৈরবী  
 কুহরে যেমন পাখী ।  
 সে যে—ধূমে ঢুলু ঢুলু আঁধি ।

তরঙ্গিত কেশে কুসুমের গুচ্ছ, কটি দেশ অতি সরু,  
 সরম-সমীরে হে'লে দুলে পড়ে সে সুরভি দেহ তরু,  
 চরণ-কমলে কে জানি দিয়াছে  
 প্রেমের আলতা মাখি ।  
 সে যে—ধূমে ঢুলু ঢুলু আঁধি ।

ধামিল সঙ্গীত, অস্ত্র নর্তকী তখন  
 কুসুম কুণ্ডলে সাজি অঙ্গরার প্রায় ।  
 আসিয়া সে সন্তানুলে কত ভঙ্গি করি  
 ঠমকে ঠমকে নেচে গাতিতে লাগিল  
 আলাপিয়া মধুমাখা ভৈরবী রাগিনী

কুল কু'টেছে কুসুম-বনে কে কে যানি তুলিতে আর  
 খুর্ খুর্ খুর্ বইছে বায়ু পাপিয়া ভৈরবী গায় ।  
 গোলাপেরি মধুর হাসি, দেখিতে বড়ই ভালবাসি,  
 টগর টাপা খুঁই মালতী বেলীর গছে প্রাণ অঁড়ারি ।  
 কে যানি ফুল তুলিতে আর ।

কুনতুলি আজ তুলে এনে, খেলব নোরা বঁধুর সনে  
হেঁসে হেঁসে আড় নরনে মারব ছুড়ে বঁধুর গায়।  
কে যাবি কুন তুলিতে আয়।

রমণী-কণ্ঠের সেই ললিত কঙ্কারে  
তালে তালে সুমধুর সুপুর নিকণে,  
বর্ণ দেহ সফালনে, নিতম্ব তাড়নে  
সৌন্দর্যের উৎস যেন উঠিল কুটিয়া  
রমণী-পুষ্পের সেই নিকুঞ্জ কাননে।  
বিমুক্ত দর্শক-বৃন্দ আশ্বহারা প্রাণে  
তুলিতে লাগিল সেই সঙ্গীত মধুর।  
নৃত্য গীতে রজনীর তৃতীয় প্রহর  
হইল অতীত, ক্রমে যামিনী সুন্দরী  
গভীর-গভীরতর; আমোদ-আহ্লাদে  
সকলেই মুগ্ধ চিত; ধনিত—প্রাবিত  
হাস্তের তরঙ্গে সেই উৎসব ভরন।

কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ কুল পুরোহিত  
আদেশিলা রঘুজীরে পাত্রী আনিবারে,  
শুভ লগ্নে শুভ কাণ্ড্য করি সম্পাদিত  
মিলাইতে দ্বিগুণ মুখী ছুইটি প্রাণীরে  
সংসার-সমরাজ্যে জীবন-সমরে!  
হর্ষ ভরে অনেকেই ছুটিল তখন  
পাত্রী অনিবারে, কিন্তু বৃথা সব আশা;  
কোথা পাত্রী? শূন্য ঘর! অতি ব্যস্ত ভাবে  
ঘুরিছে রমণী বৃন্দ এ ঘরে ও ঘরে।  
মুহূর্তের মাঝে মরি মহা কোলাহল  
উঠিল, ছুটিল সবে পাত্রী অশ্রুধে  
উর্দ্ধ্বাশ্রিত; আনন্দের সুশ্রুত গগনে  
হাইল মুহূর্ত মাঝে দেখিতে দেখিতে  
অবিচ্ছিন্ন বিবাদের কালিমা ভীষণ।

রঘুজী বিষম হৃদে উন্মত্তের মত  
কাঁদিতে লাগিলা, হৃদে কত যে যাতনা  
উপজিল, ম্লান মুখে রহিলা পড়িয়া  
তরু তলে; গৃহ মাঝে গৃহিণী তাহার  
প্রাণসিয়া আপনার বুদ্ধির কোশল  
মনে মনে. দেখাইতে আগন্তুক সবে  
আরম্ভিলা উঠেখরে কৃত্রিম ক্রন্দন।  
ধীরে ধীরে বিভাবরী হ'ল অবসান,  
সকলেই এক এক কিরিতে লাগিল  
শূন্য প্রাণে, পাইয়া সন্ধান তাহার।  
কিছুক্ষণ পরে হায় কিরি এক জন  
কহিল ব্যাকুল ভাবে 'কি বলিব আর?—  
—বলিতে বিদরে হৃদি সে কথা ভীষণ।  
তুলিলাম এক জন ধীবরের কাছে  
গভীর নিশীথ কালে একটি রমণী  
ঝুপ দিয়া ডুবিয়াছে কুফার সলিলে,  
পরিধেয় বস্ত্র তার পেয়েছি সৈকতে  
এই দেখ।' সকলেই দেখিলা চাহিয়া  
অভাগিনী যেই বস্ত্র বিবাহ নিশিতে  
পরেছিল, ইহা সেই রঞ্জিত বসন।  
বিবাদে অমনি ঘোর হাহাকার ধনি  
উঠিল গগন পথে, রঘুজী অমনি  
পড়িলা মূর্ছিয়া হায় ধরণীর পরে।  
মলিন বহন বর, আঁখি ছল ছল  
অপনেও ভাবে নাই মুহূর্তের তরে  
সাধের বিবাহে তার উঠিবে গরল।  
—কোথায় বিবাহ আস্তে সে প্রেম-প্রতিমা  
লইবে হৃদয়ে?—আজি পরিবর্তে তার  
স্থাপিয় হৃদয়ে এক মূর্তি যাতনার।

## চতুর্থ সর্গ

[ মনয় গিরির অধিত্যকা ]

সুরমা মনয় গিরি স্নাত চন্দ্র করে,—  
হাসিছে কুসুম রাশি ; হাসিছে মঞ্জরী  
হাসিছে প্রকৃতি ; চন্দ্র হাসিছে অম্বরে ।  
গিরির অশ্রুচক্ষু অধিত্যকা পরে  
বসিয়া যুবক এক গাইছে সঙ্গীত  
মধুমাখা, স্বর তার উঠিয়া পড়িয়া  
কি এক অমৃত ধারা দিছে ছড়াইয়া  
চারিদিকে — শৈল শৃঙ্গে কাননে কন্দরে ।  
কাঁপিয়া কাঁপিয়া স্বর উঠিতে অম্বরে ।

উপরে হাসিছে চন্দ্র, নীচে হাসে নদী ।\*  
হাসাময়ী বসুন্ধরা      প্রকৃতি আপন হারা  
কুসুমের বুক ভরা তরল কোমুদী ।  
মাখিয়া ফুলের গন্ধ,      বায়ু বহে মল্ল মল্ল  
কি সুখ হইত মোর সে হাসিত যদি ।

সঙ্গীতের সুধাশ্বর পড়িল ছড়িয়ে  
শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিমোহিয়া সে নৈশ প্রকৃতি,  
উঠিল পড়িল স্বর মধুর পঞ্চমে ।  
অদূরে কি মনোহর বৃক্ষ রাজি শিরে  
নানাজাতি বনকুল রয়েছে কুটিয়া\*  
বিতরি সৌরভ-সুধা স্নিগ্ধ সমীরণে ।  
কোথাও বা বালুবন ; কোথাও জল রাশি  
সিঁদু-গর্ভে ঝলছিসে চন্দ্রের কিরণে ।  
অদূরে পশ্চাৎ ভাগে গুল্ম কোপ কত  
স্থানে স্থানে কোথাও বা ছ' একটি তরু ।

অদূরে বরনা হাতে বর বর করি  
ঝরিতেছে বাশি রাশি ; দেবীর সম্মুখে  
বাজিছে গুহার মাঝে সঙ্কারণ আরতি  
মোতিয়া সে বন ভূমি । থাকিয়া থাকিয়া  
অনন্ত হৃদয়ে যুবা গাইছে সঙ্গীত  
মাতাইয়া বন ভূমি ললিত ঝঙ্কারে ।  
এমনি সময়ে সুশ্রী বালিকা একটি  
সাজিয়া কুসুম হারে বনদেবী প্রায়  
দাঁড়াল আসিয়া সেই যুবার পশ্চাতে  
চুপে চুপে, হস্তে তার বনফুল মালা ;  
ক্ষিপ্ত হস্তে সে বালিকা পরায়ে বালিকা  
কণ্ঠে তার, লুকাইল কোপের আড়ালে ।  
যুবক পশ্চাতে ফিরি দেখিল চাহিয়া  
জন মানবের চিহ্ন নাহি সেই স্থানে ;  
শুধু গুল্ম কোপ আর বেতস বজ্ররী  
মান্নে মাঝে, ছ' একটি বিটপী কেবল  
দূরে দূরে এই ক্ষুদ্র অধিত্যকা পরে ।  
তার পর স্তম্ভবিড় অরণ্যানী ঘোর  
গেছে চলি বহুদূর বেষ্টিয়া এ গিরি ।  
যুবক নিশ্চিন্ত হৃদে খুঁজিতে লাগিল  
কে তারে পরা'ল এসে এই পুষ্প-মালা  
নিশা কালে এ নির্জন নিবিড় কাননে ।  
বহু সঙ্কানের পর দেখিল যুবক  
ক্ষুদ্র এক কোপ পার্শ্বে অঙ্গুরার মত  
একটি বালিকা যুঁজি আছে দাঁড়াইয়া,  
সর্বঙ্গ সজ্জিত তার কুসুমের হারে ।

\* ইমন কল্যাণ রানিগীতে দেয়

চন্দ্রের বিমল রশ্মি পড়ি সেই দেহে  
 মর্ম্মর মুরতি প্রায় দেখাইছে তারে।  
 ক্রূপের সে জ্যোতিঃ তার গিয়াছে মিশিয়া  
 বিমল চন্দ্রিকা সনে, দেখিয়া যুবকে  
 খিল খিল করি বালা উঠিল হাসিয়া।  
 যুবক বিস্মিত ভাবে উঠিল বলিয়া  
 “হিরণ ? —কখন তুই এলি এই স্থানে ?”  
 আনন্দে উৎকল হৃদে গরি হস্ত তার  
 কহিল বালিকা “তব সঙ্গীতের স্বর  
 শুনে আমি এই স্থানে এসেছি অমর।”  
 অমর বকের কাছে টেনে এনে তারে  
 কহিল চিবুক গরি “সন্ন্যাসিনী তুই  
 এ আশ্রমে, কেন দিয়ে এ পুষ্প-মালিকা,  
 কণ্ঠে মোর, আজি তুই হলি স্বয়ংবরা ?”  
 হিরণের মুখ ধানি চইল রক্তিম  
 লজ্জা ভরে, যুবকের বাহর বন্ধনী  
 ছাড়াইয়া কহিল সে “না ভাই অমর  
 তোমার এ ঠাট্টা মোব ভাল নাহি লাগে।  
 বহু যত্নে গাঁথিছিলাম এ পুষ্প-মালিকা  
 তব লাগি, তাই এ’নে দিয়াছি তোমাবে।  
 কিন্তু তুমি অনর্থক ঠাট্টা করি মোরে  
 দেও লজ্জা, ইহাতেই হৃৎক হয় মনে।”

কহিল অমর তারে “সত্যি লো হিরণ  
 দিবি্য তোর, ঠাট্টা আমি করি নাই তোরে,  
 ইহাই শাস্ত্রের বিধি—জনিস্নে তুই ?  
 অনুঢ়া বালিকাগণ কণ্ঠে যুবকের  
 মালা দিয়া ইচ্ছা মত হয় স্বয়ংবরা।  
 দ্রৌপদী সীতার কথা গেছিস্ কি ভুলে ?  
 এ কাজে অমত তোর থাকিলে হিরণ  
 ভাবিতে উচিত ছিল ইহা তোর আগে ?”  
 হিরণ লজ্জিত ভাবে লাগিল বলিতে  
 “শাস্ত্র ত বুঝিনে আমি, অবোধ বালিকা  
 মনে যাহা এসছিল, করেছি তা ভাই,  
 ভাল হক মন্দ হক, ভাবিলে সে কথা  
 কি হবে এখন আর ? সে কথা তুলিয়া  
 কেন তুমি অনর্থক লজ্জা দেও মোরে ?”  
 “লজ্জা কি ইহাতে তোর ?” কহিল অমর  
 “আজ হতে তুই মোর হলি অর্দ্ধাঙ্গিনী  
 সাবধান, অশ্রু কোন পুরুষের সনে  
 মিশিস্নে, বিশেষতঃ দেখিলে দিলীপে  
 দশ হাত দূরে তুই যাইস্ চলিয়া।  
 নারী তুই,—নারী-ধর্ম্ম পালিয়া মতত  
 রক্ষিস্ সতীত্ব তোর—এ মোর আদেশ।”  
 লজ্জায় হিরণবালা সে স্থান ত্যজিয়া  
 পলাইল ক্রতাবগে চক্কর নিমিষে।

## পঞ্চম সর্গ

[ সেভারা ; রাজোদ্যান ]

কৃষ্ণার শ্যামল তীরে নিকুঞ্জ কাননে  
বিশাল বিটপী বৃন্দ শোভিছে সুন্দর  
ছত্রাকারে ; মুঞ্জরিত শাখা প্রশাখায়  
বিবিধ বিহঙ্গ বসি গাইছে উল্লাসে  
সায়াহ্ন সঙ্গীত স্ব স্ব মধুর সুস্বরে ।  
স্থানে স্থানে নানাবিধ পুষ্প তরু রাজি  
শ্রেণীবদ্ধ ; মধ্যস্থলে চারু সরোবর ।  
চারিপার্শ্বে শ্বেতোজ্জল মর্ম্মরে নিশ্চিত  
সুরমা সোপানাবলী ; দুই দিকে তার  
মনোহর ঝাউ বৃক্ষ মলয় পবনে  
গাইছে মধুর স্বরে সঙ্গীত-সুন্দর ।  
মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃত্রিম প্রাস্তর  
দুর্ঝাময়, সুশোভিত চারু শিলাসনে ।  
প্রাস্তরের পাদদেশে বিবিধ বর্ণের  
ফুটন্ত কুসুম গুচ্ছ নয়ন রঞ্জন ।  
মধু-মাস ; তরু লতা নবীন পল্লবে  
সুশোভিত, উল্লসিত নিকুঞ্জ কাননে  
মনোহর ঋতুপতি বসন্ত-সোহাগে ।  
কলকণ্ঠ পিক কুল পল্লবের তলে  
লুকাইয়া কৃষ্ণ দেহ কুজিছে পঞ্চমে,  
“কুহ কুহ” ধীরে ধীরে সে শব্দ মধুর  
ভাসিছে হিল্লোলময় পবনের স্তরে ।  
একটি মাধুর্য্যময় কুসুম-ভূষণে  
সুসজ্জিত, মুগ্ধচিত্ত কোকিলের রবে ।  
এমন্ত মধুপ বৃন্দ গুণ্ গুণ্ স্বরে

বিমোহিয়া অর্ধফুট কুসুম কোরকে  
লুষ্ঠিছে পীযুষ রাশি এ মঞ্জু কাননে ।  
অই যে গগনস্পর্শী অটালিকা গুলি  
বৃক্ষরাজি অন্তরালে, যেন চিত্রকর  
অঁকিয়াছে হর্ম্মমালা অতি সুশ্রী করি  
থাকে থাকে শ্রেণী মত কাননের কোলে ।  
ভানু অন্তমিত প্রায়, সুবর্ণ কিরণ  
তাজিয়া এ বন ভূমি উঠিয়াছে ক্রমে  
তরুশিরে ; তমরাশি কাননে কন্দরে  
উঠিছে জাগিয়া, সঙ্গে সন্ধ্যা সীমন্তিনী ।  
তটিনী আকুল প্রাণে কুল কুল রবে  
চুন্নিয়া সৈকত ভূমি ছুটেছে উল্লাসে  
নিরখিয়া নিকুঞ্জের শোভা মনোহর ।  
একটি সরল পথ ক্রমে সরু ভাবে  
পরশি সোপান উর্ক, মিশিছে সুন্দর  
প্রাসাদের দ্বারে, দুই ধারে সারি সারি  
অত্যাচ গুবাক বৃক্ষ গ্রহরী সুন্দর ।  
সরসীর নীল জলে সন্ধ্যা সমীরণে  
অসংখ্য জলজ পুষ্প হেলিয়া ছলিয়া  
খেলিছে মরাল সনে ; মধ্য সরোবরে  
জলচ্ছত্র মনোহর, জলরাশি তলে  
সুবিদিত, অতুলিত কৃত্রিম বল্লরী  
প্রাচীরে, গবাক্ষ' পরে স্তবকে স্তবকে  
শোভিছে কি মনোহর ফুল দল সনে ।  
সুবহু লৌহ-সেতু, চুনি সরসীর



পূর্ব প্রান্ত ; অতি দীর্ঘ সমরেখা প্রায়  
 মিশিয়াছে কি সুন্দর জলচ্ছত্র সনে ।  
 সম্মুখে অলিন্দ পরে সুরঞ্জিত টবে  
 তরুরাজি সুশোভিত নানাবর্ণ ফুলে ।  
 অলিন্দে প্রাচীর পাশে' টবের সম্মুখে  
 সারি সারি কাষ্ঠাসন স্বর্ণবিমণ্ডিত ।  
 একটি রজত-আড়ে চাক হিরামন  
 নীরবে নয়ন মুদি র'য়েছে বসিয়া  
 ঘুম-ধোরে, কক্ষ মাঝে চাক স্বর্ণাঙ্গনে  
 দুইটি মানবমূর্তি—একটি যুবক  
 রূপে রতি-পতি যেন, বিশাল হৃদয়,  
 সুদৃঢ় বলিষ্ঠ দেহ, গর্জিত বদন ;  
 পরিধানে লৌহময় সৈনিকের বেশ ;  
 কটিদেশে তরবারি ভীষণ দর্শন ।  
 অন্যটি যুবতী, মূর্তিমতী সরলতা,  
 যৌবন-মলয় বাতে মাধুর্য-লহরী  
 উছ'লে পড়িছে সদা সৌন্দর্য্য-সাগরে ।  
 হাসিমাখা মুখখানি, চন্দ্রমা কিরণ  
 লাবণ্য মিশিয়া যেন অতুলিত ভাবে  
 রঞ্জিয়াছে চাক কাস্তি প্রাণ বিমোহিনী ;  
 সৌন্দর্য্যের মহাসিদ্ধি, লাবণ্যের ধনি ;  
 যৌবনেতে চল চল অমিয় পূরিত  
 মনোহরা চাকতরা স্বর্ণ-কমলিনী ।  
 ফোটে ফোটে ভাব যেন অথচ ফুটেনি,  
 হাসে নি সরল প্রাণে পূর্ণ প্রেম-হাসি ;  
 অকুটস্থ জ্যোতির্ময় আকুলিত রূপ  
 প'ড়েছে গড়ায়ে যেন, তরঙ্গে তরঙ্গে  
 লাবণ্য পীযুষ ভরা দেহ-সরোবরে ।  
 যৌবনের সুখা হাসি বাণ্য-চপলতা  
 মিশি এক সঙ্গে, এক সৌন্দর্য্য নূতন

গঠিয়াছে, প্রেমময়ী উষার আধারে  
 বালার্ক-কিরণ যথা উদয় অচলে ।  
 যৌবনের মস্ততায় মস্ত হ'নয়ন,  
 তিলমাত্র নহে স্থির, সতত চঞ্চল ;  
 সে কটাক্ষে প্রেম-শর সদা সংযোজিত,  
 বিমুক্ত কবরী, কেশ ঘুরিয়া ফিরিয়া  
 চুবিছে কি চাক ভাবে নিতম্ব সুগোল ।  
 বসন আবৃত কুচ অকুটস্থ কলি  
 আনন্দে ফুটিতে চাহে বক্ষ-সরোবরে ।  
 সুগন্ধি অমৃতময় অধর যুগল  
 মুনি জন মনোলোভা, পদ্মরাগ মণি ।  
 নীরবে বসিয়া বামা যুবকের পাশে  
 কুটস্থ গোলাপ এক অতৃপ্ত নয়নে  
 নিরখিছে ; স্বর্ণোজ্জ্বল কর-শতদলে  
 শোভিছে কি অনূপম গোলাপ সুন্দর ।  
 কভু বা আনিছে বাস ; স্বদনের জ্যোতিঃ  
 মিশিয়াছে পুষ্প সনে ; বৃন্ত কলেবরে  
 দুটি পুষ্প এক বর্ণ—গোলাপ বদন ।  
 সহসা পুষ্পটি জলে নিক্ষেপিয়া বামা  
 কহিল। সগর্বে "নাথ । কত দিন আর  
 কাপুরুষ প্রায় হেন রহিবে বসিয়া ?  
 আমি যে অবলা নারী সহজে দুর্বল  
 নাহি শক্তি এ শরীরে, স্বদেশ উদ্ধারে  
 আমিও এ তুচ্ছ প্রাণে তৃণ সম গণি ।  
 তুমি বীর, বল দেখি কি ভয় তোমার ?  
 আচর বীরের মত, মরণের ভয়ে  
 কাঁপে কি মুহূর্ত্ত তরে বীরের হৃদয় ?  
 তুচ্ছ সে মোস্লেম-রাজ কি ভয় তাহারে ?  
 বিধুর্ম্মীর পদ ধূলা লইতে মস্তকে  
 ঘণা কি হয় না মনে ? ছুঁইলে যাহারে

স্নান বিধি, হায় নাথ, পূজিতে তাহারে  
 কেন এত অগ্রসর ?—ভারতের ভালে  
 কেন এ কলঙ্ক রেখা ? কোন্ অপরাধে  
 অভাগিনী চিরতরে হেন শৃঙ্খলিত ?  
 পরাধীনা নারী আমি,—কি সাধ্য আমার ?  
 নতুবা এ ক্রোধ-বহ্নি মোঙ্গেম-শোণিতে  
 করিতাম নির্বাপিত সমর প্রাক্ষণে ।  
 ধিক্ এ মানব জন্মে, জাতীয় গৌরব  
 রক্ষিতে অক্ষম জনে কে বলে মানুষ  
 এ ভব মণ্ডলে ? হায় শত ধিক্ তারে ।  
 স্বাধীনতা আশাতরু শৈশব জীবনে  
 অঙ্কুরিত এ হৃদয়ে, প্রতি পলে পলে  
 বর্দ্ধিত হ'তেছে ক্রমে, যে দিন ভারত  
 বিসর্জিয়া মোহ-নিদ্রা সমুন্নত শিরে  
 স্বাধীনতা-মহামন্ত্রে হইবে দীক্ষিত ;  
 যে দিন রমণী বৃন্দ সহস্র বদনে  
 সাজাইবে পতি পুঞ্জে বীর আভরণে  
 বধিতে বিপক্ষে, কিংবা মরিতে সমরে ;  
 সেই দিন এই বৃক্ষে ফলিবে সুফল ।  
 জগতের ইতিহাস খুঁজে দেখ তুমি,  
 কত যে নগণ্য জাতি নিজ বাহু বলে  
 হ'য়েছে উন্নত ভবে, পোড়া ভাগ্য-দোষে  
 আমরা কি র'ব শুধু পড়িয়া ভূতলে ?  
 মুসলমান হীন বীর্য্য, কি সাধ্য তাদের  
 যুদ্ধিতে মারাঠা সনে সম্মুখ সংগ্রামে ?  
 হও অগ্রসর—অসি খোল খরধার  
 ভারতের দক্ষ ভালে সে মহা ত্রিশূল\*  
 উড়াও আবার, নাথ পরশে তাহার  
 নির্জীব ভারত পুনঃ উঠিবে গর্জিয়া

“জয় মহা দেও” রবে কাঁপা'য়ে ধরণী ।  
 নীরবিলা শশিমুখী, সাক্ষ্য সমীরণ  
 মুহূর্ত্তেকে সেই স্বর বহিল চৌদিকে,  
 উৎসাহে বিহঙ্গ কুল উঠিল কুজিয়া  
 আশ্র বনে, যুবকের হৃদয়-কন্দরে  
 ঢালিয়া সহস্র ধারে সুরা তীব্রতর ।  
 অমনি ভীষণ স্বরে কহিলা যুবক  
 “কি ছার মোঙ্গেম বৃন্দ ?—কি আছে জগতে  
 হেন কার্য্য ? নিষ্পাদিতে এ ভুজ অক্ষম  
 ক্ষণ তরে ? এ হৃদয় তিলাক্ষের তরে  
 নাহি ডরে কোন জনে, কর্তব্য সাধনে  
 বজ্রঘাত মম কাছে পুষ্প বরিষণ ।  
 যত ক্ষণ বিন্দুমাত্র শোণিতের কণা  
 বহিব এ ধমনীতে, প্রতিজ্ঞা আমার  
 লইব এ প্রতিশোধ, না রাখিব আর  
 ভারতের পুত বক্ষে চির ঘৃণাস্পদ  
 মোঙ্গেমের পদ-চিহ্ন কালিমা গভীর ।  
 চলিলাম,—এই অসি মোঙ্গেম-শোণিতে  
 নাহি রঞ্জি যদি, নহি পেশবার পুত্র,  
 কুকুর হইতে আমি ঘৃণিত অধম  
 এ জগতে ।” বীরবর নিক্ষেপিল অসি  
 লোলজ্বল, যেন ক্রোধে ঝগ্ ঝগ্ রবে  
 উঠিলা সে ভীমা অসি গর্জিয়া ভৈরবে  
 ভাস্বর, মুহূর্ত্তে যেন বিছাৎ ভাঙিল  
 ঝলমল, বিনা মেঘে সায়াহু-আধারে ।  
 নিঃশব্দে চলিলা যুবা উত্থান প্রাক্ষণে  
 অতিক্রমি লৌহ-সেতু, পশ্চাতে তাহার  
 চলিলা কৌমুদী বাঈ অসি ভয়ঙ্কর  
 কটিদেশে ঝগ্ ঝগ্ বাজিছে সুন্দর

\* মহারাষ্ট্রীদের “ত্রিশূল” অঙ্কিত পতাকা ।

প্রতি পদ সঞ্চালনে নৃপুত্রের প্রায় ।  
 অতিক্রমি' কুঞ্জবন চলিলা হুঁজন  
 নীরবে, সহসা এক ক্ষুদ্র কোপ হ'তে  
 বংশীর সঙ্কেত স্বরে দম্ভ্য এক দল  
 বাহিরিয়া, সিংহ সম ভীষণ বিক্রমে  
 আক্রমিল যোদ্ধবরে, মুহূর্তের মাঝে  
 বজ্রিল তুমুল যুদ্ধ কপাণে কপাণে ।  
 অমুপম শিকা, বীর যুঝিতে লাগিল  
 কি কৌশলে পঞ্চজন ভীম দম্ভ্য সনে ।  
 কতু উঠি, কতু বসি, কতু জামু পাতি  
 মুহূর্তে মুহূর্তে কত ঘুরিয়া ফিরিয়া  
 প্রহারিলা ভীম বলে, নিবারি কৌশলে  
 তাহাদের অদ্রাঘাত, প্রহার ভীষণ ।  
 বহুক্ষণ হেন ভাবে যুঝিলা বীরেন্দ্র  
 প্রাণপণে, একে একে দম্ভ্য তিন জন  
 পড়িল ভূতলে ; কিন্তু বাম ভূজে তার  
 ছুটিল শোণিত-স্রোত নিখ'রের মত ।  
 প্রচণ্ড বিক্রমে যুবা আক্রমিলা পুনঃ  
 অশ্রু জনে, অকস্মাৎ পশ্চাত হইতে  
 মারিল শূভীক অসি ক্ষুদ্রে যুবকের  
 সঙ্গী তার, সে আঘাত নিবারিলা বলী  
 এক লক্ষে, কিন্তু সেই ভীষণ অস্ত্রের  
 অগ্রভাগ শির'পরে বিধিল সজোরে ।  
 দারুণ আঘাতে বলী হইলা কাতর,  
 নিকৃষ্টিলা যজ্ঞাগারে ইন্দ্রজিত যথা  
 লক্ষ্মণের তীব্রতম ভীষণ প্রহারে ।  
 ছুটিল শোণিত-স্রোত প্রস্রবণ-ধারে  
 রঞ্জিয়া বসন দেহ, মুহূর্তে যুবক  
 সংজ্ঞাহীন, অবশ্যজ, ঘুরিল মস্তক  
 ঘুরিল অবনী, বিশ্ব চলিল সরিয়া

পদ নিয়ে, অকস্মাৎ পড়িলা ভূতলে ।  
 অমনি কৌমুদী বাজি রণ চণ্ডী বেশে  
 প্রবেশিলা রণ স্থলে, উলঙ্গ কপাণে  
 ভাতিল বিদ্যাত-জ্যোতিঃ নিশার আধারে  
 মুহুমুহুঃ, পদভারে কাঁপিল প্রাঙ্গণ,  
 পুরিল সে কুঞ্জবন অসি ঝনংকারে ।  
 বিপুল বিক্রমে বামা যুঝিতে লাগিলা  
 শূকৌশলে, দম্ভ্যদ্বয় হইল কাঁকর  
 সে কঠোর আক্রমণে, অস্ত্রের ঝগনে  
 সভয়ে বিহঙ্গকুল উড়িল গগনে ।  
 আবার ভীষণ বেগে সঞ্চালিয়া অসি  
 মারিলা সজোরে বামা, পড়িল ভূতলে  
 একটি বিকট দম্ভ্য তাল তরু প্রায়  
 মহা ঝড়ে, ক্ষিপ্তকরে আক্রমিলা পুনঃ  
 অশ্রু জনে, হেনকালে উঠিলা যুবক  
 আফালিয়া, সিংহপ্রায় ভীষণ বিক্রমে  
 আক্রমিলা পুনর্বার, ভয়াকুল প্রাণে  
 অমনি আহত দম্ভ্য বিদ্যাতের বেগে  
 লুকাইল অবিচ্ছিন্ন নৈশ অন্ধকারে ।  
 আবার মূর্চ্ছিয়া বলী পড়িলা ভূতলে  
 শোণিতাক্ত, পড়ে যথা প্রভঞ্জন বলে  
 মহাতরু কাঁপাইয়া ভূধর প্রান্তর ।  
 অবিশ্রান্ত রক্তপাতে, ক্লান্ত কলেবরে  
 রহিলা পড়িয়া যুবা দুর্ব্বার উপরে  
 নিশ্চল, জীবন-চিহ্ন নিশ্বাস প্রশ্বাস  
 শুধু মাত্র প্রবাহিত ; আহত মস্তক  
 লইলা তুলিয়া বামা আকুলিত প্রাণে  
 অঙ্গ পড়ে, ক্ষত স্থান বাঁধিলা যতনে  
 ছিন্ন করি পরিধেয় বসন অঞ্চল ।  
 ধীরে ধীরে তারাময়ী আধার রজনী

হাসিল কোমুদী সনে, উদিল চন্দ্রমা  
নীলাকাশে, চারিদিকে শোভিল সুন্দর  
অগণ্য তারকা শ্রেণী স্বর্ণ-সরোজিনী।  
বিষাদে কোমুদী বাঈ মলিন বদনে  
যুবকের মুখ পানে রহিল চাহিয়া  
নীরব, নিমেষ শূন্য আঁখি মনোহর

অশ্রু ভারে অবনত, ঘোর অবসাদে  
ভগ্ন প্রায় হৃদি কক্ষ, লজ্জি নেত্রসীমা  
শূন্য মন কোন্ দেশে গিয়াছে চলিয়া।  
অভাগিনী ধীরে ধীরে করি উত্তোলন  
ভবিষ্যৎ যবনিকা, হেরিতে লাগিল  
অদৃষ্ট-আকাশ-পটে দৃশ্য ভয়ঙ্কর।

## ষষ্ঠ সর্গ

[নলয়গিরি ; সমুদ্র তীর ; মহারাষ্ট্র গুরু ও ভৈরবীর যোগাশ্রম]

মধুময়ী উষা ; অই সাগর ভেদিয়া  
উদ্বিছে বালার্ক, যেন সুবর্ণের থালা  
জল হ'তে উঠি উর্কে ছড়াইছে ধীরে  
স্বর্ণ রশ্মি ; সিন্ধু বক্ষ সে স্বর্ণ-কিরণে  
ঝিক্ মিক্ করি যেন উঠিছে ঝলিয়া  
তরল কাঞ্চন সম ; ক্ষুদ্র বীচি গুলি  
উষার সুস্নিগ্ধ বাতে হেলিয়া ছলিয়া  
নাচিছে সুবর্ণ-রাগে হইয়া রঞ্জিত ।

হেনকালে অফুটন্ত পুষ্প কলি প্রায়  
হিরণ সমুদ্র-জলে করি প্রাতঃ স্নান  
পূজার কুসুমগুলি করিয়া চয়ন  
চলিয়াছে ধীরে ধীরে আশ্রমের দিকে ।  
দেহের সৌন্দর্য্য তার উঠেছে ফুটিয়া  
সিন্ধু বস্ত্রে, স্বর্ণ-আভা পড়েছে ছড়া'য়ে  
বস্ত্র ভেদি,—হিমে ঢাকা সোনার নলিনী ।  
ঘন কৃষ্ণ আর্জ কেশ পড়েছে এলা'য়ে  
পৃষ্ঠ দেশে, মনোহর নিতম্ব উপরে ।  
সুগোল সুবর্ণ দেহে—বক্ষ-সরসিজে  
লাবণ্য সৌন্দর্য্য যেন হাবু ডুবু খে'য়ে  
বাল্য-যৌবনের চারু মধ্যস্থলে পড়ি'  
দিশ হারা, কুলপাবে ভাবিছে কেমনে ।  
মুখ খানি অতি সুশ্রী চঞ্চল নয়ন  
প্রেমের মদিরা ভরা—হাস্তের ফোয়ারা ।

সোনালী কপোল ছটি কুসুমের মত  
সুকোমল, বিনির্ম্মিত মাখন কুসুমে ।  
সুগন্ধি অধর ছটি অমৃতের খনি  
কুসুম পরাগে গড়া পরিমল ভরা  
কটিদেশ অতি সরু ; কৌমুদী-রঞ্জিত  
রূপরশ্মি পলে পলে পড়িছে উছলে ।  
যৌবন নিকুঞ্জে যেন গোলাবের কলি  
অর্দ্ধফুট, অনুপম এ মহী মণ্ডলে ।  
কুসুমের ডালা হাতে, বস্ত্র পথ দিয়া  
আসিতে লাগিলা বাল্য আশ্রমের দিকে ;  
শুনিলা-অদূর হতে সঙ্গীতের ধ্বনি  
আসিছে ভাসিয়া—কণ্ঠ চির পরিচিত  
বরষি অমিয়-ধারা প্রাণের ভিতরে ।

আমি ভাল বাসি যারে

সে'ত নাহি ভাল বাসে ।

আমি মরি যার তরে

সে ত নাহি কাছে আসে ।

অশনে বসনে ধ্যানে,

তারি কথা পড়ে মনে,

কেমনে ভুলিব তারে

সে আছে মোর প্রাণে মিশে ।

মুখ প্রাণে সেই স্থানে দাঁড়া'য়ে বালিকা  
শুনিলা সে গীত ; কণ্ঠ নীরবিল যবে ;

পুষ্প চয়নিকা ল'য়ে ধীরে ধীরে  
 অশ্বখের তলে বালা আসিলা যখন,  
 বৃক্ষ অন্তরালে থাকি পশ্চাৎ হইতে  
 একটি যুবক ধীরে ডাকিলা তাহারে  
 “হিরণ” সে শব্দ তার হিয়ার ভিতরে  
 কত যে সুধার ধারা করিল বর্ষণ।  
 বালিকা পশ্চাতে ফিরি দেখিলা চাহিয়া  
 অদূরে অমর রাও\* আছে দাঁড়াইয়া;  
 লজ্জায় ঘোমটা খানি টানিয়া বালিকা  
 তার দিকে একটুকু হ'য়ে অগ্রসর  
 কহিলা সলজ্জ ভাবে “কেন ডাকিয়াছ?  
 এত ভোরে কোথা হ'তে আইলে অমর?”  
 অমর কহিলা তারে “তব পাছে পাছে  
 আসিয়াছি গুপ্তভাবে দেখিতে তোমারে  
 কোথা যাও”। “কেন আমি অবিশ্বাসী কিসে!”  
 কহিলা হিরণ বালা যোর অভিমানে?  
 অমর কহিলা পুনঃ “গত রাত্রে তুমি  
 আহাৰ্য্য লইয়া যবে আসিতে চাহিলে  
 মম কাছে, বাধা দিয়া দিলীপ তোমারে  
 দিল না আসিতে কেন? জ্যোৎস্নারে ডেকে  
 সে শেষে গভীর রাত্রে দিল পাঠাইয়া  
 আমার আহাৰ্য্য কেন? কত দিন আমি  
 দিলীপের কাছে যে'তে করেছি নিষেধ  
 তোমারে, সে কথা তুমি গিয়াছ কি ভুলে?  
 কেন তুমি না শুনিয়া নিষেধ আমার  
 দিলীপের কক্ষ বসি এত প্রেমালাপ  
 করেছিলে? বল দেখি সাক্ষী করি শিবে  
 সত্য কিংবা মিথ্যা ইহা? যদি সত্য হয়  
 আমার নিষেধ সবে বলত হিরণ

দিলীপের সঙ্গ তুমি কেন না ত্যজিলে?  
 ইহাতেই মনে হয় আমা হতে তারে  
 ভাল বাস বেশী তুমি, ভাল নাহি ইথে।  
 না বাসিলে চলিতে না কথা মত তার  
 কভু তুমি, অবহে'লে নিষেধ আমার।”  
 হিরণ বিরক্তি ভরে বাঁকাইয়া যার  
 কহিল “কখনো নহে, কক্ষ মাঝে তার  
 যাইনি সহজে আমি, জ্যোৎস্না কালীতারা  
 অনেক বলার পর গিয়াছিলাম আমি  
 গত রাত্রে।” জিজ্ঞাসিলা অমর আবার  
 “জ্যোৎস্না আহাৰ্য্য লয়ে গুহাতে আমার  
 কেন এসেছিলে? তুমি কেন না আসিলে?”  
 হিরণ কহিলা মুখ করি ভার ভার,  
 “দিলীপ সে দিন মোরে দিল না আসিতে।”  
 অমরেন্দ্র পুনর্ব্বার সুধাইলা তারে  
 “শুধু সেই দিন? না সে আরো কোন দিন  
 নিষেধ করিয়াছিল আসিতে তোমারে  
 মম কাছে?” উত্তরিল হিরণ তাহারে  
 “করেছিল বহুদিন নিষেধ আমারে,  
 কিন্তু আমি শুনি নাই নিষেধ তাহার।”  
 অমর বিরক্ত ভরে করিলা জিজ্ঞাসা  
 “তোমার উপরে তার কোন্ অধিকার  
 কেন সে আমার কাছে আসিতে তোমারে  
 নিষেধিত?” “ইচ্ছা তার” কহিলা হিরণ,  
 ব্যঙ্গ ভাবে অমরেন্দ্র কহিলা তাহারে  
 “আচ্ছা যাও” গেল চলি হিরণ তখন  
 পুষ্প ডালা হাতে নিয়ে মনের বিষাদে।  
 পূজাস্তে হিরণ বালা—কক্ষ অমরের  
 আসিলা, দেখিলা চাহি শাস্ত্র গ্রন্থ এক



পঠিছে একাগ্র মনে বসিয়া অমর ।  
 অকৃত আহার্য তার রয়েছে পড়িয়া  
 অপুরে, জ্যোৎস্না যাহা দিয়াছিল। আনি  
 গত রাতে ; জিজ্ঞাসিলা হিরণ তাহারে  
 ম্লান মুখে “গত রাতে করনি আহার ?”  
 উত্তরিল। অমরেন্দ্র “স্বর্গ হতে তুমি  
 এলে নাকি ? কি আশ্চর্য জান না কি তুমি  
 অপরের ছোঁয়া জ্বা জীবনে কখন  
 করিনে গ্রহণ আমি ? কেন তবে মোরে  
 জিজ্ঞাসিছ সেই কথা ?” কহিলা হিরণ  
 “তব কাছে একদিন পারিনি আসিতে  
 তাতেই কি এত রাগ ?” “রাগ হব কেন ?”  
 কহিলা অমর তারে “তোমার উপরে  
 কোন্ অধিকার মম ?—কে তুমি আমার ?”  
 “কে তুমি আমার ?” হায় এ কথাটি তার  
 প্রাণের ভিতরে যেয়ে করিল আঘাত  
 তীব্র বেগে ; হৃদে কোড়ে হৃদয় ফাটিয়া  
 নয়নে আসিলে অশ্রু, মুহূর্তে বালিকা  
 বাহিরিয়া, প্রাণ ভরে লইয়া কাঁদিয়া ।  
 তারপর ধীরে ধীরে উঠিল তখনি  
 অমরের জন্ত কিছু নিয়া ফল মূল  
 প্রবেশিলা সেই কক্ষে, দেখিলা অমর  
 একান্তে বসিয়া যেন কি কথা ভাবিছে  
 অঙ্গ মনে ; হিরণের পদ শব্দ শুনি  
 ভাবিল না মোহ তার, অগত্যা হিরণ  
 কহিলা “আহার্য তব এনেছি অমর ।”  
 অমর কহিলা “কেন এনেছ যে তুমি ?  
 জ্যোৎস্না কোথায় আজি ? আসিতে এখানে  
 দিলীপ কি অনুমতি দিয়াছে তোমারে ?”  
 অমরের কথা শুনি করি তার তার

মুখ খানি, সাক্ষ নেত্রে কহিলা হিরণ  
 “অমর অথবা কেন কাঁদাইছ মোরে ?  
 মাতৃহীনা আমি, আজন্ম হুঃখিনী,  
 পড়ে আছি হুঃখে কষ্টে গুরু আশ্রমে ;  
 তুমি কেন বাক্য-বাণে বিদ্ধ করি মোরে  
 কাঁদাইছ, কি সম্পর্ক দিলীপের সনে ?  
 কে সে মোর ?” বাধা দিয়া কহিলা অমর  
 “সে তোমার প্রেমাকাকী জীবনের সাথী,  
 তারি প্রেমে আশ্রয় দিবা নিশি তুমি ।”  
 অমরের কথা শুনি বিষন্ন হৃদয়ে  
 “হা বিধাতঃ” বলি বালা পড়িলা মূর্ছিয়া  
 গুহা মাঝে, রক্ত-ধারা পড়িতে লাগিল  
 মস্তকের চর্ম কেটে, প্রস্তর আঘাতে ।  
 নিরখি এ দৃশ্য দ্রুত উঠিয়া অমর  
 দিলা বেঁধে জলপট্ট হিরণের মাথে ।  
 ছিটাইয়া বারি রাশি চোখে মুখে তার  
 অঙ্গ পরে শির তার লইলা তুলিয়া ।  
 কিছুক্ষণ পরে তার ভেঙ্গে গেল মূর্ছা,  
 লভিলা চেতন বালা, জড় শড় হ’য়ে  
 শিথিল বসন তার লইলা টানিয়া  
 সলাজে, অঞ্চল দিয়া আবরি বদন  
 উঠিয়া বসিলা বালা অতি ধীরে ধীরে ।  
 কহিলা অমর তারে “গালি ত তোমারে  
 দেই নি হিরণ আমি, কেন তুমি তবে  
 এ ভাবে মূর্ছিত হ’য়ে পড়িলে ভূতলে ?”  
 হিরণ মলিন মুখে উত্তরিল। তারে  
 গালি ত সামান্য কথা, করিলে গ্রহার  
 এত কষ্ট মম প্রাণে হত না অমর ।  
 বৃথা অপবাদে তুমি হৃদয় আমার  
 দিয়াছ ভাঙ্গিয়া, বল সহি তা’ কেমনে

সতী হ'য়ে ? সতী নারী পারে কি সহিতে  
এ কলঙ্ক, দেহে তার থাকিতে জীবন ?  
ইহাপেক্ষা মৃত্যু ভাল, মারিয়া ফেলিতে  
যদি তুমি, তাও আমি অগ্নান বদনে  
সহিতাম, এ কলঙ্ক পারিনে সহিতে ।”  
“তবে কি দিলীপে তুমি ভাল নাহি বাস ?”  
জিজ্ঞাসিলা পুনঃ তারে ; আবার হুঃখিনী  
উত্তরিল, “কতু নহে, পিতৃ সমতুল  
সে আমার, পিতা বলে ভাবি আমি তারে ।’  
কহিলা অমর “তবে জ্যোৎস্না কেমনে  
বলিল আমারে, তুমি ভাল বাস তারে ।”  
“মিথ্যা কথা” ক্রুদ্ধ হ'য়ে বলিলা হিরণ  
“না জে'নে আমার মন কেন সে তোমাতে  
বলেছে সে মিথ্যা কথা, সেই তাহা জানে,  
আমি জানি সে আমার পিতৃ সমতুল ।”  
অমর কহিলা পুনঃ স্নেহ বচনে  
“হেন বাচালতা তার শোভা নাহি নায় ;

যা'ক তুমি সাবধানে থাকিও সতত  
বহুদিন হ'তে আমি ব্যবহার তার  
আসিতেছি লক্ষ ক'রে, আনিতে স্ববশে  
সে তোমাতে নানারূপ কৌশলের জাল  
পাতিয়াছে তুমি যদি মুখ দেও তারে  
এ সময় সর্বনাশ হইবে তোমার ।  
অতএব তার কাছে যেওনা কখনি ;  
সে আসিলে কাছে, তুমি স'রে যেও দূরে ।”  
হেনকালে কালীতারা আসিয়া সেখানে  
কহিলা “হিরণ তোরে ডাকিছে দিলীপ !”  
হিরণ কহিলা “তুই বল যেয়ে তারে  
পারিব না যে'তে আমি কেন ডাকে মোরে  
বার বার, আমি তার কোন্ দার ধারি ?”  
মস্তকের পটী তার দে'খে কালীতারা  
জিজ্ঞাসিলা “শিরে তোর কি হ'য়েছে দিদি ?”  
“কিছু না—আঘাত আমি পেয়েছি প্রস্তরে”  
উত্তরিল হাসি মুখে হিরণ তাহারে ।

## সপ্তম সর্গ

[কৃষ্ণা নদী-তীর]

কৃষ্ণার সৈকতে ক্ষুদ্র শ্যামল প্রাস্তরে  
বসি বৃদ্ধ বালানাথ কাঁদিছে নীরবে :  
কত যে বিস্মৃত স্মৃতি হৃদয়ের তলে  
উঠিছে জাগিয়া, ক্রমে মানস-নয়নে  
ভাসিছে নিরাশাপূর্ণ বিগত জীবন ।  
দূরে রাখালের গান ধেনু রব সনে  
মিশিয়াছে কি সুন্দর ঢালিয়া যতনে  
ভাবময়ী প্রকৃতির অতৃপ্ত মরমে  
অনন্ত কবিত্বপূর্ণ শাস্তি-পরিমল ।  
অস্তায়ুধ দিনমণি, বসুধার বৃকে  
পড়েছে সায়াহ্ন ছায়া, প্রকৃতি সুন্দরী  
হুই বেশে সুসজ্জিত—চারু-ভয়ঙ্কর ।  
—একদিকে স্বর্ণকান্তি, অশ্রু দিকে ঘোর  
কৃষ্ণ বেশ, প্রলয়ের পূর্ব নিদর্শন ;  
পশ্চিমে অতুল শোভা, সিন্দূরে মণ্ডিত  
নভস্তল, পূর্ব দিক গ্রাসিছে তিমির  
ধূস্রবর্ণ—একাকৃতি গগন ভূতল ।  
তাহে কৃষ্ণা ভয়ঙ্করী অতি দীর্ঘ কায়  
মিশিয়াছে সেই সনে, আরো ভয়ঙ্কর ।  
বালানাথ ক্ষুদ্র প্রাণে বসিয়া নীরবে  
কত যে কাঁদিলা স্মরি অতীত জীবন  
কাতরে করুণ কণ্ঠে কহিলা কাঁদিয়া  
“দয়াময়, অভাগারে কেন নিরদয় ?  
যে নাম স্মরিয়া নাথ কত যে পতিত  
লভিল উদ্ধার, হায় সে নাম স্মরিয়া  
ভাসিবে কি এ অভাগা নয়নের জলে ?

তুমি ত সকলি জ্ঞান ওহে দয়াময়,  
এ জীবনে ভ্রমেও যে করিনি কখন  
পাপ পথে বিচরণ, তবু কেন নাথ  
অভাগার শিরে হেন অশনি সম্পাত ?  
জীবনের ঐক্য-তারী, নয়নের মণি  
স্নেহের ছহিতা সেই হিরণ আমার  
শৈশবেই মাতৃহীনা, কত যে যত্ননা  
ভুগিয়াছে অভাগিনী শৈশব জীবনে ।  
মাতৃ অনুরোধে তার মারাঠা গুরুর  
যোগাশ্রমে, শৈশবেই দিয়াছি সু সঁপে  
ভৈরবীর হাতে তারে, ব্রহ্মচর্য্য ব্রত  
দিতে শিক্ষা, সেই হতে আছে সে সেখানে ।  
স্নেহের লবঙ্গলতা ভাগিনেয়ী মম  
ভাজিয়াছে প্রাণ এই তটিনীর জলে ?  
ছঃখিনী জননী তার পতি অত্যাচারে  
রোষে ক্ষোভে আত্মহত্যা করিয়াছে হায়  
কাঁদাইতে বৃদ্ধ কালে এই অভাগারে ।  
কি কুসঙ্গে অলকারে দেখিয়া রঘুজী  
ভুলেছিল রূপে তার, পতঙ্গের মত  
ঝম্প দিয়া রাক্ষসীর গুপ্ত প্রেমানলে  
মজিল আপনি, হায় মজাল সংসার ।  
হতভাগ্য না মজিলে অলকার প্রেমে  
মরিত কি ভাৰ্য্যা তার ? তটিনীর জলে  
মরিত কি মাতৃহীন লবঙ্গ আমার ?  
এত জালা দয়াময় সহিব কেমনে ?  
নিকরেশ এক মাত্র জ্যেষ্ঠ সহোদর

শাস্ত্রজী কে জানে আশ্রি মৃত কি জীবিত ?  
দীনা হীনা ভাৰ্য্যা তার পুত্র কন্যা সনে  
স্বামীর বিচ্ছেদ, গেল। তীর্থ পৰ্য্যটনে  
ভগ্ন হৃদে, এ জনমে কিরিল না আর।  
অভাগার একমাত্র পুত্র প্রিয়তম  
শস্ত্রজী, অদৃষ্ট দোষে সেও নিরুদ্দেশ  
সেই সনে, বেঁচে আর আছে কি জীবনে ?

কত দেশ, কত তীর্থ কাননে প্রাপ্তরে  
কত লোক পাঠাইল, এ জীবনে হয়,  
কোন স্থানে কোন তরু মিলিল না আর  
রোগে শোকে ক্লিষ্ট আমি, এ ভুজ ছর্ব্বল  
কেমনে ধরিবে অসি এ মহা সমরে ?  
পুত্র ভাৰ্য্যা শোকে আমি উন্মাদের প্রায়,  
কে বোধে তা' ? সকলেই সমর উল্লাসে  
উল্লাসিত, অসজ্জিত সংগ্রামের তরে।  
শাস্ত্রি যে কি মহারত্ব মানব জীবনে  
কেমনে বুঝিবে তাহা মোস্লেম বর্ষর ?  
তাহারাই এ ভারতে অনর্থের মূল  
সসৈন্তে প্রেরিত দত্ত মোস্লেম সংগ্রামে  
কে জানে কি আছে ভাগ্যে জয় পরাজয় ?

বৃদ্ধের হৃদয়ে জল বৃদ্ধদের মত  
কত কথা কত ভাব উঠিছে মিশিছে  
পলে পলে, হৃদয়ের অশাস্তি বশত:  
জাগিয়াও বৃদ্ধ যেন দেখিছে স্বপন :—

—একটি সুবর্ণ রথে করি আরোহণ  
বহু দূর, শূন্য পথে ত্রিদিবের দ্বারে  
উপনীত, পাপপূর্ণ সংসারের মত  
নাহি সেখা কোলাহল যন্ত্রণা ভীষণ ?  
হেন কালে মাঝী এক বসিয়া আনন্দে

অনুরে সৈকত পার্শ্বে তরুণীর পরে  
গাইল সঙ্গীত এক অতি সুমধুর

দে জল দে জল বলি, কেনরে কাঁদিগু তুই  
ওরে বোকা পাখি।  
কে তোরে দিবেরে জল, এ যে মহামরু স্থল,  
এখানে সকলি হয় ফাঁকি।

ভাঙ্গিল বৃদ্ধের মোহ, শুনিলা নীরবে  
সে সুধা-সঙ্গীত স্বরে করিয়া কল্পিত  
নৈশ প্রকৃতিরে, মাঝী গাইছে উল্লাসে।

দে জল দে জল বলি, কেনরে কাঁদিগু তুই  
ওরে বোকা পাখি।  
কে তোরে দিবেরে জল, এ যে মহামরু স্থল  
এখানে সকলি হয় ফাঁকি।  
ওরে বোকা পাখি।

কি সুধা ঢালিগু তুই ও করুণ স্বরে।  
কি যেন হারানো কথা, প্রাণের লুকানো ব্যথা,  
জ্ব'গে উঠে আমার অন্তরে।

পাখিরে।—

শুনিলে সে শোক গাথা, প্রাণে উঠে কত কথা,  
তুই কি বুঝিবি পাখি  
তুই হৃদি যা'করে ?

পাখিরে।

বনের বিহগ তুই,  
খাকিগু সতত ঘোর বনে।  
তুই কি বুঝিবি পাখি, কত দুঃখ কত ব্যথা  
আমার এ মনে ?

পাখিরে !—

আমারি মতন তুই আশাতগ্নে, অর্জবৃত্ত প্রার ।  
আমারি মতন তুই, গৃহত্যাগী, বনবাসী হার ।  
আমারি মতন তোর, কোঁদে কোঁদে গেল দুটি পাখি,  
তাই কি আকুল প্রাণে, লুকায় বিজ্ঞান বনে,  
কাঁদিস গভত তুই পাখি ।

পাখিরে !—

আপন বলিতে তোর, বুঝি এ ধরণী তলে,  
নাই আর কেহ ।  
ভিজিলে বৃষ্টির জলে, সূর্য্যের কিরণ তলে,  
নাখাটি রাখিতে নাহি গেহ ।  
দে জল দে জল বলি, তাই কি কাঁদিস তুই  
আকুল পরাণে ।

কে তোরে দিবেরে জল, এ যে মহানন্দ স্বল,  
জল তুই পাইবি কেননে ?

সঙ্গীতের প্রতি শব্দে, প্রত্যেক উচ্চ্বাসে  
ঝড়িতে লাগিল যেন মুক্তা রাশি রাশি  
আধার তটিনী গর্ভে সৈকত প্রান্তরে,  
নৈশ প্রকৃতির মুক্ত অতুল হৃদয়ে ।  
নীর্বে সে বালানাথ বসিয়া সৈকতে  
দেখিলা কুফার জলে নৈশ অন্ধকারে  
নিস্তরক তরলী' পরে অসংখ্য প্রদীপ  
অলিতেছে, প্রতিবিম্ব সলিল-দর্পণে  
শোভিছে কি মনোহর স্বর্ণ রেখা প্রায়  
সারি সারি, কেঁপে কেঁপে হিল্লোলে হিল্লোলে।

## অষ্টম সর্গ

[ মনর গিরি ; সমুদ্র তীর ; দোল পুর্ণিমার মেলা ]

অপরাহ্ন ; বসন্তের স্নিগ্ধ সমীরণ  
বহিতেছে মৃদু মৃদু দোলা'য়ে বিটপী  
বন-লতা অবগাহি অশ্বখির জলে ।  
সুকণ্ঠে বিহগগুলি থাকিয়া থাকিয়া  
গাইতেছে গিরি কুঞ্জ করি মুখরিত  
সুশাস্বরে, লুকাইয়া পল্লবের তলে ।  
হিরণ বসিয়া এক অশ্বখের মূলে  
ছায়াময়, কাঁচিতেছে কাপড় তাহার  
ক্ষার জলে, আনমনে থাকিয়া থাকিয়া  
গাইছে সঙ্গীত এক মৃদু মৃদু স্বরে

সে আমারে আমি তারে কত ভাল বেগেছি ।  
কতদিন—কতবার, নাহি সংখ্যা,—বহুবার,  
প্রেমের মধুর শ্রোতে কত সুখে ভেসেছি ।  
কত প্রেম আলাপনে, কত সুখ সস্তাষণে  
নদীকূলে—তরু মূলে কত নিশি জেগেছি ।  
নাই আগা—নাই গোড়া, প্রণয় পীযুষ ভরা  
সে যে কথা ননোহরা কত সাধে শুনেছি ।  
এমন মধুর স্বর, প্রাণ মন মোহকর  
শুনিল কি এ জনমে?—কি আশ্বাসে রয়েছে ।  
আর কি পাইব তার, এ হৃদয় যারে চার,  
পাগল পরাণ হায় যারে নপে দিয়েছি ।  
সে আমারে আমি তারে কত ভাল বেগেছি ।

কণ পরে ধীরে ধীরে, পশ্চাৎ হইতে  
দিলীপ আসিয়া তারে করিল। জিজ্ঞাসা  
“হিরণ বাবিনে তুই সাগর-নৈকতে  
মম সাথে ? সেখা আজি আসিবে বেঁ মেলা  
দোল পুর্ণিমার, যাখে বহু লোক সেখা ,

কত স্থান হতে কত আসিবে সন্ন্যাসী  
তোরে নিয়ে যাব সেখা, চল মোর সাথে” ।  
হিরণ কহিল। তারে মৃদু স্বরে অতি  
‘যাও তুমি, আমি আজ পারিব না যে’তে” ।  
“পারিবি না কেন” ? পুনঃ কহিল দিলীপ  
“অমর তোরে কি তবে ক’রেছে নিষেধ  
যে’তে মোর সাথে ? মাসাধিক হল আজি  
কত ডাকিতেছি তোরে, মুহূর্তের তরে  
আসিস্ নে মম কাছে, ভালবাসি ব’লে  
হয়েছি কি অপরাধী ? তাই দিস্ হুঃখ  
অবাধ্যতা করে সদা, পবিত্র প্রেমে  
ইহাই কি প্রতিদান ?—এত ভাল নহে” ।

প্রস্তর মূর্তি প্রায় বসিয়া হিরণ  
নিরন্তর, বস্ত্রখানি লাগিলা কাঁচিতে  
নত মুখে, পুনর্ব্বার কহিল দিলীপ  
“কথা বল, চুপ করে রলি যে এখন ?  
লুকাস্নে—ভেঙ্গে বল ; রাগ করেছিস্  
মম পরে ?” নিরন্তর তথাপি হিরণ ।  
“এত সাধিলাম, তবু কথা নেই মুখে ?  
এতই আশ্পর্ক। তোর ? দেখা যাবে পরে”  
বলিয়া দিলীপ রাও ক্রোধাক্ত হৃদয়ে  
গেলা চলি মুহূর্তেকে ত্যজিয়া সে স্থান ।  
বস্ত্র কাঁচা করি শেষ, কিছুক্ষণ পরে  
হিরণ যাইতে ছিল। তৈরবীর কাছে,  
অমরেন্দ্র সনে তার হল পথে দেখা,  
কহিল। সে “মম কাছে দিলীপ আসিয়া  
কণ পূর্বে ব’লে ছিল মেলার যাইতে



সঙ্গে তার, তারে আমি করেছি নিষেধ,  
তার পর রাগ করে গিয়াছে সে চ'লে।”  
অমর বলিল। তারে “যাক সে পাবণ,  
কি হইবে রাগে তার, চল সঙ্গে য়োর,  
আমি বধি খেলা, আর শীত কাজ সে'রে”।  
হিরণ চলিয়া গেল। যোগাঙ্গমে ক্রত ;  
কাজ সে'রে কণ পরে আসিল। ফিরিয়া  
সঙ্গে লয়ে জ্যোৎস্নারে অমরের কাছে।  
তিনো জন এক সঙ্গে গেল। চলি মেলা,  
সাগর-সৈকতে ; সেখা দেখিল। যাইয়া  
সহস্র সহস্র লোক এসেছে সেখানে  
যুবা যুবক নরনারী যোগিনী সন্ন্যাসী।  
কানীড় চঞ্চল মতি ভৈরবীর সঙ্গে  
যাইয়া মেলিতে, সব মিলিল। একত্র।  
হিরণ ও জ্যোৎস্নারে অমরের সাথে  
নিরখিলো, মহাক্রোধে উঠিল অলিয়া  
দিলীপ, হৃদয়ে তার প্রতিহিংসা বহু  
অলিল, তখনি পালী করিল প্রতিজ্ঞা  
মনে মনে, এর শাস্তি প্রদানিব আমি  
উভয়েরে একদিন পারি যেই ভাবে ;  
প্রতিজ্ঞা আমার কতু বাধ নাহি হবে।”  
মেলায় সমস্ত লোক করি বিকী কিনি  
বার ঘে গজবা স্থানে গেল। চলি সবে  
একেক একে, দিবা এবে হল অবসান।  
সমস্ত শিষ্যেরে ডাকি কহিল। ভৈরবী  
“অই দেখে সূর্য্যদেব আকর্ষ ডুবা'য়ে  
সিদ্ধু জলে, হুড়াইয়া খর্ব কর রাশি  
কি সুন্দর, তেঁর আঁঠে তোমাদের পানে  
সমুদ্রের কাল-কাজ বসল মল করি  
শোভিত, কাল-কাজ কলমে খর্ব করিলে।  
সুকর্ষ বিহুগ, গুলি, গাইছে পুরবী

বিদায় করণ শীতি, সন্ন্যাসী সকল  
স্নানান্তে সূর্য্যের দিকে চাহি ভক্তি ভরে  
গভীর উদাস্ত স্বরে মাতারে এ গিরি  
করিতেছে স্তুতি পাঠ, শীতল সমীর  
কাননে কাননে আমি কুটস্থ কুলের  
সুগন্ধি কুঙ্কুম ল'য়ে খেলিছে আধির”।  
ভৈরবী কহিল। পুনঃ সুমধুর স্বরে  
“অই দেখে সকলেই আরাধ্য দেবের  
করি পূজা, কুলদল দিতেছে ভাঙ্গায়ে  
সিদ্ধু জলে, তোর। কেন রহিলি বসিয়া  
হেন ভাবে ? যদি মাঝে অরিয়। এখন  
আপন আরাধ্য দেবে, তোদের যা' আছে  
দে ভাঙ্গা'য়ে সিদ্ধু জলে,—এইত সময়।”  
দিলীপ সমর আর অমরেন্দ্র রাও  
অগণিত পুষ্প গুলি দিল। ভাঙ্গাইয়া,  
জ্যোৎস্না ও কালীতারা চঞ্চল। হিরণ  
সবাই ভকতি ভরে পুষ্প রাশি রাশি  
দিল। ভাঙ্গাইয়া সেই সাগর-সলিলে।  
শ্রোতের স্তম্ভীত টানে পুষ্প স্কুলের  
চলিল ভাসিয়া। মহা সাগরের দিকে ;  
অমর ও হিরণের পুষ্প গুলি শ্রোতে  
ভাসিতে ভাসিতে কোন্ দেবতার বরে  
একত্র মিলিত হ'য়ে সুদূর সমুদ্রে  
অদৃশ্য হইয়া গেল কাহার উদ্দেশে।  
ভৈরবী দেখিয়া তাহা ভাবিতে লাগিল।  
কে জানে কখন কার অঙ্গুলী হেলনে  
সংসার মরুর এই বালু রাশি দিয়া  
ঘুর গড়ি, কে করিবে কোন্ রূপ খেলা।  
অতঃপর সকলেই নিজ নিজ বাসে  
গেল। নিশাগমে ভেঙ্গে গেল মেলা।

## নবম সর্গ

[ মলয় গিরি ; যোগাশ্রম ; মহাদেবের গৃহাশ্রম ]

প্রত্যাহতে একাগ্র চিত্তে পূজিয়া শঙ্করে  
ভক্তি ভরে, গুহা হইতে হইল বাহির  
ভৈরবী, দেখিল দূরে আছে দাঁড়াইয়া  
দিলীপ বিষম মুখে, হেরি ভৈরবীরে  
সজল নয়নে যুব। ধরিল। যাইয়া  
ভৈরবীর পদ যুগ, কহিল। ভৈরবী  
“কেন বাছা তুমি আজি বিষম এমন ?”  
কহিল। দিলীপ তারে, “তব যোগাশ্রমে  
যোগী ও যোগিনীগণ, ভাল বাসে যদি  
কেহ কাবে, আশ্রমের রীতি অনুযায়ী  
তুমি মা বিবাহ ডোরে বাঁধিয়া তাদেনে  
আশ্রম হইতে তব দেও বিদাইয়া  
চিরতবে ; সন্ন্যাসিনী হিরণ বালাবে  
প্রাণের অধিক আমি বাসিয়াছি ভালো ;  
তাই আজি পানি প্রার্থী আমি মা তাহার,  
আশ্রমের রীতি মত বাঁধিয়া মোদেরে  
দেও তুমি, বিবাহের পবিত্র বন্ধনে ;  
বনাশ্রম এবে আর ভাল নাহি লাগে।”  
ভৈরবী মধুর স্বরে জিজ্ঞাসিল। তারে  
• “হিরণের মত তুমি জেনেছ কি বাছা ?  
সেও কি সম্মত ইথে ? আশ্রম ত্যাগিয়া  
সেও কি বাইতে চাহে তব সনে চলি ?”  
উত্তরিল। স্নান মুখে দিলীপ তখন  
“না জননি, তারে আমি করিনি জিজ্ঞাসা।”  
“ভিষ্ঠ তুমি কখন কাল” বলিয়া ভৈরবী

গেলা চলি ক্রত পদে হিরণের কাছে  
ডাকিয়া নিষ্ঠুরে তারে কহিল। ভৈরবী  
“তোমারে দিলীপ বড় ভালবাসে বাছা ;  
সে তোমার পানিপ্রার্থী, ইথে কি তোমার  
আছে মত ? থাকে যদি বল মোর কাছে  
লজ্জা কি ইহাতে বাছা, বাঁধিব তোমারে  
পবিত্র বিবাহ ডোরে দিলীপের সনে ;  
পতির সে উপযুক্ত সর্বাংশে তোমার।  
পতি প্রেম লভিলে মা পুণ্যের কিরণে  
আধার জীবন তব হবে উদ্ভাসিত।  
সাক্ষাৎ দেবতা স্বামী, সব চেয়ে বড়,  
স্থান তার বিধাতার আসনের নীচে,  
সেবিলে সে পতিপদ রমণী-জীবনে  
বহু পুণ্য, বনাশ্রম তুচ্ছ তার কাছে।  
সাধিতে বিশ্বের শুভ, তাই পতি সনে  
যোগাশ্রম তেয়াগিয়া যাও গৃহাশ্রমে।”  
তুনি ভৈরবীর বাণী আতঙ্কিত প্রাণে  
শিহরি উঠিল। বালা, কহিল। কাতরে  
স্নানমুখে “না জননি কমা কর মোরে  
ভাল আছি, পরিণয়ে স্পৃহা নাহি বোর।”  
“কেন বাছা, বিবাহ ত মানব-সমাজে  
পুণ্য-প্রথা, বিধাতার অভীষিত ইহা।  
তবে কেন তুমি ইথে বিরোধী এমন ?”  
কহিল। ভৈরবী তারে। আবার হিরণ  
উত্তরিল। “ইচ্ছা নাই পরাধীনা হতে ;

একা আছি—ভাল আছি স্বাধীন জীবন ।  
 কাহারও মুখাপেক্ষী নাহি আমি এবে ;  
 দেবতার কাছে থাকি যোগাশ্রমে তব  
 আজীবন ব্রহ্মচর্য্য করিব পালন ।”  
 ভৈরবী কহিল। পুনঃ “শিবের সম্মুখে  
 দাঁড়াইয়া মিথ্যা যদি বল ক্ষণ তরে  
 মহাপাপী হবে বাছা—যাইবে নরকে ।  
 ঠিক কও, কেন তুমি এতত্ত বিবাহে  
 অস্বীকৃত, লুকা'ওনা শিবের সম্মুখে  
 কোন কথা ।” প্রস্তুতিত গোলাপের মত  
 হিরণের মুখখানি করিল ধারণ  
 রক্তবর্ণ ; ভয়ে ভয়ে অপরাধী প্রায়  
 উত্তরিল। নত মুখে হিরণ তাহানে  
 “মা তুমি সুধালে যবে, শিখা আমি তব,  
 মাতৃ সম তুমি মোর, বলিব না মিথ্যা  
 তব কাছে, আজি এই শিবের সম্মুখে ।  
 শৈশব হইতে মাগো থাকিয়া সতত  
 অমরের সাথে সাথে সমুজ্র সৈকতে  
 পুষ্প-বনে, গিরি শিরে অনিত্যকা পরে  
 নিবিড় কাননে আর নির্ঝরিনী-তীরে  
 খেলেছি—তুলেছি ফুল—করেছি বগড়া ।  
 সে আমার বাল্যসার্থী, একত্র তখন

শৈশব হইতে মাগো আছি এ আশ্রমে ।  
 আমার মুখের পানে সেও চাহি সদা  
 জীবনের সুখ দুঃখ গিয়াছে ভুলিয়া ।  
 আজি আমি কোন্ প্রাণে পাবাণীর প্রায়  
 মুছিয়া সে অতীতের মধুমাখা স্মৃতি  
 একাকী ফেলিয়া তারে এ জন্মের মত  
 এ আশ্রমে, যাব চলি দিলীপের সাথে  
 আবদ্ধ হইয়া তুচ্ছ বিবাহ-বন্ধনে ।  
 যাওয়া ত দূরের কথা, স্মরিলেও তাহা  
 ক্ষণ মাত্র, প্রাণ মোর উঠে শিহরিয়া,  
 স্বর্গেও যাবনা আমি ছাড়িয়া তাহারে ।  
 মা আমার ক্ষমা কর দুঃখিনী কণ্ঠারে ।  
 অমরের সাথে সাথে থাকি এ আশ্রমে  
 স্বাধীন বিহগী প্রায় বেড়াব ঘুরিয়া  
 মলয় গিরির এই কাননে কাননে ।  
 তোমার পূজার ফুল দিব সদা তুলি  
 আমনা উভয়ে, ইথে দিও নাক বাধা  
 মা আমান, এই ভিক্ষা তোমার চরণে ।”  
 উন্মাদিনী প্রায় বালা ধরিল। যাইয়া  
 ভৈরবীর পদ যুগ, যুহুর্ভেকে তারে  
 উঠাইয়া ক্ষিপ্ত হস্তে চিন্তিত হৃদয়ে  
 ভৈরবী চলিয়া গেল। দিলীপের কাছে ।

## দশম সর্গ

[কোলাপুর ; কৃষ্ণানদী-তীর ; বসন্ত রঞ্জনের গৃহ]

“পিউ পিউ”-“পিউ পিউ” গাইছে পাণিয়া  
বসি তরু শাখে অই তটিনীর তীরে ।  
শোভিছে বালার্ক রবি পূরব গগনে  
হৈম বেশে : চুম্বি চারু কুমুমের কলি  
বহিছে প্রভাত বায়ু ধীরে ধীরে ধীরে ।

অই যে দ্বিতল বাড়ী তটিনী সৈকতে,  
পার্শ্বে কুঞ্জবন, নিম্নে কৃষ্ণা তরঙ্গিনী  
চলিয়াছে কি সুন্দর “কুলু কুলু” তানে  
মাতাইয়া বনভূমি, বন-বিহঙ্গিনী ।  
উহার একটি কক্ষে বসি এক বামা  
জিজ্ঞাসিছে সুধাশ্বরে এক বালিকারে  
“কি হুংখোঁ মা ডুবেছিলি তটিনী-সলিলে ?  
সরলা বালিকা তুই কোমলতাময়ী  
সংসারের কি যন্ত্রণা প’শেছিল তোর  
কোমল হৃদয়ে, এই বালিকা জীবনে ?”  
কাতরে কহিলা বামা “কি শুনিবে তুমি  
মা আমার ! এ সংসারে হুংখিনীর মত  
কে আছে ? —পাষণ্ড হবে হুংখিনীর শোকে ;  
তুমি মা কোমল প্রাণে সহিবে কেমনে  
সে যন্ত্রণা ? শৈশবেই মাতৃহীনা আমি  
জানি না সুখের লেশ, নরনের জলে  
ভাসে বন্ধ, মা আমার কি শুনিবে তুমি ?  
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে যে ঘোর যন্ত্রণা  
সহিয়াছি বিমাতার ক্রুর আচরণে  
কেমনে বুঝিবে তুমি ? চিড়িরে হৃদয়

দেখাইলে, বুকিতে মা—হৃদয় আমার  
কি ভীষণ মরুভূমি—কি মহাশ্মশান !  
স্নেহ মায়া বিবর্জিতা বিমাতা আমার  
অর্থলোভে, জ্বায় ধর্ম্যে দিয়া জলাঞ্জলি  
অর্পিতে আমারে এক পাষাণের করে  
করেছিল। কত যন্ত্র, অদৃষ্টের দোষে  
পিতাও তাহারি বশ, কাঁদিয়া কাঁদিয়া  
কত দিন কতবার চরণে তাহার  
লুষ্ঠিয়াছি, কিন্তু হায় মুহূর্তের তরে  
হ’ল না হৃদয়ে তার দয়ার সঞ্চার ।  
যখন জননী মম ছিল। এ জগতে  
রত্নজীর সহ পুত পরিণয় পাশে  
বাঁধিতে আমারে, মাতা কত অনুরোধ  
করেছিল। জনকরে, যত্ন্য পরে তার  
ভুলেছেন সে প্রতিজ্ঞা জনক আমার ।  
“রত্নজী কে বাছা ?” বামা জিজ্ঞাসিলা পুনঃ  
বালিকারে । “সে আমার” কহিলা বালিকা  
নত মুখে “সে আমার বালা সহচর ।”  
“ভালবাস তারে ?” বামা জিজ্ঞাসিলা পুনঃ  
লজ্জা ভরে বালিকার বদন-কমল  
রঞ্জিল রক্তিম রাগে, সরমে বালিকা  
নীরবে আনত মুখে রহিলা বসিয়া ।  
তখনি বুকিলা বামা রত্নজীর প্রেমে  
বালিকার ক্ষুদ্র হৃদি গিয়াছে করিয়া ।  
স্নেহে মধুর বাক্যে ভুবিয়া তাহারে  
আবার কহিলা বামা “বল দেখি বাছা

কি হইল তার পর ?” আবার বালিকা  
 কহিতে লাগিল। নেত্র পূর্ণ জল ধারে,  
 “আর কি কহিব মাগো, নিশীথ সময়ে  
 তনুি যখন আমি মহা গণ্ডগোল,  
 তুরঙ্গের হেঁচা রব, ডমরু-ঝড়ার  
 বংশীর মধুর ধনি, বৃক্শ তখন  
 সমাগত বর-যাত্রী, মবীনা প্রবীণা  
 বালক বালিকা যুবা যে ছিল যেখানে  
 ছুটিল সবেগে বর দেখিবার আশে।  
 আমিও মা ধীরে ধীরে নৈশ অন্ধকারে  
 লুকাইয়া বাহিরিহু, তটিনীর দিকে  
 চলিলাম নির্ঝাপিতে এ ভব যন্ত্রণা।  
 কি করি মা, অসহায় আমি অত্যাগিনী  
 স্মরি সেই ভগবানে, তটিনীর জলে  
 দিহু স্বপ্ন, বহুক্ষণ করি সমুদ্রণ  
 নদী গর্ভে অবশ্য হইল আমার ;  
 তার পর কি ঘটিল কিছুই না জানি।”  
 “আমি জানি সব” বামা কহিল। সাদরে  
 “উলঙ্গ চেতনামুগ্ধ দেহখানি তোরা  
 চ’লেছিল স্রোত-বেগে ভুবিয়া ভাসিয়া  
 তরঙ্গে তরঙ্গে, এক প্রবল উচ্ছ্বাস  
 আনিয়া উঠা’ল তোরে সৈকতের পরে।  
 বিধাতার অহুগ্রহে, উষার আলোকে  
 তরঙ্গী গবাক হ’তে দে’খেছিহু তোরে ;  
 অমনি বিছাড বেগে যুহুর্ভের মাঝে  
 উঠাইহু আমি, সেই তরঙ্গীর পরে।  
 কত বসে সন্ধ্যার চৈতন্য তোমার  
 সে কথা স্মরিলে আজি কখন শিহরে।  
 ফুলে বাও পূর্ণ-মুখি, অতীত স্মরণে  
 রত্নকীর সসৈ পুত পরিণয়-গানে  
 বাসিব কোয়ারে, তুমি ভিট এ ভবনে।”

নীরবে সলজ্জ বাল্য রহিল। চাহিয়া  
 নদী পানে, কত শত তরঙ্গী স্নানর  
 চলিয়াছে পাল ভরে ; শিথল সমীরণ  
 চুহিয়া তটিনী, চুহি সর-সোহাগিনী  
 সরোবরে, ধীরে ধীরে গবাকের পথে  
 প্রবেশি দ্বিতল কক্ষে চুহিছে সাদরে  
 বালিকার ওষ্ঠদ্বয়—রক্ত-কুমুদিনী।  
 হেনকালে মানবের শূকঠ নিঃশ্রুত  
 অম্পষ্ট সঙ্গীত ধনি পশিল প্রবণে  
 প্রাণিয়া প্রভাতাকাশ প্রাণিয়া বাল্য  
 ভয় হৃদি, ধীরে ধীরে বর্ষিতে লাগিল  
 অবিচ্ছাদিত সুধা রানি তটিনী-সৈকতে  
 নিস্তরঙ্গ নদী বক্ষে ; করিয়া যতনে  
 মধুর আবেশময় জীবন তাহার !  
 ধীরে ধীরে সেই স্বর উঠিল পড়িল  
 প্রকৃতির প্রাণে করি বিশ্বাসি সঞ্চার।—

তুমি ভুলে কি গিয়েছ মোরে !  
 আমি—তোমারি লাগিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া  
 ঘুরিয়া বেড়াই দোরে দোরে।  
 তব সে হৃদয় কঠিন পাষাণ  
 সারাটি জীবন কাঁদাইলে প্রাণ  
 হানিয়া সত্য বিচ্ছেদের বাণ  
 ভাগা’লে নয়ন লোরে।

ক্রমে স্পষ্ট স্পষ্টতর—আরে! স্পষ্টতর ;  
 যেন কোন পরিচিত প্রিয় কণ্ঠ স্বর  
 বর্ষিল সুধার ধারা বিশ্বাসি-বিশ্বাস  
 বালিকার উচ্ছ্বাস অতৃপ্ত মরমে।  
 অদূরে তরঙ্গী বক্ষে দেখিলা বালিকা  
 একটি উন্নত মূর্তি ভয়ে আচ্ছাদিত  
 স্বর্ণ-কাস্তি ; রাস সুখ, যুহুর্ভের মাঝে  
 সর্প দষ্ট পাহ আর কলিকাতা কক্ষে  
 “রত্নকী” বলিয়া বাল্য হইল। মূর্ত্তিত।



## একাদশ সর্গ

[ মনর গিরি ; যোগেশ্বরের নিকটস্থ পুণ্ড্রবন ]

জ্যোৎস্নারে ডেকে আজি কহিলা হিরণ  
 “আজ মোর পালা দিদি, যাই আমি এবে  
 তুলিতে পূজার ফুল, ডাকিলে অমর  
 কহিস্ হিরণ গেছে ফুল তুলিবারে।”  
 জ্যোৎস্না কহিলা তারে “চঞ্চলার পালা  
 আজি দিদি, তুই কেন কুসুম তুলিতে  
 যাস্ আজি ? যার পালা তুলুক সে যে’য়ে।”  
 “না দিদি আমার পালা” কহিলা হিরণ  
 “তুই কি গেছিস্ ভুলে ? চঞ্চলা ত কালি  
 তুলেছে পূজার ফুল ; পরশু তুলেছে  
 কালীতারা, দেখ্ ভেবে পালা মোর আজি।  
 কালি হবে পালা তোর, ডাকিলে অমর  
 বলিস্ তাহারে আমি গিয়াছি সাগরে  
 স্নানার্থে, পূজার ফুল করিতে চয়ন।”  
 হিরণ চলিয়া গেল, স্নানান্তে সে যে’য়ে  
 তুলিতে লাগিলা ফুল ভরিয়া অঞ্চল।

হিরণের সাহায্যার্থে যুহুর্ভেক পরে  
 দিলীপ আসিয়া সেখা তুলিতে লাগিলা  
 বহু ফুল, নিবেদিত। হিরণ তাহারে  
 কহিলা “তোমারে আমি ডাকিনি ত ভাই  
 কেন তুমি অনর্থক এসেছ এখানে ?  
 আমার কি কাজ নেই আমারে এখন ?  
 সময়ের অপব্যয় কেন কর তুমি ?  
 এ সামান্য ফুল আমি পারিব তুলিতে।  
 যাও তুমি দেখা হতে, আমারে কাজ

কর যে’য়ে, ত্যক্ত আর ক’রনা আমারে !  
 আমি ত তোমার কাছে করিনি প্রার্থনা  
 সাহায্য ? তথাপি কেন এসে মোর কাছে  
 বাধা দেও সব কাজে ? ভাল নাহি লাগে  
 এরূপ বিরক্ত যদি কর তুমি মোরে।”  
 “দোষ কি সাহায্য নিতে ?” কহিলা দিলীপ  
 “আমারে দেখিলে ভাই কেন জানি তুমি  
 উঠ অলে, আমি কিন্তু পারিনে বুঝিতে  
 অর্থ এর, শুধু তোমা ভালবাসি বলে  
 সাহায্য করিতে আসি, দোষ কি তাহাতে ?  
 অমরও ত আসে তব করিতে সাহায্য  
 কত দিন, কই তুমি বলনা ত কিছু ?  
 সেদিনও অমর কত ফুল তুলে দিয়া  
 সাহায্য করিল তোমা, হাসি মুখে তুমি  
 ফুলগুলি নিয়ে তার, কতনা আলাপ  
 করেছিলে, সকলিত দেখিয়াছি আমি ?  
 কোন্ গুণে আমি হতে শ্রেষ্ঠ সে অমর ?”  
 প্রত্যুত্তরে তার আর না বলিয়া কিছু  
 নীরবে হিরণ ফুল লাগিলা তুলিতে।  
 তুলিয়া অনেক ফুল দিলীপ তখন  
 হিরণে আনিয়া দিল ; পূজার্থে সে গুলি  
 চলিলা হিরণ ল’য়ে দিতে ভৈরবীরে।

অমরের সাথে তার হল দেখা পথে  
 অমর বলিলা তারে “হিহিহি হিরণ  
 আমার নিবেদন সঙ্গে আজো পুনর্ব্যয়



গেলে তুমি তার সনে কুসুম তুলিতে ?  
 প্রকৃত্তরে মন যুখে কহিলা হিরণ  
 “মিলীপের সনে কুল বাইনি তুলিতে ?  
 সে মিল'জ পাছে পাছে গিয়ে ছিল মোর  
 কুসুম তুলিতে কুল কানন ভিতরে ।”  
 অমর বলিল। “তবে কুলগুলি তার  
 মিলে কেন ?” কোণ্ডে হুঃখে হিরণ তাহারে  
 বলিল না কিছু আর, সজল নয়নে  
 নীরবে মাটির দিকে রহিলা চাহিয়া ।  
 অমর তাকুলা ভাবে কহিলা আবার  
 “নারীর চরিত্র বুঝা বড়ই কঠিন ;  
 নারীরে বিশ্বাস করে যে মূর্খ অধম  
 সে সখা আছাড় খায় প্রতি পদে পদে,  
 তার মত অপদার্থ নাহি ধরাতে ।”  
 প্রকৃত্তর মুরতি প্রায় দাঁড়িয়ে হিরণ  
 অধোমুখে, জগদীশে করিলা স্মরণ  
 মাটিতে পড়িয়া গেল ঝর ঝর করি  
 অকলের ফুলগুলি ; সে দিন তৈরবী  
 পারিলনা ফুল দিয়া পূজিতে তাহার  
 দেবতারে, মনকষ্টে পূজা সে দিনের  
 গলা জলে বিধ পত্রে করিয়া সমাধা  
 হিরণে অজস্র গালি দিয়া সে তৈরবী ।  
 সে দিন অমর ব'লে হুঃখিনী বালিকা  
 খেলনা কিছুই আহা, অনশনে তার  
 সেল দিন মনোহুখে কাঁদিলা গোপনে ।  
 নিশিতে অবল আরে হইলা আক্রান্ত  
 অভাগিনী, দিন হই তুগিলা সে আরে  
 হইল বিকার তার, বকিতে লাগিলা  
 কত সে প্রলাপ বাক্য অজানতা বশে ।  
 অমর শয্যার পাশে বসিয়া সতত  
 করিতে লাগিল কত তথ্য তাহার ।

দণ্ডে দণ্ডে প্রদানিলা সন্ন্যাসী প্রবৃত্ত  
 ঔষধাদি, অভাগিনী বিকারের বশে  
 কহিতে লাগিলা “তুমি অবিশ্বাস কর  
 অমরেন্দ্র, প্রাণ দিতে বসিয়াছি আজি ।  
 তব লাগি তবু আমি অবিশ্বাসী হ'য়ে  
 চাহিনা করিতে এই জীবন ধারণ ।  
 একমাত্র তুমি মোর আরাধ্য দেবতা  
 ধরাতে ; প্রতিদিন শৈশব হইতে  
 অন্তরে অন্তরে আমি পূজিছি তোমারে  
 অমরেন্দ্র, শিব পূজা করেছি সতত  
 তোমার মঙ্গল তরে বসিয়া নিভুতে ।  
 তথাপি অদৃষ্ট দোষে হারায়েছি আজ  
 বিশ্বাস কি ফল মোর বাঁচিয়া এখন ?  
 ক্ষমা কর তুমি মোরে, জীবনে আমার  
 নাহি সাধ ; একবার বল তুমি মোরে  
 ক্ষমিয়াছ, অভাগীরে করেছ বিশ্বাস ;  
 পরজন্মে তুমি মোরে করিবে গ্রহণ  
 দাসী ব'লে ? এই মোর শেষ আকিঞ্চন ।”  
 অমর সর্বদা তার বসিয়া শয্যাতে  
 কুসুম মনে প্রাণপণে করিতে লাগিলা  
 গুঞ্জা, প্রত্যহ এনে ঔষধ নূতন  
 সেবন করাল তারে, সপ্তাহের পর  
 বিকার কাটিয়া তার হইল চেতনা  
 ক্রমে ক্রমে, চক্ষু মেলি দেখিলা বালিকা  
 অমর কাঁদিছে তার শয্যাতে বসিয়া ।  
 চক্ষে তার অশ্রুধারা পড়িছে বরিয়া  
 অবিরল, ধীরে ধীরে অর্ধ-পদ্ম প্রায়  
 কীর্ণ হস্ত উঠাইয়া আসিতে নিকটে  
 ইঙ্গিত করিলা বালা, সানন্দে অমর  
 বুকের উপরে তার পড়িল কুঁকিয়া ;  
 অজ্ঞাতে মিলিয়া গেল অমর তাহার ।

হিরণের রোগ ক্রিষ্ট অধর যুগলে ।  
 হিরণের লে অধরের মধুমাখা স্পর্শে  
 উঠিল শিহরি, মরি চক্ষু হুইচি তার  
 আবার মুদিয়া গেল, ছঃখিনী বালিকা  
 দেখিল জাগ্রত-স্বপ্ন, উৎফুল্ল হৃদয়ে  
 ভাবিল ইহাই মোর স্বর্গ ধরাডলে ।  
 হেনকালে কক্ষ মাঝে প্রবেশি দিলীপ  
 নিরখিয়া সেই দৃশ্য উঠিল অলিয়া  
 হিংসানলে, বিনা বাক্যে উদ্ভবের প্রায়  
 কক্ষ হতে বাহিরিয়া গেল দ্রুত বেগে ।

হিরণ অমর ইহা নাগিল। আনিতে  
 ক্ষণ তরে, চক্ষু মেলে কহিল। হিরণ  
 “অমর, আমার তুমি করিয়াছ কমা ?”  
 “করিয়াছি” উত্তরিল। অমর তাহারে ।  
 হিরণ কহিল। পুনঃ সন্মিত বদনে  
 “তা হ’লে আমার তুমি করিবে গ্রহণ ?”  
 “করিব” প্রশান্ত ভাবে কহিল। অমর ।  
 আনন্দে হিরণ পুনঃ মুদিল। নয়ন ।  
 অর্ধেক বেয়াধি তার হল উপশম ।

-----

## দ্বাদশ সর্গ

[ বলর গিরি ; সমুদ্র তীর ; যোগাশ্রম ]

সন্ন্যাসীর যোগাশ্রমে গিরিপদ-নিরে  
বসিয়া শুহায় এক ভাবিছে জ্যোৎস্না  
হিরণের মুণ্ডপাত করিব কেমনে ?  
না বধিলে তারে, মোর মিথ্যা। সব আশা ;  
একমাত্র সেই মোর সুখের কণ্টক  
এ জগতে, এতএব সর্বনাশ তার  
সাধিব, বিশেষ রূপে দেখিয়াছি আমি  
লক্ষ্য কবে, অমরেন্দ্র ভালবাসে তারে  
প্রাণ সম, সে থাকিতে কি সুখ আমার ?  
তাহারে এ বিশ্ব হতে নারিলে করিতে  
অপহৃত, এ জীবনে নারিব লভিতে  
অমরের ভালবাসা ; না পেলো তাহারে  
গভীর আশার মোর ভবিষ্য জীবন ।  
ভাল নাহি লাগে মোর থাকিতে এখানে  
এক দণ্ড, কি করিব আমি অভাগিনী  
পিতৃহীনা, শিব পূজা করিতে বসিলে  
অমরের মূর্তি আমি অস্তুরের মাঝে  
নিরখি মনের চক্ষে, সে যেন সেখানে  
বসি এক রক্তাসনে লইতেছে পূজা  
শিবের বদলে মোর, শোণিতের সনে  
সে যেন রয়েছে মিশি,—ভুলিব কেমনে ?  
মনেরে বুঝানু কত, সে ত তা' বুঝেনা,  
অমরের আশা আমি নারিব ত্যজিতে  
এ জীবনে, কি করিব, হলে কি কৌশলে  
পারি যেই ভাবে আমি বধিয়া হিরণে  
লভিব অমরে, ইথে পাপ হয় হবে ।  
আমার স্বার্থের লাগি সব পাপ আমি

পারিব করিতে, তাতে ভয় কি আমার ?  
নরকে যাইতে হলে তাহাও যাইব,  
অমরের আশা আমি ছাড়িব না তবু ;  
সেই মোর ক্রবতারা সংসার সাগরে ।

অরুণ্য পদ শব্দে চমকিয়া বালা  
দেখিল। পশ্চাতে চাহি আসিছে হিরণ  
তার দিকে, স্নেহস্বরে বলিল। তাহারে  
জ্যোৎস্না “এসেছ দিদি ? তোমারি যে কথা  
ভাবিতেছিলাম আমি,—বস এই স্থানে ;  
কথা আছে তব সনে, তুমি যে আমার  
প্রিয় সখি, প্রাণ সম ভালবাসি তোমা ।  
তব সুখে সুখী আমি তোমারি বিপদে  
আমারি বিপদ বলে ভাবি আমি মনে ।  
অমরে প্রাণের সম ভালবাস তুমি  
জানি আমি, তারে ছে'ড়ে থাকিতে তোমার  
কান্দে প্রাণ, সে তোমার হৃদয়ের মণি ।  
কিন্তু দিদি, সে ত নাহি ভালবাসে তোমা ?  
সে যে ঘোর প্রবঞ্চক, চঞ্চলার প্রেমে  
মুগ্ধ সে যে, চঞ্চলা ও ভালবাসে তারে ।  
অস্তুরে গরল তার, সে ভণ্ড তোমারে  
কেবলি মৌখিক প্রেম, দেখায় সতত  
ভুলাইল। রাখে দিদি, ভাল নাহি বাসে ।”  
কহিল। হিরণ বালা শুক হাসি ছেঁমে  
“এ জগতে সে আমার আরাধ্য দেবতা,  
পূজা করি তার আমি, ভক্তি করি দিদি ।  
পাইবার আশে আমি ভালবাসা তার

ভাল ত বাসিনে তারে ? আখার জীবনে  
সে আমার একমাত্র পূর্ণিমা রজনী ।  
সে ভাল বাসুক কিংবা না বাসুক দিদি  
কি ক্ষতি তাহাতে মোর ? এইমাত্র জানি  
ভালবাসি তারে আমি প্রতিদান তার  
নাহি চাহি, স্বার্থশূন্য পবিত্র নির্মল  
আমার এ ভালবাসা, নহে কলুষিত  
কামনার পুতিগন্ধে, মিলনের আমি  
নহি অভিলাষী দিদি, অন্তরে তাহার  
পূজা ক'রে অন্তরেই পেয়েছি তাহারে ;  
বাহ্যিক মিলনে মোর কোন্ প্রয়োজন ?  
সমস্ত জগত ভরে দেখি আমি তারে ;  
চক্ষু খুলে দেখি যাবে, গুদিলে নয়ন  
দেখি তারে জলে স্থলে গগন মণ্ডলে ।  
সে ভিন্ন কিছুই মাই অন্তরে বাহিরে ।”  
নীরবিলা বালা, জ্যোৎস্না কহিল তাহারে  
“সে ত ভাল কথা, ভাল বাসিলে কাহারে  
এইরূপ ভালবাসা বাসিতে যে হয় ।  
তুমি দিদি পুণ্যবতী, তোমার মতন  
কে এ বিধে ? নরাধম দিলীপের মত  
লম্পট নাহিক কেহ, চঞ্চলারে সেও  
বাসে ভাল, তব প্রতি লালসা তাহার  
আছে দিদি, তাও আমি জেনেছি কৌশলে ।  
হতভাগা মা চণ্ডীর পূজা ক'রে দিদি  
চাহিয়াছে বর, সে যে ক'রেছে প্রতিজ্ঞা  
•আগামী মঙ্গলবারে অমাবস্তা রাতে  
অমরে করিয়া হত্যা, চঞ্চলারে ল'য়ে  
ঘাইবে প্রয়াগ তীরে, থাকিবে সেখানে  
গুপ্তভাবে উভয়েই, আমোদ প্রমোদে,  
তাও আমি কোনভাবে পেরেছি জানিতে ।  
সে দিন দেখায়ে মোরে নানা প্রলোভন •

বলেছিল তোমারে সে ক'রে দিতে বশ,  
কেননা সৌন্দর্য্যে তব মুগ্ধ সে পামর  
আয়ত্তে আনিয়া তোমা আজি কিংবা কালি  
পূরাবে কামনা তার ছলে কি কৌশলে ।  
এই বেলা আপনার চিন্ত' সহণার  
অশ্রুধা নিস্তার তব নাহিক ভগিনি ।  
সতীত্ব তোমার আর রক্ষিতে অমরে  
ইচ্ছা যদি থাকে দিদি, শোন কথা মম  
আশ্রম-উত্তরে অই কাননের মাঝে  
অমৃত সাগর নামে আছে এক দিঘী  
পুরাতন, তীরে তার দেবতা মন্দির  
অত্যাচ্চ, ভিতরে তার দেবী ছিন্ন মস্তা ।  
মন্দিরের পাশে এক ক্ষুদ্র কক্ষ মাঝে  
জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী নিবসে ।  
আর সেই পুরাতন অমৃত সাগরে  
সুগভীর কালজলে ফুটে প্রতিদিন  
রক্ত কোকনদ ত্রয়, পূজে ছুটি দিয়া  
নিত্য সে সন্ন্যাসী সেই দেবী প্রতিমারে ।  
অশ্রু কোকনদ নিয়া স্বয়ং শঙ্কর  
দেবীর মস্তকে দেন, তাই জীব জন্ত  
আছে বেঁচে, তা'না হলে ধ্বংস হত ধরা ।  
শুভাকাঙ্ক্ষী আমি তব সেই স্থানে অশ্রু  
যেয়ে তুমি, স্নান করি অমৃত সাগরে  
তুলি সেই রক্ত পদ্ম কর যে'রে পূজা  
সে দেবীর, নিশা কালে আসিলে শঙ্কর  
অমরের প্রাণ তিক্তা মাগিও চরণে ।  
সতীত্ব অক্ষুর যাতে থাকে তব দিদি  
সে তিক্তাও তার কাছে করিও প্রার্থনা ।  
তাহলে তোমার সেই আরাধ্য দেবের  
মঙ্গল হইবে দিদি, তুমিও বাঁচিবে ।  
তিন কোণ হেথা হতে অমৃত সাগর,

যাও শীঘ্র তুমি সেখা, আশীর্বাদ করি  
 তব মনকাম দিদি হইবে পূরণ।  
 এখানে তোমার কথা জিজ্ঞাসিলে কেহ  
 বলিব গিয়াছ তুমি অমৃত সাগরে  
 পূজা দিতে ছিন্নমস্তা দেবীর মন্দিরে।”  
 হিরণ কিয়ৎ কাল থাকিয়া নিস্তব্ধ  
 বলিল “জ্যোৎস্না দিদি সত্যি দিলীপ  
 বধিবে অমরে ? তবে গুরুর নিকটে  
 যাইয়া বলিলে কেন ? তিনিই তাহারে  
 রক্ষিবেন গালি দিয়া পাষণ্ড দিলীপে ?”  
 “না দিদি এমন কৰ্ম করিও না তুমি”  
 বলিল। জ্যোৎস্না মুখ করি তার ভার  
 “হবে হিতে বিপরীত, কেননা দিলীপ  
 সে কথা কখনো নাহি করিবে স্বীকার  
 গুরুর নিকটে, শেষে ঘটবে বিপদ।  
 যাও তুমি অবিলম্বে অমৃত সাগরে  
 পূজা দিতে, যদি তুমি ভাল চাও দিদি  
 অমরের।” “আচ্ছা তবে চলিলাম আমি  
 সেই স্থানে, দেখি যে'য়ে কি আছে কপালে।”  
 বলিয়া হিরণ বালা করিল। প্রস্থান।

জ্যোৎস্না ভাবিল। মনে, সুখের কণ্টক  
 তুই মোর হৃদভাগি, চাতুরী আমার  
 কেমনে বুঝিবি তুই, সর্বনাশ তোর  
 সাধিব অতাই আমি, যদি কোন মতে

সুভীক-রতন তোর পারি বিনাশিতে  
 দিলীপের দ্বারা, তবে নিশ্চয় অমর  
 করিবে না স্পর্শ তোর, তাই'লে আমার  
 কামনা হইবে পূর্ণ, পাইব অমরে  
 এ জীবনে।” ক্রত পদে গেল। সে তখন  
 দিলীপের সন্নিধানে, বলিল। হাসিয়া  
 “দিলীপ তোমার কার্য্য করেছি সমাধা ;  
 যাও তুমি ছিন্নমস্তা দেবীর মন্দিরে  
 ক্রতপদে, পথে কিংবা মন্দিরে যাইয়া  
 পাবে তারে, সাবধান এসনা এখানে  
 কিরে আর তাহা হলে পড়িবে বিপদে।  
 তুমি যাহা বলেছিলে, সেই মত তারে  
 বলিয়াছি, কি বুঝিবে আমার চাতুরী ?  
 সত্য বলে অভাগিনী ভেবেছে সকলি ;  
 তুমি তারে হেথা হতে সুদূর বিদেশে  
 নিয়ে যে'ও, কেহ যেন না পারে জানিতে।”  
 দিলীপ সানন্দ চিন্তে কহিল। তাহারে  
 “জ্যোৎস্না রক্ষিলি তুই জীবন আমার।  
 যদি এ জীবনে পারি, সাধিতে মঙ্গল  
 কভু তোর, আত্ম বলে দিব পরিচর।”  
 পাণিষ্ঠ তখনি এক সুভীক ছুরিকা  
 ব্যাঘ্র চৰ্ম্ম জটাভূট আরো বহু জব্য  
 সঙ্গে নিয়ে ক্রতপদে চলিল। সানন্দে  
 অমৃত সাগরে সেই দেবীর মন্দিরে।

## প্রবোধ সর্গ

[ বলরগিরি ; অমৃত সাগরের নিকটস্থ গভীর কানন ; ছিন্নমস্তা দেবীর মন্দির ]

সন্ন্যাসীর যোগাশ্রম কেলিয়া পশ্চাতে  
চলেছে হিরণ্যলা বিষম হৃদয়ে  
মলয় গিরির এক নিভৃত কাননে  
ক্রতবেগে ; চারিদিকে অরণ্যানী ঘোর ।  
তরুণলি আলিঙ্গিয়া শাখা প্রশাখায়  
পরস্পর সাজায়েছে কুঞ্জ মনোহর ।  
বিন্দুমাত্র নাহি রক্ত মার্তও কিরণ  
প্রবেশিতে এ কাননে—দিবসে আধার ।  
স্থানে স্থানে কত ঝোপ কটকিত তরু  
কত গুল্ম, কুমুদিতা কত বন-লতা,  
জড়াইয়া এই সব বিটপী নিচয়  
শোভিছে সুন্দর কত ফুলে ও মুকুলে ।  
বিটপীর শাখে বসি সুকণ্ঠ গায়ক  
বনপাখী, মুখরিত করিছে এ বন  
মাঝে মাঝে, মধুমাখা ললিত বক্সারে  
দিনমণি অস্তোমুখ, সন্ধ্যার আধারে  
সাজিল এ বন তুমি আরো ভয়ঙ্কর ।  
হিরণ নির্ভয় চিন্তে এ ঘোর বনানী  
করি ভেদ, অগ্রসর হইতে লাগিল।  
ক্রমে ক্রমে ছিন্নমস্তা দেবীর মন্দিরে ।  
দূর হতে চুড়া তার নিরখিয়া বালা  
প্রণমিলা, কণ পরে উঠরিল। আসি  
অমৃত সাগর তীরে মন্দির নিকটে ।  
দেখিলা সন্ন্যাসী এক জটাজুটধারী  
আরতি করিয়া শেব করিলা প্রবেশ,  
পাশের একটি কক্ষে, যুগুর্জের মাঝে  
কলাট করিলা বসে সুদূত অর্গলে ।

কতক্ষণ সেই স্থানে বসিয়া হিরণ  
বিজ্ঞামিলা, তারপর উঠিয়া তখনি  
ভাবিলা এখন তবে অমৃত সাগরে  
অবগাহি তুলে আনি সেই কোকনদ  
যা' দিয়া পূজিব আজি এ ছিন্নমস্তারে ।  
হঠাৎ দেখিলা বালা মন্দির হইতে  
বাহিরিলা মহেশ্বর শঙ্কু শূন্যপাণি  
ধীরে ধীরে, মূর্তি তার মহা ভয়ঙ্কর ;  
সভয়ে হিরণ তারে করিলা প্রণাম  
সাঁষ্টাঙ্গে কম্পিত দেহে, কহিলা শঙ্কর  
গম্ভীরে “হিরণ, তুমি কেন আসিয়াছ ?  
যে আশে এসেছ তুমি, হবেনা পূরণ  
সে আশা, অমরে তুমি পাবেনা জীবনে ।  
সে তোমারে এতটুকু ভাল নাহি বাসে,  
কেন তুমি তার জন্ত উতলা এমন ?  
মৃত্যু তার সম্মুখি, তুলে যাও তারে  
যে তোমারে বাসে ভাল তার প্রতি তুমি  
বিরাগী, তাহারে তুমি ভাল নাহি বাস,  
এ কেমন রীতি তব ? যাও চলি ক্রত  
যোগাশ্রমে, তারে তুমি ভালবাস ঘেয়ে ।  
সে আমার প্রিয় ভক্ত, চিনেছ কি তারে ?  
দিলীপ তাহার নাম সে তোমার ঘোরে  
আশ্রহারী, মম কাছে করিছে প্রার্থনা  
পূজান্তে প্রত্যেক দিন লভিতে তোমারে ।”  
আবার প্রণাম করি কহিলা হিরণ  
ভক্তিভরে, “মহেশ্বর, কহা কর যোরে,  
জগতের কর্তা তুমি, আমিও তোমার



গুলিরাহি প্রতিদিন লভিতে অমরে ।  
 যদি মোর সে প্রার্থনা ব্যর্থ হ'য়ে থাকে,  
 মোরে ফেল মোরে এই ত্রিশূল আঘাতে ।  
 ইহাই চরণে তব প্রার্থনা আমার ।  
 ভালবাসি আমি যারে, সে ভাল বাসুক  
 কিংবা না বাসুক মোরে, কোন্ ক্ষতি তাহে ?  
 তার ভালবাসা আমি পাইবার আশে  
 ভাল ত বাসিনে তারে ? নিস্বার্থ নিস্কাম  
 আমার এ ভালবাসা, পবিত্র নির্মল ।  
 চাইনে তাহারে আমি, শুধু ভালবাসি  
 মনে মনে, পূজা করি নিভৃত নির্জনে  
 ভক্তি ভরে সদা তারে প্রাণের কুসুম ।  
 ইহাতেও বাদ যদি সাধ' মহেশ্বর,  
 কি ল'য়ে হুঃখিনী তবে থাকিবে ভুবনে ?  
 হয় মোরে মোরে ফেল, নয় দয়া ক'রে  
 এই অধিকারটুকু দেও শূলপাণি  
 হুঃখিনীরে, এ মিনতি তোমার চরণে ।"  
 আবার গভীর স্বরে কহিল। ধূর্জটী  
 "যাও তুমি, যাহা ইচ্ছা কর যেয়ে এবে  
 এ মন্দিরে নিশিকালে নারিবে থাকিতে ।"  
 কহিল। হিরণ বালা যুড়ি হুই কর  
 সবিনয়ে "এত রাত্রে কোথা যাব দেব,  
 এখানে বাপিয়ে নিশি, যাব কালি প্রাতে ।"  
 কহিল। শব্দর পুনঃ শ্রুগভীর স্বরে  
 "দেবীর আদেশ নাহি থাকিতে এখানে  
 যদি তুমি পতিতাবে না তজ দিলীপে ।"  
 "হেন কথা দেব আর বলনা আমারে"  
 কহিল হিরণ বালা "এ ঘোর নিশিতে  
 অন্ধকারে করি তেদ এ মহা বনানী  
 কেমনে বাইব আমি আজি যোগাশ্রমে ?"  
 পুষ্প এক জটা হতে প্রদানি হিরণে

কহিল। শব্দর "যাও পড়িলে বিপদে  
 স্মরিও আমার নাম, হব উপস্থিত  
 সে স্থানে আমি ক্রত রক্ষিতে তোমারে ;  
 এখানে থাকিলে তব ভাল নাহি হবে ।  
 দ্বিতীয় প্রহর নিশি হ'য়েছে অতীত,  
 উদিতছে চন্দ্র অই পূর্ব গগনে,  
 যাও তুমি, হেথা আর ক'রনা বিলম্ব,  
 যাইতে পারিবে এবে চন্দ্রের আলোকে  
 কোন মতে যোগাশ্রমে প্রভাতের আগে ।"  
 প্রণমি শব্দরে বাল। কবিল। প্রস্থান  
 তথা হতে চন্দ্রালোকে হেরি বন-পথ  
 ক্রতবেগে বনমাঝে করিল। প্রবেশ  
 সভয়ে, অনেক দূর হলে অগ্রসর  
 দেখিল। অদূরে এক ক্ষুদ্র ঝোপ হ'তে  
 ভীষণ শার্দূল এক আসিছে সবেগে  
 তার দিকে, ভয়ে বাল। কম্পিত হৃদয়ে  
 ছুটিলা পশ্চাৎ দিকে চক্ষের নিমিষে  
 উর্দ্ধখানে, পাছে পাছে বিহ্বাৎ গতিতে  
 ছুটিল ভীষণ ব্যাজ্র, আক্রমিল তারে  
 মহাবলে এক লক্ষে । "কোথা মহেশ্বর  
 রক্ষা কর" বলি বাল। পড়িল। ভূতলে ।  
 কি আশ্চর্য্য, অভাগিনী দেখিল। বিষয়ে  
 ব্যাজ্রের উদর ভেদি' হইল বাহির  
 শিব মূর্তি, তার সেই আকুল আশ্বানে ।  
 শিরে জটা হস্তে শূল বিভূতি কপালে ।  
 অভাগিনী ভক্তিতরে প্রণমিরা তারে  
 কহিল। কাতরে "দেব রক্ষা কর মোরে,  
 আমি বড় অভাগিনী" কহিল। পিনাকী  
 "কেন তুই মিছে মিছে অমরের লাগি  
 আগনার সর্বনাশ করিস্ সাধন ?  
 যে ঘোর কপট, তোরে ভাল নাহি বাসে

সে তোরে হৃদয় করে ভালবাসি বলে  
 শুধু যুখে, হৃদে তার জ্যোতার সৃষ্টি  
 প্রতিষ্ঠিত, সে তাহারে প্রাণের সমান  
 বাসে ভাল পূজা করে দিবস রজনী ।  
 তার আশা ত্যাগ কর, পাবিনে তাহারে ;  
 আরু অন্ন, বৃত্তা তার এসেছে খনায়ে  
 অতি শীঘ্র, কেন তুই পড়ি মোহে তার  
 ডুবিলি জন্মের মত বিপদ সাগরে ।  
 দিলীপ আমারি শিষ্য ভালবাসে তোরে  
 প্রাণ সম, কেন তুই ঘনিস তাহারে ?  
 তুই আমি তার প্রতি তার প্রেমে তুই  
 মজিলে, আমারে তুই পাইবি অচিরে ।  
 দিলীপের বেশে আমি দেখা দিয়ে তোরে  
 প্রেম শিখাইব আজি, না শিখিলে প্রেম  
 বল তুই ভগবানে পাইবি কেমনে ?  
 প্রেম ভিন্ন ভগবানে কে পারে লভিতে ?  
 হিরণ্যমস্তা তোর প্রতি এ অশ্রু বিরূপ,  
 ভেবে দেখ, পুনঃ বলি তুলে যা অমরে ।  
 প্রেম শিক্ষা দিয়া তোরে, দিলীপের সাথে  
 দিব তোর পরিণয়, তা হলে এখানে  
 থাকিবি হৃদয়ে হিরণ মস্তার মন্দিরে ।  
 প্রত্যহ আমার সনে দেখা হবে তোর,  
 মশরীরে হেথা তুই পাবি ভগবানে ।”  
 “কাজ নেই প্রেমে মোর” কহিল হিরণ  
 ব্রহ্মচর্য্য ব্রত আমি করিয়া ধারণ  
 যাব চ’লে কানীধায়ে, থাকিব সেখানে  
 আত্মবন, দিব্যরাত্রি ভজনে পূজনে ।”  
 “সে ও জ্ঞান আমারি ধাম” কহিল সে শিব,  
 “বিশেষরূপে আমি প্রতিষ্ঠিত সেখা ;  
 কি লাভ সেখানে যেরে ? সেখানেও আমি,

এখানেও আমি ; তবে কি লাভ সেখানে ?”  
 শিব হইলি প্রাপ্ত এ উত্তর স্থানে ।  
 কাজ নেই সেখা যেরে, আর হৃদে মোর  
 দিলীপ আমারি শিষ্য, দিলীপের রূপে  
 তজ মোরে, পাবি তুই দিলীপে এখানে ।”  
 চক্কর নিমিষে তারে ধরিল সে শিব  
 মহাবলে, হৃদে তারে লইলা টানিয়া ।  
 “একি মহেশ্বর ?—তুমি ?” বলিয়া হুঃখিনী  
 চীৎকারিলা উচ্চৈঃস্বরে “কে আছ এখানে  
 রক্ষা কর হুঃখিনীরে, মাতঃ হিরণ্যমস্ত  
 আমি যে বিপদাপন্ন আজি তব দ্বারে ।”

মূহুর্তে সে বন ছুঁমি করিয়া কম্পিত  
 কে জানি ভীষণ করে কহিল গজিয়া  
 “ভয় নাই—ভয় নাই আসিয়াছি আমি ।”  
 বিহ্বল গতিতে এক বীরেন্দ্র যুবক  
 আসিলা ছুটিয়া সেখা কৃপাণ লইয়া  
 হিরণে নিক্ষেপি দূরে দাঁড়াল শঙ্কর  
 বীরদর্পে, হু’ও জন সূৰ্ব্বিতে লাগিলা  
 অসি নিয়ে, শিব তারে মারিলা ত্রিশূল  
 মহাবলে, করি ব্যর্থ সে ঘোর আঘাত  
 বীর যুবা, শিরে তার মারিলা কৃপাণ  
 স্তম্ভীকৃত, বিহ্বলবেগে সে অসি ভীষণ  
 বিধিল শঙ্কর শিরে, পলা’ল সে বনে  
 দ্রুতবেগে, বলে গেল যাইবার কালে  
 “অমরেন্দ্র, দেখা যাবে তোর বীরপণা,  
 কেমনে লভিস তুই হিরণ বালায়ে  
 জীবিত থাকিতে আমি ধরণীর পরে ?  
 হয় তুই, নয় আমি থাকিব জীবিত  
 বরা নাহে, কিংবা যুদ্ধে মরিব উভয়ে ।”

তুলি সেই কঠোর চমকিয়া যুবা ।  
 কহিল হিরণে “এ যে পাষাণ দিলীপ  
 একাকী নির্জনে পেয়ে এ ঘোর নিশিতে  
 ধরেছিল তোরে, তুই চিনিস্‌নি তারে ?”  
 কহিল হিরণ বালা অতি যুৎ করে ।  
 “এখানে চিনি, হির মস্তার মন্দিরে  
 এই পাণ্ডা কত কথা বলেছিল মোরে  
 ছন্ন বেশে শিবরূপে, তুলিয়া তোমারে  
 দিলীপে বাসিতে ভাল, তখনো চিনি ;  
 একে নিশিখিনী, তাহে তরুচ্ছায়া ঘন,  
 শুধু তার কঠোর, দিলীপের মত,  
 নিরর্থক বালিকা আমি বুঝিব কেমনে  
 তার এই বড়বড় ? রাত্রিটুকু সেখা  
 চাহিছ থাকিতে, তাও দিলনা থাকিতে ।  
 তারপর ব্যাঘ্র চর্ম্মে আবরিয়া দেহ  
 নরাধম, এই স্থানে আক্রমিল মোরে ।  
 বিপদে পড়িয়া আমি ডাকিছ শঙ্করে,  
 যুদ্ধে কৈ নরাধম তেয়াগিয়া সেই  
 ব্যাঘ্র চর্ম্ম, শিবরূপে আসিল সম্মুখে,  
 কত কথা বসি পুনঃ লইল টানিয়া  
 হৃদে মোরে, আমি ভয়ে করিছ চীৎকার  
 উঠেছরে, সেই করে আসিয়াছ তুমি ।”  
 যুবক আবার তারে করিলা জিজ্ঞাসা  
 “কোন্‌ বুদ্ধি বলে তুই আইলি এখানে  
 একাকিনী, না বলিয়া কিছুই আমারে ?”  
 “অমর” ঘোমটা টানি কহিল হিরণ  
 “আজি প্রাতে বলেছিল জ্যোৎস্না আমারে  
 আগামী মঙ্গলবার অমাবস্তা রাত্রে  
 দিলীপ বসিতে তোমা করেছে প্রতিজ্ঞা  
 যা চণ্ডীর পূজা দিয়া দেবীর মন্দিরে ।  
 আমি কোরে তাকি করে আজই নিশিতে

পূজা দিলে হিরমস্তা দেবীর মন্দিরে  
 কল্যাণ হইবে তব, অমঙ্গল সব  
 কেটে যাবে, এসেছি তুই পূজা দিতে ;  
 বলার সময় আমি পাইনি তোমারে ।”  
 অমরেন্দ্র পুনর্বার কহিল তাহারে  
 “যাই হক পূর্বাছুই আমাকে এ সব  
 বলা ত উচিত ছিল ? না ব’লে এভাবে  
 আসা ত সঙ্গত নহে কদাপি এখানে ?  
 এখন ত সর্বনাশ হয়েছিল তোমার,  
 যদি নাহি আসিতাম কি হত উপায় ?”  
 হিরণ তাহারে পুনঃ করিলা জিজ্ঞাসা  
 “কেমনে জানিলে তুমি এসেছি যে আমি  
 এই স্থানে ?” অমরেন্দ্র কহিল তাহারে  
 “তুই যবে এসেছিলি, তার কিছু পর  
 যে যে বস্তু সাথে নিয়ে কামাচ্ছ দিলীপ  
 এসেছিল ছুটে ক্ষত তোর পাছে পাছে,  
 কালীতারা বলেছিল সে কথা আমারে ।  
 ভেবেছি মনে আমি নিশ্চয় দিলীপ  
 আক্রমিবে আজি তোরে একাকী পাইয়া  
 এ নির্জন পার্বত্য কানন এদেশে ।  
 তাই আমি এই পথে এসেছি ছুটে  
 উদ্ধারিতে তোরে এই আসন্ন বিপদে ।  
 চল্‌ এবে হিরমস্তা দেবীর মন্দিরে,  
 কোথা যাব এত রাত্রে ? কি সাহসে তুই  
 এসেছিলি ? চারিদিকে ঘোর অরণ্যানী  
 হিংস্র জন্তু বাসস্থল, যাইলে এখন  
 মারা যাব সিংহ কিংবা ব্যাঘ্রের কবলে ।  
 কালি প্রাতে যাব মোরা যোগাঙ্গমে চলি  
 আজ নিশি বাসিগে সে দেবীর মন্দিরে,  
 চল্‌ তবে ।” উভয়েই গেল চন্দ্রাবতীর  
 সে মন্দিরে, জন প্রাণী নাহি কেহ-কোথা ।

নিজের নির্জন স্থান, সব একাকার  
কিছুই না দৃষ্টি হয়—কেবলি আবার।  
অমর আলিলা অগ্নি ধরিয়া অরপি,  
নিরখিলা পুরাতন সে ভগ্ন মন্দিরে  
প্রস্তরে গঠিত এক হিরণ্যময় মূর্তি  
ভয়ঙ্কর, রক্ত দ্বারা লোহিত প্রস্তরে।  
পদতলে ছুটি মূর্তি,—পুরুষ রমণী  
জঘন্য কুৎসিত ভাবে গঠিত প্রস্তরে।  
পাশের একটা ঘরে মাহুর পাতিয়া  
উভয়ে সমস্ত নিশি করিলা যাপন  
জে'গে জে'গে নানারূপ কথা আলাপনে;  
উঠি প্রাতে উভয়েই গেলা যোগাশ্রমে,  
সন্ন্যাসীর কাছে যেয়ে কহিলা অমর  
“গুরুদেব, গতকল্য একাকী হিরণ  
গিয়াছিল বনে, তারে নির্জনে পাইয়া  
করেছিল আক্রমণ পাষণ্ড দিলীপ;  
আমি ছিলাম কিছু দূরে, আত্মনাদে তার  
গিয়াছিলাম ছুটে তথা বিহ্যতের বেগে।  
আমারে দেখিয়া পাপী গেল পলাইয়া  
উর্দ্ধ্বাশে, আমি তারে নারিলাম ধরিতে।”  
সন্ন্যাসী ক্রোধাক্ত চিত্তে করিলা জিজ্ঞাসা  
হিরণে “তোমার সঙ্গে কি শত্রুতা তার?  
কেন সে তোমারে বনে একাকী পাইয়া  
করেছিল আক্রমণ?” বিনম্র বচনে  
উত্তরিলা মত মুখে হিরণ তাহারে  
“গুরু দেব, ব্যাঘ্র চর্মে আবরিয়া দেহ  
শিব রূপে, আক্রমণ করেছিল যোরে  
দিলীপ, সতীত্ব মোর করিতে হরণ।  
ব্যাঘ্র দেখে ভয়ে আমি দিয়াছিলাম দৌড়,

কিন্তু সে পাষণ্ড মোরে ধরিয়া সবলে  
কত যে প্রবোধ বাক্যে ভুলাইতে মোরে  
করেছিল চেষ্টা, আমি ভুলিনি তাহার  
প্রলোভনে, তার পর চীৎকারে আমার  
অমরেন্দ্র দ্রুত বেগে যাইয়া সেখানে  
ক'রেছে উদ্ধার মোরে, দেখিয়া তাহারে  
সে পাষণ্ড উর্দ্ধ্বাশে গেছে পলাইয়া  
সে নিবিড় বনমাঝে।” কহিলা সন্ন্যাসী  
বুঝেছি সকলি আমি, নিলম্বের মত  
পাষণ্ড আমার কাছে বিবাহ প্রস্তাব  
করেছিল একদিন হিরণের সনে।  
কালী কে \* জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম আমি  
হিরণের ভাব নাই দিলীপের সনে  
ক্ষণ তরে, সে তোমারে ভালবাসে সদা  
অমর, তুমিই তার স্বামী উপযুক্ত;  
যদিও সন্ন্যাসী আমি, কামনার লেশ  
নাহি হৃদে মোর, তবু পবিত্র প্রেমের  
মর্যাদা আমিও বুঝি, তোমরা উভয়ে  
ভালবাস পরস্পরে, কামনা-কলুষে  
নহে তাহা কলঙ্কিত, দোহেই দোহার  
শুভাকাঙ্ক্ষী, নহে ব্যগ্র মিলনের তরে।  
জগতে ছলভ ইহা, এ প্রেম পবিত্র  
স্বর্গীয় জিনিষ, ইহা বিধাতার দান।  
তোমাদের এ পবিত্র প্রেম-পুরস্কার  
কি দিন? সন্ন্যাসী আমি পুরস্কার তার  
দিবু এই—চিরতরে বাঁধিলাম উভয়ে  
স্নেহের কুসুম ডোরে বিবাহ-বন্ধনে।  
হিরণ যখন তুমি মৃত্যু শয্যা পরে  
ছিলে যোর অচেতন বিকারের ঘোরে;

সে সময় একমাত্র শুভকার তুমি  
 অমরের, পেয়েছিলে নূতন জীবন ।  
 তেঁবে দেখ তোমার সে নব জীবনের  
 একমাত্র কর্তা সেই, তারি হস্তে তোমা  
 দিহু সঁপে, আজি হস্তে স্বামী সে তোমার ।  
 পবিত্র চরিত্র তার দেবতা সদৃশ,  
 তোমার কঠোর মালা পরায়ে তাহার  
 জী-কঠে, প্রণাম কর স্বামী ব'লে, তারে ।”  
 সন্ন্যাসীর কথা শুনে, হিরণের মুখ  
 হইল রক্তিম বর্ণ, হিরণ তখন  
 কঠ হস্তে ধুলে তার রক্তাক্ত মালিকা \*  
 পরায়ে অমর-কঠে সলজ্জ বদনে  
 প্রণাম করিলা তারে, তার পরে তারা  
 মহারাষ্ট্র-গুরুদেবে করিলা প্রণাম ।  
 স্থাপিয়া অমর-হস্তে হস্ত হিরণের  
 সন্ন্যাসী প্রকৃত চিন্তে লাগিলা কহিতে  
 “আত্মকর্মান করি দোহে পবিত্র জীবন  
 যাপিও, ভুলনা কতু পাপের কুহকে ।  
 এ সংসার কন্ম তুমি যে বীজ রোপিবে  
 ফল তার অমররূপ লভিবে নিশ্চয়,  
 সে যে স্ব স্ব কন্মফল অবশ্য বুঝিবে,  
 অদৃষ্ট তাহারি নাম অস্ত কিছু নয় ।  
 কিন্তু এক ভর মোর হইতেছে মনে,  
 রক্তাক্ত মালিকা দিয়া হিরণ যখন  
 হ'ল আজি স্বরূপী, পরিণাম এর  
 নাহি জানি তোমাদের কি আছে অদৃষ্টে  
 এ ভগতে, ভর হস্তে ভবিষ্য জীবনে  
 রক্তের সাগরে বুঝি ডালিবে তোমরা,

তাহারি অগ্রিম চিহ্ন দেখিলাম আজি ।  
 বাহা হ'ক, ভাবিরা তা' লাভ নেই কিছু, \*  
 এ বিশেষ প্রাক্তন লিপি কে খণ্ডাতে পারে ?  
 বিশেষতঃ মহারাষ্ট্র মেতেছে সংগ্রামে  
 মোস্তেমের সনে, বুদ্ধ অনিবার্য্য এবে ।  
 যতদিন মুসলমান না হবে নিশ্চিহ্ন  
 ভারতের বন্ধ হতে, হিন্দুর কল্যাণ  
 নাহি হবে, বুঝি তা' অনেক চিন্তিয়া ।  
 আজি হতে এ পবিত্র আশ্রমে আমার  
 কামাক্ষ দিলীপরাও নাহি পাবে স্থান ।  
 তবে ছুট লুকাইয়া থাকি দূরে দূরে  
 হিরণে সন্মোহন মত নিতে পারে হ'লে,  
 সেই মোর একমাত্র আশঙ্কা এখন ।  
 অতএব এ আশ্রমে রাখা এবে তারে  
 অসঙ্গত, বিশেষতঃ বিবাহের পর  
 স্ত্রী পুরুষ কেহ নহে থাকিতে এখানে  
 অধিকারী ; গৃহাশ্রম তাহাদের তরে ।  
 ' অনূচ অনূচ তরে যোগাশ্রম বাছা ।  
 তোমরা সংসার বন্ধ্য পালিবে এখন  
 বিধি মত ; বাণাশ্রম নহে গৃহী তরে ।  
 হিরণের কঠ স্থান শুধু হলে তুমি  
 নিরে যে'ও পত্র মম স্মরণ নগরে,  
 বিপ্রদাস নামে মোর শিষ্য আছে সেখা,  
 তারি কাছে পত্র দিয়া রাখিও হিরণে  
 সেই স্থানে, তার পর ভুক্ত হ'য়ে তুমি  
 মহারাষ্ট্র সৈন্য দলে, করিও উদ্ধার  
 মোস্তেমের হস্ত হতে হুঃখিনী ভারতে !  
 আমার প্রধান নিষ্ঠ তুমিইছ বাছা,

\* সিংহীন যখন সারিকামে মন্দির অরলো হিরণকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই সময়ে বুদ্ধ যুগে সামান্য আঘাত  
 আনিয়া হিরণের মস্তক হইতে ক্রিষ্ণ রক্ত বাহির হইয়াছিল, সেই রক্তই এই মালিকা রক্তিত হইয়াছিল ।

রীতি মত তোমারেই সমর কোশল—  
—শাস্ত্র আর অস্ত্র বিজ্ঞা শিখায়েছি আমি।  
তোমারি মতন আরো বহু শিষ্যে আমি  
শিখায়েছি অস্ত্র বিজ্ঞা, তাহাদের সাথে  
থাকিয়া বীরের মত যুদ্ধেও সমরে।  
বীর তুমি, কোন্ ভয় মরণে তোমার ?  
অসি হস্তে রণস্থলে ধরিয়া প্রবেশ  
মস্ত মাতঙ্গের মত দলিও চরণে  
মোস্তেমের সৈন্ত বৃন্দে, করিতে উদ্ধার  
স্বর্গ সম গরিয়সী জননী ভারতে।

যে দিন পারিবে বাছা এ কার্য সাধিতে,  
সেই দিন তোমাদের শুভ পরিণয়  
করিব সম্পন্ন আমি মহা আড়ম্বরে  
সেই মহা রণাঙ্গনে—সে মহাশ্মশানে।”

হিরণ সপ্তাহ পরে লভিলে আরোণ  
সন্ন্যাসীর পত্র আর আশীর্বাদ সহ  
অমর তাহারে ল'য়ে সুরাট নগরে  
গেলা চলি,—জ্যোৎস্না হেথা ডুবিল আধারে।



## চতুর্থ সর্গ

[সাহোরে প্রান্তদেশ, — জোহরা বেগমের কুত্র-কুটীর]

সাহোরের প্রান্তদেশে উজান ভিতরে  
বসিয়া একটি কক্ষে কহিল। কাতরে  
এব্রাহিম “বাই তবে জোহরা এখন ?  
শত্রুদের বড়যন্ত্রে হইরাছি আমি  
পদচ্যুত, কত স্থানে করেছি ভ্রমণ  
কতদিন, কোন্‌স্থানে হল না চাকরী।  
কি করিব, দায়ে ঠেকে করেছি গ্রহণ  
মারাঠা-দাস আমি অদৃষ্টের দোষে।  
কমা কর মোরে, আর দিও নাক বাধা,  
বাই এবি মহারাষ্ট্রে পেশবার কাছে,  
তোমাতে দেখিতে শুধু মাসেকের তরে  
এসেছি বিদায় নিয়ে, চল সঙ্গে মোর  
সেই দেশে ; উভয়েই র’ব এক সাথে।  
তোমাতে ছাড়িয়া সেখা থাকিতে আমার  
কি যে কষ্ট, তুনি তাহা বুঝিবে কেমনে ?”

জোহরা সজল নেত্রে কষ্ট ধরি তার  
কহিল। “এ কথা তুমি বলনা আমারে।  
যাবনা সে দেশে আমি, তুমি গেলে তখা  
তোমাতে ছাড়িয়া আমি থাকিব কেমনে  
একাকিনী ? প্রাণনাথ দিবনা বাইতে  
মহারাষ্ট্রে, পারে ধরি কমা কর মোরে।”  
এব্রাহিম মুখ নেত্রে নিরখি তাহার  
অশ্লীলিত রূপরানি, রহিল চাহিয়া  
তার পানে, বন্ধ তার পড়িল চলিয়া  
কুতূহলের মালা লম্ব জোহরা বেগম।  
এব্রাহিম সুহৃৎ করে কহিল তাহারে

“না গেলে কোথায় পাব অন্ন বস্ত্র আমি ?  
কি দিয়ে করিব আমি তোমাতে পোষণ ?”  
ছাড়া’রে সজোরে তার বাহর বন্ধনী  
মুহুর্তে জোহরা তার স্বর্ণ-ভূষা গুলি  
দিল। আনি বাক্স সহ স্বামীর চরণে ;  
কহিল। সে “এ সকল করিয়া বিক্রয়  
যাহা পাও, প্রাণ নাথ সব মেও তুমি।”  
উত্তরিল। এব্রাহিম বিরক্তির ভাবে  
“ছি জোহরা স্বামী হয়ে কোন্‌ মুখে আমি  
খুলিয়া তোমার এই দেহের ভূষণ  
নিব আজি ? কোন্‌ স্বামী করে এ কুকার্য  
ধরাতলে ? স্বামী যে, সে বসনে ভূষণে  
সাজায় ভার্য্যারে তার ; ল’ব কি কাড়িয়া  
তোমার দেহের ভূষা স্বামী হ’য়ে আমি ?”

উত্তরিল। সুধাস্বরে জোহরা বেগম  
“চাইনে এ সব আমি, কি কাজ আমার  
অলঙ্কারে ? স্বামী তুমি, তুমিই আমার  
অলঙ্কার, তব সম কে আছে আমার  
ধরাতলে ? প্রাণ নাথ নারীর নিকটে  
সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার স্বামীই জগতে।  
পিতৃদেব দিয়াছিল। যে সব যৌতুক  
বিবাহ-সময়ে, তাও দিলাম তোমাতে।  
ইহাতেই কেটে যাবে জীবন মোদের,  
তবু মহারাষ্ট্রে তোমা দিবনা বাইতে  
দস্যুর দাস পুনঃ করিতে গ্রহণ।  
বিধবার দেশ উহা পাপে তাপে ভরা,  
নাহি সেখা ধর্ম দেশ, সন্তত তাহার

করে পাপ অনুষ্ঠান, সে দেশী লোকের  
নাহি দয়া মায়া, তারা পুত্র সমান।  
ইসলাম বিদ্রোহী, তারা সর্বনাশ য়োর  
করেছে জনকে মম করিয়া হনন  
আদিনার \* পরামর্শে লাহোর সমরে।  
অতএব প্রাণনাথ মিনতি আমার  
যে'ওনা সেদেশে তুমি, দাসত্ব তাদের  
ছেড়ে দেও ; ধর অসি স্বদেশের তরে।  
আমরা মোস্লেম জাতি, ইসলামের তরে  
দিব প্রাণ অকাতরে, ধর্মের নিকটে  
প্রাণ ত অতীব তুচ্ছ, কেন তবে ছিছি  
অর্থের লাগিয়া ধর্ম করিব বিক্রয় ?  
কোন্ প্রাণে তুমি নাথ মোস্লেম হইয়া  
মারাঠা দাসত্ব ত্রুত ক'রেছ গ্রহণ ?  
ইসলামের মহানিষ্ঠ হবে না কি ইথে ?  
পায়ে ধরি, যেওনা সে কাকেরের দেশে  
ঘৃণিত দাসত্ব আর করিতে গ্রহণ ?  
এই শেষ ভিক্ষা মম চরণে তোমার।  
যাও যদি না মানিয়া নিষেধ আমার,  
পবিত্র ইসলাম যাবে ডুবিয়া অতলে।  
সে কলঙ্ক প্রাণ নাথ ঘুচাবে কেমনে ?  
স্বামী তুমি—প্রভু তুমি, সংসার-অর্ণবে  
তুমি মোর জীব তারা, কলঙ্ক তোমার  
নারিব দেখিতে আমি থাকিতে জীবন।  
একান্তই তুমি যদি মোস্লেম বিপক্ষে  
ধর অসি, কি করিব আমি তব দাসী,  
তোমার কলঙ্ক রাশি শোণিতে আমার  
প্রক্ষালিব, ইহা মোর শেষ আকিঞ্চন।  
স্বামীর কলঙ্ক আমি দেখিব কেমনে

\* আদিনা বেসের

সত্যি হ'রে ? সত্যি তাহা পারে কি দেখিতে ?”

জোহরা স্বামীর বকে লুকাইয়া মুখ  
লাগিলা কাঁদিতে, রক্ত বেদনা প্রাণের  
অঙ্গ রূপে বাহিরিল নয়নের পাশে।  
এব্রাহিম মুখ তার ধরিলা তুলিয়া  
সাদরে, নয়ন ছুটি মুদিলা জোহরা  
—নিশির শিশির সিক্ত যেন কমলিনী,  
সাদরে বীরেন্দ্র তার চুস্থিলা অধরে।  
জোহরা আবার তারে কহিলা কাতরে  
“কও নাথ কথা মোর রাখিব না তুমি ?  
সে বারো আমার কথা না শুনিয়া তুমি  
গিয়াছিলে মহারাষ্ট্রে আজিও কি যাবে ?”  
এব্রাহিম উত্তরিল। সজল নয়নে  
“প্রিয়তমে, ক্ষমা কর, নিমক হারাম  
নহি আমি, যার অঙ্গে এ দেহ আমার  
হ'য়েছে বর্জিত, তার বিপক্ষে কেমনে  
যাইব এখন আমি ? হেন অমুরোধ  
করিও না ভার্য্যা হ'য়ে, এ মোর মিনতি।  
তোমার সমস্ত ধন দিতে চাই তুমি ;  
নারীর সাহায্য আমি লইব না কভু,  
যতক্ষণ দেহে মোর থাকিবে জীবন।  
হেন কাপুরুষ তুমি ভেবনা আমারে ;  
যাই প্রিয়ে।” এব্রাহিম বিদ্রোহ গতিতে  
তথা হ'তে ক্ষিপ্পদে করিলা প্রস্থান।  
প্রস্তর মূর্তি প্রায় জোহরা বেগম  
রহিলা দাঁড়ায়ে তথা ক্ষণেকের তরে।  
তার পর কোষ হতে মুক্ত করি অসি  
কহিলা গভীর স্বরে চাহি উর্দ্ধ পানে  
“হে বিভূ করুণাসিদ্ধ পতিত পাবন

স্বামীজীঃ নাকী তুমি—প্রতিজ্ঞা আমার  
যে আমি করিছ মুক্ত কোব হতে আমি,  
করিব না বন্ধ তাহা, যতদিন আমি  
স্বামীর কলঙ্ক নাথ নারিব ধুইতে  
মস্তে মোর, না পারিলে মোস্তেম রমণী

নহি আমি—নহি বীরের গৃহিনী ।  
ব্যর্থ না হইবে মোর থাকিতে জীবন  
এ প্রতিজ্ঞা, তুমি নাথ শক্তির আধার ।”  
বন্ধ বন্ধ করি আমি উঠিল বলিয়া  
হস্তে তার,—উষালোকে বিছাড়ের মত ।

---

## পঞ্চদশ সর্গ

[ ছোট নগর, -জলী নদী-তীর, বিদ্রোহের কূটর ]

একাগ্র মনে বিধি পঠিতে লাগিল।  
 পত্রখানি, অমরেন্দ্র দাঁড়ারে অদূরে ;  
 হিরণ পশ্চাতে তার ; পাঠান্তে সে পত্র  
 কহিল। অমরে বিধি “গুরুর আদেশ  
 নিরোধার্থ, ধর্মপত্নী হিরণ তোমার  
 থাক সে এখানে, আমি পরম যতনে  
 রাখিব তাহারে, তুমি আসিবে যখন  
 তখনি পাইবে তারে এ গৃহে আমার ।  
 অমর কহিল। তারে বিনয় বচনে  
 “তোমার এ অনুগ্রহে হইল কৃতার্থ  
 মহাশয়, তবে আমি কবে যে আসিব  
 পারিব না বলিতে তা, নিশ্চয় তোমারে ।  
 কেননা গুরুর আজ্ঞা ল’য়ে শিরোপরে  
 আসিয়াছি সাধিতে তা’ বহুদিন হবে ।  
 হিরণ রহিল হেথা, কত। সম তারে  
 রাখিও, আসিতে নারি যতদিন আমি”  
 “অবশ্য সে কথা মোরে হবে না বলিতে”  
 কহিল। তাহারে বিধি, হিরণের পানে  
 চাহিয়া কহিল। পুনঃ “যাও মা, হিরণ  
 গৃহ মাঝে, সেথা তব জননী যে আছে ।”  
 সলাজে হিরণ বালা করিল। প্রণাম  
 বিধির পদীরে যে’য়ে গৃহ অভ্যন্তরে  
 সসজ্জমে ; আশীর্বাদ করিল। সে তারে ।  
 তারপর বিদ্রোহ অমরের সনে  
 আলাপিল। স্বদেশের নানাবিধ কথা  
 বহুতর ; কহিল। সে “গুরুর আদেশে  
 মহারাষ্ট্র রণরঙ্গে উঠেছে মাতিয়া ।  
 বোধ হয় মুসলমান পারিবে না আর

রক্ষিতে তাদের এই রত্ন সিংহাসন  
 স্বীয় বলে, হেন কোন বীরেন্দ্র এমন  
 নাহি আর সে সমাজে যুঝিতে সমরে ;  
 রমণীর রূপার্ণবে বিলাসিত। স্রোতে  
 শৌর্য্য বীৰ্য্য সবি তারা দিয়াছে ভাসা’য়ে ;  
 যারা আছে, তাহারাও কাপুরুষ হবে ।”  
 অমরের মুখ খানি হইল রক্তিম  
 তার বাক্যে মুহুর্তে কৈ আশ্রয় সংবরণ  
 করিয়া সে, ভাবিল। “তা, দেখা যাবে পরে ।”  
 আবার কহিল। বিধি “শিবাজী যে রাজ্য  
 স্থাপিয়াছে বাহু বলে, সে রাজ্য কি কত  
 দিতে পারে মহারাষ্ট্র হেলায় ছাড়িয়া  
 মুসলমানের ? বীর তারা, এক বিন্দু রক্ত  
 যতক্ষণ থাকিবে এ মহারাষ্ট্র দেহে  
 হটিবে না যুদ্ধে তারা, ভেবে দেখ ভাই  
 মুসলমান অত্যাচারী, অত্যাচারী রাজা  
 রাখিতে নারিবে রাজ্য আপন অধীনে  
 বহুদিন, বিধাতার ঘোর অভিশাপে ।  
 আজি হ’ক কালি হ’ক হইবে পতন  
 তাহাদের, বিধাতার অলঙ্ঘ্য নিয়মে ;  
 ইহাতে সন্দেহ নাই দেখিবে অচিরে ।”  
 অমরের কটিদেশে ঝগন করিয়া  
 উঠিল বাজিয়া আসি, অজ্ঞাতে তখন  
 স্পর্শিল। সে আপনার কপাল ভীষণ ।  
 বিদ্রোহ দীর ভাবে কহিতে লাগিল।  
 “মহারাষ্ট্র ধর্মপ্রাণ, ধর্মের লাগিয়া  
 যুঝিবে, কি চিন্তা তার ধর্মের সমরে ?  
 চারি বর্ষ হ’ল, তারা শক্তি আপনার

লক্ষ্যে কত চেষ্টা করিতেছে সদা ;  
 এরি মধ্যে বহু সৈন্য করিছে সংগ্রহ ;  
 বোধ হয় অচিরেই সমগ্র ভারতে  
 মহারাষ্ট্র বৈজয়ন্তী উড়িবে নিশ্চয় ।”  
 অমর কহিল। হেঁসে “অসম্ভব ইহা  
 মুসলমান শক্তিশালী, নহে কাপুরুষ  
 পরাক্রমে তাহাদের কম্পিত ধরিত্রী ;  
 মহারাষ্ট্র কোন্ বলে হনে সম্মুখীন  
 তাহাদের ? আমি ইহা না পারি বুঝিতে ;  
 এত শক্তি মহারাষ্ট্র লভেনি এখন ।  
 বহু রক্ত পাত হবে, লক্ষ লক্ষ সৈন্য  
 ত্যজি প্রাণ রণস্থলে চির নিদ্রা যাবে,  
 তথাপি সন্দেহ জয় হয় কিনা হয় ।  
 আজিও সামান্য সৈন্য, একই কুংকারে  
 বাবে উড়ে মোস্তেমের তোপের সম্মুখে ।  
 সংগৃহীত হলে আরো সৈন্য বহুতর  
 তবে যদি মোস্তেমের তোপের সম্মুখে  
 বুক পেঁতে একবার পারে দাঁড়াইতে,  
 সে আশীও বহুদূর, বোধ হয় মোর  
 পাঁচ বছরেও তাহা হবে না পূরণ ।  
 কেমনে বুঝিবে ইহা ? অস্ত্র ব্যবসায়ী  
 নহ তুমি, তব পক্ষে গোরা তা’ কঠিন ।  
 সৈনিক হইলে তবে পারিতে বুঝিতে  
 রণ-নীতি, এ যে বড় সমস্তা কঠিন ।”  
 তারপর আহা রাস্তা বিধগ্ন বদনে  
 অমর বিদায় নিয়ে সকলের কাছে  
 হিরণে নির্জনে ডাকি কহিল। সাদরে  
 “হিরণ এখন আমি বেঁতে পারি তবে ?  
 লক্ষদশ বর্ষ দেবি থাকি এক সঙ্গে  
 যোগাযোগ, কত কিছু ব’লেছি ব’কেছি,

করেছি কত না রাগ কত কথা নিয়ে,  
 তবু তুমি একবার কওনি আমারে  
 কোন কথা, ক্ষণ তরে হওনি বিরক্ত  
 মম পরে, আজি প্রিয়ে সে কথা স্মরিয়া  
 কেঁটে যায় হৃদি মোর,—কমিও আমারে ।  
 তব হৃদি হৃদে নিয়ে চলিলাম দেবি  
 বড়ই কঠিন কার্য্য—দেশের কল্যাণে ।  
 রেখ মনে, দেখা হবে যদি বেঁচে থাকি ।’  
 ক্রমালে মুছিয়া অশ্রু বিবাদে অমর ;  
 হিরণের চক্ষু ছুটি গেল ভেঁসে জলে  
 নীরবে কাঁদিলা বালা ; সাদরে অমর  
 মুছিয়া নয়ন তার আপন ক্রমালে ।  
 অজ্ঞাতে অধর তার পড়িল মুইয়া  
 হিরণের পুষ্প সম রক্তিম অধরে ;  
 পুষ্পের উপরে পুষ্প মরি কি সুন্দর  
 উঠিল ফুটিয়া যেন সৌন্দর্য্য-কাননে ।  
 উভয়েই সংজ্ঞা হারা, পড়িল গড়ায়ে  
 ছই বিন্দু প্রেম-অশ্রু মুকতার মত  
 হিরণের হৈম গণ্ডে—অমর নয়নে ।  
 ক্ষণ পরে উভয়েই লভিল। চেতনা ।  
 অমরের কণ্ঠে ধরি আকুল হৃদয়ে  
 কাঁদিয়া কহিল। বালা সকলকণ স্বরে  
 “অমর আমায় তুমি ভুলনা জীবনে ?  
 দাসী বলে মনে রেখ—মিনতি চরণে ;  
 তুমি ভিন্ন এ জগতে কে আছে আমার ?  
 শৈশব হইতে থাকি তব সাথে সাথে  
 এ হৃদয় তব সনে গিয়াছে মিশিয়া  
 চিরতরে, আজি আমি ভুলিব কেমনে ?  
 যত শীঘ্র পার তুমি আসিও আবার,  
 এ দাসী থাকিবে তব পথ পানে চেয়ে ।”  
 অমর চলিয়া গেলা, হৃৎধিনী হিরণ  
 রহিল। হৃৎলে পড়ি মনের বিবাদে ;  
 বসন ভিজিয়া গেল নয়নের জলে ।

## ষোড়শ সর্গ

[ সেতারা, রত্নজীর গৃহ ]

“সৌন্দর্যের মহাসিদ্ধ সে স্বর্ণ প্রতিমা”  
কহিল। যাদব রাও সন্মিত বদনে,  
“দেবতা বিমুক্ত হেরি সে মুখ-চন্দ্রমা  
তুলনা নাহিক তার এ তিন ভুবনে ।  
সে সৌন্দর্য-সে লাবণ্য নহে পৃথিবীর,  
স্বর্গীয় পদাধ তাহা পার্থিব সৌন্দর্য  
তার কাছে অতি হেয়, কি দিব তুলনা ?  
—গগনে চন্দ্রমা, আর ভূতলে কুসুম  
এ দুই তাহার কাছে ঘোর বিমলিন ।  
ঘন কৃষ্ণ কেশ গুচ্ছ তরঙ্গে তরঙ্গে  
হলে সেই পৃষ্ঠ দেশে আজানুলব্ধিত ।  
মুখখানি অতি সুস্বী, সদা হাসি মাখা,  
যেন সত্ত্ব প্রসুতিত গোলাপ কুসুম ।  
ওষ্ঠদ্বয় রক্তবর্ণ, নিশ্বাসে তাহার  
গোলাপের গন্ধ, স্বর কোকিলের ধ্বনি ।  
সেই হাসি মাখা মুখে—সৌন্দর্য-কাননে  
চঞ্চল নয়ন দুটি সুধা-নিষ্করিনী ।  
কি ছার ছাহার কাছে সৌন্দর্য ধরার ?  
সে যেন এ ধরাভূলে স্বর্গীয় রতন,  
তুলনা নাহিক তার, রত্নজীর সনে  
মিলিবে সুন্দর যেন রতনে কাঞ্চন ।  
রত্নজী এ রূপ রাশি হেরিলে নয়নে  
। ডুবিয়া যাইবে সেই সৌন্দর্য-সাগরে ।  
লবঙ্গের কথা আর পড়িবে না মনে  
কুটিবে প্রীতির উৎস হৃদয় কন্দরে ।”  
বিষাদে মলিন মুখে রত্নজী জননী  
কহিল। কান্দর কণ্ঠে লজ্জল নয়নে

“কে জানে হৃদয়ে প্রীতি হ’বে কি না হবে ?  
অশান্ত যুবক সে যে, কিছুই বুকে না  
সংসারে নিম্পূহ, সদা বিষন্ন বদনে  
কি যে ভাবে, মাঝে মাঝে ফেলে দীর্ঘশ্বাস,  
পরিণয়ে অনিচ্ছুক, অশনে বসনে  
সতত সজল আঁখি, ভ্রমেও কখন  
হাসির কনক রেখা ফুটে না সে মুখে ।  
নিশীথ সময়ে কভু শয্যা ত্যাগিয়া  
একাকী চলিয়া যায় কৃষ্ণ নদী তীরে ।  
‘লবঙ্গ লবঙ্গ’ বলে কভু ঘুম-ঘোরে  
কৈদে উঠে, সদা ব্যগ্র ভ্রমিতে বিদেশে ।  
কত দেশ কত স্থান করিয়া ভ্রমণ  
তব মনে, বাছা মোর এসেছে সে দিন ।  
আবার যাইতে ইচ্ছা, বল দেখি বাছা  
কি ক’রে ফিরাই তারে ? কত বুঝাইল  
অরণ্যে রোদন সব, নির্বোধ যুবক  
মানে না সে বাধা মম, আমি অভাগিনী  
কেমনে ধরিব প্রাণ বাছার বিহনে ?”

“কি চিন্তা জননি ?” হেসে কহিল। যাদব,  
“উপায় করেছি স্থির রণদার সনে  
বাঁধিলে বিবাহ পাশে, এ জীবনে আর  
বৈরাগ্যের কথা কভু আনিবে না মুখে ।  
কি সাধ্য রত্নজী তারে হেরিলে নয়নে  
যাইবে বিদেশে ? মাগো অসম্ভব আশা,  
এমনি সুন্দর সে যে, এমনি কোমল,  
তুলনা নাহিক তার, দেবতা বাহিত



মন্ডার পুষ্পের মত, সুধাংশুর সম  
 শিখ রূপরাশি, কুল পঙ্কজের মত  
 কোমলতা ভরা সেই স্বর্ণ-দেহ খানি ;  
 —ভূতলে মানবী রূপে স্বর্গীয় কুসুম ।  
 কেমনে উপেক্ষা করি এ স্বর্ণ রতনে  
 রত্নজী ত্যজিবে গৃহ—হইবে সন্ন্যাসী ?  
 স্নেহের কুসুম-ডোরে বাঁধিবে যখন  
 শিখরের পাখী প্রায় রহিবে ঘুরিয়া  
 সতত এ মায়াময় সংসার শিখরে ।”  
 নীরবিলা যত্নরাও, চিন্তিত হৃদয়ে  
 রহিলা নীরবে বসি রত্নজী-জননী ।  
 কণ পরে তুলি মুখ कहিলা আবার  
 “সত্য কথা, কিন্তু বাছা সে মায়া-বন্ধন  
 ছিড়িলে, সে হুঃখিনীর কি উপায় হবে ?  
 “অনর্থক আমি এক কুসুম-কলিকা  
 ছিঁড়িয়া অযত্নে কেন শুকাইব তারে ?”  
 অসম্ভব তাহা,” স্থির গভীর বদনে  
 कहিলা যাদব রাও “মানব জীবনে  
 সাধ্য কি ছিঁড়িতে সেই স্নেহের বন্ধন ?  
 গুরুকর্ম কিরূপ দেব অপারগ যাহে ?  
 অকস্মাৎ বাধা দিয়া कहিলা আবার  
 রত্নজী জননী, মুখ বিষাদে মলিন,  
 “বাছা তোর কথাগুলি নহে অসঙ্গত,  
 বুঝি তাহা, কিন্তু আমি চিন্তার সাগরে  
 ভাসমান, ভালমন্দ বুঝিব কেমনে ?  
 ভয় হয়, পাছে মোর নিজ বুদ্ধি দোবে  
 মহেশ গড়িতে যেন না গড়ি বানর ?”  
 উত্তরিলা হানিমুখে যাদব আবার  
 “না জননী, সে সম্বন্ধে নির্ভর হৃদয়ে  
 ভিষ্ট ছুমি, কেন বুঝা চিন্তার সাগরে

ভাসিতেছ ? আর সেই বিপদ ভঞ্জে ।  
 প্রতিভু তাহার আমি, ভেঁব নাক ছুমি।”  
 উৎসাহে कहিলা পুনঃ রত্নজী জননী  
 “বাও বাছা, সব তার অর্পিণু তোমারে,  
 পাত্রী সহ আন যেয়ে বসন্ত রঞ্জে,  
 শুভ পরিণয় বাছা হইবে সম্পন্ন  
 এইখানে রত্নজীয়ে দিবনা বাইতে  
 কোলাপুরে, নারী আমি ভয় হয় পাছে  
 কি জানি সে যদি আহা কঁাকি দিয়া মোরে  
 যায় পালাইয়া, আমি কোথা পা’ব তারে ?  
 অন্ধের নয়ন বাছা রত্নজী আমার,  
 মুহুর্তে সে মুখ চন্দ্র না দেখিলে আমি  
 কেমনে রহিব ঘরে ? অই মুখে মম  
 জীবনের সুখ শান্তি স্নেহ সাধ আশা  
 রয়েছে নিহিত, বাছা না দেখিলে তারে  
 কেমনে বাঁচিবে এই হুঃখিনী জননী ?  
 আজি পঞ্চ বর্ষ, আহা জনক তাহার  
 স্বর্গবাসী, সেই হ’তে হুঃখিনী বিধবা  
 যতপ্রায়, শুধু এই রত্নজী আমার  
 আলোকের স্তম্ভ এই আধার জীবনে ।”  
 নিরাশা ব্যথিত নেত্রে গড়িল বরিয়  
 অশ্রু রাশি, হেমন্তের শিলিরের মত  
 মলিন প্রকৃতি মুখে,—কাঁদিলা হুঃখিনী ।  
 হেনকালে দাসী এক প্রবেশিয়া গৃহে  
 कहিলা সন্ত্রমে “মাগো রত্নজী তোমারে  
 আহ্বানিছে, এস শীঘ্র বিলম্ব না সহে ।”  
 অমনি উঠিয়া ধীরে জননী তাহার  
 মেজা চলি কক্ষান্তরে, বসিয়া নীরবে  
 ভাবিতে লাগিলা যত, “যদিও রত্নজী  
 শত্রু বলে ভাবে মোরে তবু কিন্তু আমি

সুতত মঙ্গল তার করিব সাধন  
প্রাণপণে । কিন্তু আমি দিবনা জানিতে  
কে এ বালা ? এই মাত্র জানাইব তারে  
সৌন্দর্যের মহাসিদ্ধ সে স্বর্ণ প্রতিমা ।  
বিবাহান্তে এ রমণী রত্নজী যখন  
নিরখিবে, কি ঝটিকা হৃদয়ে তাহার  
বহিবে ?—ভাবিবে হৃদে সকলি স্বপন ।  
কিন্তু পুনঃ স্থির নেত্রে আবার যখন  
নিরখিবে, সেই মূর্তি, মস্তিষ্ক তাহার  
প্রান্তির অতল গর্ভে যাইবে ডুবিয়া ।  
সে মুহূর্তে দর্প ভরে দেখাইব তারে  
যাদব কেমন শত্রু ; আত্মগ্রানি তার  
হবে না কি সে সময়ে ? বুঝিবে তখন  
না জে'নে সন্দেহ করা অধর্ম কেমন ?  
তাহারি মঙ্গল আশে সিকুজীর গৃহে

গিরাহিষু এক দিন জানিতে তাহার  
কি বাসনা, তাই আজি লাহিত এমন ।  
তাহারি মঙ্গল ভরে ব'লেছিষু তারে  
ভাজিতে লবঙ্গ আশা, ভুলিতে তাহারে ;  
তাই আজি শত্রু আমি, থিক্ মানবেয়ে,—  
—উপকারে—অপকার প্রতিদান যদি ।”  
চলিলা যাদব রাও, পশ্চাত হইতে  
আবার ডাকিলা তারে রত্নজী-জননী ।  
কিরিলা যাদব, গৃহে প্রবেশিলা পুনঃ  
পুণ্যময়ী, স্নেহ-ধরে কহিলা তাহারে  
“যাও বাছা, আন যে'য়ে সে স্বর্ণ কুসুম  
এই স্থানে অবিলম্বে, এ পুণ্য মাসের  
গুরু দশমীর নিক্ত পুণ্য রজনীতে  
এ শুভ বিবাহ যেন হয় সম্পাদিত ।”

## কল্পদশ সপ্ত।

[ দিল্লীর প্রান্ত ; যমুনাভীর ; জোহরা বেগমের গৃহ ]

দিল্লীর অমতিদূরে যমুনা সৈকতে  
কূল কূল সুশোভিত নিকুঞ্জ কামন  
সুনিজন-মনোলোভা মধুর দর্শন ।  
চারি দিকে কুঞ্জবন, মধ্যে অষ্টালিকা,  
সম্মুখে সুদীর্ঘ সরঃ শোভিত সুন্দর  
রাশি রাশি রক্ত নীল কুমুদ-কল্যানে ।  
সরসীর চারিধারে সুশুভ্র প্রান্তরে  
গঠিত সোপানাবলী, কত পুষ্প-তরু  
সুশোভিত শ্রেণীমত কেয়ারি ভিতরে ।

সায়াকু ; রক্তিম ভানু পশ্চিম পশমে  
ডুবু ডুবু, তরু শিরে সুবর্ণ-কিরণ ।  
একটি জীবন্ত পুষ্প কোটো কোটো যেন,  
অথবা লাবণ্যময়ী কনক-প্রতিমা  
সৌন্দর্যের মহা মণি, সুনীল বসনে  
সুসজ্জিত, অস্তোমুখ ভাস্কর-কিরণ  
পড়ি' সেই স্বর্ণ মুখে, হৈম কলেবরে  
কি এক অপূর্ব কাস্তি ক'রেছে ধারণ ।  
মহাবীৰ্য্যময়ী বামা, ভীক ভরবারি  
কটি দেশে, শৌর্য্য বীৰ্য্য সৌন্দর্য্যের সনে ।  
আসাদের শীর্ষ দেশে ছাদের উপরে  
দাঁড়াইয়া মুকুট প্রাণে সে স্বর্ণ-কুমুদ  
নিরখিছে যমুনার শোভা অল্পমম ।  
অদূরে যমুনা অই ঘাইছে বহিয়া  
“কুসু কুসু” ডানে, হৃদে তরল কাকন ।  
সহসা সোলগুন আসি কহিল তাহারে  
“নাহি জানি কোথা হতে যুবক একটি

একাকী আসিতেছিল। এই বন-পথে ;  
বোধ হয় দিল্লীর সে কোন সেনাপতি ।  
তিন জন আততায়ী দস্যু নরাধম  
আসি চুপে চুপে সেই যুবকের পিছে,  
করেছে আঘাত তারে পশ্চাৎ হইতে  
উড়ানোর বহির্ভাগে যমুনার তীরে ।  
সে আঘাতে ধরাশায়ী হয়েছে যুবক,  
ছুটিয়াছে রক্ত-স্রোত অজস্র ধারায়  
রক্তিয়া বসন তার, সবাই মিলিয়া  
করিতেছে টানাটানি ধরিয়া তাহারে  
কেলিতে যমুনা জলে ।” শুনি এ সংবাদ  
পুরুষের বেশে বামা হইয়া সজ্জিত  
গেলা চলি মুহূর্ত্তে কে দস্যু সন্নিধানে ।  
ক্রোধ ভরে বীর বামা কহিল। গর্জিয়া  
“নরাধম, এত স্পর্দ্ধা । আমরি সম্মুখে  
নর হত্যা । ফিরে আর হবেনা ঘাইতে  
গৃহ পানে, এই স্থানে হইবে এখনি  
প্রায়শ্চিত্ত, কর্ম ফল ভুগিবি নিশ্চয়,  
স্বর জগদীশে ।” বলি সিংহিনীর-মত  
আফালিয়া বীর বামা ভীষণ বিক্রমে  
আক্রমিল। একবারে দস্যু তিন জনে ।  
পাষণ্ডেরা বহুক্ষণ বুঝিলা সজোরে  
প্রাণপণে : কিন্তু তারা নারিল সহিতে  
বামার সে বীৰ্য্য-বহি-অশনি ভীষণ ।  
অসি গুলি অগ্নি-কণা করিয়া বর্ষণ  
খণ্ড খণ্ড হ'য়ে ভূমে পড়িল ছিটিয়া ।  
মহা ক্রোধে বীর বামা বিছাড়ের বেগে

মারিলা সুভীক্ৰ অসি দম্ভ্য এক জন  
 দ্বিখণ্ডিত হ'য়ে ভূমে পড়িল গড়ারে,  
 অস্ত্র দম্ভ্য ভীম বলে সংকলিয়া অসি  
 মারিল রমণী-শিরে, বলমূল করি  
 নামিল সে ভীক্ৰ অসি বিছাডের মত,  
 কি শিক্ষা কোর্শলে বামা অসির এহারে  
 নিবারিয়া সে আঘাত মারিলা সজোরে  
 তরবার, সে প্রচণ্ড কৃপাণ আঘাতে  
 হইল ভূতলশায়ী দম্ভ্য সেই জন।  
 হেরি সঙ্গীদের দশা দম্ভ্য অস্ত্র জম  
 পলাইল ক্ষতবেগে, উৎসাহে সে বামা  
 কহিল তখনি ডাকি বাদি গোলশনে  
 “শীঘ্র ঘে'য়ে বল তুমি ভূত্যেরে আমার,  
 শিবিকা বাহক নিয়া আসিতে এখানে।”  
 ভূত্য তার ক্ষণ পরে আসিল সেখানে  
 শিবিকা বাহক সহ; আহত যুবকে  
 উঠা'য়ে সে যান পরে, গেলা চলি সবে  
 প্রাসাদের সুসজ্জিত এক কক্ষ মাঝে।  
 অচেতন যুবা, নাহি চিহ্ন জীবনের  
 ছন্দ পিণ্ডে, মুখখানি কালিমা মণ্ডিত।  
 যুবার অবস্থা দেখি তখনি সে বামা  
 আদেশিলা ভূত্যে এক আনিতে ডাকিয়া  
 হেকিম গোলামি রবে, তখনি সে ভূত্য  
 গেলা চলি ক্ষত বেগে আনিতে হেকিমে।  
 ক্ষণ পরে দাসী এক বামার নিকটে  
 দিল আনি পত্র এক, নিরখিয়া তাহা  
 কহিল বিশ্বরে বামা দাসীরে তখন  
 “মরিয়ম, কোথা পেলে এই পত্র তুমি?”  
 উত্তরিল দাসী অতি বিনয় বচনে

“নিহত দম্ভ্যর বক্ষে কীথা ছিল ইহা,  
 পেয়েছি সে রণ-স্থলে যেখানে সে হত।”  
 তখনি সে পত্রখানি পড়িলা রমণী।  
 ছিল লেখা “একমাত্র ভরসা মোদের  
 তুমিই আদিলা বেগ, তব দয়া বিনে  
 আমাদের এই কার্য্য হ'বেনা সাধিত  
 শুনিমু ছরশী সাহা আসিবে ভারতে  
 পুনর্ব্বার, সে হৃৎকর্ষ পাবণের সনে  
 কেমনে যুঝির মোরা ভয় হয় মনে।  
 তোমারি কৃপায় পত লাহোর সমরে  
 পাজাব লড়িয়াছিমু, কিন্তু ভাগ্য-দোষে,  
 আর সেই নারকীয় ছরশী সাহার \*  
 প্রতিকূল আচরণে ঘোর ক্ষতিগ্রস্ত  
 হইয়াছি, এইবার মোস্লেম-সাম্রাজ্য  
 করি কংস প্রতিশোধ লইব তাহার।  
 এ ছরহ কার্য্য তব সহায়তা বিনে  
 কেমনে সাধিব বল? তোমারি উৎসাহে  
 মোস্লেম বিরুদ্ধে অস্ত্র ক'রেছি ধারণ।  
 বিধাতার অল্পগ্রহে, জয়ী হ'লে মোরা।  
 প্রদানিব তব করে দিল্লী সিংহাসন।  
 এ প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ কতু হবেনা মোদের,  
 দাক্ষিণাত্য নিয়ে শুধু সুখী হব মোরা।  
 তোমারি স্বার্থের জন্ত সে সকল শ্রম  
 করিব, যে কষ্ট মোরা সহিব জীবনে  
 রণ-ক্ষেত্রে। মূল্য তার কি দিবে মোদেরে?  
 নাহি চাহি বন রত্ন বিনিময়ে তার  
 পাজাব মোদেরে তুমি করিও প্রদান,  
 ইহা ভিন্ন আমাদের নাহি অস্ত্র আশা।  
 আর এক কথা ভাই অমরেন্দ্র নামে

\* ইনি কাবুলের অধীশ্বর, ইহার নাম আব্দুল্লাহ সাহু জাঙ্গদারী অথবা আব্দুল্লাহ সাহু দুরানী।

একটি স্বজাতিজোহী পাবও বর্ষর  
আমাদের দল ছেঁড়ে ছ'বৎসর হতে  
মিশেছে মোস্লেম সনে ; গুপ্ত কথা যত  
আমাদের, হতভাগ্য গিয়াছে জানিয়া,  
বহুজানে সে পানিঠে খুঁজেছি আমরা  
গুপ্তভাবে, না পাইবু কোথাও তাহারে ।  
বোধ হয় হতভাগ্য হিন্দু বেশ ছাড়ি  
মোস্লেম সৈনিক বেশ করেছে ধারণ ।  
যেই স্থানে পাবে তারে, অসুরোধ মোর  
খণ্ড খণ্ড করে তারে ফেলিবে কাটিয়া ।  
দিলীপ নামেতে এক সৈন্য আমাদের  
চিনে তারে, এই সঙ্গে পাঠাইবু তারে ।  
সে তোমাদের এ সম্বন্ধে করিবে সাহায্য  
প্রাপণে, বহু কার্য্য হইবে উদ্ধার  
তারে দিয়া, তব কাছে রাখিও তাহারে ।"  
পত্র প'ড়ে রমণীর প্রাণের ভিতরে  
ভীষণ রোষাগ্নি যেন উঠিল অলিয়া  
ভীত ভেজে, ক্রুদ্ধ ভাবে কহিলা গর্জিয়া  
"মরিয়ম" এই নেও পত্র দম্ভাদের,  
কে'লে দেও ইহা ঘোর অলস্তু অনলে ।"  
রমণীর চক্ষু হুটি অনলের মত  
অলিতে লাগিল ক্রোধে, ভাবিতে লাগিলা  
মহারাষ্ট্র ?—কাপুরুষ দম্ভ রাজজোহী  
মহারাষ্ট্র ?—আর সেই নরকুল রানি  
সদাশিব ?—যার নাম করিলে অরণ  
এখনো উপড়ে যুগা, সেই দম্ভাদল  
খেলিতেছে এ চাতুরি, ভেবেছে কখনে  
মোস্লেম-সাম্রাজ্য ধ্বংস করিবে তাহার ।  
বুধা সে হুসনা, বতদিন এ অগতে

রহিবে জীবিত এই জোহরা বেগম,  
কি সাধ্য তাদের, ধ্বংস করিতে এ রাজ্য ?  
অগদীশ সাকী, আমি করিহু প্রতিজ্ঞা  
এক বিন্দু রক্ত-কণা যতক্ষণ ক্ষুদে  
বহিব, ধ্বংসিবে সেই রাজজোহীগণে ।  
ইহা যদি নাহি পারি রাখিব না আর  
এ জীবন, নহি আমি বীর কুলধন  
মেহেঁদি বেগের কস্তা জোহরা বেগম ।"  
মুহুর্তে রক্তাক্ত অসি উঠিল অলিয়া  
করে তার, সর্ব্ব অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল  
ক্রোধভরে, ক্ষুদে তার উঠিল অলিয়া  
প্রতিহিংসা-বহু, বামা ভাবিতে লাগিলা  
ক্রুদ্ধ মনে, 'দম্ভাদের চক্রান্তে পড়িয়া  
হারিয়েছি পিতা ভ্রাতা জননী আমার ।  
নারীর দেবতা স্বামী, তা'ও হারিয়েছি ।  
ভাগ্য দোষে, দম্ভাগুলি বুধা প্রলোভনে  
ভুগাইয়া আমারে সে পতি এতাহিমে ।\*  
ধরিয়াছে তাহাদের সেনাপতি পদে ।  
বুঝি আর তাঁর সনে হইবে না দেখা  
এ জীবনে, কি করিব মোস্লেম হইয়া  
বিধর্ম্মীর দাসত্ব সে করেছে গ্রহণ ;  
তাহাদের পক্ষ হ'য়ে মোস্লেম সাম্রাজ্য  
ধ্বংসিতে সে ধরিয়াছে কপাণ ভীষণ ।  
এত নিবেধিহু তারে, তবু তনিল না  
বাধা মম, পাপ-পঙ্কে হ'ল নিমগ্নন ।  
পরী আমি, ঘুচাইতে না পারিহু যদি  
পাপ তার, বুধা তবে আমার জনম ।  
তাই এ প্রতিজ্ঞা মম, পোণিতে আমার  
রণক্ষেত্রে করিব সে পাপ প্রক্ষালন ।

\*এতাহিম কাশি, ইনি মহারান্ট পক্ষের সেনাপতি ।

সকলি গিয়াছে মোর, শুধু একা আছি,  
কি কল বহিয়া তবে এ পাপ জীবন ?  
জন্মিলে নিশ্চয় মৃত্যু, ভয় কি তাহাতে  
জোহরা ত নহে ভীক, স্বধর্মের তরে  
মরিতে মুহূর্ত সে ত ডরেনা কখন ?  
ভাদ্রতীয় মোস্মেমের করি উত্তেজিত  
ধর্ম যুদ্ধে জালাইব যে ঘোর অনল,  
ভস্মীভূত হ'বে তাহে পাষণ্ড সকল ।  
এ কার্যে নজিবদৌলা সহায় আমার,  
পেশবা বিপক্ষে সে যে ধরিয়াছে অসি,  
আসিছে ছুরাণী সাহা ভারতে আবার ।”

হেন কালে দাসী এক নিবেদিল আসি  
“হেকিম গোলাম রব উপস্থিত দ্বারে।”

“নিয়ে এস” বলি বামা যবনিকা পাশে  
গেলা চলি, অবিলম্বে পশিলা হেকিম  
কক্ষ মাঝে, স্থির দৃষ্টে আহত যুবকে  
নিরখিয়া কিছুক্ষণ, বাঁধিলা যতনে  
ক্ষতস্থান ; প্রদানিয়া মহৌষধ কিছু,  
কহিলা ভিষকবর “প্রতি যামে যামে  
প্রদানিও, এ রোগীর জীবন সংশয়,  
বোধ হয় বহু যত্নে বাঁচিতেও পারে ,  
রীতিমত পরিচর্যা না হলে ইহার  
মৃত্যু অনিবার্য ; আমি প্রভাতে আসিয়া  
ব্যবস্থিত ঔষধাদি করিব প্রদান ।”  
“সাধ্যমত পরিচর্যা হইবে নিশ্চয়”  
উত্তরিয়া যুত্ম্বরে জোহরা বেগম ।  
হেকিম প্রণমি তারে করিলা প্রস্থান ।

— — —



## অষ্টাদশ সর্গ

[ দিল্লীর প্রাচীনেশ ; যমুনা তীর ; জোহরা বেগমের গৃহ ; আতাখাঁর বীচা ]

জোহরার বহু যত্নে লভেছে আরোগ্য  
মোস্লেম যুবক এবে, হয়েছে সবল  
দুর্বল শরীর তার ; কিন্তু দিব্য নিশি  
জোহরার স্নেহ যত্ন, স্বজাতির দুঃখ  
স্মৃতি-পথে উদ্দি' তারে করিছে বিহ্বল ।  
উত্তানের পার্শ্বে এক কক্ষের ভিতরে  
যুবক আনন্দ মুখে রয়েছে বসিয়া  
কাষ্ঠাসনে, মুখ খানি গভীর চিন্তায়  
কালিমা মণ্ডিত, যুবা বসিয়া নীরবে  
ভাবিছে অনেক কথা, “কতদিন আর  
রহিব এখানে আমি কাপুরুষ প্রায়  
ভুলিয়া ধর্মের কার্য—কর্তব্য আপন ?  
যখন আহত দেহে মৃত্যু শর্যা' পবে,  
হিলাম শায়িত আমি, জোহরা বেগম  
জ্ঞাত নিব্বিশেষে আহা কত না যতন  
ক'রেছে সতত মম শুশ্রূষার তরে ।  
সে যদি করিত হেলা, নিশ্চয় এ প্রাণ,  
ভুলিয়া যাইত মহা কালের সাগরে ।”  
যুবকের হৃদি মাঝে শ্রোতঃস্বর্তী প্রায়  
কত না চিন্তার ধারা চলিল বহিয়া ।  
যুবার পশ্চাতে আসি বাদী গোলশন  
দাঁড়াইল, স্থির চিত্তে দেখিতে লাগিল  
ভাব তার, কণ পরে সম্মুখে আসিয়া  
বলিল সহাস্র মুখে “কেন ডাই তুমি  
আজি এত বিমলিন ? কি চিন্তা-কণিনী  
করেছে লগ্নন আজি হৃদয়ে তোমার ?”  
যুবক সম্মুখ নেত্র কহিতে লাগিল

“গোলশন, সে যাতনা বলিব কাহারে ?  
কে বুঝিবে এ হৃদয়ে যে অগ্নি ভীষণ ?  
দুর্বল রমণী যাহা না পারে সহিতে,  
মোস্লেম সেনানী হ'য়ে কাপুরুষ প্রায়  
কেমনে সে দৃশ্য আমি দেখিব নয়নে ?  
বিজোহী পেশবা, আর দম্ভ্য সদাশিব  
অসংখ্য সৈনিক বৃন্দ করি সংগৃহীত  
উচ্ছেদিতে রাজ শক্তি মহা পরাক্রমে  
হইয়াছে অগ্রসর সময় প্রাগণে ।  
মোস্লেম রমণীবৃন্দে নৃশংসর প্রায়  
পথে ঘাটে অন্তঃপুরে যেখানে সেখানে  
ধরিয়া লাজনা দিয়া শত বেত্রাঘাতে  
করিতেছে জর্জরিত ঘোর অত্যাচারে ।  
তারা এবে মৃতপ্রায় দুঃখে ও সরমে ।  
'সে দৃশ্য দেখিলে হৃদে অনলের উৎস  
উঠে অগ্নি, ছুটে রক্ত বিছাভের বেগে ।  
বল তবে কোন্ প্রাণে—কোন্ প্রাণে হায়  
দেখিব সে দৃশ্য আমি বসিয়া নীরবে  
যে জাতি দম্ভ্যতা করি ভারত-হৃদয়ে  
দিনে দিনে, মাসে মাসে, সপ্তাহে সপ্তাহে  
ঢালিছে এ গরলাগ্নি, নাহি কি ভারতে  
হেন বীর, তাড়াইতে সে পামণ দলে ?  
স্পর্শিয়া কোরান তাই করেছি প্রতিজ্ঞা  
লইব সে প্রতিশোধ বধিরা কাকেরে ।—  
—বধিরা সে রাজজোহী পেশবা তব্বরে ;  
পিতৃ সমতুল্য রাজা, যে জাতি হটক  
পুজাই ; রাজার ধর্ম প্রচার কি কতি ?

হ'ক না সে হিন্দু কিংবা ইহুদী খুঁটান  
কতি কি ? পিতার মত মানিব রাজার, বিপক্ষে  
প্রজা হ'য়ে যে পাবও রাজার বিপক্ষে  
ধরে অসি, তার সম নরাকৃতি পশু  
কে বিবে, শোধিতে তার রক্তিব ধরনী ।  
সম্রাটের প্রজা হ'য়ে ক্ষুদ্র সদাশিব,  
নগণ্য পেশবা, আরো বহু মহারাষ্ট্র  
জ্ব'লেছে বিজোহ-বহু ভস্মিতে অচিরে ।  
ভারতীয় মোস্লেমের রাজ-সিংহাসন ;  
ভাবিতে এ কথা হায় শিহরে হৃদয়  
কে আছে মোস্লেম হেন এ বিশ্ব মাঝারে,  
নীরবে এ পাপ দৃশ্য দেখিতে যে পারে ?  
শিরায় শিরায় যার অনলের কথা  
নাহি হয় প্রবাহিত বিছাতের বেগে ?  
সঁপেছি জীবন মম এই মহাত্মিতে  
মরি বাঁচি হুঃখ নাই,—রক্ষিব ইসলামে ।  
মলয় গিরির গুপ্ত নির্জন প্রদেশে  
যোগাশ্রমে ভৈরবী ও মহারাষ্ট্র গুরু  
নিবসয়ে, সে পাপিষ্ঠ করি সংগৃহীত  
বলিষ্ঠ যুবক যত, শিক্ষা দেয় সবে  
অস্ত্র বিদ্যা, তারপর পাঠায় তাদের  
মহারাষ্ট্র সৈন্ত দলে । আমিও সেখানে  
থাকি বহু দিন, সব করেছি দর্শন  
কুকার্য তাদের ; বহু সন্ন্যাসী সৈনিক  
আছে তার, বহু স্থানে মহারাষ্ট্র দেশে ।  
তহি আমি নানা স্থানে করিয়া ভ্রমণ  
সমগ্র মোস্লেম জাতি করি উদ্বেজিত  
পেশবা বিপক্ষে, আমি অগণিত সৈন্ত  
করিয়াছি সংগৃহীত, গিয়াছে তাহার।  
হুগাণী সাহার কাছে, স্বধর্মের তরে

যুঝিতে সম্মুখ যুদ্ধে মহারাষ্ট্র সনে ।  
যুগয়া করিতে এসে পড়ে ছিন্ন পাছে  
তাহাদের, তাই আমি দস্যুদের করে  
হ'য়েছি সেইদিন আক্রান্ত ভীষণ ।  
গোলশন, কতদিন রহিব বসিয়া  
হেন ভাবে ?—তুলি সেই কর্তব্য আপন ?  
মুহূর্ত্ত হৃদয় আর ভিষ্ঠেনা এখানে,  
জোহরা বিদায় দিলে যে'তেম চলিয়া  
হুগাণী সাহার কাছে মোস্লেম শিবিরে ।  
জোহরার ঋণ আমি নারিব শোধিতে  
এ জীবনে, সে আমার জীবন দায়িনী,  
আমি ভ্রাতা, সে আমার স্নেহের ভগিনী ।”  
“তিষ্ঠ তুমি ক্ষণকাল” বলিয়া গোলশন  
গেল চলি, ক্ষণ পরে জোহরা বেগম  
সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ লয়ে দাঁড়াইলা আমি  
কপাটের পাশে, যুবা দাঁড়াইলা উঠি  
সমস্ত্রমে, স্মিত মুখে কহিতে লাগিলা  
“ভগিনি, বিদায় দাও যাইব শিবিরে,  
বোধ হয় এ জীবনে তোমার সে ঋণ  
নারিব শোধিতে আমি, এই হুঃখ হায়  
সতত আমার মনে ।” তখনি জোহরা  
বাধা দিয়া স্নান কর্ণে কহিতে লাগিলা ।  
“এত শিষ্টাচার কেন ? ভগিনীর হুঃখ  
বীর যেই, সে কি কভু পারেনা যুচাতে ?  
আতর্কী, বীরেন্দ্র তুমি, সাজেনা তোমার  
হেন কথা, তুমি মোরে ভগিনীর মত  
স্নেহ কর, ধর আজি পুরস্কার তার  
এই তরবারি—এই সুতীক্ষ্ণ কৃপাণে  
মম শত্রু—পিতৃশত্রু—ইসলাম ধর্মের  
শত্রু—শত্রু স্বদেশের যে নয় পিশাচ,

বধি তারে, তার সেই উত্তপ্ত শোণিতে  
 আমার প্রাণের আশা কর নিবারণ ।  
 কে সে পানী জান তুমি ?—সে নর পিশাচ ।  
 পেশবা বিজোহ-নেতা, সেনাপতি তার  
 সঙ্গাশিব, আরো বহু কাফের বর্ষর ।  
 পারিবেনা ?—বল ভাই পারিবেনা তুমি  
 বিনাশিতে রাজজোহী পেশবা তব্বরে ?  
 তুমি কি বীরেন্দ্র নহ, তব ভূজ ধরে  
 নাহি শক্তি ?—নহ তুমি বীর সেনাপতি ?  
 পার যদি, ধর এই সুতীক্ষ্ণ কুপাণ,  
 এখনি প্রতিজ্ঞা কর, একটি কাফের  
 থাকিতে জীবিত, তুমি ফিরিবে না আর  
 গৃহপানে, পারিবে না করিতে বিবাহ  
 এ জীবনে, যেই দিন সম্মুখ সমরে  
 সমস্ত মারাঠা সৈন্য পারিবে বধিতে :

সেই দিন—সে যুগ্ম বৃষ্টিব নিশ্চয়  
 তুমি মোরে স্নেহ কর, বৃষ্টিব সে দিন  
 আমি ভগ্নী, তুমি ভাই, বিধাতার স্নেহে  
 এক বস্তুে ছিটি পুষ্প—প্রাণের সমান ;  
 সেই দিন তুমি ভাই করিও বিবাহ ।  
 অন্তথা সমর ক্ষেত্রে নিজা যে'ও তুমি !  
 বর্ষিবে শোকাঙ্গ-ধারা তব সে শ্মশানে  
 নিশি দিন তোমার এ দুঃখিনী ভগিনী ।”  
 গেলা চলি বীর বামা ; স্তম্ভিতের প্রায়  
 রহিল। দাঁড়ায়ে সেই অসি হস্তে নিয়া  
 আতর্ষা, ভাবিলা হৃদে “হইলু দীক্ষিত  
 জোহরা তোমার কাছে ; ফিরিব না আর  
 গৃহাশ্রমে ; করিব না বিবাহ জীবনে,  
 যদি না ধ্বংসিতে পারি সমস্ত কাফেরে ।”  
 বিছাৎ গতিতে যুবা করিলা প্রস্থান ।

## উনবিংশ সর্গ

[ যমুনা তীর ; জোহরা বেগমের গৃহ : নজীবদৌলার দীক্ষা ]

সুদৃশ যমুনা তীরে সুরমা প্রাসাদে  
জোহরার, সমাসীন মলিন বদনে  
বীরেন্দ্র নজীবদৌলা মর্ম্মর আসনে  
মনোহর ; কুলসুম করিছে বাজন  
নীরবে দাঁড়ায়ে তথা ; অদূরে জোহরা  
বসিয়া পর্য্যাক পরে করিলা জিজ্ঞাসা  
কোমল মধুব কণ্ঠে “এত বিমলিন  
কেন আজি হেরি তোমা হে বীর কেশরি ?”  
উত্তরিল। শ্রান মুখে নজীব তাহারে  
“কি আর বলিব দিদি, জেরিণা আমারে  
বুঝি হায় চিরতরে যাইবে ছাড়িয়া।”  
“কি হয়েছে জেরিণার ?” জিজ্ঞাসিলা বামা,  
বীরেন্দ্র ক্রমাৎ চক্ষু মুছিয়া কহিলা  
“মূচ্ছা রোগে সে যে আজি অর্ধ যুত প্রায় ;  
যদি সে ডুবিয়া যায় কালের সাগরে  
ভাগ্য দোষে ; তবে মোর কি কল বাঁচিয়া ?  
সেই হুঃখে প্রাণ মোর বড়ই অস্থির,  
সে মোরে ছাড়িয়া গেলে বাঁচিব না আমি,  
জেরিণা যে পথে যাবে, যাইব সে পথে।  
সংসারের সাধ আর নাহি মম মনে।”  
পথিকের পদ-স্পর্শে কাল ভুজঙ্গিনী  
উঠে যথা গরজিয়া, তেমতি সরোষে  
জোহরা আরক্ত নেত্রে উঠিল। গর্জিয়া  
“কি বলিলে কাপুরুষ, রমণীর প্রেমে  
প্রাণ দিবে ? কোন্ মুখে আনিলে এ কথা  
বীর হ’রে ? শত বিক জীবনে তোমার।”  
ছি ছি ছি, রোহিলা বীর নজীবের মুখে

তনিব এ পাপ কথা ভাবি নাই মনে  
কণ তরে, বীর বংশে জনম তোমার,  
ভুলিয়া সে পূর্ব কথা, কামুকের প্রায়  
ডুবালে কি সে গৌরব রমণীর প্রেমে ?  
রোহিলা-কলঙ্ক তুমি, শত্রু স্বদেশের  
কি কাজ জীবনে তব ? কেন বেঁচে আর  
বাড়াও পাপের বোঝা ? এ পাপ-জগতে  
মরিতে কি কালকূট পে’লেনা খুঁজিয়া ?  
রমণীর প্রেম ভিন্ন নাহি কি জগতে  
অন্য কোন কাজ তব ? বিজোহীর অঙ্গে  
ধর্ম্ম গেল—দেশ গেল—গৌরব সম্মম  
সকলি যে গেল, আর তুমি কিনা হার  
তুচ্ছ রমণীর প্রেমে এত আত্ম হারা ?  
জেরিণার কথা আর আনিওনা মুখে,  
বীরের সম্মান হ’য়ে ভুলিয়া কর্তব্য  
রমণী-প্রেমের জন্ত কেন লালায়িত ?  
এই কি বীরের ধর্ম্ম ? যে জাতি জগতে  
সহস্র অক্ষয় কীর্ত্তি ক’রেছে স্থাপন,  
সেই রক্ত হৃদে ল’য়ে—কাপুরুষ তুমি,  
তুচ্ছ রমণীর প্রেমে এত উচাটন ?  
পবিত্র মানব জন্ম শুধু কি জগতে  
পাখিব স্নেহের জন্ত ? পুরুষের জন্ম  
শুধু কি জগতে পাপ করিতে বর্ধন ?  
ইন্দ্রিয় সেবার জন্ত জন্ম কি নারীর  
ধরাতলে ?—না না। ভুল, শত ভুল তব,  
মানব জন্মের গূঢ় উদ্দেশ্য যে আছে  
বিশ্ব রাজ্যে, জগদীশ যে গূঢ় উদ্দেশ্যে

পবিত্র মানব জাতি করেছে সৃজন  
 সে কথা কি ভুলে গেছ ? সুপথ ছাড়িয়া  
 যে'ওনা কুপথে কড় থাকিতে জীবন ।  
 আর নারী জাতি ? তারা এ জৈব জগতে  
 মহামণি, মানবের অশান্ত হৃদয়ে  
 শান্তি দিতে বিধাতার প্রীতি-নিষ্করিনী !  
 ভোগ বিলাসের বস্তু কামের পুতুল  
 নহে তারা, বিধাতার এ বিশ্ব ভুবনে  
 জন্ম শুধু বীর পুত্র করিতে এসব  
 জগতের মঙ্গলার্থে, ধ্বংসি পাপ রাশি  
 বিধাতার শুভ কার্য্য করিতে সাধন ।  
 ভুলিয়া সে তব, কেন পাপ আচরণে  
 কলঙ্কিত করিতেছ পবিত্র জীবন ?  
 স্বধর্ম অক্ষুন্ন রাখি জীবন প্রাপ্তরে  
 যাইবে গন্তব্য পথে, জ্ঞানের আলোকে  
 নিরখিয়া ভাল মন্দ শ্রায় ও অশ্রায়,  
 পাপ-পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম দেখিবে তখন  
 ভাসিয়া উঠিবে তব চক্ষুর সম্মুখে ।  
 পরের অনিষ্ট-চেষ্টা মহাপাপ ভবে,  
 পর উপকার ধর্ম্ম, কিন্তু তাই বলি  
 ছুটরে প্রজ্ঞা দিতে শাস্ত্রে নাহি বলে ।  
 ছুটরে দমন, আর শিষ্টের পালন  
 ইহাই শাস্ত্রের বিধি,—কর্তব্য তোমার  
 মহারাষ্ট্র পশুগণ ঘোর অত্যাচারে  
 নিপীড়িয়া তোমাদের জননী-ভগিনী  
 কষ্টা-জায়া, অসহায় আশ্রয় বাক্যে  
 যে কষ্ট দিতেছে সদা তোমার হৃদয়ে,  
 তার প্রতিশোধ তুমি নিবে না কি তবে,  
 বীর তুমি, বীর ধর্ম্ম কর আচরণ,  
 কেন রমণীর প্রেমে হ'য়ে আত্মহারা

বীরের সমুজ্জল মর্ম্মর প্রাসাদে  
 করিতেছ কলকে কালিয়া লেপন ?  
 খোল অগ্নি, রণস্থলে হও আগুয়ান ।  
 স্বধর্ম্মের—স্বজাতির—স্বদেশের হিতে  
 দেও হৃদয়ের রক্ত—কর প্রাণ দান ।  
 প্রেম বল, অর্থ বল, সকলি অসার,  
 জীবনের সার ধন ধর্ম্ম আপনার ।  
 রক্ষি সেই নিজ ধর্ম্ম জীবন সংগ্রামে  
 চলিবে বীরের মত, বধি আত্মবলে  
 কাম ক্রোধ লোভ মোহ মাৎসৈর্য্য ভীষণ ।  
 বীর যেই, সে কি কড় রমণীর প্রেমে  
 হয় আত্মহারা ? সে যে তুচ্ছ গণে প্রাণ ।  
 স্বজাতির হিতব্রতে ধর্ম্মের সমরে !—  
 —সে সদা কৃপাণ হস্তে রণ-মদে মাতি  
 স্বদেশের—স্বজাতির—স্বধর্ম্মের তরে  
 যুঝি শত্রু সনে, প্রাণ করে বলি দান ।  
 অবলা রমণী আমি হৃদয় আমার  
 কোমল কুসুম সম, কিন্তু সে হৃদয়ে  
 এত বল, নাহি ডরি দানব-মানবে ।  
 একা মহারাষ্ট্র কেন ? সমগ্র পৃথিবী  
 আমার বিপক্ষে অস্ত্র করিলে ধারণ,  
 অথবা স্বর্গের ইচ্ছা হানিলে দস্তোলি  
 এক পদ না টলিবে জোহরা বেগম !  
 তবে আর কারে ভয় ? জন্মিলে মরণ  
 বিধাতার চির নীতি, দানব মানব  
 কে কবে ক'রেছে তবে এ নীতি লঙ্ঘন ?  
 তবে আর কোন্ হ'ব ?—ভয় কারে ভরে ?  
 সাধিব আপন কার্য্য রক্ষিব মোস্লেমে,  
 কি করিবে মহারাষ্ট্র ?—পেশবা ভদ্র ?  
 প্রতিজ্ঞা—প্রতিজ্ঞা মম সমুখ সমরে

বধি সেই বিজোহীরে, ছিন্ন যুগ তার  
দিব আনি, কিংবা সেই সমর-প্রান্তরে  
তুইব জন্মের মত রক্তাক্ত হৃদয়ে ।  
ইহা যদি নাহি পারি, মেহেদি-হুহিতা  
নহি আমি—নহি আমি মোস্লেম রমণী ?  
যতক্ষণ রক্ত-প্রোতঃ শিরায় আমার  
বহিবে, প্রতিজ্ঞা মোর সাক্ষী রবি শশী  
মারাঠার সত্ত রক্তে প্রাণের তৃষা।  
নিবারিব, উড়াইব শিবাজীর ছুর্গে  
ইসলামের “অর্দ্ধচন্দ্র” গৌরব কেতন ।  
এতে যদি প্রাণ যায়, হুঃখ নাহি তাহে,  
এ প্রাণ ত অতি তুচ্ছ, ধর্ম্মের সমরে  
সতত প্রস্তুত আমি ; কর্তব্য সাধনে  
এ ছদি বজ্রের মত, মোস্লেম রমণী  
নহে ভীক, নহে তারা কুন্সুম কোমলা  
শুকাইবে সূর্য্য করে—ঝরিবে পবনে ।  
তৃণ সম গণে তারা এ পার্থিব সুখ,  
ধন লোভে—প্রেম লোভে হ’য়ে আত্মহারা  
ধর্ম্ম পথ ছাড়ি, কতু অধর্ম্মের পথে  
চলে না, কর্তব্য কাজে সদা আগ্রহান,  
বীর প্রসূ; বীর-পত্নী মোস্লেম রমণী ।”  
নীলবিলা বামা, পুনঃ মুহুর্তের পরে  
কহিল। “বীরেন্দ্র তুমি ধৈর্য্য ধর প্রাণে  
অচিরে জেরিণা সতী হ’রে রোগ হীন।  
পিত্রালয় হতে তাই আসিবে তোমার  
গৃহ-মাঝে, তুমি কেন আশঙ্কা-সাগরে  
ভাসমান ? স্বদেশের অনিষ্ট সাধন  
করিতে উদ্ভট আজি রমণীর প্রেমে ?  
এই দেখ পত্র তার ।” পড়িতে লাগিল।  
জোহরা সে পত্রখানি “বুঝা দোষ দিদি

অভাগীরে, নহে ভীক জেরিণা তোমার ।  
এ জীবন তুচ্ছ গণি স্ব-ধর্ম্মের তরে ;  
জগতে এমন কিছু নাহি হুঃখিনীর  
প্রিয় পাত্র, যার লাগি ত্যজিতে সে পারে  
নিজ ধর্ম্ম, একমাত্র এ ভব সাগরে  
ধর্ম্মই তরণী মোর সহায় সম্পদ,—  
—প্রাণেশ কাণ্ডারি তাহে, তারি পদ সেবি’  
হব উত্তীর্ণ দিদি এ ভব সাগর ।  
রমণীর পতি গুরু, পতি পদ রক্তঃ  
আধার সংসার ক্ষেত্রে আলো সমুজ্জল  
পতির চরণ নিয়ে স্বর্গ রমণীর,—  
—তারে ছাড়ি কেন আমি র’ব পিত্রালয়ে ?  
শীঘ্রই আসিব আমি পতির সদনে,  
নানা রূপ চিন্তা জ্বলে হৃদয় আমার  
জড়ীভূত, মূচ্ছা রোগ হইয়াছে দিদি  
এবে মো’র, যাই হ’ক এ ধর্ম্ম-সমরে  
হবে না বিরোধী দিদি জেরিণা তোমার ।  
বলিও ভাতারে তব, আরাধ্য দেবতা  
সে আমার, চির দাসী আমি সে চরণে ;  
আপন কর্তব্য তুমি সাধ প্রাণপনে ।”  
শেষ হ’লে পত্র পাঠ, জোহরা নীরবে  
কিছুক্ষণ সেই স্থানে রহিল। বসিয়া,  
মলিন বদন তার আঁখি স্তরা জল,  
অভাগিনী ধীরে ধীরে সক্রিয় হয়ে  
কহিল। “নজীব, তুমি সকলি ত জান  
জোহরার মত হার চির অভাগিনী  
বোধ হয় ধরাতলে নাহি কোন জন ;  
পতি মোর বীরপ্রার্থী কুবন বিজয়ী  
মহারাত্রি সেনাপতি, অদৃষ্টের দোষে  
ছাড়িয়া মোস্লেম পক্ষ করেছে গ্রহণ



দস্যুর দাসত্ব, আজি ভাবিলে সে কথা  
 হৃদয়ের তন্ত্রী মোর ছিঁড়ে যায় দাদা।  
 কত বুকাইলু তারে, বুখা চেটে। মম,  
 আমার সে কথাগুলি মুহূর্তের তরে  
 তুলিল না, সব যেন অরণ্যে রোদন।  
 তারি স্মৃতি নিয়ে আমি আছি এ জগতে  
 মরুত্ব জীবন মোর, সেই শাস্তি-ধারা।  
 সে যদি এ ছদি মাঝে শ্রীতি-সিংহাসন  
 না পাতিত, না বসিত দেবেস্ত্রের মত  
 আমার আরাধ্য হয়ে, নিশ্চয় হুঃখিনী  
 অতীতের অন্ধকারে যাইত ডুবিয়া।  
 প্রাণ হ'তে অতি প্রিয় সে জন আমার,  
 কিন্তু যতদিন নাহি ছাড়িবে দাসত্ব  
 কাকেরের, গৃহে তার যাইব না আমি।  
 এজ্জদয়ে যে যজ্ঞ।—যে অগ্নি ভীষণ  
 সতত দহিছে মোরে—কে বুঝিবে দাদা।  
 আমরা সুখের জন্ত দিব না কালিমা  
 কতু, আমি স্বজাতির উজ্জল গৌরবে।  
 প্রাণ যায়, তাও ভাল, তবু স্বার্থ লোভে  
 ধর্ম' বিগর্হিত কার্য করিব না আমি ;  
 তস্ব হ'ক, এ হৃদয়, তেজে যা'ক প্রাণ,  
 ডু'বে যা'ক রবি শশী অকুল সাগরে,  
 তথাপি.—তথাপি আমি করিব না কতু  
 আমার সুখের জন্ত পাপ অমুষ্ঠান ?  
 সত্য বটে, সে আমার প্রাণাধিক-আমী  
 দাসি আমি সে চরণে ; নয়নে আপনে  
 সে আমার এক মাত্র আরাধ্য দেবতা  
 এ জগতে, সে বিহনে হৃদয় আমার  
 হয়েছে শূন্য প্রায় ; তারি পদনিম্নে  
 অতীতের সুখ শাস্তি রয়েছে নিষ্পিত

চিরতরে ; কতবার বুকাইলু তারে  
 তেয়াগিতে সে দাসত্ব, সে নাহি তা' শোনে ;  
 অবলা রমণী আমি কি করিব হায়,  
 নয়নের অশ্রুতির কি আছে আমার।  
 ইসলাম ধর্মের কাছে ঘোর অপরাধী  
 পতি মম, বলিতেও শিহরে হৃদয়  
 মোস্লেম হইয়া সে যে ভৃত্য পেশবার।  
 সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই এ জগতে।  
 তাই এ প্রতিজ্ঞা আমি করেছি হৃদয়ে  
 ইসলাম ধর্মের জন্ত বলি দিয়া প্রাণ  
 সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব বিধান।  
 আর তুমি ?—ছিছি ঘৃণা হয় মনে মোর  
 স্মরিলে তোমার কথা, রমণীর প্রেমে  
 দিতে চাও এ জীবন, কলঙ্ক-কালিমা  
 প্রদানিয়া চিরতরে রোহিলা গৌরবে।  
 এ'স'তুমি বীরবেশে এ ধর্ম' সমরে,  
 আমি ভয়ী তুমি ভাই, এ'স দোহে মিলি  
 দিব প্রাণ রণ-ক্ষেত্রে স্বদেশের তরে।  
 ধর্ম' যায়—দেশ যায়—গৌরব সম্মান  
 সব যায়, ভারতের রক্ত-সিংহাসন  
 যায় যায়,—বুঝি হায় ভাবিবে অচিরে  
 পেশবার পদাঘাতে জনমের তরে।  
 তোমরা মোস্লেম বৃন্দ বিজোহীর করে  
 হবে বন্ধ, পদাঘাতে যাইবে জীবন ;  
 পবিত্র ইসলাম ধর্ম' যাবে রসাতলে।  
 সোনার সাজায়া যাবে বিজোহীর করে  
 কেমনে সহিবে তাহা ? হৃদয় ভেদিয়া  
 প্রচণ্ড অলস বহি হ'বে না নির্গত ?  
 মোস্লেমের পুত রক্ত লইয়া হৃদয়ে  
 ইসলামের অপমান সহিব কেমনে ?

পবিত্র কোরাণ স্পর্শ কর এ প্রতিজ্ঞা  
 স্বধর্মের হিত ত্রতে বলি দিবে প্রাণ।  
 মহারাষ্ট্র পণ্ডদের হৃদয় শোণিতে  
 প্রাণের পিপাসা-বহ্নি করিবে নির্বাণ ;  
 পারিবে না ? —হে বীরেন্দ্র, পারিবে না তুমি  
 হৃদয়ের রক্ত দিয়া করিতে পূরণ  
 ছঃখিনী ভগ্নীর আশা ? তব ও হৃদয়ে  
 মোস্লেম শোণিত যদি হয় প্রবাহিত,  
 এস তবে—হে বীরেন্দ্র, এস তবে আজ  
 স্বধর্মের হিতত্রতে সেনাপতি পদে  
 বরিশু তোমারে আজি—ধর তরবার।”  
 মুহূর্তে নজীবদৌল লইল সে অসি,  
 আবার জোহর। সতী কহিতে লাগিল।  
 “কিন্তু এক কথা দাদা মনে রেখ সদ।  
 রমণী বালক আর পলাতক জন  
 করিও না অশ্রাঘাত ; হয় যদি কভু  
 শত্রুও শরণাগত, ক্ষমিও তাহারে।”  
 আরো এক কথা দাদা, মুখ খানি তার  
 লজ্জায় রক্তিম রাগে হইল রঞ্জিত।  
 ছঃখিনী সজল নেত্রে চাহি ধরা পানে  
 কহিতে লাগিল। পুনঃ আকুলিত কণ্ঠে  
 “তারে কভু অশ্রাঘাত করিও না তুমি,

হে বীরেন্দ্র এই ভিক্ষা চরণে তোমার।  
 সে আমার এ প্রাণের আরাধ্য দেবতা,  
 স্বর্গের সোপান মোর তাহারি চরণ।”  
 ছঃখিনী পশ্চাত্ দিকে ফিরাইয়া মুখ  
 নীরবে অঞ্চল টানি মুছিল। নয়ন।  
 আবার কহিল। বামা “সৈনিক সাজিয়া  
 যাব আমি রণস্থলে বধিতে কাকেরে ?  
 তুমিও আমার সঙ্গে এস রণস্থলে,  
 দেখাব মোস্লেম বামা নহে পুষ্প-রেণু,  
 অনল-ক্ষুলিঙ্গ তার। ধর্মের সমরে।”  
 নজিবের হৃদে যেন অনলের উৎস  
 উঠিল ফুটিয়া, বীর উঠিল। গর্জিয়া।  
 সিংহ প্রায়, অগ্নি যেন ভূধর ফাটিয়া  
 বাহিরিল মেঘ-মল্লৈ কাঁপায়ে অবনী।  
 “আর না—আর না বোন্—প্রতিজ্ঞা আমার  
 পেশবার ধ্বংস ত্রত করিহু গ্রহণ  
 আজি হ’তে তব কাছে হইহু দীক্ষিত  
 চির তরে, যেই স্থানে পাইব কাকেরে  
 এই অশ্রাঘাতে তারে করিব নিধন।”  
 মুহূর্তে স্তম্ভীকৃত অসি উঠিল অলিয়া  
 বীরেন্দ্র করে যেন বিছাৎ ভীষণ।

— — —

## বিংশ সর্গ

[ সাজাহানাবাদ ; রাজ-প্রাসাদ ]

সুবহঃ কক্ষ ; শ্বেত মন্দির-প্রাচীরে  
অসংখ্য বিবিধ চিত্র নয়ন রঞ্জন !—  
—কত শত নৃপকুল বসি রাজাসনে  
শিখাইছে আয়তুরী মোহাক মানবে  
“কিছু নয় মিথ্যা। সব অনিত্য অবনী।”  
প্রাচীরে সুগোল স্তম্ভে স্বর্ণ-বিমণ্ডিত  
আরসী, দেয়ালগীর শোভিছে সুন্দর  
জ্যোতী মত ; স্থানে স্থানে নয়ন-রঞ্জন  
কৃত্রিম বল্লরী, তাহে যুক্ত। রাজি প্রায়  
প্রফুল্লিত ; পুষ্প বুল কত মনোহর।  
কত মনোহর সেই পল্লব শ্যামল  
বিনির্মিত বহু মূল্য প্রবাল রতনে।  
উজ্জ্বল নীল চন্দ্রাতপ মণি মণ্ডিতে  
সুশোভিত, প্রাস্তবিত্ত সুবর্ণ-কালরে  
ঝলিছে হীরক-পদ্ম স্তবকে স্তবকে  
জ্যোতির্ময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রের মত ;  
নিরে শত শত স্বচ্ছ ফটিকের ঝাড়  
ঝলসিছে নানা বর্ণে ঘোষিয়া নীরবে  
সজ্জাটের অতুলিত অনন্ত বৈভব।  
সমাসীন স্বর্ণাসনে আমেদ আকালী\*  
বীর চূড়ামণি, মুখে জলন্ত প্রতিভা  
বিজ্ঞাসিত, যার তীব্র বীরক-গৌরবে

বিকম্পিত বীর-হৃদি সমগ্র ভুবন !  
সম্মুখে রক্ত-পাত্রে রক্ত-বিমণ্ডিত  
দত্তজীর † ছিন্ন মুণ্ড, সম্মিত বদনে  
ছই পার্শ্বে পাত্র মিত্র বহু সভাসদ  
চক্রাকারে, নিমকোটি ‡ সজ্জিত নীরব।  
প্রাসাদের বহির্ভাগে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে।  
রক্ত-বিখচিত চাক চন্দ্রাতপ তলে  
অসংখ্য মোস্লেম সৈন্য রোহিণী পাঠান  
আবদালী—ভীমাকৃতি আফগান ভীষণ  
সকলেরি শিরস্থিত লোহিত উষ্ণীষে  
“অন্ধ চন্দ্র” কি সৌন্দর্য্য গাভীর্য্যের সনে।  
অসি হস্তে রণ-বেশে দৌবাবিক দল  
ভ্রমিতেছে চারি দিকে ভীষণ-দর্শন।  
সম্মুখে একটি যোদ্ধা কৃতান্ত সদৃশ  
শূল পাণি, দাঁড়াইয়া অনিত্য-আননে !  
নীরব নিস্তব্ধ সভা, স্তব্ধ ধরণী,  
একটুকু শব্দ নাই প্রকৃতির মুখে .  
ভাঙ্গিয়া এ নিস্তব্ধতা সুগভীর স্বরে  
কহিল। কাবুলেশ্বর † “ধন্য বীরবর।  
বল দেখি যুদ্ধ বার্তা শুনিতে বাসনা  
কেমনে বধিলে তুমি এ মূর্খ কাকেরে ?  
আমার সে সেনাপতি বীর কুলধ্বজ

\* আহমদ সাহ আন্দালী

† মহারাষ্ট্র সেনাপতি।

‡ এক প্রকার দুর্ভয় সৈন্য, ইহার। কেবল আহমদ সাহ আন্দালীর আদেশে পরিচালিত হইত। অন্য কোন সেনাপতির আদেশ মানিত না।

† আহমদ সাহ আন্দালী

কেমনে হইল হত বিধর্ষা সমরে ?”

“জাহাপনা”, কর যোড়ে আরঙিলা বীর  
 “কি ক’ব সে যুদ্ধ বার্তা ? ক্রোধে অঙ্গ অঙ্গে  
 দিবসের ঘোর যুদ্ধে না পারি আঁটিতে  
 পাপিষ্ঠ কাকের সৈন্য, তরবারের মত  
 বেষ্টিয়া মোস্লেম দলে বাউলি প্রান্তরে  
 গোপনে গভীর রাত্রে প্রদানি অনল  
 জালিল শিবির রাশি, দেখিতে দেখিতে  
 ভস্মিয়া অসংখ্য প্রাণী ধক্ ধক্ করি  
 উঠিল জলিয়া বহু গগন উপরে ।  
 নিজিত মোস্লেম সৈন্য উঠি শশবাস্তে  
 সাজিল সমর সাজে, বাজিল হৃদভি  
 নাচিল উলঙ্গ অঙ্গি কলমল করি  
 আধারে ধাঁধিয়া নেত্র বিছাতের ছলে ।  
 অযুত কলহ কুল উড়িল আকাশে  
 শন্ শনি, যেন বহু ভুঙ্কণ ভীষণ  
 ছুটিল গগন-পথে গর্জিয়া তৈরবে ।  
 কাঁপিল বাউলি ভয়ে তোপের ঘর্ঘরে  
 ধর ধরি, কাঁপে যথা ঘোর ভূকম্পনে  
 বসুন্ধরা, সিঁদু গর্ভে উঠিল কল্লোল,  
 মুহূর্তে পুরিল মাঠ ঘোর কোলাহলে ।  
 কত সৈন্য, সেনাপতি পড়িল ভূতলে  
 ছিন্ন দেহে, তোমার সে বীর সেনাপতি  
 যুঝি প্রাণপণে বহু কাকের সৈনিকে  
 বঁধিলা, কপাণ তার বিছাতের মত  
 ঘুরিতে লাগিল বধি অসংখ্য কাকেরে  
 চারি দিকে, হেন কালে পশ্চাৎ হইতে  
 শার্দুলের মত এই দস্তজী পায়ণ  
 আক্রমিয়া বীরবরে মারিলা সজোরে

ভীকু অসি, ভেদি চর্ম সে অসি ভীষণ  
 নামিল বিছাৎ বেগে, ছিন্নমুণ্ড তার  
 অমনি মুহূর্তে হার পড়িল ভূতলে ।  
 খেচ্ছা সৈনিক আমি—ইসলাম সেবক  
 দূর হ’তে এই দৃশ্য দেখিছু যখন  
 শিরায় শিরায় মোর শোণিতের স্রোতঃ  
 ছুটিল তড়িৎ বেগে, “দীন দীন” বলি  
 এক লক্ষ আক্রমিছু এ মূর্খ কাকেরে  
 ভীম বলে, বহুক্ষণ পাপিষ্ঠের সনে  
 যুঝিলাম আমি ঘোর উন্মত্তের মত  
 প্রাণপণে, অঙ্গি রাশি ঘাত প্রতিঘাতে  
 খণ্ড খণ্ড হ’য়ে ভূমে পড়িল ছিটিয়া  
 শন্ শনি, নরাধম বিপুল বিক্রমে  
 আঘাতিল শিরে মম যমদণ্ড প্রায়  
 ভীম গদা, সে আঘাত লইয়া ফলকে  
 হুকারিছু “দীন দীন”, জাগিল গগনে  
 প্রতিধ্বনি, বীরবৃন্দ উঠিল গর্জিয়া  
 “দীন দীন” এক সঙ্গে অসংখ্য কামান  
 গর্জিল অশনি মস্ত্রে তৈরব ররাবে  
 উদগারি অনলপূর্ণ গোলা ভয়ঙ্কর ।  
 পড়ে যথা রক্তা তরু ধরণীর বুকে  
 মহাবড়ে, সেইরূপ পড়িল ভূতলে  
 অসংখ্য কাকের সৈন্য সে মহা সমরে ।  
 নিরখি এ শোচনীয় দৃশ্য ভয়ঙ্কর  
 পলাইল দস্যুদল, জাহাজী \* তরু  
 বহুক্ষণ যুঝি মর্ন্ত মাতঙ্গের মত  
 মোস্লেম সৈনিক সনে, ভঙ্গ দিল রণে ।  
 অমনি ভীষণ বেগে পশ্চাতে তাহার  
 ছুটিল মোস্লেম সৈন্য, ধায় যথা সিংহ

\* দস্তজীর দাতুঙ্গুর এবং মহারাষ্ট্র সেনাপতি ।

কাপাইয়া বনহুলী ভীষণ বিক্রমে  
 আক্রমিতে যুগ-যুগ নির্জন কাননে ।  
 আমিও এ নরাধম দত্তজীর সনে  
 বহুক্ষণ করি যুদ্ধ, বহিষু পাবণে  
 এই বর্শাঘাতে", বর্শা ফেলিয়া বীরেন্দ্র  
 ধরাডলে, বীর অসি উঠিল গর্জিয়া  
 বন্ বন্, বীরবৃন্দ চাহিল। বিষ্ময়ে ।  
 কহিল। আদালী সাহা আনন্দে বিহ্বল,  
 "ধন্য তোমা বীরবর, ধন্য সে জননী  
 এ হেন বীরেন্দ্র পুত্র ধরে যে জঠরে ।  
 রক্ষিবে এমনি ভাবে জাতীয় গৌরব,  
 ইহাপেক্ষা প্রিয়তর কি আছে জগতে ?  
 কি নাম তোমার বীর ? বাড়ী কোন্ দেশে  
 আমার সৈনিক দলে সেনাপতি পদে  
 বরিশু তোমারে, তুমি থাক মম কাছে,  
 উপযুক্ত অর্থ আমি দিব মাসে মাসে ।"  
 "আহাপনা ক্ষমা চাই বেতন গ্রহণে  
 করিব না যুদ্ধ আমি", কহিল। সে যুবা  
 "ইসলাম সেবক আমি, নহি ব্যবসায়ী,  
 ত্রুত মম ধর্ম যুদ্ধ, স্বধর্মের তরে  
 প্রাণ যায় তাও ভাল, তথাপি কখন  
 ইসলামের অবনতি নারিব দেখিতে ;  
 নাহি আমি অর্থ গৃহ, অর্থ বিনিময়ে  
 করিব না ধর্ম বিক্রী, স্বদেশের হিতে  
 এ অসি সনাই যুদ্ধ, পৌত্তলিক দলে  
 ধ্বংসিয়া রক্ষিব আমি ইসলাম-গৌরব ।  
 নাম মোর মারুবেগ, নিবাস দিল্লীতে ।"  
 এক দৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহি তার পানে  
 কহিল। আদালী সাহা ধন্য বীরবর  
 তোমার বীরবে, ধন্য জনকে তোমার ।"

মুহূর্ত্তে ফিরায়ে মুখ কহিল। আবার  
 এ'স হে মোসলেমগণ, এ'স বীর বেশে  
 আজি এ ধর্মের যুদ্ধে ভয় কি মরণে ?  
 মরিলে অক্ষয় কীর্ত্তি যাইবে ত্রিদিবে  
 এ হেন পুণ্ড্রের কাজে ভয় কেন তবে ?  
 হয় জয়, নয় রণে মরণ নিশ্চয়  
 এ প্রতিজ্ঞা মন মধ্যে করিয়া রোপণ  
 হও সবে অগ্রসর,—কি কাজ বিলম্বে ?  
 নহি কাপুরুষ আমি, নহে শক্তিহীন  
 আমার এ ভুক্তব্যয় ;—এই ভুক্ত বলে  
 অর্ধেক পৃথিবী রাজ্য পারি উলটিতে,  
 ভয় কি ?—সহায় অসি স্বদেশ উদ্ধারে  
 যত্নাত বীরের পক্ষে স্বর্গের সোপান ।"  
 নীরবিলা বীর শ্রেষ্ঠ, মুহূর্ত্তের মাঝে  
 বিযুক্ত সেনানী বৃন্দ উঠিল জাগিয়া  
 ভীষণ শার্দূল সম, বিছাডের বেগে  
 ছুটিল শোণিত-স্রোত শিরায় শিরায়  
 সকলের, ছুটে যথা বর্ষার প্লাবনে  
 জলরাশি দ্রুত বেগে তটিনীর বুকে ।  
 উৎসাহে পিধান মাঝে তীক্ষ্ণ তরবার  
 সহসা ঝণন রবে উঠিল গর্জিয়া  
 কটিদেশে, অভিমানে মস্ত যুদ্ধ প্রায়  
 অজ্ঞাতে কুপাণ স্ব স্ব পরশিল সবে ।  
 আবার ভীষণ করে কহিল। আদালী  
 "বিনাদোষে নরাকৃতি পাবণ সকল  
 যে দারুণ অত্যাচারে করেছে পীড়িত  
 মুসলমানে, পুরিয়াছে সমগ্র ভারত  
 স্বামীহীন, পুত্রহীন রমণী-ক্রন্দনে,  
 মরিলে তা' কার হৃদি না উঠে অলিরা ?  
 দিন দিন পূর্ণ বল, অক্ষরে এখন

না ধ্বংসিলে ভবিষ্যতে ঘোর অমঙ্গল ।  
 অনলে পবন প্রায় বুটিয়াছে তাহে  
 মোস্লেম কুলের গ্রানি আদিনা \* পামর ।  
 দম্ভাঙ্গের প্রলোভনে জাতীয় গৌরব  
 বিসর্জিয়া, নরাদম স্বজাতির প্রাণে  
 হানিয়াছে কি দারুণ অসি ভয়ঙ্কর ।  
 সেই অত্যাচারে যবে মোস্লেম নিচয়  
 নিয়াছে আশ্রয় মম, প্রতিজ্ঞা আমার  
 ঘৃণিত কাফের বৃন্দে দলিব চরণে ;  
 দলিব চরণে সেই কৃতঙ্গ পামরে ।  
 মরণে নির্ভয় আমি, ডরিব কাহারে ?  
 এ বক্ষ ইন্দ্রের বজ্রে নহে বিকম্পিত  
 “হয় জয় নয় রণে মরণ নিশ্চয় ।”  
 এ প্রতিজ্ঞা হৃদি মাঝে সদা বহমান,  
 তবে কেন ডবিব সে কাফের কুকুরে ?  
 এ’স সবে বীর বেশে,—এ’স রণস্থলে,  
 কিং ভয় ?—তরুর দে’খে কে লুকায় ঘরে ?  
 এই দেখ কি বিক্রমে সম্মুখ সমরে  
 বীরশ্রেষ্ঠ মারু বেগ বাউল প্রান্তরে  
 যুঝিয়া বীরের মত অসংখ্য কাফেরে  
 ধ্বংসিয়াছে, ধ্বংসিয়াছে কাফের-গৌরব  
 মহারাষ্ট্র-বীরশ্রেষ্ঠ দত্তজী সেনানী ;  
 এই দেখ রোপ্য-পায়ে ছিন্ন মুণ্ড তার ।  
 তোমরাও সাজ সবে এ মহা আহবে ;  
 দেখাও বীরত্ব এই বীরেন্দ্রের মত  
 \* ধ্বংসিয়া কাফের সৈন্য, কিম্বা রণক্ষেত্রে  
 ভীষণ ভোপের মুখে অনল-সাগরে  
 স্বদেশের—স্বজাতির—স্বধর্মের ভরে  
 দেও প্রাণ-বীর-বেশে সম্মুখ সমরে ।”

প্রতি বাক্যে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি কণা যেন  
 হইল নির্গত ভস্ম করিতে অবনী ।  
 আবার, আবার বীর কহিল। গজিয়া  
 “ভুলেছ কি সেই দিন ?—সে ধর্ম গৌরব ?  
 তুমি এ ভারত ভূমি—সমগ্র পৃথিবী  
 কাঁপিত যাহার নামে, যুরোপ এসিয়া  
 প্রদানিত ভক্তি পুষ্প যাহার চরণে  
 নিশি দিন ; মধ্যাহ্নের মার্জিতের মত  
 যাহার পবিত্র ধ্বজা বিপুল বিক্রমে  
 ধ্বংসিয়া খৃষ্টান-শক্তি ভীষণ সমরে  
 উড়েছিল গর্ব ভরে স্পেন-ভূর্গ-শিরে ।  
 একটি হৃদয়ে যার কম্পিত হৃদয়ে  
 নমিত সমগ্র বিশ্ব, মানব কি ছার,  
 পশিত বিবরে সিংহ শার্দূল কাননে ;  
 আতঙ্কে কাঁপিত সিদ্ধ—ভূজঙ্গ ভূধরে ।  
 কি গভীর মর্ম ব্যথা মোস্লেম হইয়া  
 কেমনে দেখিছ আজি হৃদ-শা তাহার ?  
 কে বলে মানুষ তারে এ ভব মণ্ডলে ?  
 —স্বজাতির অশ্রুজলে যাহার হৃদয়  
 নাহি জবে, পশু ভিন্ন কি বলিব তারে ?  
 স্বধর্মের অবনতি কে পারে সহিতে ?  
 বীরেন্দ্র, সাবাসি তোমা, ধন্য জন্ম তব  
 রাখিলে অতুল কীর্তি বীরেন্দ্র সমাজে ।  
 বীর তুমি, পুরস্কার পাইবে তাহার ।”  
 নীরবিলা বীর, সত্তা আবার নীরব,  
 স্পন্দহীন বীরবৃন্দ, সকলেরি মুখে  
 ভাসিছে ক্রোধাগ্নি নেত্রে ঝরিছে অনল ।

আবার গজিল। বীর অবরুদ্ধ নীর



ছুটিল সবেগে যেন অজস্র ধারায় —  
 প্রাবিয়া সে সচাঞ্চল তৈরব হুঙ্কারে ।  
 কত কাল হেন ভাবে নিপীড়িত হ'বে ?  
 কত কাল কাকেরের ভীম পদাঘাত  
 হৃদয় পাতিয়া লবে । ইশ্রাম-জীবন  
 এতই কি পদানত ? অতল সলিলে  
 ডুবিয়া এ পাপ রাশি দুচাও সধর ।  
 কি লজ্জার কথা হুংখে বিনরে হৃদয়  
 কেশরী সজ্জিত কবে সারমেয়-রবে ?  
 পুনঃ বলি, এ জীবন নহে চিরস্থায়ী,  
 মার—কিছু মর রণে কি ভয় শমনে ?  
 যুত্বা ত অপরিহায্য জন্মিলে মরণ  
 বিধাতার স্থিরলিপি — ভয় কেন তবে ?  
 হও অগ্রসর অসি খোল পুনর্বাব  
 ইশ্রামের পূর্ণ বাঁধা দেখাও আবার  
 সমর প্রাপ্তি, কিছা জলধির তলে  
 লুকাও এ পোড়া মুখ জনমের মত ।”  
 নীরবিল। বীর জ্যেষ্ঠ বসিল। আসনে ।

গজ্জিলা নজিবদৌলা \* বীর কুলধন  
 কি ভয় তরুর বৃন্দে ? কাপুরুষ প্রায়  
 কেন লুকাইছ সবে রমণী অকলে ?  
 কি কাজ রাজত্বে তার তরুরে যে ভরে ?  
 বিজোহের অধিপতি প্রধান তরুর  
 শিবাজী তাহারি অস্ত্রে মোস্লেম সাম্রাজ্য  
 ছিন্ন ভিন্ন, ইসলামের শত্রু সে প্রধান ।  
 সেই শিবাজীর—সেই প্রধান দস্যুর  
 বংশধর, চৌধা বৃদ্ধি বাবসা বাহার  
 সেই রাশি রাজা এবে জিজ্ঞাসি কাহারে

\* সাহরনপুর অকলের রোহিলা আকসীরদার ।

দস্যুতা কি বৃদ্ধি তবে ?—দস্যু কে জগতে ?  
 নাহি কি মোস্লেম কুলে বীরেন্দ্র এমন,  
 ধ্বংসিয়া কাকের বৃন্দে সমুখ সমরে  
 লইতে সে প্রতিশোধ, করিতে স্থাপন  
 চির শান্তি, ভারতীয় মোস্লেম সমাজে ?  
 তোমরা কি একেবারে কাপুরুষ প্রায়  
 শৌর্য্য বীৰ্য্য বিবর্জিত ? অশুখা কেমনে  
 স্বজাতির এ হৃদ-শা বসিয়া নীরবে  
 দেখিতেছে ? গুণা লজ্জা হয় না কি মনে ?  
 পড়ে না কি মনে সেই অতীত গৌরব ?  
 সুদূর আরব ভূমে যেই বীর জাতি  
 মধ্যাহ্নে মার্শও প্রায় প্রচণ্ড বিক্রমে  
 অতিক্রমি সে অনন্ত বালুকা সাগর  
 যাইত ছুটিয়া কত দেশ দেশান্তরে ।  
 কত যে সাম্রাজ্য কত নগর বন্দর  
 তাহাদের পদস্পর্শে হয়েছে পবিত্র ;  
 কত কীর্তিস্তম্ভ, সৌধ সে পদ পরশে  
 গৌরবিত ; বিশ্বজয়ী কত সম্রাটের  
 হিরা মুক্তা স্নানোভিত স্তবর্ণ মুকুট,  
 তাহাদের তাঁকধার অগ্নি আঘাতে  
 চূর্ণীকৃত এবে কি তা হয় না স্মরণ ?  
 আফ্রিকার মরুভূমে বালুকা প্রান্তরে  
 বিসর্জিয়া আত্ম প্রাণ কেমন বিক্রমে  
 স্থাপিয়াছে ধ্বংসরাজ্য “আল্লা আল্লা” রবে  
 কাপাইয়া স্বর্গ মর্ত্য, সে ভীষণ স্বর  
 আজিও ধ্বনিত সেই নীল নদ নীরে ।  
 অই সমুদ্রের তীরে মহা পরাক্রান্ত  
 ফ্রান্স স্পেন, বকে তার আজিও অঙ্কিত  
 ইসলামের পদ চিহ্ন, সারাক্ষণ প্রভাতে

আজিও আজান-শব্দে, কোরাণের শ্লোকে  
 ধনিত সে মহাদেশ, প্রচণ্ড কশিয়া  
 কাঁপিয়া উঠিত যার ক্রকুটি দর্শনে  
 হৃৎকল সজ্জা প্রায়, তুরস্ক মিশর  
 যে জাতির অতুলিত বীরত্ব-সঙ্গীতে  
 মুধরিত দিবা নিশি, কোকিল বন্ধারে  
 বসন্তে ভারত যথা, গৌরবে যাদের  
 সুবাসিত স্বর্গ মর্ত্য, নিকুঞ্জ যেমতি  
 সুবাসিত কুসুমের মধুর সৌরভে।  
 যে জাতির শৌর্য্য বীৰ্য্য বীরত্ব-কাহিনী  
 আফ্রিকার নীল নদ, তুরস্কে ফোঁরাত  
 ভারতে যমুনা গঙ্গা সিঁদু গোদাবরী  
 গাইছে সতত, সেই জীবন্ত জাতির  
 বংশধর তোরা আজি শৃগালের মত  
 কাঁপিস তরুর ভয়ে ?—ছিল তারা বীর,  
 ভীকৃত্য কি বিন্দুমাত্র জানিত না কভু  
 সেই জাতি, ভো !-লিঙ্গা ছিল না তাদের,  
 ছিল তারা প্রকৃতির স্বাধীন সম্মান,  
 করে অসি কটিদেশে বাঁপিয়া খজুর  
 আরবের মরুভূমে বালুকা প্রাস্তরে  
 স্থাপিয়াছে ধর্মরাজ্য, সে মহা মরুর  
 প্রান্তে প্রান্তে তাঁরবেগে যাইত ছুটিয়া  
 একটু ইঙ্গিতে, তারা একতার পাশে  
 ছিল বদ্ধ, একমুখে হইত চালিত,  
 নাহি ছিল দলাদলি বাদ বিসংবাদ ;  
 বগড়া কলহ কভু ছিল না তাদের  
 গৃহ পাশে, কিন্তু তারা বৈর-নির্যাতনে  
 ভীষণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—মূর্ত্তিমান যম।  
 অতীতের কতশ্রুতি জাগাইব আর

বুধা আমি, সে জাতির ভুবন বিজয়ী  
 খালেদের \* পরাক্রম পড়ে নাকি মনে ?  
 দেখ মনে ক'রে সেই বীরেন্দ্র কেশরী  
 খালেদের কথা আজি, —ধর্মের সমরে  
 খোদার যে তরবারি ? যার ছুঁছকারে  
 আসমুদ্র গিরিতল হইত কম্পিত ?  
 তার সেই তীক্ষ্ণ ধার অসির আঘাতে  
 রোম সম্রাটের সেই নভম্পর্শী উচ্চ  
 সৌধ রাজি বিলুপ্তিত ধরণীর বুকে  
 চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে, মনে কি তা পড়ে ?  
 তার সেই তীক্ষ্ণ ধার অস্ত্রের আঘাতে  
 সহস্র সহস্র সৈন্য প'ড়েছিল ভূমে  
 প্রত্যেক মুহূর্ত্তে সেই ভীষণ সমরে।  
 —তার সেই অশ্রাঘাতে —প্রচণ্ড বিক্রমে  
 পরাক্রান্ত রোমরাজ্য চির নিম্পেষিত।  
 কে তখন দাঁড়িয়েছিল সম্মুখে তাহার ?  
 সে প্রবল শক্তিগালী রোম সম্রাটের  
 'অজ্জয়—হৃদ্বীর্ষ—ভীম সৈন্য ভগণিত  
 মহিরা—ধ্বংসিয়া প্রতি সপ্তাহে সপ্তাহে  
 কত দেশ—কত রাজ্য ক'রেছিল জয়  
 যে বীরেন্দ্র তীক্ষ্ণ ধার অসির আঘাতে ;  
 সে কথা কি ভুলে গেছ ? কাপুরুষ প্রায়  
 কেন তবে বসে আছ ?—খোল তরবার !  
 অতীতের ইতিহাস কর উদ্ঘাটিত,  
 দেখ সেই মুষ্টিমেয় দরিজ মোস্লেম  
 কেমন ভীষণ বীৰ্য্যে “আল্লা আল্লা” বলি  
 রোম সম্রাটের সেই ভুবন বিজয়ী  
 সপ্তলক্ষ বর্ষাবৃত ভীষণ সৈনিকে  
 করেছিল ধ্বংস সেই এরমুক সমরে।

তুলেছ কি খালেদের সে বীৰ্য্য ভীষণ ?  
 যুগ্মজন সৈন্য যুগ্ম সহস্র কাকেরে  
 ক'রেছিল বিমর্দিত সে রণ-প্রান্তরে ?  
 পড়ে না কি মনে সেই জোবের \* কজল † ?  
 পড়ে না কি মনে সেই মোস্লেম রমণী  
 কুমারী ওয়ে এবান, ওকিরী সালেমা ?  
 যাহাদের দণ্ডাঘাতে ঘোর নিষ্পেষিত  
 কত যে রোমক সৈন্য—পড়ে নাকি মনে  
 মোস্লেম রমণী-রক্ত জেরার ভগিনী  
 খাওয়া কি ভীম বলে করেছিল। ধ্বংস  
 সে ভীষণ পরাক্রান্ত রোম সেনাপতি  
 হুর্দ্ব পিটারে সেই স্ত্রিয়াকের তীরে ?  
 পড়ে নাকি মনে সেই অতীতের কথা ?  
 —দ্বিবিজয়ী মহাযশা: বীরেন্দ্র ওকবা  
 অসংখ্য কাকের সৈন্য বধিতে বধিতে  
 গিয়াছিল ছুটে যবে প্রান্তজন বেগে  
 অতিক্রমি' বহু দেশ “আল্লা আল্লা” রবে  
 জলজল গিরিগুহা করি' বিকম্পিত ।  
 কেহই ছিলনা সেখা বাধা দিতে তারে,  
 একমাত্র বাত্যানুক ভূমধ্য সাগর  
 রক্ত বেগে দাঁড়াইলে করি অবরোধ  
 পথ তার, বীরবর রূপ দিয়া জলে  
 অধঃসহ, তুলি' উর্দ্ধে অসি ধরধার  
 বলেছিল। মেঘমস্ত্রে গর্জিয়া ভৈরবে  
 “সর্বশক্তিমান আল্লা” আজি এ সমুদ্র  
 না করিলে পথ রোধ, এ দাস তোমারি  
 পবিত্র ইসলাম ধর্ম করিত প্রচার  
 জগতের সর্বস্থানে—তুলেছ কি তাহা ?

পড়ে না কি মনে বীরেন্দ্র তারিক ?  
 যে জন উত্তীর্ণ হ'য়ে ভূমধ্য সাগর ।  
 অবতরি শত্রু মাঝে—স্পেন উপকূলে,  
 ত্যজিয়া প্রাণের মায়া অসম সাহসে  
 ভ্রমীভূত করেছিল সমস্ত তরুণী ।  
 নিরখি এ কার্য্য তার, বিহ্বল হৃদয়ে  
 মোস্লেম সৈনিক বৃন্দ প্রাণের মায়ায়  
 ভীত হয়ে, বলেছিল তাহারে বিনয়ে  
 “পরাজিত হলে যুদ্ধে ঘাইব কেমনে  
 দেশে মোরা ?” সিংহ সম বীরেন্দ্র তারিক  
 বলেছিল। মেঘ মস্ত্রে গর্জিয়া ভৈরবে  
 “সে বাসনা দূর কর, যত্ন আর লাগিয়া  
 সবাই প্রস্তুত হও, পলায়ন পথ  
 দিহু আজি রুদ্ধ ক'রে—হও অগ্রসর ।  
 বীরেন্দ্র যে—সে কি কভু পালা'ব কেমনে  
 ভাবে হৃদে ? সে সতত অটল হৃদয় ।  
 সে ভাবে সমুদ্র যুদ্ধে মরিব সমরে  
 ধ্বংসিয়া অরাতিবৃন্দে স্তূতীকৃত কৃপাণে,  
 পৃষ্ঠ দেশ না দেখাব শত্রুরে কখন ।  
 কাপুরুষ নহি মোরা, না পারিলে রণে  
 শত্রু সনে,—এইস্থানে মঙ্গল মরণ ।  
 তুলেছ কি তার কথা ?—হারুণ রসিদ ?  
 বীরেন্দ্র আস্শাফ। আর আবু মোসলিম ?  
 আর কত নাম ক'ব ? কেশরীর ঘরে  
 শৃগাল তোমরা, হিছি মোসলেম হইয়া  
 যুগ। কি হয় না মনে করিতে লেহন  
 বিধর্মীর পদ রক্ত : ? নীরব নিষ্ঠল  
 কেন তবে ?—অসি হস্তে হও অগ্রসর ।

\* জোবের মিন আশ্শাম

† কজল মিন আশ্শাম

বিনাশিয়া ধর্ম্মাধেশী অশ্লীল কাকেরে  
ভারতে ইসলাম ভিত্তি কর সংস্থাপিত ।  
এই কি ইসলাম ধর্ম্ম ?—পড়ে নাকি মনে  
সে পবিত্র নীতিপূর্ণ ধর্ম্ম উপদেশ \*  
শাজের সে মহা বাক্য কত শাস্তিপ্রদ  
রণস্থলে, বিপদের তরবারি তলে ?  
আর সেই বীরশ্রেষ্ঠ তেজস্বী আমির †  
যাহার সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রে রক্ত-প্রবাহিনী  
হ'য়েছিল প্রবাহিত সমগ্র আরবে ।  
পড়ে নাকি মনে সেই খলিফা ওমর ?  
যাহার ভীষণ অস্ত্রে উলঙ্গ কপাণে  
পবিত্র ইসলাম ভিত্তি হয়েছে স্থাপিত  
দেশ দেশান্তরে, হায় পড়ে না কি মনে  
ওহোদ বদর যুদ্ধ বিখ্যাত জগতে ?  
পড়ে নাকি মনে সেই বীরদ্বুর্গবিন্দ ?  
ইসলাম ধর্ম্মের সেই অলঙ্কার  
ভুবন বিজয়ী আলী ‡ মেঘমল্ল জিনি  
যাহার গগন ভেদী শব্দ “দীন দীন”  
আজিও ধ্বনিত কত নগরে প্রান্তরে  
দিবলা কোরাউত আর সাতেল আরবে । §  
পড়ে নাকি মনে সেই কার্বালা ভীষণ ?—  
—অবিরত “হাহা” শব্দ উঠিছে যেখানে  
বায়ু শব্দে —মরুবাসী পাখীর কুঞ্জে ;  
পূজ্যপাদ হোসেনের পবিত্র শোণিতে  
অঙ্কিত যে উপদেশ সে মহাশ্মশানে ।—  
—তা'ও কি ফুলিয়া গেলে ? অধর্ম্মের তরে  
দেখ দেখি কি পবিত্র আশ্রয় বলিদান ?  
যা'কু সে হুরের কথা, দেখ পুনর্ব্বার

অস্ত্র চিত্র, মেত্রযুগ ধাঁধিবে চমকে—  
সাল্লাহান, আরজীব সুলতান্ মায়ুদ  
খেলেছিল সেই খেলা ভারত-ভদরে ?  
—উঠেছিল সেই রোল গভীর হুকারে  
কাঁপাইল দিগন্তর, অতিধ্বনি বার  
আজিও লাগিয়া আছে প্রবণের কোণে'  
ভারতের অগণিত হিন্দু রাজগণ  
মিলি একসঙ্গে, সৈন্ত করিয়া সংগ্রহ  
লক্ষ লক্ষ, রণ ক্ষেত্রে এ'সেছিল যবে'  
মহিতে মোসলেম দলে, অস্ত্রের ভুবন  
দিয়াছিল যবে বহু ভারত-রমণী  
রণরঙ্গে, সৈন্ত বৃন্দ সংগ্রহের তরে ;  
সে অর্থেও কত লক্ষ সৈন্ত পরাক্রান্ত  
হ'য়েছিল সংগ্রহীত সে রণ প্রাঙ্গণে ;  
তাহে পুনঃ পার্শ্বভীত গোক্ষুর সকল  
যুটেছিল আসি সেই হিন্দু সৈন্ত সনে  
রণক্ষেত্রে, সে ভীষণ সঙ্কট সময়ে —  
সেই সমবেত মন্ত সৈন্তের সাগরে  
মোসলেম কুলের সেই অলঙ্কার  
সুলতান মায়ুদ কত ভীষণ বিক্রমে  
“আল্লাহো-আল্লাহো” রবে করিয়া হুকার  
প'ড়েছিল লক্ষ দিয়া ; সে রণ-প্রাঙ্গণ  
কাকেরের স্তম্ভ রক্তে কি মূর্ত্তি ভীষণ  
ধ'রেছিল,—আজি তাহা পড়ে না কি মনে ?  
আবার ভীষণ বীর্ঘ্যে দৃশ্যবতী তীরে  
সাহাবদী, হিন্দুদের চারি লক্ষ সৈন্ত  
বিমর্দিয়া, মোসলেমের বিজয় কেতন  
উড়াইয়া ছিল যবে ভারত অধরে ;

\* জম জামাতো ভাবুতা খেনায়ে হকুকে—জম তরবারের হারাতে প্রতিবিধিত । † আমির হামজা । ‡ হজরত আলী ।

§ দিওয়লা (উইলিস) এবং কোরাউত (একটিস) যেখানে নিমিত্ত হইরাছে, উহারই নাম সাতেল আরবে ।

সেই কেতনের বন্ধে স্বর্ণ বিম্বিত  
 “অর্ধচন্দ্র” মোস্লেমের কি শক্তি ভীষণ  
 করেছিল বিঘোবিত সমগ্র জগতে।  
 সেই কেতনের তলে নর অসি করে  
 লক্ষ লক্ষ মোস্লেমের বীর সেনাপতি  
 “দীন দীন” রবে হবে কাপারে মেদিনী  
 উঠেছিল মহাদর্পে গঞ্জিরা ভীষণ।  
 কোথাছিল কাকেরের এত পৌর্য বীৰ্য  
 সে সময়ে? মোস্লেমের একটি চরণ  
 টলা’তে কি পে’রেছিল সে মহা সময়ে?  
 সেই ধানের বুকে কত যে কাকের  
 হ’য়েছিল নিশ্চেষ্ট; সিকিরা সমরে  
 হৃদয় সংগ্রাম সিংহ কত যে লাহিত  
 মনে পড়ে? চিতোরের গর্জিত প্রতাপ  
 হ’য়েছিল নির্বানিত সুদূর কাননে  
 গিরি মূলে? মোস্লেমের উলঙ্গ কপাণে  
 আজিও চিতোর তার ভীষণ শ্মশান।  
 মোস্লেম গৌরব কীৰ্ত্তি বীর-কাহিনী  
 কত ক’ব? ইতিহাস প্রত্যক্ষ প্রমাণ  
 সেই বীর জাতি আজি মহারাষ্ট্রে ভরে  
 আতঙ্কিত, এ বিস্তৃত সমগ্র ভারত  
 দস্যুদের অজ্ঞাঘাতে কণ্ঠাগত প্রাণ।  
 লও প্রতিশোধ তার, কাকের ষোণিতে  
 রঞ্জিরা ভারত-বন্ধ হও অগ্রসর।  
 অস্ত্রধা তালিবে বন্ধ নরনের জলে।  
 মোস্লেম রমণী সেই চাঁদ মূলতানা  
 কেমন ভীষণ বীৰ্য্যে, করেছিল কাস  
 বিপক্ষ সৈনিকে, প্রাণ করিরা বিপন্ন  
 লক্ষ লক্ষ অস্ত্রের মুখে সমুখ সমরে।  
 “ভয়” যে কি বড় জাহা জীবনে কখন

জানিত না বীর বামা, অরাতি নিমস  
 অথবা জীবন পণ, মূল মন্ত্র তার’;  
 নারী হ’রে বীর বামা যে বীৰ্য্য ভীষণ  
 দেখাইয়া রণস্থলে বধেছিল অসি,  
 কি আক্ষেপ, তোমরাও সেই জাতি হ’রে—  
 —সেই রক্ত হৃদে লয়ে একাংশও তার  
 নারিলে দেখাতে, হি হি বিক্ এ জীবনে।  
 বীর হ’রে রাজজোহী মারাঠা-সংগ্রামে  
 যদি না বীরের মত পারিলে রক্তিতে  
 নিজ ধর্ম, ধন মান জাতীয় গৌরব,  
 বীর ব’লে পরিচয় কেন দেও তবে?  
 শৃগালের মত হি হি কেন আছ ওবে?  
 মরে যাও—ভুবে যাও জলধির জলে,  
 মোস্লেম-কলঙ্ক যেন থাকে না তুতলে।  
 কি আশ্চর্য্য, ভাবিলেও ক্রোধ অঙ্গ অঙ্গে,  
 সপ্তদশ অখারোহী প্রবেশি ভারতে  
 দেখাইল যে বিক্রম, এ লক্ষ মোস্লেম  
 পারে না কি দেখাইতে সে দৃষ্ট আঘাত?  
 আর কি মাতে না হিরা হৃদুভির রবে?  
 আর কি সে ধর্ম-বুদ্ধে প্রাণের তিতরে  
 খেলে না এ রক্ত সনে বিহ্যৎ ভীষণ?  
 এতই হৃদয় কি সে মোস্লেমের কর?  
 পারে না কি নিশ্চাইতে অমৃত বিহ্যৎ  
 তরবারে? পারে না কি বন্ধের উপরে  
 লইতে অনল-বৃষ্টি নোলা তরবার?  
 সেইত মোস্লেম বংশ সেইত কাকের?  
 কেন তবে চিত্তাকুল?—সুদৃঢ় সুটিতে  
 ধর অসি, ইম্রানের সহায় সৈন্য।  
 ধর্ম-ই সর্ব্বম, পুত কোরাণের বাক্য  
 অমর কবচ হ’রে রক্ষিবে সমরে।

সর সেই পূর্ব বীৰ্য্য, “দীন দীন” রবে  
 আবার কাপাও বিশ্ব, উড়াও গগনে  
 ইল্লাহের “অর্ধ চন্দ্র” পতাকা সুন্দর ।  
 নীরবিলা বীর ; গৃহ কাশিতে লাগিল  
 আতঙ্কে, ধর্মের নামে সমস্ত সেনানী  
 উঠিল কেশিয়া, যেন জলধি-স্থলয়ে

উঠিল কমল ঘোর গভীর হুকারে ।  
 সহকাথে উন্নত ভাবে বীরেন্দ্র নিচর ।  
 দাঁড়াইলা পূর্ণ বেগে, উঠিল গজিয়া  
 “দীন দীন”, একেবারে লক্ষ তরবার  
 ভাঙিল সৈনিক হস্তে ঝল মল করি  
 দেখাইয়া বিনা মেঘে চপলা চঞ্চল ।



## একবিংশ সর্গ

[ সেতারা ; রত্নজীর গৃহ ]

সামিনী জ্যোৎস্নাময়ী ; চাক চকোরিণী  
উড়িছে অমৃত আশে বিমল গগনে ।  
হাসিছে একুতি সতী আনন্দ দায়িনী,  
হাসিছে বনুধা স্নিগ্ধ স্নুখাংগু কিরণে ।

অই যে প্রকাণ্ড এক অট্টালিকা মাঝে  
অলিছে অসংখ্য ঝাড় নক্সত্রের মত ।  
উহার প্রত্যেক দ্বার, প্রত্যেক গবাক্ষ  
শোভিছে কি মনোহর আলোকের হারে,  
শ্রামল পল্লবে, কুলে ফুটন্ত কমলে ।  
বহুজনাকীর্ণ পুরী, সকলেরি মুখে  
বিবাদ-কালিমা-চিহ্ন, এ আনন্দ দিনে  
কেন এত নিরানন্দ ? ঘোর মর্ম্ম হুঃখে  
এক জন পোড় বসি অলিন্দ উপরে  
জিজ্ঞাসিছে অন্ত জনে “বড়ই আশ্চর্য্য,  
কোথা গেল হতভাগা রত্নজী এখন ?  
কোন্ হুঃখে বল দেখি বিবাহের দিন  
হ’ল দেশভ্যাগী আহা শোকের সাগরে  
ডুবাইয়া চিরতরে হুঃখিনী জননী ?  
ডুবাইয়া চিরতরে বিচ্ছেদ পাথরে  
নবপরিণীতা এই বালিকা হুঃখিনী ?”  
“তাইত ত” দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল বিবাদে  
“এ কেমন ব্যবহার ? মানব-চরিত্রে  
সম্ভবে কি এ হুঃখা ? বস্ত্র পণ্ড যাহে  
বিরত, সে কার্য্যও কি মানব ইন্দ্ৰিয় ?  
অসম্ভব তাহা ; হি হি রত্নজীর কথা  
ভাবিলে ঈশজ্ঞে হৃদে দৃশ্য ভয়ঙ্কর ।”

আবার প্রথম ব্যক্তি কহিতে লাগিল  
“অই দেখ সকলেই এ’সেছে কিরিয়া  
একে একে, কোন স্থানে পাইল না তারে ।”  
আবার দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল বিবাদে  
“বোধ হয় হতভাগা কিরিরে না আর ।”

সকলেই শোকাকুল, সবরি নয়নে  
অশ্রুজল, রত্নজীর জননী হুঃখিনী  
ঘোর উন্মাদিনী প্রায় পড়িয়া ভূতলে ।  
হুইজন বর্ষায়সী বিধবা রমণী  
ধরি তারে কত যত্নে নয়নের জল  
মুছাইছে, প্রবোধিয়া হুঃখিনীর মন ।  
অই যে অদূরে আরও দৃশ্য সন্ধান ।  
ভূতলে সুবর্ণলতা অথবা দামিনী  
মেঘ-ভ্রষ্ট, কিম্বা ছিন্ন সুবর্ণ-কুসুম—  
—অই নব বধু, অই পড়িয়া ভূতলে  
ভগ্ন-হৃদে অবিরত করিছে রোদন ।  
এলো খেলো কেশগুচ্ছ ভুজঙ্গিনী প্রায়  
করিতেছে কি মধুরে চরণ চুম্বন ।  
হেরি শ্রদ্ধামার দশা হৃদয়ে তাহার  
বহিতেছে প্রলয়ের ঝটিকা ভীষণ ?  
নবীনা প্রবীণা বহু সধবা বিধবা  
তুষিছে বধুরে কত মধুর বচনে ।  
কেহ আসে, কেহ যায়, কেহ বা বসিয়া  
“আহা উহ” করি কত সন্ধান করে  
জানাইছে হৃদয়ের গভীর বেদন ।  
চারি দিক্ একশ্লিষ্ট জন কোলাহলে ;

হেন কালে “চুপ চুপ” শব্দ শ্রুগভীর  
উঠিল, যুহুর্ভে সব হইল নীরব।  
হৃদয়ের অনিবার্য ঘোর কুতূহলে  
যুবা বৃদ্ধ সকলেই দেখিল চাহিয়া  
সম্মুখে যাদব ব্রাও উদ্ভাদের মত  
রক্তবর্ণ আধিভয় নত অশ্রুভারে,  
বিষাদের মূর্তি ঘেন গভীর মলিন।  
রক্তজী-জননী যে’য়ে ধরিল। যাদবে  
ক্রুত বেগে, কেঁদে কেঁদে কহিতে লাগিল।  
কোথা রেখে আলি বাছা ঘোর হৃদি-মনি,  
না দেখি তাহার মুখ বল দেখি আজি  
কেমনে বাঁচিবে তার ছুঃখিনী জননী ?  
কেঁদে কেঁদে ভগ্ন-হৃদে কহিলা যাদব  
“মা আমার যুবা আর ক’দিও না তুমি।  
মহা পাপী আমি, মাগো’না বুঝিয়া হায়  
এ ঘোর বিপদ রাশি এনেছি ডাকিয়া।  
আমারি আশ্বাসে তুমি এ শোক-সাগরে  
নিপতিত, শ্রি তাহা হৃদয়ে আমার  
শতধা বিদীর্ণ আজি, অদৃষ্টের দোষে  
ভেবেছি এক, তাহে হইল মা আর।  
নহে এক দিন মাগো বহুদিন আমি  
রক্তজীর হাব ভাব করি নিরীক্ষণ  
বুঝিলাম অভাগার ভবিষ্য-জীবন  
ঘোর অন্ধকারময় লবঙ্গ বিহনে।  
কি করিব ? অবশেষে দেশ পর্যাটনে  
চলিহু রক্তজী সনে, আমি নানা দেশ  
দেখিলাম এক দিন প্রভাত সময়ে  
কোলাপুরে, বনিকোষ্ঠ বনস্তের গৃহে  
লবঙ্গের খরে তার চিনিকার আমি।  
ছিল সে গবাক্ষ-পাশে ; রক্তজীর পানে

অভাগিনী গেল চলি বিছাডের মত  
আধারি গবাক্ষ ; হায় রক্তজীর-সনে  
রহিহু বসিয়া সেই ভটিনীর তীরে।  
বহুকণ এই ভাবে হইল অতীত,  
তবুও সে অভাগিনী, আসিল না কিরে  
কণ তরে আর সেই গবাক্ষের পাশে।  
বহু কষ্টে পুনঃ আমি যাইয়া সেখানে  
দেখিলাম ছুঃখিনীরে, হায় অভাগিনী  
কত যে ক’দিম মাগো দেখিয়া আমারে।  
কত কষ্টে আমি তোর বাধা অবহে’লা  
করিহু লবঙ্গ স্থির,— দিহু পরিণয়।  
ভেবেছিহু বিবাহান্তে রক্তজী যখন  
দেখিবে এ ছুঃখিনীরে, বুঝিবে তখন  
অভাগা যাদব তার বাক্যব কেমন ?  
নাহি জানিতাম সেই হৃদয়ের সাধ  
চিরকাল হেন ভাবে হৃদয়েই র’বে।  
না হ’তে মিলন এই অশনি-সম্পাত  
হইবে অচিরে মাগো কে জানিত কবে ?  
তন্ন তন্ন করি আমি সমস্ত শরীরী  
খুঁজিয়াছি, কোন স্থানে না পাইহু তারে।  
কিন্তু এই পত্রখানি পাইয়াছি আমি  
উপাধান নিয়ে মাগো বিছানার ধারে।”  
“পড় বাছা,” ভগ্নধরে-লুটাইয়া তুমে  
রক্তজী জননী আহা কহিলা ক’দিয়া  
বাকুল হৃদয়ে ; ঘোর ভূষিত নয়নে  
যাদবের পানে সবে রহিল। চাহিয়া।  
যাদব সম্মুখেন্ত্রে পড়িতে লাগিল।—

১

বে পাপ করেছি মাগো না বুঝিয়া হায়,  
চলিলাম প্রাণচিহ্ন করিতে তাহার।

কত বসে কত বসে মইব নাথান  
তবু বাগো গৃহবাগি হইব না আর ।  
কুবি ত জান না বাগো সবদের মনে  
বে প্রতিজ্ঞা ক'রেছিল তব এ সত্যান ।  
মরিবু নাথিতে তাহা ভোমারি কারণে  
প্রতিজ্ঞা তব বাগো আবার এ'প্রাণ ।  
এ কর্ত্তে জানবাক্য পবিত্র নির্বাক  
সবদেরি সাজে তাহা আবি পাণী ঘোর ।  
কলঙ্কিত জারে আবি করেছি কেবল  
তাই বা বিদার মাগে এ সত্যান ভোর ।

( ২ )

কুবি ত জান তা বাগো পিতা বর্জনানে  
কি প্রতিজ্ঞা করেছিল সবজ-জননী ।  
সেই হ'তে আবারে উভয়ের প্রাণে  
বহিত নীরবে পুত-প্রেম তরঙ্গিনী ।  
উভয়েই বর্গবানে গেছেন চলিয়া  
ভুবাইয়া আবারে এ দুঃখ সাগরে ।  
সবক ত চ'লে গেছে আবারে ত্যজিয়া,  
আরিও চলিবে আজি এ জনের তরে ।  
কুবি ত জান না বাগো প্রাণের ব্যথা  
কি কটে জীবন আবি করেছি বাপন,  
স্বপ্নের প্রতিভারে বিদারের গাঁথা,  
নির্জনে বসিয়া কত করেছি রোনন ।

( ৩ )

তাই বা সত্যান ভোর চরণে বসিয়া  
কাজের বিদার মাগে জাসি অশ্রুধরে ।  
পাবে না, আবারে তুবি অগত খুঁজিয়া  
প্রতিজ্ঞা হ'বে বাগো দূর বিদ্যাচলে ।  
সেই স্থানে—সেই ঘোর নিবিড় কাননে  
সবদের দূর বাগি কবিয়া সুরণ ।  
সেবাদিসেবকের সেই পবিত্র চরণে  
বিস্তারিত হাসি বুকে ও পাপ-খীরন ।  
কিন্তু তা একটি ভিত্তি জোয়ার চরণে,  
অসর্বক হি'ড়ে এক কুসুম-কলিকা  
এ জনের বস্তু জারে বসিলে জীবনে ।  
সে কি জানে?—সে যে বাগো অখণ্ড বাসিকা ?

( ৪ )

অভাগীয়ে চিরবিষ করিও কতন  
কাদিলে মুক্তির বিধ অশ্রুধর জলে  
বসিও তাহারে মাথো কুলিরে আশ্রয়  
সবদের নাম বেন জপে অনিবার ।  
আপন অস্তিত্ব বুছে সবদের মনে  
যদি সে বিশিষ্টে পারে সাধনের বলে,  
পাইবে আবারে সেই পবিত্র জীবনে  
বহুদূর—বিদারের চরণের ডলে ।

শেষ হ'ল পত্র পাঠ, নীরবিলা যত্ন ।  
উজ্জ্বলে উজ্জ্বলে কত ক'দিতে লাগিলা  
রত্নজী-অমরী, মরি সবক হুঁশিরা  
একটি চীৎকার দিরা বিদ্যাতের বেগে  
মুন্ডিয়া পড়িলা কুমে, বিষম বিজ্ঞাট  
বীথিল, রজনী কুম্ব মূর্ত্তির মাঝে  
শশব্যস্তে সবদেরে কুলিয়া যতনে  
মুন্ডিত গোলাপ জল প্রদানিলা শিরে ।  
কেহ বা অজনি তারি স্নিগ্ধ-বারি-রাশি  
নয়নে বসনে মতে ছিটাইলা বীরে ।  
বীরে বীরে প্রত্যাহার শিশির-অস্তিত্ব  
সরৎ সোহাগিনী প্রাণ মেলিলা মরুত  
অভাগিনী, পুত্ৰপানে রহিলা চাহিয়া ।  
কত লোক কত রূপ আশ্রয়-বচন  
প্রবোধিলা উভয়েরে, কিন্তু সে আশ্রয়ে  
আরো যে ক'দিলা জোরে, বহুজন পরে  
বসিয়া উভরে, মিলে প্রাণের ভিতরে  
প্রবীণা রজনী কুম্ব । সেবিত্ত সেবিত্ত  
পতীর—পতীরতর হইল বাসিনী ।  
নীরব হইল বিধ, একে একে  
সেমা চলি সকলেই মরুত বসিতরে ।

বহু রোদনের পর রক্তাক্ত-করমী  
 ক্রান্ত দেখে, ধরি করে হুঃখিনী লবঙ্গ  
 স্নেহ করে, ধীরে ধীরে লড়িল। বিজ্ঞান  
 নিজার কোমল কোমল, তুলি শোক হৃৎ  
 সংসারের হৃৎবিহীন যন্ত্রণা ভীষণ।  
 ঘুমাইল জীবজন্তু, নীরব অবনী ;  
 সংসারের কোলাহল করি বিহীনিত  
 ঘুমাইল ধীরে ধীরে প্রকৃতি রমণী।  
 ঘুম-ঘোরে অত্যাগিনী লবঙ্গ লড়িকা  
 দেখিতে লাগিল। এক বয়স ভরসার।  
 ত্রিদিব হইতে যেন এক রক্তাক্ত  
 ধীরে ধীরে মর্ত্যধারে নামিতে লাগিল,  
 সেই সিংহাসন পরে সুধেন্দুর লম  
 জ্যোতির্ময়ী মূর্তি এক, রূপের কিরণে  
 উদ্ভাসিত দশ দিক, উজ্জল ছবন।  
 হুঃখিনী লবঙ্গ লতা চিনিলা তখনি  
 সেই মূর্তি, এ যে সেই করুণারূপিণী  
 জননী তাহার ; হুঃখিনী দেখ জ্যোতিঃ  
 ধীরে ধীরে সেই মূর্তি নামিল ভূতলে।  
 লবঙ্গের হস্তে ধরি উঠাইলা তারে  
 রক্তাক্ত, ছবি তার গ্লান মুখ ধানি।  
 ধীরে ধীরে উর্ধ্বদিকে উঠিতে লাগিল  
 রক্তাক্ত, বাহু বেগে চলিল গগনে  
 কি সুন্দর, পূর্বাকাশে উদিল তপন  
 অর্পোজ্বল, রক্তি রিক্ত সুবর্ণ কিরণে  
 উদয় অচল শূল, নিরুজ-কাননে  
 ধরিল। বিহীন হৃৎ প্রত্যাহত-লগ্নীত  
 বধুর, অর্প-রক্ত চলিল গগনে  
 ধীরে ধীরে অত্যাগিনী বাহুর লগ্ন।  
 কত বেশ কত নবী কত কুজবন

অরণ্য শেখর কত কেলিলা পশ্চাতে  
 ক্রমে রথ জড় বেগে উঠিতে লাগিল।  
 দেখিল। সম্মুখে এক দৃষ্ট ভরসার,  
 অনন্ত অসীম সিদ্ধ, মুহু সমীরণে  
 হিলোলিত, করোলিত ; বালার্ক কিরণে  
 অনল-সমুদ্রে যেন, নাহি বেলা ক্রমি,  
 চারিদিকে সীমা শূন্য শুধু অমুরাশি  
 “কল কল” শব্দে সদা গঞ্জিছে ভীষণ।  
 কত জলচর পক্ষী উড়িছে সুন্দর  
 থাকে থাকে, সমুদ্রের বিশাল উরসে।  
 এইরূপে বহুপথ করি অতিক্রম  
 অপরাহ্নে, স্বর্ণ রথ উত্তরিল। আমি  
 স্বর্ণের ছায়ায়, কত দেব বালা আমি  
 সস্তাবিলা উত্তরে, অবতরি ধৌহে  
 সেই স্থানে, স্বর্ণ ধামে করিলা প্রবেশ  
 মহানন্দে, কি সুন্দর রমণীর দেশ,  
 নাহিক উপমা তার, চারু মন্দাকিনী  
 রজতের রেখা আর “কল কল” তানে  
 বহিতেছে কি সুন্দর, অমৃতের আর  
 সুনিষ্ক সলিল তার দেবতা বাহিত।  
 হুই তীরে মনোহর প্রাসাদ নিচর  
 সমুজ্জল, সুনির্মিত অধি মরকতে।  
 স্থানে স্থানে কুজবন, লতা গুল কত  
 বেড়িয়াছে কি সুন্দর স্বর্ণ বিমণ্ডিত  
 ধন্যশালা, কত শত সুখ-সরোবর  
 অমুগম, সুশোভিত কুহু কহিলারে।  
 প্রসন্ন সুন্দর পথ সমরোখা আর  
 শোভিতেছে কি সুন্দর, হুই পার্শ্বে তার  
 সুহু সুহু পুষ্প তর, নীল পীত লগ্ন  
 স্বর্ণীয় কুহু কত সেই তরু শিরে।

হুই ধারে এই সব তরুর পশ্চাতে  
 সুবর্ণ শুভ্র কক শোভিছে সুন্দর  
 জ্যোতিষ কি সুদৃশ্য নয়ন-রঞ্জন ।  
 অসংখ্য দেবতা বুল কঠে কুল-মালা ;  
 শিরোদেশে সুবাসিত কুসুম-নির্মিত  
 শিরত্ৰাণ, বক্ষোদেশে শুভ্র উত্তরীয়  
 বিনির্মিত ত্রিদিবের কুসুম-পরাগে ।  
 হাসিছে খেলিছে সবে প্রাণের উল্লাসে  
 পথে ঘাটে মাঠে ধারে নিকুঞ্জ কাননে ।  
 নাহি হেথা জরা যুতা বিপদ আপদ,  
 সকলেই সুখী হেথা, সরস বসন্ত  
 নিত্য বিরাজিত এই ত্রিদিব নগরে ।  
 সুবাসিত সমীরণ কুসুমের রেণু  
 মাখি জ্বলে, এক ভাবে সত্যত সঞ্চারে ।  
 নাহি হেথা কক পক্ষ, পূর্ণ সুধাকর  
 বিতরে কৌমুদী সুধা সমস্ত ঘামিনী  
 কেমন মধুরে, আহা কুলে জলে কলে  
 যুকুলে পল্লবে মরি কি শোভা বিকাশে  
 সেই রশ্মি, দেব বুল প্রাসাদ শিখরে  
 কুল বনে নদী তীরে করিয়া ভ্রমণ  
 লাবা নিশি ভুজ্জে সেই স্বর্ণ সুধরাশি ;  
 চলিলা নীরবে দৌড়ে আনন্দিত জ্বলে ;  
 বেধিলা অদূরে এক সুরমা প্রাসাদ  
 হীরক নির্মিত, শত মার্ভজের প্রায়  
 বলনিছে কি সুন্দর ধাঁড়িয়া নয়ন ।  
 অত্যন্তরে কারুকার্য হীরক প্রাচীরে  
 হীরকের ভেত্রে কত লতা পাতা কুল  
 ত্রিদিবের ব্রহ্মলুপ্ত প্রান্তর রতনে  
 বিনির্মিত, প্যাসবর্ণ পল্লবের কলে  
 লোহিত বরণ পুষ্পে মরি কি সুন্দর

শুভ্রে শুভ্রে চারিদিকে নয়ন রঞ্জন ।  
 কত শত সমুজ্জল কক সমোহর  
 সেই প্রাসাদের বক্ষে, পাখি মলাকিনী  
 “কুল কুল” তান বরি গাইছে সঙ্গীত  
 সুললিত, প্রকালিরা এতোক হিলোলে  
 সেই প্রাসাদের শুভ্র পবিত্র চরণ ।  
 নিকটেই মনোহর ধর্মের মন্দির  
 অতি উচ্চ, চারিদিকে কুসুম উজ্জান ।  
 নানাবর্ণ প্রকৃতি কুসুম নিচয়  
 হাসিতেছে বৃন্তে বৃন্তে, পড়িছে বরিরা  
 রাশি রাশি মন্দিরের পবিত্র চরণে ।  
 সমুখে অবত কুণ্ড, বিন্দু মাত্র সুধা  
 এ কুণ্ডের পান করি অতি বৃদ্ধ জীব  
 মুহূর্তে লভয়ে মরি অনন্ত যৌবন ।  
 মন্দিরের বহু উচ্চ কোটি সূর্য্য প্রায়  
 বিধাতার সিংহাসন বলিছে সুন্দর  
 আলোকিয়া স্বর্ণধাম, তাহার আভার  
 কোটি সূর্য্য, কোটি চন্দ্র, কোটি কোটি তা  
 এহ উপগ্রহ কোটি আলোকিত সদা  
 গগন মণ্ডলে, স্নিগ্ধ সৌরভে তাহার  
 আমোদিত স্বর্ণপুরী, সেই সৌরভের  
 কণামাত্র সুবাসিত সমগ্র কুসুম  
 ত্রিদিবের, দেবকুল আশ্রয় হাছে ;  
 কি আছে তুলনা তার এ মহীমণ্ডলে ?  
 ত্রিদিবের প্রকৃতি একটি পুষ্পের  
 সূর্য্যোত্তে সুবাসিত রাশি রাশি কুল  
 মরতের, নর নারী বিবুধ বাহাতে ।  
 অদূরে কি শোভার নয়ন কানন  
 দেবতাবাহিত শিখ কোকিল-কুজিত  
 কুসুমিত সুধরিত রিহন-সঙ্গীতে ।



বসন্তের লীলা ক্ষেত্র : নিত্য প্রকৃতি  
 স্বর্গীয় কুসুম রাশি, চামেলী চন্দ্রক  
 মালতী মতিয়া বেলী গোলাপ টগর,  
 বকুল রজনী-গন্ধা জুই হাসনা-হেনা  
 আরো কত পুষ্প, স্নিগ্ধ গৌরভে যাহার  
 অমৃতের উৎস ফুটে পবনের স্তরে।  
 পারিজাত শতদল কুসুম কল্লার  
 কি সুন্দর অবিরত রয়েছে ফুটিয়া  
 সেই বনে, নানাবর্ণ কুসুম স্তবকে  
 সুসজ্জিত তরু রাজি, স্থানে স্থানে কত  
 নিখরিনী, ঝর ঝর ঝরিছে সত্তত  
 বারি ধারা নির্মাইয়া হীরক রঞ্জিত  
 অগণিত অকুটস্থ ফুল রাশি রাশি।  
 কোথা বা সুবর্ণ বৃক্ষ, পল্লব নির্মিত  
 মরকতে, সুশোভিত হীরকের ফুলে।  
 কোথা বা রজত লতা-আলিঙ্গি' সে তরু  
 উঠিয়াছে, ফুটিয়াছে স্তবকে স্তবকে  
 অগণিত মুক্তানিত কুসুম সুন্দর।  
 স্বর্গীয় বিহঙ্গ কত সুবর্ণ-বরণ  
 বসি অই তরু-শাখে গাইছে সঙ্গীত  
 মধুময়, সেই স্বরে রাশি রাশি ফুল  
 ফুটিছে ঝরিছে কিবা শোভা মনোহর।  
 রজত-নির্মিত রম্য বকুল বিতানে  
 সুবর্ণ ব্যাপিয়া, কোথা সুবর্ণ বউরী  
 শ্রামা ঘুঘু, সুবর্ণের বউ কথা কও  
 গাইছে স্বর্গীয় গান, কোথা স্বর্ণ-বৃক্ষে,  
 নীলকান্ত বিনির্মিত বুলবুল মণিয়া  
 খেলিছে মনের সুখে, কোথা বা আনন্দে  
 গাইতেছে নাচিতেছে স্বর্ণ কপোতিনী।  
 কোথা স্বর্ণ শিখী বৃন্দ অশ্বখের শাখে

নাচিছে শিখিনী সনে ঘুরিয়া ফিরিয়া  
 বিস্তারে বিচিত্র পাখা নয়ন-রঞ্জন  
 হিনির্মিত নানা বর্ণ সুরমা প্রান্তরে ;  
 কোথা বা আনন্দে বসি সুবর্ণের শাখে  
 রক্ত পীত নীল বর্ণ কোকিল নিচয়  
 গাইছে স্বর্গীয় গান, বিমুগ্ধ ত্রিদিব  
 সে সঙ্গীতে, প্রতিধ্বনি জাগে দূর বনে।  
 কোথা বা সরসী জলে হেলিছে ছলিছে  
 চন্দ্রকান্ত বিনির্মিত কুল শতদল  
 বসন্তের মধুমাখা স্নিগ্ধ সমীরণে।  
 পারি বিনির্মিত চারু শ্যাম দুর্বাদল  
 শোভিতেছে কি সুন্দর প্রবাল কুসুমে।  
 উজ্জল রজত বর্ণ মুক্তা নিখরিনী  
 ঝরিতেছে ঝর ঝর, অসংখ্য মুক্তা  
 ধীরে ধীরে সেই সঙ্গে চ'লেছে ভাসিয়া।  
 কত দেব-বালা সেই নিখরিনী-তীরে  
 বসিয়া আনন্দে সেই মুক্তা মনোহর  
 তুলিতেছে, গাঁথিতেছে মালা সমুজ্জল  
 মুনিজন মনোলোভা, কেহ বা সে মালা  
 পরি গলে, প্রেম-মদে মাতিয়া উন্মাদে  
 ভ্রমিতেছে কান্ত সনে নিখরিনী-তীরে।  
 কেহ বা গাঁথিয়া মালা সন্মিত বদনে  
 পরাইছে কত যত্নে দয়িতের গলে।  
 কোথা বা অমৃত বৃক্ষ শোভিছে অমৃতে  
 বার মাস, কোথা লেচু, কোথা বা আতুর  
 কোথা বা বেদানা পেস্তা, কোথা বা বদরী  
 কোথা বিব, কোথা জাম, কোথা বা বর্জুর,  
 কোথা বা পনস আতা, কমলা পেরারা,  
 কোথা টঙ্ক নারিকেল, আরো কত বৃক্ষ  
 স্মৃষ্টি স্বর্গীয় ফলে শোভিত সত্তত



সে নিকুঞ্জে, নানা জাতি বিহগ নিকর  
 বসি সেই বৃক-শাখে গাইছে সঙ্গীত  
 বরষি পীযুষ রাশি পবনের স্তরে ।  
 দেব কুল ছুঁই মনে আমি এ নিকুঞ্জে  
 অবিরত, ফুল ফল করিছে চরন ।  
 স্থানে স্থানে কি স্নন্দর অমৃতের উৎস  
 করিতেছে, দেব-বালা আসি দলে দলে  
 পিইছে সে সুধা রাশি, গাইছে সঙ্গীত  
 মুখরিত করি সেই নিকুঞ্জ-কানন ।  
 কত দেব-বালা দেব-যুবকের সনে  
 খেলিছে, সমস্ত দেহ সজ্জিত কুমুমে ।  
 কত পরী কস্তা, পরী যুবকের সনে  
 অমিছে আনন্দে, যেন প্রসূনে প্রসূনে  
 কি মধুর সংমিলন দৃশ্য অমুপম ।  
 “কারা মা এতক কস্তা ?” ছুঁখিনী লবঙ্গ  
 জিজ্ঞাসিল। জননীয়ে, সাদরে জননী  
 উত্তরিল। “মানবের নিপ্পাপ সন্তান  
 শিশু কালে মরে যারা তাহারাই মাগো  
 দেব-কস্তা, দেব যুবা ত্রিদিব নগরে ।  
 ধর্মাত্মা মানব যত মরণের পর  
 দেব-বেশে স্বর্গে এসে সদা বাস করে ।”  
 নানা রূপ দৃশ্য রাশি দেখিতে দেখিতে  
 অমিতে লাগিল। বালা সে মজু কাননে ।  
 কত যে বিস্মৃত স্মৃতি ছুঁখিনীর মনে  
 জাগিতে লাগিল, বালা হইলা বিহ্বল  
 শোকাবেশে, অশ্রু বিন্দু শোভিল নয়নে ।  
 একটি সুবর্ণময় অম্পট মুরতি  
 পুনঃ পুনঃ পড়িতেছে ছুঁখিনীর মনে ।  
 সহসা ছুঁখিনী আহা দেখিলা অদূরে  
 রক্ত-নির্মিত এক বাউ বৃক তলে

রক্তজী দাড়ারে ধীরে দেখিছে তাহার  
 রূপ রাশি, নেত্র কোণে খেত পুষ্প সম  
 ছুঁই বিন্দু অশ্রু জল রয়েছে কুটিয়া ।  
 পশ্চাতে চাহিলা বালা, দেখিলা তখন  
 ছুঁখিনী জননী তার রয়েছে স্নদুরে  
 নিকুঞ্জের অন্তরালে, অমনি বালিকা  
 রক্তজীর কণ্ঠদেশ ধরিল। যাইয়া ।  
 ছুঁও জন মুখ চিত, অজ্ঞাতে রক্তজী  
 চুপিল। সে বালিকার অলস অধরে ।  
 রক্তজীর কণ্ঠ দেশে ছুঁখিনী বালিকা  
 রাশি শির, অভিমানে কাঁদিতে লাগিল।  
 নীরবে, প্রেমাত্ম ধারা কপোল বহিয়া  
 পড়িতে লাগিল ধীরে রক্তজী-হৃদয়ে ।  
 উত্তরেই আশ্রয়, স্পন্দনহীন দেহ,  
 নীরবে প্রসূর প্রায় রহিলা চাহিয়া  
 উত্তরেই, উত্তরের মুখ-ইন্দু পানে ।  
 উত্তরেই প্রেম-অশ্রু কপোল বাহিয়া  
 ঝরিতে লাগিল শ্রিত পঙ্কজ-নয়নে,  
 ঝরে যথা মুক্তা প্রায় প্রভাত-শিশির  
 উদে যবে তিমিরারি উদয়-অচলে ।  
 হেন ভাবে বহুক্ষণ হইল অতীত ;  
 উত্তরেই ধীরে ধীরে অমিতে লাগিল।  
 সেই বনে, কত শোভা দেখিতে দেখিতে  
 নিকুঞ্জের প্রান্ত দেশে উত্তরিল। আসি  
 আশ্রয় প্রাণে ; দৌহে দেখিলা তখন  
 স্বর্গের অনতিদূরে অনল-সমুদ্র  
 ধক্ ধক্ জলিতেছে, পাপাত্মা মানব  
 কোটি কোটি, অতি কষ্টে ভাসিছে ডুবিছে  
 সে-সমুদ্রে, উগ্রমূর্তি শমন-বিধর  
 ভীষণ লণ্ডাঘাতে চূর্ণিছে মস্তক

ভাহাদের, বর বর খোঁপিতের ধারা  
 করিছে সে প্রজ্জ্বলিত অনল-সাগরে ।  
 অভাগারা যন্ত্রণায় ছট কট করি  
 চাহিলে পানীর, আহা যম-কিঙ্কর  
 পুরীষ মিশ্রিত মৃত্র প্রদানে সবারে ।  
 কোথা বা ভীষণ মূর্তি অগ্নি-অজগর  
 বদন ব্যাদন করি প্রাণিছে যুহুর্ভে  
 অসংখ্য পাপাশ্রা নরে, কিছুক্ষণ পরে  
 উদ্গারিয়া পুনর্ব্বার ফেলিছে সকলে ।  
 কোথা বা লম্পট নরে ধরি ভীম বলে  
 যম-ভৃত্য শিখদেশ কাটিছে তাহার  
 তীক্ষ্ণ ছুরিকায়, রক্ত ঝরি অবিশ্রান্ত  
 অভাগারা মুহূর্হ হইছে মূর্চ্ছিত ।  
 আবার যুড়িছে, হায় কাটিছে যুড়িছে,  
 এইরূপ অমুক্ণ কাটিছে আবার,  
 প্রদানিতে তুর্কিবহ যন্ত্রণা ভীষণ  
 মোহ-মূর্খ খেচ্ছাচারী লম্পট মানবে ।  
 কোথা বা অনল-সিংহ গর্জিয়া ভৈরবে  
 আক্রমিছে পাপী নরে ছিন্ন ভিন্ন করি  
 স্তনীক দশনাঘাতে—কি দৃশ্য ভীষণ ।  
 কোথা বা শমন-দূত স্তনীক তরাতে  
 কত শত পাপী নরে বিখণ্ডিত করি

কাটিতেছে, যুহুর্ভেকে যুড়িছে আবার ।  
 কোথা বা কৃতান্ত চর প্রবঞ্চক নরে  
 বীথিয়া শৃঙ্খলে জিহ্বা কাটিছে তাহার  
 তীক্ষ্ণ অস্ত্রে, রক্তধারা বর বর করি  
 ঝরিছে তিতিয়া বক্ষ, ঘোর যন্ত্রণায়  
 অভাগারা অবিরত করিছে রোদন ।  
 কোথা বা তক্ষর বৃন্দে বেড়িয়া সজোরে  
 অসংখ্য অনল-সর্প করিছে দংশন ।  
 নরকের এই সব দৃশ্য ভয়ঙ্কর,  
 নিরখিয়া অভাগিনী কাদিতে লাগিল  
 আতঙ্কে ; সহসা সেই অনল-সমুদ্র  
 আলোড়িয়া, উছেলিয়া সেই অগ্নি রাশি  
 উঠিল। যুহুর্ভে এক মূর্তি ভয়ঙ্কর ।  
 করে খড়া, পৃষ্ঠে চর্ম্ম, কটিতে কুপাণ ;  
 ভীষণ বিক্রমে আসি ধরিল। লবঙ্গ  
 সেই মূর্তি, যুহুর্ভেকে আতঙ্কিত হৃদে  
 দেখিল। লবঙ্গ, সে যে মহা ভয়ঙ্কর  
 সিদ্ধজীর উগ্রমূর্তি, বিকম্পিত হৃদে  
 “রত্নজী” বলিয়া বাল। উঠিল। কাদিয়া ;  
 ভাজিল ঘূমের ঘোর ভাজিল স্বপন,  
 দেখিল। রজনী অস্ত্রে গবাক্ষের পথে  
 পলিয়াছে কি সুন্দর বালার্ক-কিরণ ।

## ষাষিংশ সর্গ [ সেভারা ; রাজপ্রাসাদ ]

সুগভীর তরুণিনী, সুনীল গগনে  
 অসংখ্য তারকা রাজি শোভিছে সুন্দর  
 হৈম বেশে, যেন নীল পর্যাধির জলে  
 ভাসিছে কনক-পদ্ম, অথবা ত্রিদিবে  
 উজ্জল প্রদীপ-রাজি অলিছে সুন্দর  
 ঘরে ঘরে ফটিকের স্বচ্ছ দীপাধারে,  
 কিংবা বহু উৎকর্ষ নৈশ নিখর গগনে  
 ছলিতেছে কোটি কোটি রক্ত মনোহর,  
 বলমলি, বিধাতার সিংহাসন তলে !  
 স্পন্দহীন জীবজন্তু, নীরব অবনী ।  
 ঘুমন্ত-প্রকৃতি দেবী ; প্রহরীর প্রায়  
 সুশীতল নৈশ বায়ু রহিয়া রহিয়া  
 সঞ্চরিছে ; ঢলু ঢলু ঘুমন্ত যামিনী ।  
 এ ঘোর নিশিতে অই কৃষ্ণার সৈকতে  
 বিতল প্রাসাদে উচ্চ কক্ষের ভিতরে  
 অলিছে প্রদীপ এক, কোমুদীর প্রায়  
 উহার একটি রশ্মি গবাক্ষের পথে  
 বাহিরিয়া শূন্যে শূন্যে মিশিছে আধারে ।  
 সুসজ্জিত কক্ষ : অত্র ছলিছে প্রাচীরে  
 প্রেমীমত, এক পার্শ্বে সুবর্ণ পর্য্যবে  
 শাসিত একটি যুবা, বীর অবয়ব,  
 নিমিলিত নেত্রয়, কালিয়া মণ্ডিত  
 যথাক্রমে ভাস্কর জিনি বদন ভাস্কর ।  
 প্রবল বিকার করে সংজ্ঞাহীন যুবা,  
 বিকল্পিত হৃদি, মরি নিশ্বাস প্রথাস  
 ঘন ঘন প্রবাহিত, চকলা ধমনী ।  
 আলোকিত সেই গৃহ রূপের কিরণে

পদ-প্রান্তে জ্যোতির্ময় একটি রমণী,  
 সৌন্দর্য্য সরসে যেন স্নগা বিমণ্ডিত  
 অনাজাতা-অর্ধফুট স্বর্ণ-কুমুদিনী ।  
 যুবতীর স্বর্ণোজ্জল বদন-উৎপলে  
 পড়েছে বিবাদ রেখা, ললাট-দর্পণে  
 বিন্দু বিন্দু শ্বেদ রাশি, মরি কি সুন্দর  
 স্বরদেব-স্বর্ণাসন খচিত রতনে ।  
 যুবতী বিষন্ন হৃদে বসিয়া নীরবে  
 নিরখিছে যুবকের বদন পাণ্ডুর ।  
 যুবতীর ভয় হৃদে কি বড় ভীষণ  
 বহিছে, শোভিছে ক্লম নেত্র-নীলোৎপলে  
 হুই বিন্দু অশ্রুবারি বল মল করি  
 স্নানিষ্ক প্রদীপালোকৈ মুকুতা সুন্দর ।  
 গভীর নিশীথ কালে ঘুমন্ত জগতে  
 এ পবিত্র প্রেম-চিত্র কত মনোহর ।  
 যুবতীর স্বর্ণ-ভূজ, কক্ষ কেশ দামে  
 অঙ্ক' অনাবৃত কুচ মন্থ-মুকুটে  
 প্রদীপের স্নিক আভা অলিছে সুন্দর ।  
 পাঠক, চিনেছ এই যুবক-যুবতী ?—  
 —সেই যে সায়াহ্ন কালে উদ্ভান-প্রাক্ষণে  
 ফেলিয়া এ'সেছ যারে ঘোর অচেতন,  
 দম্ভাদের অজ্ঞাঘাতে রক্ত বরিষণে  
 হ'য়েছিল যে যুবার সুমুখ জীবন ;  
 সেই বিশ্বনাথ এই, কোমুদী যুবতী ।  
 ভীষণ বিকার করে কত যে প্রলাপ  
 বকিছে যুবক, কত স্বপ্ন ভয়ঙ্কর  
 নিরখিছে মুহূর্ত্ত ; কত বা সজ্ঞাথে

উঠিয়া বলিতে চাহে শস্যার উপরে।  
 কত বা আরক্তনেত্রে উঠিছে গর্জিয়া  
 নতু কড়মড়ি, কত হাসিছে, কান্দিছে  
 এইরূপে দণ্ডে দণ্ডে অবস্থা রোগীর  
 বিবস্তিত ; অকস্মাৎ উঠিল কান্দিয়া  
 উঠেবরে নিরখিয়া বিভীষিকাময়  
 একটি ভীষণ স্বপ্ন, মুহূর্তে কোমুদী  
 ধরিলা যুবার গলে সজল নয়নে।  
 অদূরে কক্ষের মাঝে যবনিকা-আড়ে  
 গ্রানমুখী বর্ষায়নী ছুইটি রমণী  
 অর্ধ নিমিলিত নেত্রে রয়েছে শুইয়া।  
 উভয়েরি মুখ-প্রান্তে বিষাদের রেখা  
 প্রকটিত, হৃদি যেন গিয়াছে ভাঙ্গিয়া।  
 অদূরে সংলগ্ন এক ক্ষুদ্র কক্ষ মাঝে  
 এক জন বহুদর্শী ভিষক প্রবীণ  
 বসি এক স্বর্ণাসনে, পঠিছে নীরবে  
 প্রাচীর চিকিৎসা গ্রন্থ, কিছুক্ষণ পরে  
 উঠিল ভীষকবর, স্বর্ণ বিমণ্ডিত  
 হিরদ রদ নিম্নিত বাক্স খুলিয়া  
 ক্ষুদ্র এক শিশি বৃথ করিলা বাহির ;  
 সেই শিশি হতে ছুটি ক্ষুদ্রতম বড়ী  
 প্রদানিয়া বিশ্বাসের \* জননীর করে  
 কহিলা ভীষকবর “দ্বিতীয় প্রহর  
 নিশি এবে, অবশিষ্ট প্রত্যেক প্রহরে  
 একটি একটি ক’রে দিবে এই বড়ী।  
 প্রত্যাহ্তে স্বচক্ষে আমি করিয়া দর্শন  
 বিশ্বনাথে, জদপিও করিব পরীক্ষা  
 পুনর্বার, ব্যবস্থিত ঔষধ তখন  
 প্রদানিব “বলি বৃথ শুইলা যাইয়া

রক্ত-নিম্নিত এক পর্য্যায়ের পরে।  
 এই প্রাসাদের পার্শ্বে উজান ভিতরে  
 একটি বৃহৎ কক্ষ বীরেন্দ্র নিচর  
 সমাসীন শ্রেণী মত, গভীর চিন্তায়  
 সকলেই মগ্ন এবে, কুণ্ডিত ললাটে  
 বিষাদের কাল ছায়া উঠেছে ভাসিয়া।  
 রজনী গভীর ; স্তব্ধ দিক্দিগন্তর,  
 শুধু দূরে থেকে থেকে ভাসিছে গগনে  
 প্রহরীর শব্দ প্রায় সারমেয়-রব।  
 গগনের পূর্ব কোণে উঠিছে ভাসিয়া  
 এক খণ্ড কৃষ্ণ মেঘ, তিল তিল করি  
 বিস্তারি সুদীর্ঘ কায়া ফেলিল ঢাকিয়া  
 দক্ষিণের আভূতল অর্ধেক গগন।  
 প্রাসাদের পূর্ব দিকে সহকার বনে  
 বহু দিবসের এক জীর্ণ সরোবরে  
 অসংখ্য মণ্ডুক কুল গাইছে মল্লার  
 আস্থানি জলদ বৃন্দ—রাগিনী গভীর।  
 এ ঘোর নিশিথে কোন্ ভাবী আশঙ্কায়  
 ব্যাকুল এ বীর বৃন্দ ? কোন্ তপস্তায়  
 পাষাণের মূর্তি প্রায় এ হেন নিশ্চল ?  
 ভীম-বাহু সদাশিব আরক্ত নয়নে  
 দক্ষিণ কপোল স্তম্ভ করি করতলে  
 কত অমঙ্গল কথা ভাবিছে হৃদয়ে।  
 হুয়াশা-গর্জিত প্রাণে চিন্তার কপাট  
 উদঘাটিয়া, আরোহিয়া ভবিষ্য-গগনে  
 হেরিছে মানস নেত্রে দৃষ্ট ভয়ঙ্কর —  
 —কত যোদ্ধা কত প্রাণী শোণিত-সাগরে  
 ভাসিতেছে ; ডুবিয়াছে সমগ্র ভারত  
 সে গভীর রক্ত স্রোতে, গিয়াছে ভাসিয়া

স্বাধীনতা-রত্ন তার তৃতীয় হিরোলে।  
 চমকিল। বীর নেত্রে পড়িল পলক,  
 আবার চিন্তার স্রোত বহিল নীরবে।—  
 হেরিল। সম্মুখে রোষে গর্জিছে শিবাজী  
 মেঘ মল্ল, উলঙ্গিয়া অসি ধরধার—  
 পাবও আজিও চিন্তা? গভীর নিজায়  
 আজিও নিজিত? উঠ, খোল তরবার,  
 কার ভরে ভীত মুখ?—এ প্রাণ নখর,—  
 —নহে চিরস্থায়ী, পাণী কেনরে হেলায়  
 হারাস এ প্রিয় রত্ন অপার্থিব ধন?  
 তুলেহিস নিজ কার্য? স্বদেশ উদ্ধার  
 হ'বে না কি?—হবে না কি মোস্তেম-শোণিতে  
 ভারতের কৃষ্ণ বুক রক্ত-পারাবার?  
 খোল অসি, তর করে স্বদেশ উদ্ধারে?  
 মৃত্যুত সামান্ত কথা, ডরে কিরে কতু  
 বীর জাতি প্রাণ দিতে সম্মুখ সমরে?  
 কেন তবে চিন্তাকুল? উঠ খোল তরবার।  
 কে আছেরে মহারাষ্ট্রে হেন কাপুরুষ?—  
 —জননীৰ অশ্রুজলে যাহার হৃদয়  
 নাহি জবে, নাহি কাঁদে তিলাঙ্কুর তরে?  
 মুখ হুঃখ চক্রবৎ ঘোরে অনিবার;  
 আজি মুখ, কালি হুঃখ আসিছে যাইছে  
 সতত পর্যায়ক্রমে অনিত্য জগতে।  
 দেখ, চেয়ে দিবা-নিশি বিধির সৃজন।  
 সকলি অনিত্য ভবে, স্বকর্মে কল  
 কে এড়াবে? কে মুছিব ললাট লিখন?  
 কি কল ভাবিয়া তবে করে কুলজার,  
 জয় মৃত্যু অনিবার্য;—তর কি কারণ?  
 এই দেখ অভাগিনী ভারত-জননী  
 কাঁদিতেছে, মোস্তেমের ঘোর অত্যাচারে।

ছিল যেই রাজরাণী আজি ভিখারিনী।  
 এই দেখ শত ছিন্ন বস্ত্র পুরাতন;  
 অনাহারে কুশাজিনী, পাগলিনী প্রায়  
 ক্লক কেন, মা আমার করিছে রোদন।  
 এদৃশ কেমনে তোরা দেখিল নয়নে?  
 উঠ, মুখ, উঠ, উঠ,—খোল তরবার!  
 হেন কালে ভীম স্বরে কাঁপারে মেদিনী  
 পড়িল বিহ্বল এক, সে ঘোর ঘরে  
 তাজিল চিন্তার স্রোত, উঠিল। চমকি  
 সদাশিব, আতঙ্কিত জাগ্রত স্বপনে,  
 কহিল। নিশাস ছাড়ি গভীর বিবাদে  
 “নিহত দস্তকী হায় মোস্তেম সংগ্রামে,  
 এ হুঃখ সহিব কিসে? কোথা শক্তিময়ি  
 মা আমার? রক্ষা কর এ ঘোর বিপদে।  
 কেন মা বিমুখ তুমি?—সন্তানের দোষে  
 জননীৰ স্নেহ-সিদ্ধ শুকায় মা কবে?  
 দস্তুর নিধন বার্তা শুনিলে সহসা  
 অবিশ্বাস হয় মনে, কে জানে জননী  
 তোমার মহিমা ভবে? নির্যোধ মানব  
 কি বুঝিবে? মহাযোগী অক্ষয় বাহাতে।”  
 অধোমুখে সদাশিব রহিল। বসিয়া।  
 সম্মুখে শঙ্কর সম একটি সন্তানী  
 ছিল। বসি, স্নেহ-স্বরে কহিতে লাগিল।  
 “সদাশিব, কেন তুমি রহিলে বসিয়া  
 অধোমুখে? বাধ চিত্ত কঠিন প্রসারে;  
 হও রণে অগ্রসর, কি তর মোস্তেম?  
 চামুণ্ডা সহায় যার, তার কিরে বাহা  
 সাজে শিশু প্রায় এই করুণ কন্দন?”  
 সগর্বে তুলিয়া মুখ কহিল। বীরেন্দ্র  
 “মানা গুরুদেব, আমি করিনে কন্দন

কি হার তাহা প্রভু ? সমগ্র পৃথিবী  
মোঙ্গলের অঙ্গুলে ধরে যদি আসি,  
অথবা দেবতা বুল যদি বজ্র মুখে  
করেন অনল বৃষ্টি, তথাপি এ দাস  
এক পদ না টলিবে থাকিতে জীবন ।  
এক বিন্দু রক্ত-কণা যতক্ষণ ক্ষেদে  
বহিব, প্রতিজ্ঞা মম এ ভীকৃ কৃপাণে  
ধ্বংসিয়া মোঙ্গলে, সেই অম্পৃক্ত শোণিতে  
ডুবাইব রণস্থল, প্রাণিয়া ভারত  
মিশিবে সে রক্ত-স্রোত সমুদ্রের সনে  
অই শোন,—অই শোন গর্জিছে শিবাজী  
মেঘ-মল্ল উলজিয়া আসি ধরধার ।  
আর কেন ? সাজ হবে বীর আভরণে ।  
মহারাত্রী কাপুরুষ ? থাকিতে জীবন  
হেন অপমান বল সহিবে কেমনে ?  
অতএব বৃথা বাক্য নাহি প্রয়োজন,  
সাজ হবে বীর সাজে, হও অগ্রসর  
সম্মুখ সংগ্রামে, পুনঃ দেখিব মোঙ্গলে ;  
বীর মোরা, আমাদের ভয় কি মরণে ?  
এ ভূজ অক্ষম নহে অস্ত্র সঞ্চালনে ।”  
নীরবিলা বীর , শুক বীরেন্দ্র নিচর  
ভাবনার কত শত ভরঙ্গ তুমুল  
উঠিছে পড়িছে ক্রমে প্রাণের ভিতরে ।  
এই ক্রোধে অগ্নি প্রায়, নিকংসাহে পুনঃ  
সমস্ত উত্তম আশা বাইছে ভাঙ্গিয়া ।  
সকলেই পরম্পর রহিছে চাহিয়া  
নীরব, সবাই যেন প্রস্তর মূর্তি ।  
এ গভীর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া সগর্বে  
কহিল পেশবা খেঁচ মুগ্ধতার ধরে—  
“সদাশিব, কেন তুমি ক্রোধাক্রম এমন ?

অদৃষ্টে নির্ভর করি তিষ্ঠ কণকাল,  
অবশ্য পূরিবে আশা, ব্যস্ত কেন এত ?  
ক্রমে ক্রমে বল রাখি করিয়া সক্ষম  
কার্য্য-ক্ষেত্রে পূর্ণ বলে হও অগ্রসর  
আজি হ'ক কালি হ'ক মোঙ্গল পতন  
সুনিশ্চিত ইতে আর নাহিক সংশয় ।  
অচিরেই মহারাষ্ট্র বিজয়-কেতন  
উড়িবে গৌরব ভরে সমগ্র ভারতে  
ধ্বংসিয়া মোঙ্গল রাজ্য বীর পরাক্রমে ।  
সে শক্তির ভীত ঢেউ লিঙ্গ বিলোড়িয়া  
তুলিবে যে মহা ঝড় ডুবিলে তাহাতে  
কত রাজ্য উপরাজ্য কে পারে বলিতে ?”

“যে দিন পলাশী ক্ষেত্রে ইংরাজ সমরে  
বঙ্গ-স্বাধীনতা সূর্য্য জনমের মত  
ডুবিয়াছে, মোঙ্গলের একটি চরণ  
ভাঙ্গিয়াছে সেই দিন, গিয়াছে ডুবিয়া  
মোঙ্গলের ভাগ্য লক্ষী অতীত-সাগরে ।  
কেন তবে চিন্তাকুল ? বৃথা আফালনে  
কার্য্য নাশ, অর্থ নাশ, তিষ্ঠ কণকাল,  
নিজ বুদ্ধি দোষে তারা চ'লেছে নরকে,  
অচিরেই একেবারে যাবে রসাতলে ।  
এক দস্ত মরিয়াছে লক্ষ দস্ত আছে  
ভয় কি ?—সহায় আসি স্বধর্মের তরে  
মৃত্যু ত কুসুম-বৃষ্টি চন্দ্রমা কিরণ ।  
মহারাত্রী বীর প্রসূ, অন্নান বদনে  
অমৃত ভীষণ বর্ষা লইবে ক্ষদয়ে ।”  
নীরবিলা বৃদ্ধ বীর, উঠিল গর্জিয়া  
জাহ্নবী \* গভীর রোষে আরক্ত লোচন ।



“কি কব লজ্জার কথা ?—কাপুরুষ আর  
এখনো বসিয়া র’ব ? নাকি কি শোণিত  
এ শরীরে ? এ বাহু কি এতই অক্ষম  
বৈর-নির্যাতনে ?—তবে রমণীর মত  
এ দাক্ষণ অত্যাচার সহিব কেমনে ?  
ধীক্ এ বীরবেশে, ধিক্ এ জীবনে,  
অদেশ উদ্ধারে যদি এ ভুজ অক্ষম  
ক্ষণ তরে, সিদ্ধ-গর্ভে মৃত্যু প্রেরকর !  
যে পাপিষ্ঠ বধিয়াছে পিতৃব্যে আমার,  
বধিয়া তাহারে, তার উত্তম শোণিতে  
প্রতিহিংসা বহি আমি করিব নির্বাণ  
কে জানিত বৃণ প্রেষ্ঠ পেশবার মনে  
হইবে যে ছেন ভাব ? বিদরে হৃদয়  
মোস্তেমের অত্যাচার করিলে অরণ ।  
আমি এই অত্যাচার থাকিতে জীবন  
সহিব না, এই অসি মোস্তেম-হৃদয়ে  
বিধাইয়া, রক্ত-স্রোতে ভাসাব অবনী”  
বাধা দিয়া প্রেব বাক্যে কহিল পেশবা  
“কোথা ছিল এই বীরা ? শৃগালের মত  
কেন দেখাইলে পৃষ্ঠ বাউলি প্রান্তরে ?  
দস্তের নিধন কালে কেন প্রাণপণে  
না বুঝিলে বীর আর সন্মুখ সমরে ?  
হৃদয়ল কেরর প্রায় আপন বিবরে  
কেন দস্ত ? থাকে বল হও অগ্রসর ।”  
পরস্পর-মুখপানে রহিল চাহিয়া  
বীরবল, জ্ঞপে যেন কি এক ভাবনা  
উদিল, ডুবিল সবে বিবাদ-সাগরে ।  
সহসা নীরব কক করিয়া ধ্বনিত  
কহিল সে অতিবৃদ্ধ প্রবীণ সন্ন্যাসী  
“হি হি হি, পেশবা তুমি কেন তরাতুর ?

কি চিন্তা ? এবার যুদ্ধে নিশ্চয় পতন  
মোস্তেমের যোগ-বলে জানিয়াছি আমি  
হৃদ্যন্ত মোস্তেম-রাজ্য হইবে বিধ্বস্ত  
চিরতরে, না রহিবে ভারত-অঙ্গরে  
মোস্তেমের “অর্কচন্দ্র” অচিরে ভারত  
ভ্রাজি নিভ্রা, প্রায়শ্চিত্ত করিবে নিশ্চয়  
রণ-ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ মানব-শোণিতে ।  
সেই রক্তে পাপরাশি যাইবে ধুইয়া ।  
সেই রক্তে নব শক্তি, হবে অকুরিত  
ভারত জদরে, এক নব শক্তিশালী  
বীর-জাতি অচিরেই হইবে উখিত ।  
অধীনতা অন্ধকার জনমের মত  
বিদূরিয়া, স্বাধীনতা-শাস্তি-প্রভাকর  
হাসিবে গগন-প্রান্তে বিমল কিরণে ,  
—ভারতে নূতন রাজ্য হইবে স্থাপিত ।  
কে সে জাতি ?—জান কি তা ? শোন বলি তে  
সে জাতি ভারত-পুত্র শক্তি-উপাসক  
মহারাত্রী ; সেই জাতি ধ্বংসিবে মোস্তেমে ।”

“হিন্দুর ভারতে পুনঃ হইবে স্থাপিত  
হিন্দু রাজ্য, মহারাত্রী ঘোষিবে উল্লাসে  
“হর হর” প্রতিধ্বনি উঠিবে তাহার  
সুদূর বিহার বঙ্গে আসাম চট্টলে ;  
সমগ্র ভারত-পুত্র উঠিবে গর্জিয়া  
“হর হর”, উদ্ধারিয়া হৃদয়-শোণিতে  
অন্ন ভূমি অত্যাগিনী ভারত-জননী ।  
আশীর্ব্বাদ করি বাহা, যাও রণ-স্থলে,  
উদ্ধার জনম-ভূমি হুঃখিনী মায়েরে ।  
তোমরা ভারত-পুত্র শক্তি-উপাসক,  
তোদের কি সাজে বাহা এ নিভ্রা পতীর ?

বাও বাহা, অই উৎসব আশীষে তোদেরে  
মহা শক্তি, ভয় কিরে মোস্তেসম-সমরে ?  
মোস্তেসম বিজয়ী বেশে আসিলে আবার  
মহারাজে, দেব বন্দ করিবে বর্ষণ  
পুষ্প-বৃষ্টি, মহাশক্তি হাসিবে উল্লাসে ;  
বাজিবে বিজয়ডঙ্ক। ত্রিদিব-অস্থরে ।”  
নীরবিলা যোগীশ্রেষ্ঠ, বীরেন্দ্র নিচয়  
পরম্পর মুখপানে রহিলা চাহিয়া  
নীরব, আবার যোগী কহিলা গর্জিয়া  
“সহজীর নির্ধাতন পড়ে না কি মনে ?  
পড়ে না কি মনে সেই দিল্লী দরবারে  
শিবাজীর অপমান ?—ভুলেছ সকলি ?  
বিনা দোষে নরাকৃতি পাষণ্ড সকল  
বীরশ্রেষ্ঠ শিবাজীর প্রানাদিক পুত্র  
শত্ৰুজীরে করি হত্যা, কি ঘোর শোকাগ্নি  
দিয়াছিল চলে হায় মহারাজে-প্রাণে ।  
সে কথা স্মরিলে আজি হৃদয় বিদরে ।  
বীরশ্রেষ্ঠ শিবাজীর স্মৃতি কপাণে  
হৃদ্যন্ত মোস্তেসম-রাজ্য হয়েছে দ্বিখণ্ডিত  
হিন্দুর পবিত্র রাজ্য হ’য়েছে স্থাপিত ।  
সে রাজ্য কি অবলোহ তাহাদের পুনঃ  
প্রদানিবে ? শিবাজীর বংশধর তোরা,  
তোদের কি সাজে এই করুণ ক্রন্দন ?  
কার ভয়ে তোরা আজি এত আতঙ্কিত ?  
উঠ, মূর্খ, উঠ, উঠ, খোল তরবার ।”  
নীরবিলা যোগী, সবে দেখিলা চাহিয়া  
কি ভীষণ উগ্রমূর্তি তপস্বী প্রবর ।  
আবার কহিলা যোগী “ভে’বে দেখ মনে,  
তোমরা বীরের পুত্র বীরকুলবর্ত্ত,  
আমি যে সংসার-ত্যাগী বনের সন্ন্যাসী

জনতুমি জননীরে বিধর্মীর করে  
উদ্ধারিতে, আমিও এ ক্ষুদ্র প্রাণখানি  
করিয়াছি নিয়োজিত, জনমের মত ।  
ব্রত মম একমাত্র ভারত-উদ্ধার ;  
ইহা ভিন্ন অন্য আশা নাহি এ হৃদয়ে ।  
মহারাজে যোগীশ্রেষ্ঠ রামদাস স্বামী  
গুরু মম, তারি মস্ত্রে দীক্ষিত এ হৃদি ।  
শতাব্দিক বর্ষ আজি হইল অতীত,  
একদিন গিরিশৃঙ্গে কুটিরে তাহার  
ছিহ্ন বসি, আরো কত শিশু ছিল কাহে,  
সাদরে সে যোগীশ্রেষ্ঠ আত্মানি আমারে  
কহিলা মধুর স্বরে ‘বৎস আজি তোরে  
একটি কার্যের ভার করিব অর্পণ ।  
আজি কিম্বা কালি, কিংবা যুগ যুগান্তরে  
মহারাজী বীরবংশে করি উত্তেজিত  
ধর্ম যুদ্ধে, উচ্ছেদিয়া অম্পৃশ্য মোস্তেসমে  
রণক্ষেত্রে—ভারতের সে মহাশ্মশানে  
মহারাজে ধর্ম তুমি করিও স্থাপন ।”  
সেই দিন—সে মুহূর্ত্তে হৃদয়ের মাঝে  
কি এক চিন্তার রেখা হইল অঙ্কিত ।  
উৎসাহে সে স্বামীজীর পবিত্র চরণ  
পরশিয়া করিলাম প্রতিজ্ঞা ভীষণ ।  
সেই হ’তে দেশে দেশে আমি অহরহঃ  
করেছি সাধনা কত, চলেছি যতনে  
কত যে বিষাগ্নি কোটি বীর পত্নী-হৃদয়ে;  
ভারতের বীর পুত্রে, বীর পত্নী দলে  
করেছি দীক্ষিত আমি দিবস শব্দবরী  
ভারত উদ্ধার ব্রতে, অথবা সমরে  
ভেয়াগিতে পাপপূর্ণ নবর জীবন ।  
কি কাজ বিলম্বে আর, হও অগ্রসর

রণক্ষেত্রে, কত কাল রবি সূর্য-খোরে ?  
 আর না,—আলস্ত-নিদ্রা কর্ণ পরিহার,  
 আর সেন্যে বীর-বেশে, বীরগুণ তোর।  
 কি চিন্তা ? বীরের মত খোল্ তরবার।”  
 নীরবিলা বৃদ্ধ যোগী, আরক্ত নয়নে  
 জীবণ রোষায়ি যেন উঠিল গর্জিয়া।  
 মুহূর্তে বিছ্যত বেগে উঠিয়া সন্ন্যাসী  
 সজ্জাধে, কম্পিত কণ্ঠে কহিল। আবার  
 “চলিলাম,—রণক্ষেত্রে হইবে সাক্ষাৎ  
 পুনর্বার।” মুহূর্তেকে বিছ্যতের বেগে  
 চলি গেল। যোগীবর, বীরেন্দ্র নিচয়  
 স্পন্দহীন, সে বৃহৎ বক্ষ মনোহর  
 কি এক বিস্মৃতিময় ভাবের হিল্লোলে  
 মুহূর্তে ডুবিয়া গেল, হইল ধ্বনিত  
 মুহূর্তে—মুহূর্তে সব বীরেন্দ্র-হৃদয়ে  
 “কি চিন্তা ? বীরের মত খোল্ তরবার।”

“কি চিন্তা ?—বীরেন্দ্র মত খোল্ তরবার।”  
 গর্জিয়া অশনি-মস্ত্র বীরেন্দ্র কেশরী  
 সঙ্গাশিব, মুখে যেন অসম্ভ্র প্রতিভা  
 উঠিল ভাসিয়া, নেত্র বিছ্যতের মত  
 করিতে লাগিল কত আলস্ত অনল।  
 হেরি সে ভৈরব মূর্তি বীরেন্দ্র সকল  
 প্রমাদ গণিলা মনে, গর্জিলা আবার  
 সঙ্গাশিব, “মহি আমি দুর্বল। রমণী  
 নহে এই অসি মম কুম্বের মালা,  
 করির সখ্য-বৃদ্ধ যা’ থাকে অদৃষ্টে  
 বটিকে,—বটুক তাহে ভয়-নাই মনে ;  
 সহায় আমার সেই অশুর মর্দিনী।”

মুহূর্তে বিছ্যত বেগে অসি ভরষর  
 উঠিল বলিয়া মরি লোল-জিহবা প্রায়  
 ভূজঙ্গের, বীরশ্রেষ্ঠ সঙ্গাশিব-করে।  
 প্রস্তরের মূর্তি প্রায় বিস্মিত হৃদয়ে  
 স্পন্দহীন বীরবৃন্দ রহিলা চাহিয়া।  
 সহসা ক্রোধাক্ত হৃদে ভাজি নিস্তকভ।  
 “আমারো তাহাই মত” কহিলা গর্জিয়া  
 যশোবন্ত, \* “বীর হ’য়ে রমণীর মত  
 কে র’য়েছে কবে ভরে রমণী-মহলে ?  
 হারি জিতি ছঃখ নাই, স্বদেশের ভরে  
 প্রাণ যায়, তা’ও ভাল, তথাপি কখন  
 রহিব না মোস্তেমের চরণের তলে।  
 আজ মরি, কাল মরি, মরিব নিশ্চয়,  
 অমর হইয়া কতু আসিনি জগতে।  
 কেন তবে আতঙ্কিত—শঙ্ক। কার ভয়ে ?  
 মৃত্যু ত অপরিহার্য এ জীব-জগতে।  
 তবে কেন সাধ ক’রে হ’ব নিষ্পেষিত  
 বিধর্মীর পদতলে ? রমণীর মত  
 পূর পদাঘাত কেন লইব হৃদয়ে ?  
 এ দেহ দুর্বল নহে, নহে শক্তিহীন  
 এ ভূজ, সাহস শূন্য নহে এ হৃদয় ?  
 হও অগ্রসর, অসি খোল্ পুনর্বার,  
 উড়াও ভারত-ভালে সে মহা “ত্রিশূল,”  
 বাজাও সমর ডঙ্কা, নাচুক বিজলি  
 তরবারে, স্রোতবতী উঠুক উছলি,  
 দেবতা কিরর নর সমগ্র ভারত  
 “জয় মহাদেও” হবে উঠুক গর্জিয়া।”  
 সহসা অদৃষ্ট ভাবে অন্তরাল হ’তে  
 কে জানি রমণী-কণ্ঠে উঠিল তর্জিয়া

\* মহারাষ্ট্র গজেন্দ্র সেবাপতি।

“যুদ্ধ!—যুদ্ধ!—যুদ্ধ! যুদ্ধ বিনা ভারতের  
হ'বে না উদ্ধার, যুদ্ধ বিনা মহাশক্তি  
জাগিবে না আর” নীরবিল নারী-কণ্ঠ,  
স্পন্দহীন বীরবৃন্দ ভয়ে ও বিস্ময়ে  
পেশবার দিকে সবে রহিলা চাহিয়া।  
“আর কেন?” মেঘ-মস্ত্রে উঠিলা গঞ্জিয়া  
সদাশিব “আর কেন? শুনেছ ত সবে  
যুদ্ধ বিনা ভারতের হ'বে না উদ্ধার  
আদেশিলা মহাশক্তি, চল যাই সবে  
সমগ্র মোস্লেম বংশ ধ্বংসিব সমরে।”  
“বীরবর! পুরিবে না এ বাসনা তব”  
কহিলা গম্ভীরে ধীরে রঘুনাথ রাও  
“হৃদ্যস্ত মোস্লেম সনে সম্মুখ সমরে।  
পারিবে না, সে বাসনা কর, পরিহার,  
বৃথা এ ছরাশা ছলে কেন হারাইবে  
ধন মান, জান না কি মোস্লেম ভাণ্ডারে  
অগণিত ধন রত্ন, বালি রাশি যথা  
অনন্ত, অগণ্য মহা সমুদ্র-সৈকতে?  
একে ত মোস্লেম বৃন্দ মহা বীর্যশালী,  
তাহে পুনঃ আদালীর \* বিপুল-বিক্রমে  
ধরিবে যে ভীমমূর্তি, সম্মুখে তাহার  
কার সাধ্য এক পদ হ'তে অগ্রসর?  
তোমরাও বীর্যবান্, কিন্তু ভে'বে দেখ  
অর্থ অনটনে এবে নিস্পীড়িত সবে।  
মোস্লেমের সে বীরত্ব, সে অর্থ প্রভাবে  
কোথায় যে যাবে ভে'সে কে পারে বলিতে?  
কি যে কষ্টে ধর্মদেবী পাষণ্ড মোস্লেমে  
দ'লে ছিহু আমি, সেই লাহোর সমরে; •  
স্মরিতে সে কথা আজি হৃদয় শিহরে।

যবে সেই নরাকৃতি পাষণ্ড সকল  
“আল্লাহো-আল্লাহো” রবে করিরা হুকার  
ভীরবেগে রণক্ষেত্রে আসিত ছুটিয়া,  
সমস্ত সৈনিক মম হইত কল্পিত  
সে বিক্রমে, প্রতিরোধ করিতে তাহার  
কি যে বেগ পে'য়েছিহু সে মহা সংগ্রামে,  
ভুলিব না তাহা আমি থাকিতে জীবন।  
দেবদেবী জেহানের স্মৃতি কৃপাণে  
কত যে সৈনিক মম পড়েছিল রণে  
কে বলিবে? ভূপকারে শব রাশি রাশি  
অসংখ্য-পর্বত প্রায়; সে রণ-প্রাঙ্গণ  
ধরেছিল কি যে ঘোর মূর্তি ভয়ঙ্কর।  
কিন্তু বিধাতার বিধি কে খণ্ডাবে বল?  
মুহূর্তের মাঝে যেন মস্ত্রের প্রভাবে  
রণক্ষেত্র ধরিল যে মূর্তি অভিনব,  
হেরি তাহা প্রাণ যেন উঠিল নাচিয়া  
মহানন্দে, দেখিলাম মোস্লেম-বাহিনী  
ছুটিয়াছে উর্ধ্বশ্বাসে আটকের দিকে,  
সেই দিন দেখিয়াছি বীরত্ব তাদের,  
নহে কাপুরুষ তারা, সমস্ত মোস্লেম  
মহাবীর,—রণক্ষেত্রে সাক্ষাৎ শমন।  
তাহে পুনঃ যুদ্ধপ্রিয় হৃদ্য আকগান  
মিনিয়াছে সেই সনে, অনলে পবন।  
কার সাধ্য সে ভীষণ সৈন্যদের সনে  
যুঝিবে এবার এই সম্মুখ-সমরে?  
তাই বলি সাবধান, থাকিতে সময়  
চিন্ত সবে সতৃপায়, গোড়া বুদ্ধি দোষে  
পড়িও না অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গের মত।  
পরিহরি উগ্রভাব বহুতার ছলে

বিমোহিয়া মূৰ্খ মনে অগ্নিতে অগ্নিতে  
 উদ্বেগ সময়ে, কিন্তু সন্মুখ সময়ে  
 পারিবে না পরাজাস্ত মোহনের সনে ।  
 আদিনার আশা মিথ্যা, যুদ্ধের তরে  
 জুলনা আশাসে তার,—বিশ্বাস তারে ?  
 যে কৃত্য অর্থ কিংবা সাম্রাজ্যের লোভে  
 যে জাতির প্রতিকূলে—দেশের বিপক্ষে  
 ধরে অসি, কি বা ঘোর বড়বস্ত্র করি  
 বিনাশিতে নিজ ধর্ম বধিতে স্বজাতি  
 হয় সংমিলিত, হিহি অস্ত্র জাতি সনে,  
 সেও কি মায়াব ভবে ? নরাকৃতি পশু,  
 তার মত, ঘণ্য জীব নাহি এ ভুবনে !  
 কে জানে উদ্বেগ তার সবল গরল,  
 বিশেষতঃ, ভবে দেখ. যদিও সময়ে  
 হৃদাস্ত মোহনম বৃন্দ হয় পরাজিত,  
 কি লভিবে মহারাষ্ট্র ? অর্ধেক সাম্রাজ্য  
 ঘাইবে আদিনা-হস্তে, দিল্লী সিংহাসন  
 আদিনার পদতলে লুপ্তিবে নিশ্চয় ।  
 প্রতিজ্ঞার বন্ধ সনে, অস্ত্রধা তাহার  
 করিবে কেমনে ? ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছায়  
 অবশ্য করিতে হ'বে প্রতিজ্ঞা পূরণ ।  
 অতএব এ বাসনা কর পরিহার  
 এই দণ্ডে, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া যে জন  
 নাহি চলে, প্রতি পদে বিপদ তাহার”  
 নীরবিলা রঘুরাও, কহিলা পেশবা  
 “ঠিক কথা, ইথে আর নাহিক সংশয় ;  
 এ কাল-সময়ে দেখি সবি কুলক্ষণ,  
 গভ্র প্রায় হই যাস, অদৃষ্টের দোষে  
 আজিও সে পুত্র • মম বৃত্ত্য শয্যা 'পরে ।

নিহত মদলে দত্ত বাউলি প্রান্তরে,  
 নাহি জানি এ অদৃষ্টে বিধাতা নিষ্ঠুর  
 কি লিখেছে, বুঝি হার জনমের মত  
 ভুবিবে এ মহারাষ্ট্র চির অন্ধকারে ।  
 সুহসা আমার মতে সন্মুখ সময়ে  
 অবিধেয়, বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রসেনা  
 সন্মুখ সময়ে নহে অভ্যস্ত ভেমন ।  
 দক্ষ তারা গুপ্ত যুদ্ধে, সন্মুখ সময়ে  
 অনভিজ্ঞ, আকাশগীর ভীষণ বিক্রম  
 অনিবার্য, অর্থাভাবে কেমনে বুঝিবে  
 তার সনে ? পরিণামে ঘোর অমঙ্গল ।  
 তাই বলি প্রথমেই দিল্লী আক্রমিয়া  
 গুপ্তভাবে, ছলে বলে ওমরাহ সকলে  
 বধ প্রাণে, অনায়াসে পুরিবে বাননা ।  
 লুপ্তি শেষে রাজ-কোষ, সে অর্থ প্রভাবে  
 ধ্বংস কর একে একে সমস্ত নবাবে ।  
 যদিও এ কাজ নহে ধর্মাত্মমোদিত,  
 তথাপি—তথাপি ইহা কর্তব্য মোদের ;  
 বীর বল,—ভীক বল,—অথবা তোমরা  
 যা ইহা তাহাই বল, কি ক্ষতি তাহাতে ?  
 মহারাষ্ট্রী মোরা, শুধু ধর্মের কথায়  
 ভুলিব না, ছলে বলে গোপনে কৌশলে  
 যখনি যে ভাবে পারি ধ্বংসিয়া বিপক্ষে  
 আপনার স্বার্থ মোরা করিব সাধন ।  
 কি কাজ সন্মুখ-যুদ্ধে ? এত রক্তপাতে  
 কোন্ লাভ ? পারি যদি ধ্বংসিতে বিপক্ষে  
 গুপ্ত যুদ্ধে ; কেন করি সন্মুখ সময়ে ?  
 অতএব ধর্ম-কথা কর পরিহার,  
 বীর-ধর্ম কেন মোরা মোহনের সনে



পালিব ? বধিব শত্ৰু হলে কি কৌশলে ।  
 ইহাতে নাহিক পাপ, অতএব সবে  
 গুণ যুদ্ধে ধ্বংস কর সমগ্র যোদ্ধেয়ে ।  
 সমুখ-সমরে এবে নাহি প্রয়োজন ।”  
 উত্তরিল। সমসের \* “অসম্ভব নহে  
 এ মন্ত্ৰণা, ধনাগার করিয়া লুণ্ঠন  
 সন্ধ্যাটের, সেই অৰ্থে শক্তি আপনাব  
 করি দৃঢ়, মহাযুদ্ধে ধ্বংস কর সবে ।”  
 “আমারো তাহাই মত” উত্তরিল। ধীরে  
 বালানাথ, মহারাষ্ট্র সমুখ সমরে  
 পারিবে না পরাক্রান্ত আকালীর সনে ।”  
 উত্তরিল। সদাশিব সম্মিত বদনে,—  
 তথাস্তু । “প্রথমে আমি দিল্লী আক্রমিয়া  
 বিনাশিব মন্ত্ৰীদলে, লইন কাড়িয়া  
 সিংহাসন, কোষাগারে রতন কাঞ্চন ।”  
 পেশবার পানে চেয়ে কহিল। আবার  
 সদাশিব, “উপস্থিত যোদ্ধেয় সংগ্রামে”  
 “সেনাপতি পদে আমি করিব বরণ  
 রঘুনাথে” বাধা দিয়া কহিল। রঘুজী  
 “সেনাপতি-পদ আমি করিব গ্রহণ  
 কে বলিল ?—অসম্ভব” আমা হ’তে আর  
 হবে না সে কাৰ্য্য, গত লাহোর-সমরে  
 যে কল লভিয়াছিহু, তাই যে যথেষ্ট  
 অত্যাগার, † আর কেন ?—বৃথা প্রলোভনে

ভুলিবে না এ নিৰ্বোধ রঘুজী কখন ?  
 কমা কর, বিশেষতঃ লবঙ্গের শোকে  
 সতত অস্থির আমি, এ মহা সংগ্রামে  
 সাজে কি আমার এই কর্তব্য ভীষণ  
 লইতে মস্তক’ পরে ? সমর-প্রান্তরে  
 যাই কি না যাই, তাই সন্দেহ বিষম ।”  
 হেনকালে শেঁ। শেঁ। রবে তরঙ্গে তরঙ্গে  
 বহিল ভীষণ ঝড়, কাঁপিল মেদিনী  
 বজ্রনাদে, কর্ণভেদী তৈরব গর্জনে  
 কাঁপিল জলধি, সিংহ পশিল বিবরে ।  
 মরি কি ভীষণ দৃশ্য, ভৌতিক সংগ্রামে  
 উন্মত্ত প্রকৃতি এবে কালান্তক বেশে  
 বায়ু সঙ্গে রণ রঙ্গে ঘোর ছহুকারে  
 কাঁপাইছে দিগন্তর কাঁপিছে অবনী  
 সেই রবে, মুহূৰ্ত্ত গর্জিছে তৈরবে  
 ঈরশ্বদ বিদারিয়া গগন-প্রাঙ্গণ ।  
 একটি ঝটিকাঘাতে পড়িল ভাজিয়া  
 গবাক্ষ-কপাট দৃঢ়, বীরেন্দ্র নিচয়  
 দেখিল। সে মুক্ত পথে গভীর আধারে  
 বিধাতার রক্তময় নেত্র ভয়ঙ্কর ।  
 যুহূৰ্ত্তে মুদিল। চক্ষু, হেরিল। আবার  
 সেই দৃশ্য । শূন্যময় অনন্ত আধারে  
 অবিচ্ছিন্ন তমোরাশি, তাহে বিধাতার  
 রক্ত আঁখি অগ্নিময় অশনি ভীষণ ।

\* সমসের বাহাদুর, মহারাষ্ট্র পক্ষের সেনাপতি ।

† গত লাহোর যুদ্ধের পর সদাশিব অনেক বিষয়ে রঘুজীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছিলেন । পেশবার  
 মধ্যস্থতায় সে বিবাদ মিটিয়াছিল বটে, কিন্তু রঘুজী সেই অভিমানে সেনাপতি পদ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক ।



## ত্রয়োবিংশ সর্গ

[ সুরাট নগর, ভান্টী নদী-তীর, বিদ্রুদাসের কুঠীর ]

অন্তগত দিনমণি ; গ্লান কমলিনী  
কাঁদিয়ে নিরখি শূন্য গগনের পানে,  
কাঁদে যথা শূন্যপ্রাণে নব বিরহিনী  
যার যবে প্রাণকান্ত দূর দেশান্তরে ।  
একুতি নবীনদেশে সন্ধ্যা-সমাগমে  
মুহুচ্ছিত, পাখী দল বসিয়া কুলায়  
আলাপিত্বে স্ব স্ব রবে সঙ্গীত মধুর ।  
ছুটিয়াছে দলে দলে বায়স নিচয়  
নীড়পানে । অবসন্ন কৃষক নিকর  
করিয়াছে হল কঁকে, কাহারো মস্তকে  
বিশ্রুত তৃণের বোঝা ; ক্লান্ত পান্থদল  
ছুটেছে দ্বিগুণ বেগে নিরখি সম্মুখে  
যামিনী, রাখালবৃন্দ ধেমুদল সনে  
চলেছে গো-গৃহ পানে রাখালিয়া গানে  
ভাসাইয়া সায়াহ্নের নিধর অম্বর ।  
আইল গোধূলি, বীরে স্বর্ণবিন্দু প্রায়  
কুটিল একটি তারা সায়াহ্ন-ললাটে  
মনোহর, বসুমতী ঈষৎ আধারে  
আবরিল রূপ-রাশি, আবারে যেমতি  
সলাজে বদন-চন্দ্র ঘোমটার তলে  
নব বধু, যবে কেহ সাদর-সম্ভাষে  
কান্ত-আগমন-বার্তা জানায় তাহারে ।  
কুসুমিত কুজবণ,—মরি কি মাধুরী  
পড়ে পড়ে ফুলে ফলে প'ড়েছে ছড়ারে  
একুতির চাক্র শোভা করিয়া বর্জন ।  
স্থানে স্থানে মনোহর সুভারাজি আর

প্রফুটিত পুষ্পবৃন্দ, মস্ত মধুকর  
গুঞ্জরিছে চারিপাশে ঘাঁচিয়া কাতরে  
মকরন্দ, চাতকিনী প্রদোষ-অম্বরে  
ছড়াইছে “পিউ পিউ” মধুর সুস্বর ।  
অদূরে বকুল বনে পল্লবের তলে  
লুকাইয়া বেণেবউ গাইছে পঞ্চমে  
মধুর পুরবী গান, সে স্বর-তরঙ্গে  
একুতি বিহ্বল-চিত্ত আত্মহারা প্রাণ ।  
নিকুঞ্জের স্থানে স্থানে শ্রাম তৃণদল  
শোভিছে বিবিধ বর্ণ কুসুম-স্তবকে  
অনুপম —রত্নময় শয্যা মনোহর ।

গোধূলি চলিয়া গেল, আইল রজনী  
বিমল জ্যোৎস্নাময়ী সূচাক হাসিনী ।  
উজ্জল তারকা রাজি কুটিল গগনে  
স্বর্ণকাস্তি, ফুটে যথা মানস-সরসে  
তরুণ অরুণ করে চারু কমলিনী ।  
সুরাটের প্রান্তদেশে ভাণ্ডীর সৈকতে  
শ্রাম তৃণদলে এক কুটির সম্মুখে  
একটি বালিকা স্নিগ্ধ সুধাংগু-কিরণে  
মুগ্ধ ছিয়া, অদূরেই ভাণ্ডী তরঙ্গিনী  
ভর ভর ভর রবে চলেছে বহিয়া  
কি সুন্দর, নাচিতেছে কুজ বীচিকুলি  
মাখি ক্ষুদ্রে স্বর্ণোজ্জল সুধাংগু-কিরণ ।  
অন্ত পাড়ে বৃকগুলি কক রেখা আর  
শোভিছে গগন-পটে, অতিবিহ-ভার

প'ড়েছে তাত্তীর তীরে মরি কি মোহন :  
চন্দ্রমার চাক্র ছবি চকল জীবনে  
শত খণ্ডে ভাঙিতেছে ; নক্ষত্র নিচয়  
বিধিত সে নীল জলে, বাণারসী \* হৃদে  
খচিত যেমতি শত সুবর্ণ কুসুম  
শ্রেণীমত, চন্দ্রমার কাস্তি মনোহর  
রচিয়াছে পাছাপেড়ে সে নীল বরণে  
কি সুন্দর কুসুমিত বল্লবী সোণার।  
বিমুক্ত প্রকৃতি যেন রে'খেছে গড়িয়ে  
এ সুনীল বাণারসী তাত্তীর হৃদয়ে  
কোন্ দেব বাল্য তরে, সাজাইতে তার  
অর্ণবপু এ সুন্দর সুনীল বসনে।  
বালিকা একাগ্র মনে বসিয়া নীরবে  
নিরখিছে এ অতুল শোভা মনোহর।  
থেকে থেকে একবার নৈশ-সমীরণ  
চুহিয়া তাত্তীর বক্ষ হিল্লোলে হিল্লোলে  
বালিকার কেশগুচ্ছ করিছে চুসন।  
সে চুসনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ সুন্দর  
উঠিয়াছে কৃষ্ণ কেশে ; প্রতিমার প্রায়  
র'য়েছে ডুবিয়া বাল্য কৌমুদী-সাগরে।  
পার্শ্ব দেশে শিশুগুলি বসি শ্রেণীমত  
খেলিতেছে চন্দ্রমারে “আয় আয়” ব'লে।

কুটীরের অভ্যন্তরে একটি রমণী  
বসি এক কাষ্ঠাসনে বিপ্রদাস সনে  
আলাপিত্বে ; নিরাশার ছায়া মসিময়  
উঠিছে ভাসিয়া ক্রমে ললাট-দর্পণে।  
বিপ্রদাস ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল।  
চারিদিকে যে বিপ্লব, রাখিব কোথায়

\* বাণারসী নাট্য।

হুঃখিনীরে, হৃষ্টদের বেকরণ প্রভাব  
কে জানে কখন কোন্ পাপ অভিনয়  
হয় অন্তর্ভিত ; তুমি শোন নি সে দিন  
দম্ভা দল গুপ্তভাবে করেছে হরণ  
বাসন্তী নামিনী এক বিধবা বাল্যারে।  
আবার সে দিন সেই সেতার। নগরে  
কৌমুদীরে দম্ভাদল করি আক্রমণ  
দিয়াছে লাঞ্ছনা কত ; সে দিন আবার  
ধরেছিল হিরণেরে সরোবর-তীরে।  
অদৃষ্ট সহায়, তাই ছিল। যশোবন্ত  
সন্নিকটে, তা না হ'লে কি হ'ত উপায় ?  
নিশ্চয় পাষণ্ড দল হরিত ইহায়ে।  
সদাশিব অচিরেই যাইবে সসৈন্তে  
যুদ্ধার্থে দিল্লীর দিকে, কে জানে তখন  
হৃদাস্ত মোস্লেম-বৃন্দ অরক্ষিত দেখি  
এ নগরী, ভীম বলে করে আক্রমণ।  
কিংবা এই হুঃখিনীরে করিয়া হরণ  
নেয় যদি, কি করিব আমরা তখন ?  
কলা আমি যোগাশ্রমে যাইব চলিয়া  
হিরণেরে সঙ্গে করি, দিব ফিরাইয়া  
গুরুদেবে, ধরি তার যুগল চরণ  
বলিব তাহারে আমি এ ঘোর হৃদ্যনে  
রাখিতে অক্ষয় এই হিরণ বাল্যারে।  
কেননা বুঝতী সে যে, যদি কেহ তারে  
নেয় হরি, প্রাণময়ি, বল দেখি তবে  
কি উত্তর দিব আমি সেই যোগীবরে ?  
অমর ত হেথা আর এলনা কিরিয়া ?  
—আসিলে ভাষ্যারে তার দিতাম কিরা'রে”  
অদূরে বালিকা এক বসিয়া প্রাঙ্গনে

শুনিলা এ সব কথা, কহিলা বিবাদে  
 “আমাদেরে হেঁড়ে তুই যাবি যোগাশ্রমে  
 গুরুদেব কাছে ? মারা হবে না কি তোর  
 হেঁড়ে বেঁড়ে ? হার দিদি কেমনে থাকিব  
 তোরে হেঁড়ে, তুই দিদি নয়নের মণি !”  
 অমনি চুপিয়া সেই ক্ষুদ্র মুখখানি  
 ক্ষুদ্র বালিকার, অই হুঃখিনী হিরণ  
 লইলা তুলিয়া ফোড়ে ; আবার বালিকা  
 কহিল চিবুক ধরি মলিন বদনে  
 “কেন লো নীরব তুই ? ক’ দেখিলো দিদি  
 হ’বে না মমতা তোর যাবি যে ছাড়িয়া ?  
 গেলে তুই কে বলিবে নিশীথ সময়ে  
 রূপ কথা ? কে গাইবে সে সুধা-সঙ্গীত  
 তুরিতে আমারে, আমি কাঁদিব যখন ?  
 বলিব বাবার কাছে, দিব না যাইতে  
 দিদি তোরে, এ জনমে থাকিতে জীবন ?”  
 “না দিদি যাব না আমি” বলিয়া হিরণ  
 সজল নয়নে, অই ক্ষুদ্র বালিকারে

বসাইয়া দূর্ব্বা পরে, অতি দৃঢ় করি  
 কথিয়া পড়িল বস্ত্র, বাঁধিলা কবরী  
 উঠাইয়া তুঙ্গবর বাকিয়া পশ্চাতে  
 অনঙ্গের ধনু প্রায়—ছটি পুষ্প-কলি  
 শোভিল সে মনোহর অনঙ্গ-ধনুকে  
 ছটি সুবর্ণের শর নয়ন রঞ্জন ।  
 ছটি সুবর্ণের কর, কমলিনী প্রায়  
 শোভিল সে মনোহর কবরী-কুশ্মে  
 ভাবুক প্রেমিক-প্রাণ করিয়া হরণ ।  
 অগ্নরে তালুীর বক্ষে স্বর্ণ-বীচি মালা  
 শোভিছে কি মনোহর চন্দ্রমা-কিরণে  
 নেন’চে নেন’চে, সমীরণ হিল্লোলে হিল্লোলে  
 চুপিয়া উটিনী-বন্ধ বহিছে মধুরে ।  
 বহিছে মধুরে সেই তালুী তরঙ্গিনী  
 কলু কলু কলু রবে, সে সঙ্গীত-স্বরে  
 বিমুক্ত হৃদয় হারা সে নৈশ-প্রকৃতি  
 মনোহরা ; মুগ্ধ হিয়া হিরণ হুঃখিনী ।

## চতুর্বিংশ সর্গ

[ ফতেপুর সিক্রি—একটি ভগ্নবাড়ী ]

এ'স গো করনে দেবি ভুবন-মোহিনী,  
এ'স এ কবির সঙ্গে, যাব পানিপথে,  
তুমি দেবি সুখে দুঃখে সতত-সঙ্গিনী ।  
কবির হৃদয়-কুঞ্জে অযুত কুসুম  
ফুটাইয়া, সৃজ তুমি সেই পরিমলে  
সৌন্দর্য্য-জগতে এক সুধা-নিষ্ক'রিনী ।

এ কোন্ নগর দেবি—ফতেপুর সিক্রি ?—  
—যাহার সুরম্য দেহ অসংখ্য রতনে  
করেছে সজ্জিত সেই সম্রাট প্রধান  
আকবর ? হায় দেবি, এই সে নগরী ?  
যাহার অতীত স্মৃতি, গৌরব-কাহিনী  
অঙ্কে অঙ্কে বিজড়িত, যার পদ-স্পর্শে  
পবিত্র এ পুরী দেবি,—এই সে নগরী ?  
অই দেবি অমুপম সে পঞ্চ মহল,—  
কি শিল্প-নৈপুণ্যে দেবি গঠিত এ গৃহ,  
মুসলমান গৌরবের অনন্ত ভাণ্ডার,  
নিরখিলে এ প্রাসাদ পড়ে দেবি মনে  
কি এক অতীত স্মৃতি, পড়ে দেবি মনে  
কি এক কুসুটিময় স্বপনের মত  
মোস্লেমের ইতিহাস অতীত-গৌরব ।  
কবির কি সাধ্য দেবি করিতে অঙ্কিত  
সে সৌন্দর্য্য—সে স্বর্গীয় শোভা মনোহর  
কেমনে আঁকিবে কবি ক্ষুদ্র তুলিকায়  
ভাবার কুৎসিত বর্ণে এ মর-জীবনে ?  
মর্ম্মরে গঠিত দেবি এ মহা প্রাসাদ  
সৌন্দর্য্যের লীলাক্ষেত্র ধবল উজ্জল ।

স্থানে স্থানে কি সুন্দর স্তম্ভে ও কার্ণিসে  
কত কুসুমিতা লতা নয়ন-রঞ্জন ।  
কক্ষগুলি কি মনোহর, শুধু স্তম্ভ' পরে  
বিনির্ম্মিত এ প্রাসাদ, চতুষ্কোণাকৃতি,  
চারিধার মুক্ত যেন সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার ।  
চারিপাশে' কুঞ্জবন, কত জাতি পুষ্প  
প্রফুল্লিত বৃন্ত' পরে ; সিদ্ধ সমীরণ  
পুষ্পের সৌরভ রাশি মাখিয়া হৃদয়ে  
সঞ্চরে সতত দেবি এরম্য প্রাসাদে  
কক্ষে কক্ষে, সে সৌন্দর্য্য হেরিলে নয়নে  
কি এক আনন্দময় শোক-প্রস্রবণ  
ফুটে দেবি মোস্লেমের হতাশ অন্তরে ।  
এমন সুন্দর গৃহ আছে কি জগতে ?  
কি দিব তুলনা তার ?—গঠন আকৃতি  
অমুপম, শ্রেণীমত স্তম্ভের উপরের  
ছাদগুলি প্রতি তলে স্থাপিত সুন্দর ।  
ত্রিতল, চতুর্থতল ক্রমে ক্ষত্রতর  
মুনিজন মনোলোভা মধুর-দর্শন ।  
পঞ্চতলে অতি সুশ্রী গুহোজ সুন্দর  
শোভিছে কি মনোহর কিরীটের মত  
উর্ধ্ব' শিরে সাহস্কারে পরশি গগন ।  
সে সৌন্দর্য্য না হেরিলে শুধু কাব্য পাঠে  
কি বুঝিবে ? সে যে মর্ত্যে স্বর্গ অমুপম ।  
সে উন্নত মনোহর কিরণ মিনার  
সৌন্দর্য্যের মহাখনি, হেরিলে বারেক  
আনন্দ সাগরে ডুবে ভাবুকের মন ।  
এমনি সে কারুকার্য্য, এমনি গঠন,

তুলনা নাহিক তার ভুবন-মণ্ডলে,  
 গঠিত বিরল-দৃষ্টে মনে হয় ভ্রম ।  
 অই যে মসজিদ, অই সৌন্দর্য্য আধার  
 বর্গ হ'তে কেহ যেন আনি এই স্থানে  
 স্থাপিয়াছে রম্য ভাবে, তুলনা ইহার  
 কি দিবে এ ক্ষুদ্র কবি, বারেক এখানে  
 বসিলে বিমল প্রাণে অমৃতের ধারা  
 হয় প্রবাহিত, চিন্তে নাহি রহে আর  
 সংসারের শোক হৃৎ অক্ষ হাহাকার ।  
 এখানে সে যোগী ঐষ্ঠ সেলিম সমাধি,  
 যাহার করুণা বলে স্নেহ-আশীর্ব্বাদে  
 এক মুষ্টি ভস্ম নিয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদে  
 লভেছিল। পুত্র-রত্ন ভারত সম্রাট  
 আকবর, তাই সেই তাপসের নামে  
 রেখেছিল। নাম তার কুমার সেলিম ।  
 হায় দেবি, পুত্র আশে আজও যেখানে  
 অসংখ্য রমণী আসি অই ধূলা বালি  
 মাখি হৃদে, লভে হায় নূতন জীবন ।  
 আরো কত শত আহা প্রাসাদ সুন্দর  
 তুলিয়া উন্নত শির নীল নভস্থলে  
 মুসলমান সম্রাটের অতীত গৌরব  
 ঘোষিছে নীরবে দেবি, কে আছে জগতে  
 এমন মোসলেম আহা নিরখি এ দৃষ্ট  
 এক বিন্দু অক্ষ যার না করে নয়নে ?  
 অই যে সুউচ্চ এক প্রাসাদ সুন্দর  
 সম্রাটের জীড়াক্ষেত্র, মরি কি কোশলে  
 বিনির্ম্মিত এই গৃহ, কত গুপ্ত কক্ষ  
 গুপ্ত পথ হায় এই প্রাসাদ ভিতরে ।  
 এই স্থানে কই চিন্তে আগনি সম্রাট  
 লুকাইত, খুঁজে খুঁজে বেগম নিচর

ধরিলে সম্রাটে, জয় হ'ত তাহাদের ।  
 বেগম নিচর পুনঃ প্রাণের আনন্দে  
 লুকাইত গুপ্ত কক্ষে, সম্রাট আবার  
 খুঁজিয়া বেগম কুন্দে করিলে বাহির,  
 সম্রাটের হ'ত জয়, আনন্দে সম্রাট  
 একে একে সকলের সূবর্ণ কপোলে  
 চুম্বিত, বেগমবন্দ আনন্দে তখন  
 হইত বিহ্বল, কত ইরানী তুরানী  
 তাতারী জর্জেন দাসী প্রাণের আনন্দে  
 ধরিত প্রেমের গান ঘুরিয়া ফিরিয়া  
 নেচে নেচে খেকে খেকে দিয়া করতালি  
 হাসিমুখে সম্রাটেরে করিয়া বেষ্টন ।  
 অসংখ্য তারকাগুলি যেন শশধরে  
 বেড়িয়া করিত হেঁসে প্রেম সম্ভাষণ ।

নগরের মধ্যস্থলে কেমন সুন্দর  
 সুপ্রসর রাজ-পথ, হৃদারে বিপণি ।  
 অসংখ্য পথিক মরি ভ্রমিছে নগরে  
 পদব্রজে, শকটে কি মধুর দর্শন ।  
 ফল মূল লুচি পুরি ক্ষীর ছানা ননী  
 কত যে মিষ্টান্ন, কত সুগন্ধি পানীয়  
 সম্বিভ বিপণি মাঝে নয়ন-রঞ্জন ।  
 বিবিধ সুরম্য বস্ত্র বিপণি-অলিন্দে  
 ভুলাইছে কত শত পথিকের মন ।  
 নানাবিধ জবাগুলি কেমন সুন্দর  
 সুসজ্জিত স্তরে স্তরে বিপণি তিতরে  
 হেরিলে জুড়ায় আধি, কত জাতি লোক  
 নিবসিছে এই ক্ষুদ্র শিকরী নগরে ।  
 নগরের প্রান্তদেশে অসংখ্য উদ্যান  
 মনোহর, নামাধিহ কলার বিটপী  
 গুল্ম-ভর, কুম্বিত্ত বিবিধ বন্যজী

শোভিতেছে এই সব কুসুম উজানে  
মোহিয়া মানব মন ; নগর বাহিরে  
সরল প্রসর পথ, গিয়াছে চলিয়া  
কেমন সুন্দর ভাবে আগরা নগরে ।  
পথের ছধারে মরি কত মনোহর  
সেগুন অশোক তাল নিহ দেবদারু  
মাঝে মাঝে কলবৃক্ষ—অমৃত পনল ।  
আতপ তালিত ক্রান্ত পথিক মিচর  
এই সব তরু-তলে বসিয়া আনন্দে  
নিবারে অমৃত প্রাপ্তি স্নিগ্ধ সমীরণে ।  
স্থানে স্থানে এ প্রসর পথের ছধারে  
গৃহস্থের বাড়ীগুলি শোভিছে সুন্দর  
চিত্রাপিত প্রায় শ্রাম কানন-আধারে ।

অই যে পথের পার্শ্বে ভয় এক বাড়ী  
সম্মুখে সরসী এক অতি পুরাতন,  
ছ'ধারে সোপান বাঁধা, স্বচ্ছ নীল জলে  
ছ'একটি শতদল রয়েছে ফুটিয়া  
এ ঘোর নির্জন স্থানে, পার্শ্বে কুঞ্জবন ;  
বেষ্টিত বিটপীগুলি বন-লতিকায় ।  
কণ্টকিত তরুগুলি উঠিয়াছে ক্রমে  
চারি দিকে ; শ্রীহীন এ নিকুঞ্জ কানন  
বয়স্কভাবে ; পুষ্পতরু কলের বিটপী  
বিগত ললবশুস্ত নর কলেবর ।  
সরসী পশ্চাতে এক ভয় অট্টালিকা  
সুবহু, স্থানে স্থানে গিয়াছে কাটিয়া,  
কোথা বা কার্নিস ভয়, কোথা বা প্রাচীর,  
কোথা ভয় ছাদ, দীর্ঘ সাতির মিচর  
পড়িয়াছে আড় ভাবে প্রাচীর ঘেষিয়া  
অসংখ্য অমৃত বট বহু তরুগুলি

উঠিয়াছে স্থানে স্থানে প্রাচীর ভেদিয়া ।  
কপোত পেচক ঘুঘু বন পাখীগুলি  
নিবসিছে ভয় প্রায় কোটরে তাহার  
মন সুখে, নিস্তকতা পেতেছে সাম্রাজ্য  
পূর্ণভাবে, নির্জনতা সদা সহচর,  
ধ্বংস তার সিংহাসন, সেনাপতি ঘম ।  
এ বাটীর অধীশ্বর কালের কবলে  
নিষ্পেষিত, ধন রত্ন আত্মীয় স্বজন  
সঙ্গী তার বহু দিন, নাহি কেহ আর  
বংশের প্রদীপ দিতে নখর জগতে ।  
সৌভাগ্য চলিয়া গেছে, শুধু স্মৃতি তার  
রহিয়াছে গৌরবের সমাধি-গহ্বরে  
চিরতরে অতীতের অনন্ত আধারে ।  
সম্মুখে অলিন্দ ভয়, পশ্চাতে তাহার  
একটি দ্বিতল গৃহ বহু পুরাতন  
পার্শ্বে সোপানের শ্রেণী ঘুরিয়া ফিরিয়া  
উঠিয়াছে সেই উচ্চ দ্বিতল ভবনে ।  
এক পার্শ্বে সুবহু কক্ষের ভিতরে  
একটি মানব মূর্তি পর্য্যটকের পরে  
অবলম্বি উপাধান রয়েছে বসিয়া  
বক্রভাবে, শাশুরাজি চুইছে হৃদয়  
অন্ধ পক্ষ, নেত্রদ্বয় কাপট্যের খনি ।  
মুখেতে মদের গন্ধ, সম্মুখে পতিত  
ছইটি বোতল শূন্য, ক্ষুদ্র পাত্র এক  
মদপূর্ণ, গন্ধে তার কক্ষ কলুষিত ।  
পার্শ্বে তার একজন মহারাজী দূত  
নীরবে চিন্তিত হৃদে রয়েছে বসিয়া ।  
অদূরে বিংশতি চর যমদূত প্রায়  
সুবহু কাষ্ঠাসনে, ললাট দর্পণে  
বিব্রিত কোটিল্য-ছায়া বিশ্ব ধ্বংসকারী



হৃদয়ের অনিবার্য পাপ-আশা সনে ।  
 সকলেই উগ্রমুর্তি, কে ক'বে আমায়  
 কেন এ অশ্রুগুণি এ নিভৃত স্থানে ?  
 হয় ত গোপনে কোন স্বাক্ষী রমণীর  
 স্মৃতিতে সতীত্ব-রত্ন, কিম্বা ধন-লোভে  
 বধি কোন সাধুজনে, হরিতে তাহার  
 সর্বস্ব, এ গুপ্তসভা নির্জন-কাননে ।  
 কহিল সে নরপশু “কে জানে মসির  
 এবারো নিষ্ফল হ'বে ? বৃথা আফালন  
 তোমাদের, বুদ্ধি দোষে বৃথা পরিশ্রম ।  
 প্রথমেই অনর্থক আনিলে হরিয়।  
 একটি রমণী, রোগে মরিল সে জন  
 নশ্বদা তটিনী-তীরে ঘটালে আবার  
 এ বিভ্রাট, বল দেখি উপায় এখন ?  
 সমস্ত ভরসা মম হয়েছে নির্ব্বাণ ।”  
 কহিল মসির “রাজ-উদ্যানের পাশে  
 দেখেছিহু সন্ধ্যাকালে এই রমণীরে ;  
 অনিন্দ্য সুন্দরী সে যে, তুলনা তাহার  
 নাই এ জগতে, সঙ্গে পুরুষ একটি  
 বীর ঐক্য, ভেবেছিহু এই সে রমণী ;  
 নতুবা করিব কেন বৃথা আক্রমণ  
 সেই রমণীরে ?” “না না তোমারি সে ভ্রম”  
 উত্তরিল। যোদ্ধা বর “আমি চিনি তারে  
 সে নহে লবঙ্গ, সে যে কৌমুদী সুন্দরী  
 পেশবার পুত্র-বধু বিশ্বাস-সজিনী ।  
 সে নহে সামান্ত নারী, সন্ধ্যাসী ছহিতা,  
 যুদ্ধান্তে বিশ্বাস সনে বিবাহ তাহার  
 সংঘটিবে, অস্ত্র বামা কি সাধ্য যুঝিবে  
 পঞ্চ জন বীর সনে সম্মুখ সংগ্রামে ?

লবঙ্গ সুশীলা অতি কোমল-প্রকৃতি,  
 বর্ণ তার সমুচ্ছল কাকনের মত,  
 সদা হাস্ত মুখী, ধীরী, জঘুগল মাঝে  
 এক খণ্ড কৃষ্ণ তিল কত মনোহর,  
 কাকন-কুসুমে যেন নীল কান্ত মনি ।  
 রঘুজী জনক তার, বিমাতার কাছে  
 আছে এবে, গুপ্ত ভাবে করিলে সন্ধান  
 পাইবে তাহারে কৃষ্ণা তটিনীর তীরে  
 রঘুজী প্রাসাদে সেই সেতার। নগরে ।  
 কি আশ্চর্য্য, এত বড় যোদ্ধা চারি জন  
 নিহত সে নারী যুদ্ধে, —তুমি পলাতক ।  
 দুইবার ব্যর্থ ভ্রম, স্মরিলে সে কথা  
 যে ঘণা উপজে মনে বুঝিবে কেমনে ?  
 যাও পুনর্ব্বার আজি পঞ্চদশ জন  
 ছদ্ম বেশে, ছলে বলে আনিলে তাহারে  
 এই স্থানে, বহু অর্থ প্রদানিব সবে ;  
 যাও তবে ।” সসজ্জমে উঠিয়া তখনি  
 পঞ্চদশ ভীম দম্ভা চলি গেল বেগে ।  
 অবশিষ্ট পঞ্চজন রহিল বসিয়া ।  
 সেই স্থানে, পাপিষ্ঠের আদেশের তরে ।  
 নরাধম কিছুক্ষণ চিন্তিয়া নীরবে  
 শূন্য দৃষ্টে, সম্মুখস্থ দম্ভা পঞ্চজনে  
 কহিল “কে আছে বিধে তোমাদের মত  
 নির্ব্বোধ এমন ? আমি কত বলেছিহু  
 বধিতে গোপনে সেই পাপিষ্ঠ তৈমুরে ।”  
 কিন্তু তোমাদের বাক্যে নির্ব্বোধের মত  
 তুলিয়া আপন লক্ষ্য পথভ্রান্ত হ'য়ে  
 অশেষ কলঙ্কভাগী হইহু কেবল ।  
 আমার আদেশ মত বধিলে তাহারে

কে হইত প্রতিদ্বন্দী ? অবাধে পাঞ্জাব  
 আসিত এ করতলে, ছলে কি কৌশলে  
 বধি' আদালীয়ে কোন সম্মানিনী যোগে  
 বেগমে করিয়া বাধ্য আহাৰ্য্যের সনে  
 গুপ্তবিষে বধিতাম দিল্লীর সম্রাটে  
 নৃত্য উপলক্ষে কোন স্বৈরিণীর গৃহে  
 আনিয়া গাজিরে, আত্ম করিতাম তার ।  
 তা হ'লে কে বাধা দিত ? দিল্লী-সিংহাসন  
 অবশ্য আসিত এই চরণের তলে ;  
 পাঞ্জাব যেতনা কভু রাঘবের করে ।  
 নিষ্ফল বিগত চিন্তা, নির্বোধের প্রায়  
 কি বলিছ পুনর্বার ? আমি কিন্তু আর  
 ভুলিব না বৃথা বাক্যে, শেষ কথা মম  
 নজীবে করিয়া হত্যা গভীর নিশিতে,  
 সাজি তার বেশে সেই লোহিত উষ্ণীষে  
 প্রবেশিয়া গুপ্তভাবে আদালী-শিবিরে  
 বধি তারে, মুণ্ড তার আনিবে এখানে ।  
 তা' হইলেই আশা মম পূরিবে নিশ্চয়,  
 দিল্লী-সিংহাসন আমি লইব কাড়িয়া  
 পেশবার বলে, এই আদেশ আমার  
 পালিতে অক্ষম যেন। বধিব তাহারে ।  
 যাও নীজ, যাও যাও, কেন চিন্তাকুল  
 বসিয়া মজল তুমি ? আদালীর মুণ্ড  
 আনিবে যে জন, আমি করিহু প্রতিজ্ঞা  
 বহু অর্থে পুরস্কৃত করিব তাহারে ;  
 তুমি বীর, কার ভয়ে বসিয়া নীরবে ?  
 অমনি একটি দম্মা যমদূত প্রায়  
 রক্ত মূর্তি, বজ্রস্বরে কহিল গর্জিয়া  
 “মজল রমণী নহে ভীত হবে কেন ?  
 ভয় কারে বলে, এই মানব জীবনে

জানে না মজল তাহা, কত নর-হত্যা  
 করিয়াছি, বধিয়াছি সমগ্র জীবনে  
 কত নর-নারী, সংখ্যা কে করিতে পারে ?  
 শঙ্কর থাকিলে সঙ্গে কে আছে জগতে  
 মজলের কাছে থাকে অক্ষত শরীরে ?  
 চলিলাম যতদিন আদালীর মুণ্ড  
 না পারি আনিতে, আর বধিতে নজীবে,  
 ফিরিব না গৃহে আর, হবে না সাক্ষাৎ  
 তত দিন, এ প্রতিজ্ঞা যাই আমি তবে ।”  
 এত বলি দম্মাপতি উঠিল সবেগে  
 এক লক্ষে, ভীমস্বরে কহিল আবার  
 “শঙ্কর বসিয়া কেন ? উঠ অবিলম্বে ।”  
 মুহূর্তে বিহ্বতবেগে দম্মা পঞ্চজন  
 ছুটিল, কাঁপিল কক্ষ চরণের ভারে ।  
 নীরবে পর্য্যাক্ত ত্যজি পাপিষ্ঠ হৃদয়  
 ভ্রমিতে লাগিল ধীরে চিন্তাকুল প্রাণে  
 ইতস্ততঃ, ক্ষণপরে ক্রোধাক্রমিত হৃদয়ে  
 ভাবিতে লাগিল “বৃথা চিন্তার সাগরে  
 কেন আমি ভাসমান কাপুরুষ প্রায়  
 ভয় ? কারে ভয় ? কে সে ? মিথ্যা সে ভাবনা  
 আদিনা বেগের হৃদি মুহূর্তের তরে  
 নহে ভীত ; তবে কেন ? এই ভুজ-বলে  
 কত শত হুঁতগায় শমনে-সনে  
 প্রেরিয়াছি লুপ্তিয়াছি কত রমণীর  
 অমূল্য সতীত্ব-রত্ন ত্রিদিবের মণি ।  
 ছার গণি অশ্রু লোকে, আমি বাম যারে  
 দিল্লীর সম্রাট হলে নাহিক নিস্তার ।  
 সাক্ষী তার নরাধম পাপিষ্ঠ তৈমুর ।  
 যুদ্ধান্তে মোস্তেম সৈন্ত হইলে বিধ্বস্ত  
 একমাত্র হবে মোর দিল্লী-সিংহাসন,

সমগ্র ভারতবর্ষ লুপ্তিবে চরণে ।  
 আর সেই প্রেমময়ী রমণী-রতন  
 লবঙ্গ ? শোভিবে হৃদে কুশুমের মত ।  
 আবার ভাবিলা পানী “অদৃষ্টের দোষে  
 না পুরিলে আশা হার যাইবে ডুবিয়া  
 সুখের জীবন মম বিধান-সাগরে ।”  
 মুহূর্তে কালীম রেখা ছাইল বদনে,  
 ভাবিল “গোপনে হার কেন গিরাহিছু  
 সেতারায় নরাদম রঘুজীর সনে ?  
 না যাইলে লবঙ্গের এত রূপ রাশি  
 কে দেখিত, কে ডুবিত প্রেমের সাগরে ?  
 হতভাগা পেশবাই অনর্থের মূল,  
 পাবণের অশ্রুরোধে যাইয়া সেখানে  
 প্রাণের অশান্তি শুধু এসেছি লইয়া ।”  
 তার পর নরাদম মহারাষ্ট্র দূতে  
 কহিল ‘দিলীপ, ভাই লবঙ্গ বিহনে  
 কেমনে বাঁচিব আমি ? তারে না দেখিলে  
 প্রাণে মোর দিবা নিশি অশান্তি ভীষণ ।’  
 আদিনার কথা শুনে কহিল দিলীপ  
 “কেন ভাই তুমি এত হয়েছ অধীর ?  
 কি ছার লবঙ্গলতা হিরণের কাছে ?  
 তার মত সুখী কেহ নাহি এ জগতে,  
 হেরিলে সে রূপ রাশি আপনি অনঙ্গ  
 আশ্রহারী, সে যে দাদা সৌন্দর্যের রাণী,  
 তারি কথা বহুদিন বলেছি তোমারে,  
 তবু তুমি অনর্থক লবঙ্গের লাগি  
 হয়েছ পাগল এত, ভুলে যাও তারে ।  
 আদিনা কহিল পুনঃ “আচ্ছা ভাই তবে  
 লবঙ্গেরে নিও তুমি, হিরণে আনিয়া  
 দেও মোর, তাহা হলে আমরা দুটাই

মদ ও রমণী ল’য়ে র’ব মহা সুখে ।”  
 দিলীপ কহিল হাসি “ব্যস্ত কেন ভাই,  
 হিরণে আনিয়া আমি দিব তব কাছে,  
 অমরেন্দ্র নামে এক প্রেমাস্পদ তার,  
 সেই এনে বিপ্রগৃহে রেখেছিল তারে  
 গুপ্তভাবে তান্ত্রী ভীরে শুরাট নগরে ।  
 তারে না বধিলে দাদা সমস্ত কৌশল  
 ব্যর্থ হবে, সেবে দাদা শঠ চূড়ামণি ।  
 মুসলমান সৈন্যদলে ক’রেছে এবেশ  
 সে এখন, দিল্লী প্রান্তে যমুনার তীরে  
 জোহরার গৃহ পার্শ্বে পাইয়া একাকী  
 আমি তারে ছই জন সঙ্গী নিয়া সাথে  
 করেছিছু আক্রমণ, অসির আঘাতে  
 আহত হইয়া সে যে পড়েছিল ভূমে  
 যমুনার গর্ভে তারে ফেলিতে তখনি  
 সকলে মিলিয়া মোরা টানাটানি কত  
 করেছিছু, কোথা হতে আসি আচম্বিতে  
 বুঝা এক, ভীম বলে ক’রে আক্রমণ  
 বধেছিল আমার সে সঙ্গী ছই জনে  
 ঘোর রণে, আমি দাদা এসেছি পলা’য়ে ।”  
 আদিনা বিরক্তি ভরে চাহি তার পানে  
 কহিল “দিলীপ তুমি কেন তয়াতুর ?  
 তুচ্ছ সেই অমরেন্দ্র, তৃণ সম তারে  
 গনি আমি, তার জন্ত ভাবনা কিসের ?  
 মদিরা জড়িত কণ্ঠে হেলিয়া ছলিয়া  
 আবার কহিল পানী করিয়া তর্জন  
 একটি চরণাঘাতে বধিব তাহারে,  
 ভয় কি ? সহস্র দশ্য আছে মম হাতে,  
 যারে ক’ব, সেই তার হৃদয় ছিঁড়িয়া  
 করিবে শোণিত পান ।” বাধা দিয়া তারে

কহিল দিলীপ “আমি ভরিয়া তাহারে ।  
 চিন্তা মোর, হাত ছাড়া হইলে হিরণ  
 আনিতে যে কষ্ট হবে, এইত সে দিন  
 মনস্থরে নিয়া সাথে সুরাট নগরে  
 ধরেছি হিরণেরে সরোবর-তীরে ।  
 যশোবন্ত ছিল কাছে, চীৎকারে তাহার  
 এসেছিল ছুঁতে তাই নারি হিরণ আনিতে  
 ধরে তারে, তনিরাছি গুপ্তচর মুখে  
 সেদিন সে বিপ্রদাস নিয়া গেছে তারে  
 যোগাশ্রমে — বহুদূর মলয় গিরিতে ।  
 দস্যুদের ভয়ে তার হলনা সাহস  
 রাখিতে তাহারে সেই সুরাট নগরে ।”  
 “কত দিন যোগাশ্রমে থাকিবে তাহার?”  
 জিজ্ঞাসিল নরাকৃতি আদিনা পামর ।  
 উত্তরিল আততায়ী দিলীপ তাহারে  
 “প্রতিবর্ষে নয় মাস থাকে যোগাশ্রমে,  
 তারপর তিন মাস পঞ্চবটী বনে ।”  
 মদির। জড়িত কণ্ঠে করতালি দিয়া  
 কহিল আদিনা “বেশ, সেই ভাল তবে,  
 বড়ই দুর্গম স্থান যোগাশ্রম তার,  
 কেননা মলয় গিরি ভেদ করি তথা  
 যাওয়া ত সহজ নহে, পঞ্চবটী বনে  
 আসিবে যখন, ধরি আনিব তাহারে ।”  
 বাধা দিয়া পুনর্ব্বার কহিল দিলীপ  
 “আরো এক তরু আমি পেয়েছি সম্প্রতি  
 গুপ্ত চর মুখে মোর, পঞ্চবটী বনে  
 যাইবার আগে তারা যাবে বিদ্যাচলে  
 পূজা দিতে বিদ্যেশ্বরী দেবীর মন্দিরে ।  
 সেই স্থানে মুনি শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞী আশ্রমে  
 নিবসিয়া কিছুদিন যাইবে তাহার।

বহুতীর্থে, কাশি আশ্রা প্রয়াগ ঘুরিয়া  
 যাইবে তাহার। শেষে পঞ্চবটী বনে  
 নাসিক নগর কাছে, পেশবা সেনাপতি  
 দিয়াছে নির্ধারে এক বজর। তাদের ।”  
 “বেশ বেশ” মহাহর্ষে কহিল আদিনা  
 “সুবর্ণ সুযোগ এই, পথ হতে তবে  
 আনিব হিরণে মোর। কাড়িয়া সবলে ।  
 না পাইলে পথি মাঝে, পঞ্চবটী হতে  
 নিশ্চয় আনিব তারে করিয়া হরণ ।”  
 “তাই হবে” উত্তরিল দিলীপ তাহারে ;  
 আবার ভাবিল। পাপী আনিতে হিরণে  
 না পারিব বস্ত্র দিম, না পাইব শাস্তি ।  
 হিরণ লবঙ্গে যদি পারি আনিবারে  
 উভয়ে লইয়া আমি সুরাট কাশ্মীরে  
 যাব চলি, কি করিবে আদিনা আমার  
 তথা যেরে ? রক্ত-হার বানরের গলে  
 শোভে কি কখন ? মুখ ভেবেছে জনরে  
 লবঙ্গ হিরণে লয়ে প্রেমের সাগরে  
 ভাসিবে মনের সুখে ? সে আশায় ছাই ।  
 এত কষ্ট করে আমি আনিয়া হিরণে  
 দিব তারে ? আর আমি পথে ঘাটে পড়ে  
 হিরণের মুখখানি দেখিব স্বপনে ?  
 তা হলে কি লাভ মোর আনিয়া তাহারে ?  
 তবে আমি আদিনার সাহায্য লইয়া  
 আনিব তাহারে হেথা পারি যে প্রকারে ।  
 তারপর হেথা হতে যাইব চলিয়া  
 গুপ্তভাবে তারে ল'রে সুরাট কাশ্মীরে ।  
 অতথা একাকী আমি নারিব আনিতে  
 যোগাশ্রম-কিংবা সেই পঞ্চবটী হতে ।  
 একা আমি হিরণস্তা দেবীর মন্দিরে

করেছিল কত চেষ্টা, কত যে কৌশল  
 পেতেছিল গুপ্তভাবে, জ্যোৎস্নারে ল'রে ;  
 শুধু এই অমরেন্দ্র চক্রান্ত আমার  
 দিয়াছে করিয়া বার্ষ, দেখিব এবার  
 কেমনে সে রক্ষা করে হিরণ বালারে ।  
 দিলীপের পৃষ্ঠ দেশে থাকা দিয়া জোরে  
 কহিল আদিনা বেগ “কি ভাবিছ ব'সে  
 ভায়া তুমি ? কেন আজি এহেন উন্নয়ন ?  
 সহসা কৃত্তম পক্ষী উঠিল চীৎকারি  
 বৃক্ষের কোটরে, ভয়ে প্রকৃতি সুন্দরী  
 কাঁপিয়া উঠিল সেই নির্জন প্রদেশে  
 ভয়াবহ, পাপিষ্ঠের পাষণ্ড হৃদয়ে  
 উপজিল ভীতি, পাপী উঠিল কাঁপিয়া  
 সেই রবে, কত কথা উদিল মানসে ।  
 দেখিল পাষণ্ড এক মহারাষ্ট্র চর  
 আসিছে তাহার দিকে, ভাবিল তখন  
 “না জানি কি তব পুনঃ এ'নেছে অভাগা ।”  
 যুদ্ধে প্রবেশি চর কক্ষের ভিতরে  
 ঘোড় হাতে সসজ্জা কহিতে লাগিল  
 “বীরেন্দ্র ! পেশবা ঐষ্ঠ সানন্দ হৃদয়ে  
 দিয়াছেন বৃত্তবাদ, যুদ্ধান্তেই তিনি  
 আপনাকে অর্পিবেন দিল্লী-সিংহাসন ।  
 অজিরেই মহারাষ্ট্র চতুরঙ্গ সেনা  
 আসিবে দিল্লীর দিকে, সঙ্গে সদাশিব  
 সেনাপতি । সুকৌশলে নিশীথে আপনি  
 বধিবেন গুপ্তভাবে আকালী-নজীবে ।  
 তাহা হ'লে সকলেই স্বাধীনতা লাভ

প্রাপ্ত দেখাতে চাবে, আপনি তখন  
 মিশি সেই সনে, সব মোস্তেসম সৈনিকে  
 ভুলায়ে, বিজোহ-বহ্নি করি প্রজ্জ্বলিত  
 ভস্মীভূত করিবেন সমস্ত নবাবে ।  
 তা হ'লেই মহারাষ্ট্র লভিবে বিজয়,  
 উড়িবে ত্রিশূল স্বজা দিল্লী-দুর্গ-শিবে  
 আপনার জয়ধ্বনি হইবে ঘোষিত  
 প্রতি ঘরে ঘরে এই ভারত ভিতরে ।”  
 বিদায় হইল চর, নীরবে পাষণ্ড  
 ভাবিতে লাগিল হৃদে “যে ছল চাতুরী  
 খেলিয়াছি বিনাশিতে আকালী সাহারে ;  
 অবশ্য সকল হ'ব, সমুখ সংগ্রাম  
 কে করিবে বীরশ্রেষ্ঠ আকালী বিহনে ?  
 যদিও সময় বাঁধে, কি ভয় তাহাতে ?  
 পেশবার লক্ষ লক্ষ সৈনিকের কাছে  
 শৃগালের মত সবে পলাইবে রণে ?  
 ক্ষণকাল শূন্য দৃষ্টে পাষণ্ডের প্রায়  
 রহিল বসিয়া পাপী, মানস-নয়নে  
 কত শত মহাচিত্র উঠিল ভাসিয়া,—  
 —দেখিল লবঙ্গলতা, হিরণ সুন্দরী  
 আর সেই চির শিয় দিল্লী-সিংহাসন  
 লুপ্তিত চরণ তলে, সমগ্র ভারত  
 “জয় আদিনার জয়” উঠিছে গর্জিয়া ।  
 এ অসার মোহময় জাগ্রত স্বপনে  
 আত্মহারা পাপী, ক্রমে আশা-মায়াবিনী  
 উঠাইল অভাগারে স্বর্গের সোপানে ।



## পঞ্চবিংশ সর্গ

[ সেতারা — রাজোদ্যান ; কৌমুদীবাঈ ও মহারাষ্ট্রে গুরু ]

পাঠক, বারেক চল উজ্জানের মাঝে  
দেখিতে বাসনা যদি সরসী-সলিলে  
ফুটন্ত কুমুদ-শোভা, হিল্লোলে হিল্লোলে  
চন্দ্রমার প্রতিবিশ্ব কত মনোহর ।  
অই দেখ ঝাউ তলে সরসী-সোপানে  
একটি রমণী, কাস্তি বিমলিন ঘোর ।  
সুগঠিত কলেবর অতুল জগতে,  
মর্ম্মরে কাটিয়া যেন বিধাতা চতুর  
গঠিয়াছে এ মুরতি, লাবণ্যে জড়িয়া  
প্রেমের উজ্জল বর্ণে রঞ্জিয়াছে মুখ ।  
রমণী সজলনেত্রে চাহি উর্ধ্ব পানে  
কহিতে লাগিল “কোথা বিপদ-ভঞ্জন  
দয়াময়, কে বুঝে এ প্রাণের বেদনা ?  
অগতির গতি তুমি, পতিত-পাবন ;  
কে বুঝে তোমার লীলা ? বোধগম্য তুমি,  
তুমিই তোমারে বুঝ, অস্ত্রে কি বুঝিবে ?  
সঁপেছি তোমার করে বীরেন্দ্র কেশরী  
বিশ্বনাথে, দয়াময় রক্ষিও তাহারে  
এ বিপদে, এ ভীষণ সংগ্রাম-সাগরে ।”  
সহসা দেখিল বামা পশ্চাতে তাহার  
একটি তাপস-মূর্ত্তি, সম্মুখে তখনি  
দাঁড়াইল প্রণমিয়া সে পদ-যুগল ।  
আশীসিয়া যোগিবর কহিতে লাগিল  
“কেন মা চিন্তিত এত ? বীর হুদি তোর  
কেন এত শঙ্কাসিত ? বীর বালা হ'য়ে  
এত চিন্তা এত শঙ্কা সাজে কি মা তোর ?  
অশ্রুবিদ্ধা, যুকনীতি শিখায়েছি তোরে

বহুদিন, সকলি তা' যাইবে বিফলে ?  
মলয় গিরির সেই নিবিড় কাননে  
কত সিংহ, কত ব্যাঘ্র বধেছিস্ তুই  
অসি হস্তে দাঁড়াইয়া নির্ভীক হৃদয়ে ।  
সকলি তা' স্বপ্ন ? সেই সাহস হৃদ্যার  
ডুবালি কি চিরতরে সাগর সলিলে ?  
আছে মনে ?—গিরিমূলে সেই যোগাশ্রমে  
গিয়াছিল বেড়াইতে বিশ্বনাথ যবে ?—  
—সেই দিন শক্তি পূজা, কত শত বীর  
পূজান্তে মলয়গিরি করিয়া মথিত  
ব'ধেছিল কত যুগ, হিংস্র পশু কত ।  
সায়াছে একটি ভীম মন্ত ঐরাবত  
বাহিরিয়া বন হতে ; করেছিল তাড়া  
বীরবৃন্দে, সকলেই গেছিল পলা'য়ে  
প্রাণভয়ে, শুধু একা বীর কুলবর্ত্ত  
বিশ্বনাথ, অসিহস্তে রোধি পথ তার  
দাঁড়াইয়াছিল সেই কৃতান্তের কাছে ।  
বহুক্ষণ যুঝি শেষে সে দস্তী ভীষণ  
না পারি আটিতে সেই বীরেন্দ্রের সনে  
শুণ উঠাইয়া যবে বধিতে তাহারে  
করেছিল বহুচেষ্টা, তুই মা তখন  
লক্ষ দিয়া কেটেছিলি সেই শুণু তার  
বিদ্যায় গতিতে এক তীক্ষ্ণ তরবারে ।  
হেরি তোর এত বীৰ্য্য, ধন্য ধন্য সবে  
করেছিল শত মুখে, পেশবা-নন্দন  
হেরিয়া বীরক তোর বিমুক্ত হৃদয়ে  
বিবাহ-বন্ধনে তোরে বাধিতে তখনি



করেছিল অসুখরোধ কত মোর কাছে ।  
 তুইও মা বীরবে তার মুখ হয়ে অতি  
 সঁপেছিলি মন তারে, আমি মা সন্ন্যাসী  
 নিরখি' তোদের তার সে শুভ প্রভাবে  
 দিয়াছিলু হুটে চিন্তে সম্মতি আমার ।\*  
 সেই হ'তে তুই মাগো পেশবার গৃহে  
 এসেছিস্ তোদের সে ভালবাসা হেরি  
 আমিও হয়েছি কুটে, আজ কেন তোর  
 নিরখি এমন ভাব ? মোল্লের ভয়ে  
 তুইও কি মা হয়েছিস্ শক্তিতা এখন ?  
 হি হি মা কোমুদী, উঠ্ খোল তরবার  
 রণচণ্ডী বেশে মাগো সে রণ-প্রাঙ্গণে  
 নিরখিলে তোরে, আমি আনন্দ-সাগরে  
 ভাসিব, জীবন মোর হইবে সার্থক  
 সেই দিন ; তবে কেন এত চিন্তাকুল  
 মা আমার ? নিজ জীবন দিয়াছি সঁপিয়া  
 ভারত উদ্ধার ব্রতে ধ্বংসিয়া মোল্লেরে ।  
 তুই মা সন্তান মোর, পিতার আকাঙ্ক্ষা  
 কত হ'য়ে পূরাবি নে ?—প্রাণের শোণিতে  
 পিতৃ ঋণ—মাতৃ ঋণ করিবি নে শোধ ?  
 শুধু কি পাপের বোঝা বাড়াইতে তবে  
 লভেছিস্ জন্ম তুই ? নারীর জীবন  
 এতই কি হয় ? হায় ভাবিলে তা' হুদে  
 সহস্র বৃষ্টিক মোরে করে দংশন ।  
 তুই মা কৃপাণ মোর, সমরে অশনি ।  
 তোরি বলে বিশ্বনাথে করিয়া সহায়  
 পড়িয়াছি কল্প দিয়া এ মহা-সমরে ।

বুঝ আমি, তবু এই শরীরে আমার  
 মত্ত মাতঙ্গের বল ধ্বংসিতে মোল্লেরে ।  
 শুরু মোর যোগীজ্যেষ্ঠ রামদাস স্বামী  
 তারি পদরজঃ মাগো মাখিয়া ললাটে  
 নিয়াছি এ মহাব্রত, তাহারি আদেশে  
 মহারাষ্ট্র ধর্ম পুনঃ করিতে স্থাপন  
 এ ভারতে, মাগো তুই কৃপাণ আমার  
 সেই ব্রতে, ধরু অসি, আয় রণ-রঙ্গে  
 রণ ক্ষেত্রে, মাগো সেই রণচণ্ডী বেশে ।  
 মহারাষ্ট্র বামা কতু ডরে কি সমরে ?  
 সমগ্র সেনানী বৃন্দ স্তম্ভিত আজি  
 রণ-বেশে, মহারাষ্ট্র ছাড়িছে হুকার  
 ভৈরব-গর্জনে, মাগো উঠেছে অলিয়া  
 ভীষণ সমরানল ধ্বংসিতে মোল্লেরে ।  
 সেই দিন মাগো তোরে মন্ত্রণা আবাসে  
 আনি যবে, দৈববাণী শুনাইলু সবে ।  
 মহারাষ্ট্র বীরবৃন্দ উঠেছে মাতিয়া  
 রণ-রঙ্গে, নব শক্তি বিজ্ঞাতের বেগে  
 হ'য়েছে মা সঞ্চারিত মহারাষ্ট্র-প্রাণে ।  
 যাই তবে, যুদ্ধক্ষেত্রে বিশ্বনাথ সনে  
 উদাহ-বন্ধনে আঁমি বাঁধি মা তোরে ।”  
 চলি গেলো যোগীজ্যেষ্ঠ, সলজ্জবদনে  
 রহিলো দাঁড়িয়ে তথা কোমুদী সুন্দরী ।  
 কিছুক্ষণ পরে বামা ভাবিতে লাগিলো  
 “যুদ্ধান্তে বিবাহ ?—কেন, অর্থ কি তাহার ?  
 বিবাহ কাহারে বলে ?—হুইটি আশ্রয়  
 সংমিলন, আপনার অস্তিত্ব তুলিয়া

\* কোমুদীবাই মল্লের মিল্লির আশ্রমবাসিনী একজন নিম্না। জ্যোৎস্না, হীরণ, কালীতারা প্রভৃতির সঙ্গিনী ।  
 দেশের পুত্র বিশ্বনাথ রাও ( বিশ্বাস রাও ) ইহার বীরবে মুগ্ধ হইয়া আশ্রমের তলভী (মহারাষ্ট্র গুরু) কে বহু  
 অনুরোধ করিয়া পরিশ্রমার্থে ইহাকে নিজ বাড়ীতে লইয়া আসিয়াছিলেন । বঙ্গাবাহিনী ইনিও বিশ্বনাথের বীরবে মুগ্ধ  
 হইয়া তাহাকেই প্রাথমিক সঙ্গপণ করিয়াছিলেন ।

মিশিলে অন্তর সনে, রূপান্তরে তার  
 লভে আশা পুনঃ এক নূতন জীবন ।  
 ইহাই বিবাহ, শাস্ত্র বিহিত আদেশ ;  
 আমার আমিষ লোপ, তুমিষে বিকাশ  
 না হইলে শাস্ত্র মতে নহে তা বিবাহ ।  
 আশ্রয় মিলন ভিন্ন, লৌকিক আচারে  
 কে বলে বিবাহ সিদ্ধ ?—ভ্রম তাহা, ভ্রম ।  
 প্রকৃত বিবাহ যাহা, সে বিবাহ মোর  
 হইয়াছে বহুদিন বিশ্বনাথ সনে ।  
 লৌকিক বিবাহ আমি জানি না কেমন ?  
 —হয় নি আমার তাহা, হায় গুরুদেব  
 তুমিও কি অভাগির হৃদয়ের কথা  
 অক্ষম বুঝিতে ?—তবে কে আর বুঝিবে  
 এ জগতে ?” অভাগিনী বিষন্ন হৃদয়ে  
 ভাবিলা অনেক কথা, দেখিলা অদূরে  
 কত জাতি ফুলকুল স্তবকে স্তবকে  
 শোভিতেছে বস্তু পরে হেলিয়া ছলিয়া  
 সুস্নিগ্ধ হিল্লোলময় নৈশ সমীরণে ।  
 ফোটো ফোটো নিশি, হাসি ধরে না বদনে  
 প্রকৃতির, চন্দ্রমার সুস্নিগ্ধ কিরণ

রজিয়াছে কি সুন্দর সুগুহ বরণে  
 বসুধার অমুপম শ্রাম-কলেবর ।  
 সরসীর উন্নিময় সুনীল জীবনে  
 বিদ্বিত চন্দ্রমা চাক, কত মনোহর ।  
 নিরখিয়া প্রকৃতির শোভা অমুপম  
 চিন্তিত হৃদয়ে বামা রহিলা বসিলা ।  
 গভীর—গভীরতর নীরব যামিনী ;  
 নিদ্রার মোহন-মত্তে বসুধা সুন্দরী  
 হইল চেতনাহীন, নৈশ-সমীরণ  
 সঞ্চরিছে যুহু যুহু প্রকৃতির প্রাণে  
 ঢালিয়া মত্ততা ঘোর প্রতি পলে পলে ।  
 উঠিলা অভাগী ছাড়ি একটি মিথাস  
 সুদীর্ঘ, কহিলা ধীরে “হায় বিশ্বনাথ,  
 করিলাম যেই কার্য্য রমণী-জীবনে  
 নহে করণীয়, কিন্তু নাহি জানি শেষে  
 কি লিখেছে দয়াময় কোমুদীর তালে !  
 ধীরে ধীরে শশিমুখী চলিলা নীরবে  
 শয্যাগৃহে, শোভাময়ী প্রকৃতি সুন্দরী  
 রহিল একাকী এবে হারায় সজিনী ।’

## ষড়বিংশ সর্গ

[ নন্দিনী—নদী তীর ; বিদ্যাচল বৃন্দার আশ্রম ]

নিশি অবসান প্রায় ; তরুণ তপন  
রঞ্জিয়া বারিদপুঞ্জ স্তরে স্তরে স্তরে  
হিমাজি শৃঙ্গের মত, উদয় অচলে  
পাতিল কি মনোহর স্বর্ণ-সিংহাসন ।  
ছাইল খেতাতা, ক্রমে প্রতাহীন তারা  
লুকাইল একে একে প্রভাত-গগনে ।  
বিবাদিনী স্বর্ণ-উষা কুসুম ভূষণে  
সাজিল কি মনোহর, বহু দিন পরে  
সাজে যথা হৈম বেশে রতনে ভূষণে  
বিরহিনী বজ বধু কান্ত সমাগমে  
অর্ক হাসি মুখে অর্ক মলিন বদনে ।  
গাইছে বিহগবন্দ প্রভাত-সঙ্গীত  
লুকাইয়া অতি ঘন-পলব আধারে  
মনোহর, কুসুমিত নিকুঞ্জ-কাননে ।  
এখনো ভিমিরাকৃত কানন কমর  
গিরি গুহা, বালার্কের সুবর্ণ কিরণ  
এখনো চুহে নি আঁহা বসুধা-বদনে ।  
উজ্জল লোহিত ছটা পূরব গগনে  
উঠিছে ভাসিয়া ক্রমে, বসুধা সুন্দরী  
সাজিছে কমলঃ ধীরে সুত্তম বসনে ।

অই যে নন্দিনী, অই চলেছে নাচিয়া  
মধুর—মধুরতর মধুর গমনে  
কুলু কুলু তান ধরি প্রেম মাখা সুরে  
মাতাইয়া তীরস্থিত নিকুঞ্জ-কানন ;  
হই পার্শ্বে কুসুমিত কত বন-লতা  
প'ড়েছে হেলিয়া অই তটিনী-সলিলে

তরু সহ, স্রোত-ধারা করিয়া চূষন ।  
সুন্দরী তটিনী বন্ধে ক্ষুদ্র তরীগুলি  
ছুটিয়াছে সারি সারি দাঁড় সঞ্চালিয়া ;  
অপ্, অপ্, শব্দগুলি মরি কি সুন্দর  
বর্ষিছে পীযুষ ধারা সৈকত-কাননে ।  
অই যে তটিনী-তীরে অসংখ্য তরী  
সুদৃশ্য নগর নিয়্যে,—স্থির অচঞ্চল ।  
উর্ধ্বে 'শ্রেণীমত বহু উটজ সুন্দর ;  
মাঝে মাঝে হ'একটি মন্দিরের চূড়া  
শোভিছে প্রহরী প্রায় পরশি গগন ।  
কে অই যুবক, একা এ বন সৈকতে  
চলিয়াছে পদ ব্রজে ? উজ্জল বদন  
মসীময় ; রক্ত আঁখি নিশি জাগরণে ।  
চলিয়াছে অশ্রুমনে, প্রতি পদোক্ষেপে  
সংজ্ঞাশূন্য, বহিষ্ঠক্কু মোহ-আবরিত ।  
অদূরে নিকুঞ্জ-তলে পাপিয়া রঞ্জিনী  
আলাপিছে আসোয়ারি, সে মধুর রবে  
ভাজিল যুবার মোহ, দেখিলা চাহিয়া  
কুলু কুলু তান ধরি চারু তরঙ্গিনী  
চলিয়াছে যুহু যুহু হিল্লোল খেলিয়া  
অবিচ্ছাদ্য মুখ-কদে, পার্শ্বে মুকুলিত  
অবিচ্ছিন্ন কুঞ্জ-তল, কক্ষ প্রকৃতির  
শোভিছে কি মনোহর ঐষৎ আধারে,  
শোভিছে কি মনোহর তট যুগ মরি  
শ্রামল নিকুঞ্জে, চারু শ্রাম-তরুদলে ।  
তরুগণ অগণন শাখা প্রশাখায়  
আলিজিয়া পরস্পরে কি সুন্দর ভাবে ।

সাজায়েছে সুললিত কুঞ্জ মনোহর ।  
 শীতল প্রভাত-বায়ু মধুর হিলোলে  
 রহিয়া রহিয়া ধীরে যাইছে বহিয়া  
 কাঁপাইয়া কুঞ্জ-লতা শ্রামপত্রাবলী ।  
 অনুরে যুবতীবৃন্দ, অনঙ্গ-মোহিনী  
 কলশী পুরিছে জলে, নীল জল' পরি  
 নানাবর্ণ পদ্ম যেন রয়েছে কুটিয়া  
 উজ্জলি এ বন-ভূমি রূপের গৌরবে ।  
 অশ্রু দল সারি সারি কাননের পথে  
 চলেছে কলশী কক্ষে মস্তুর গমনে  
 সম্ভাষিয়া পরস্পরে, সে কণ্ঠ-লহরী  
 তুলিছে কি প্রতিধ্বনি প্রকৃতির প্রাণে  
 মোহিয়া কানন এই নির্জন প্রদেশে ।  
 নদী-বক্ষে ধীরে ধীরে একটি তরঙ্গী  
 অশুকুল শ্রোত বেগে চ'লেছে ভাসিয়া ।  
 কে জানি তরঙ্গী হৃদে একটি সঙ্গীত  
 গাইছে বিবাদে ঘোর করুণ উচ্ছ্বাসে,

করে তুই প্রিয় পাখি,  
 কাননে লুকায়ে থাকি  
 গাইলি করুণ স্বরে      ভৈরবীর তান ।  
 ভুলাইলি শোক-স্মৃতি,  
 জাগাইলি প্রীতি ভক্তি  
 উদাস করিয়া দিলি প্রাণ ।

সঙ্গীতের সুধাস্বর তরঙ্গে তরঙ্গে  
 উঠিল ভাসিয়া সেই প্রভাত গগনে,  
 রাশি রাশি মুক্তা যেন পড়িল ঝরিয়া  
 নদী-বক্ষে সে নিস্তরঙ্গ সৈকত কাননে ।  
 ধীরে ধীরে সেই স্বর হিলোল খেলিয়া  
 মিশে গেল তটিনীর কুলু কুলু তানে ।  
 আবার—আবার স্বর উঠিল ভাসিয়া

করে তুই প্রিয় পাখি,  
 কাননে লুকায়ে থাকি,  
 গাইলি করুণ স্বরে      ভৈরবীর তান ।  
 ভুলাইলি শোক-স্মৃতি,  
 জাগাইলি প্রীতি ভক্তি,  
 উদাস করিয়া দিলি প্রাণ ।

(২)

ত্রিদিবের পাখী তুই  
 কেন এলি হেথা ?  
 এখানে পাবি নে সুখ  
 এখানে কেবলি দুখ  
 এখানে বিশ্বাস-ঘাতকতা ।  
 প্রেম নাই, প্রীতি নাই,  
 আদর সোহাগ নাই,  
 স্বামী-স্ত্রীতে ঘোর কঠোরতা ।  
 পিতা পুত্রে স্নেহ নাই,  
 ভাই ভগ্নী ঠাঁই ঠাঁই,  
 স্বার্থ ভিয়া নাহি অন্য কথা ।  
 এখানে থাকিলে পাখি,  
 অন্ধ হবে দুটি অঁরি  
 পাবি শুধু বুক ভরা ব্যথা ।  
 এমন জঘন্য দেশ,  
 পুণ্যের নাহিক লেশ,  
 কেন তুই এসেছিস্ হেথা ।

(৩)

যে দেশ পুণ্যের দেশ,  
 নাহি যেথা ঘেঘ লেশ,  
 সে দেশ ছাড়িয়া কেন এলি ?

এ যে ঘোর মরুস্থল  
 কি সুখ পাইলি বল  
 এখানে কেবলি দলাদলি ।

নাহি হেথা সুখ-লেশ,  
 এখানে কেবলি ক্রেশ  
 এখানে সবাই স্বার্থপর ।

কে জনক কে জননী,  
 কেবা ভ্রাতা কে ভগিনী,  
 এখানে সবাই পর পর ।

এমন পাণের স্বাদে,  
এসেছি কান্ প্রাণে  
পথ ভুলে এসেছি হেথা ?  
তাই তুই দেশে দেশে  
কাঁদিস্ বিহগ-বেশে,  
তাই তোর প্রাণে এত ব্যথা ?

(৪)

কোথা হ'তে এলি পাখি,  
কোথা যাবি বল দেখি,  
কেমন তুই ভুলানি আবারে ?  
কোথাকার পাখি তুই,  
কোথায় বসতি তোর,  
জীবনের এ পাড়ে, ওপাড়ে ?  
দিন নাই, রাত নাই,  
বিরাম বিজ্ঞান নাই,  
কেমনে কাঁদিস্ তুই পাখি ?  
কি তোর প্রাণের ব্যথা,  
কি তোর মনের কথা,  
কেমন তোর ঝরে দুটি আঁখি ?  
আবারি মতন তুই,  
ভাল বে'লে ওরে পাখি,  
দেশে দেশে করিস্ ভ্রমণ ?  
আবারি মতন তুই,  
উদাসীন হ'য়েছি,   
পরকে সঁপিরা নিজ মন ?  
বার কথা মনে ক'রে  
কাঁদিস্ বিজনে প'ড়ে,  
সে কি তোর করে না আদর ?  
তার কি হৃদয় নাই,  
দয়া নাই, মার্য্য নাই,  
সে কি তবে নিষ্ঠুর পায়র ?

(৫)

যে দেশে বসতি তোর,  
সে দেশ কেমন পাখি,  
সে দেশে কি কুটে কুল কল ?

সে দেশে কি রবি উঠে,  
সে দেশে কি বায়ু ছুটে  
ভাটিনী কি করে “কল কল” ?  
বসন্তের আগে আগে,  
সে দেশে কি পিক আগে,  
শরতে কি শেফালী কোমল ?  
সে দেশে কি চন্দ্র তারা,  
বরষে কিরণ-ধারা,  
গায় পাখী, নাচে শিখীদল ?  
শ্যামল ভূপের গায়,  
নিশির নিশির হায়,  
প্রভাতে কি করে ঝলমল ?  
সরসীর নীল জলে,  
সেখা কি মরাল খেলে,  
প্রভাতে কি কুটে শতদল ?  
এ দেশের মত সেখা,  
সুখ দুঃখ হ'য় ব্যথা,  
প্রণয়ে কি বিরহ অনল !  
আনন্দে বিমাদ তথা,  
সারল্যে কি কটিলতা,  
সেখাও কি অমৃতে গরল ?

(৬)

বল তবে বল পাখি,  
ভুলিয়া জুড়াই প্রাণ,  
ভুলে যাই প্রাণভরা দুখ  
গগনে উধাও হ'য়ে,  
প্রেমের সঙ্গীত গেয়ে  
তব মনে ভুলি স্বর্গ-সুখ !  
গিরিশূঙ্গ, কুঞ্জবনে,  
বসি সদা তব মনে,  
নিরখিব প্রকৃতির হাসি !  
পল্লবে মুকুলে কুলে,  
সৌন্দর্য্যের কুলে কুলে,  
নেহারিব তার রূপ রাশি !  
নির্ব্বরের কল-তানে,  
জাগিয়া উঠিবে প্রাণে  
তাহারি প্রেমের সঙ্গীত !  
সিঁদ্ধ মরীরের স্পর্শে,  
তারি আলিঙ্গনে, হর্ষে,  
মুগ্ধ হ'য়ে হারায চেতন !

নিখর গগন উড়ে,  
নিরখিব প্রাণ ত'রে,  
স্বধাংস্তর স্বধা মাখা হাসী !  
তাহারি রূপের জ্যোতি  
প্রেনের অতীত স্মৃতি,  
হৃদয়ে উঠিবে সদা ভাসি ।

নীরবিল কণ্ঠস্বর । সে ক্ষুদ্র তরঙ্গী  
অনুকূল স্রোতে পড়ি হিল্লোলে হিল্লোলে  
গিয়াছে অনেক দূর, বিমুক্ত যুবক  
দেখিলা চাহিয়া ক্ষুদ্র পক্ষীর আকার  
ভাসিছে তরঙ্গী দূরে তটিনী-সলিলে ।  
উদিয়াছে দিনমণি পূর্বব গগনে  
রঞ্জিয়া তটিনী বক্ষ, রঞ্জি মেঘপুষ্প  
স্তরে স্তরে স্তরে স্নিগ্ধ স্তব্ধ কিরণে ।  
চলিলা যুবক ধীরে সৈকতের পথে  
মুক্ত হৃদে, বহুক্ষণ করিয়া ভ্রমণ  
কত মাঠ, কত পল্লী ফেলিয়া পশ্চাতে  
পথ-শ্রমে ক্লান্ত হ'য়ে বসিয়া একটি  
বিশাল অশ্বখ মূলে স্নিগ্ধ ছায়ায় ।  
শীতল বৃহল বায়ু হিল্লোলে হিল্লোলে  
জুড়াইল যুবকের ক্লান্ত কলেবর  
দেখিলা সন্মুখে রম্য প্রাচীরের প্রায়  
জড়গুলি শৃঙ্গে শৃঙ্গে তরঙ্গ খেলিয়া  
ঘেরিছে সে মহাবক্ষে অতুল সুন্দর ।  
প্রকৃতির চাকরীলা, রেখেছে সাজায়ে  
কতশত মনোহর কক্ষ অবয়ব  
ভূগাইতে সন্তাপিত পথিকের মন ।  
সুদীর্ঘ বিশাল বৃক্ষ মহা ছত্র প্রায়  
শোভিছে অসংখ্য শাখে পরশি গগন ।  
শাখা হ'তে উপশাখা উপজিয়া মরি  
অসংখ্য, কে করে সংখ্যা নারি নির দিকে

চুম্বিছে ধরঙ্গী-পৃষ্ঠ শায়ল সুন্দর ;  
আলিঙ্গিয়া সেই শাখা কুম্ব-বল্লরী  
শত শত, উঠিয়াছে সংখ্যাহীন করে  
অবিরল শাখাদল করিয়া বেঁটন ?  
কত শত নানাবর্ণ নয়নরঞ্জন  
বন-কুল ফুটিয়াছে স্তবকে স্তবকে  
অনুকারি সূর্য্যকান্ত নীলকান্ত মণি ।  
অদূরে তটিনী-বক্ষে সুনীল সলিলে  
অবগাহি, কত শত যুবক যুবতী  
মার্জিতহে আপনার কম কলেবর ;  
কেহ বা ভুবিছে নীরে, কেহ বা ভাসিছে,  
কেহ বা সাতারি বেগে সজিনীর সহ  
করিতেছে জল-কেলি প্রাণের উল্লাসে ।  
দরিদ্রা রমণী কত বন-কুল প্রায়  
বিবাদে মলিন বেশ ধুইছে যতনে  
মলিন বসন কত কাছারিয়া পাটে ।  
যুবক একাগ্র মনে বসিয়া নীরবে  
নিরখি এ অভিনয়, ভাবিতে লাগিলা  
অদৃষ্ট চক্ষের বক্ষ ভীম আবর্জনে  
পড়িয়া মানবগণ সদা নিম্পেষিত ।  
অদৃষ্ট সহায় যার, সেই সুখী'তবে,  
নহিলে সংসার মাঝে প্রতি পদে পদে  
কত যে লাহুনা তাহা কে পারে বলিতে ?  
ভাসায়ে দিয়াছি দেহ অদৃষ্টের স্রোতে  
নাহি ইচ্ছা নাহি লিপ্সা শুধু তৃণ প্রায়  
অদৃষ্ট যে দিকে নেয় যাইব সে দিকে ।  
মানব ইচ্ছার বল কিবা প্রয়োজন,  
নিয়তি ত নহে কত মানব অধীন ?  
ভাবিতে ভাবিতে যুবা রহিলা বসিয়া  
অশ্রমনে, ভূমিতল খুঁড়িতে লাগিলা



ধীরে ধীরে পদ-বৃদ্ধ-অঙ্গুলি-আঘাতে ।  
 কণ পরে তুলি শির দেখিলা মার্ত্তণ্ড  
 বরষি কিরণ রানি অগ্নি-কণা সম  
 পশ্চিম গগন-কোলে প'ড়েছে চলিয়া ।  
 অমনি উঠিয়া যুব। চলিলা আবার ;  
 বহুদূর অতিক্রমি দেখিলা অদূরে  
 মেঘাকৃতি কক্ষবর্ণ সমুচ্চ শেখর  
 শোভিছে কি রমণীয় শ্রাম তরুদলে ।  
 চক্রে চক্রে ঘুরি ফিরি, উঠিতে লাগিলা ।  
 ক্রমে ক্রমে মনোহর উচ্চ শৃঙ্গ'পরে ।  
 দেখিলা পিরাল শাল অশোক তমাল  
 কত শত মহাবৃক্ষ ঘন ঘনাকারে  
 ঘেরেছে সে গিরি-শৃঙ্গ, সূর্য্যোর কিরণ  
 প্রবেশিতে নাহি স্থান—দিবসে আধার ।

ভাবিল যুবক “আজি পূরিল বাসনা,  
 আইলাম বিজ্ঞাচলে—এ নিভৃত বনে  
 শীতলি অনলপূর্ণ হৃদয় মন্দির  
 অগ্রজলে, কাননের পুষ্প-রেণু বাহি  
 নৈশ প্রকৃতির শেষ নিশ্বাসের মত  
 মিশাইব এ নিশ্বাস অনন্তের সনে ।  
 চলিলা যুবক ক্রমে সমুখের দিকে  
 এ মঞ্জু কানন-রাজ্য ফেলিয়া পশ্চাতে ;  
 কিছু দূরে অগ্রসর হইলে অমনি,—  
 —হেরিলা নূতন শোভা মানস মোহন ।  
 প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র, শাস্তির আলয়  
 পূর্বদিকে পুষ্পোদ্ভান, পশ্চিমে সরসী ;  
 সরসী পশ্চাতে শ্রাম হর্ষা সুনোভিত  
 ক্ষুদ্র অধিত্যকা এক শোভার সদন ।  
 পার্শ্বে এক বাটীবৃক্ষ “সর সর” রবে

গাইছে মৃদল বাতে মোহিয়া সে বন ।  
 নিরখিয়া প্রকৃতির শোভা অকৃত্রিম  
 যুবক বিমুগ্ধ চিত্তে রহিলা বসিয়া ;  
 পার্শ্বে তার তপোবন—শোভার ভাণ্ডার,  
 নিরখি এ সব দৃশ্য মানবের প্রাণে  
 বহে অমৃতের ধারা—শাস্তি প্রসবণ ।  
 সংসারের কোলাহল ঝগড়া কলহ  
 দলাদলি, ভেয়াগিয়া জনমের মত  
 আসি এই বন মাঝে নিভৃত নির্জনে  
 ইচ্ছা হয় পূজি' সেই বিপদ ভঞ্জে  
 যাপিতে অশাস্তিময় মানব জীবন ।

অদূরে সরসী-তীরে নিকুঞ্জ কাননে  
 মুনিদের মঠগুলি শোভিছে সুন্দর  
 শ্রেণীমত ছোট বড় নয়নরঞ্জন ।  
 প্রতি মন্দিরের পার্শ্বে স্তম্ভের উপরে  
 সূচাকু তুলসী বৃক্ষ, চরণে তাহার  
 নানাবর্ণ পুষ্প, গ্লান তপন-কিরণে ।  
 অদূরে কেয়ারি পার্শ্বে ক্ষুদ্র বৃক্ষ'পরে  
 বিকশিত পুষ্পরাজি নাচিছে পবনে ।  
 মুনিদের শিশুগুলি খেলিছে নিকটে  
 কুঞ্জপাশে মনোহর অধিত্যকা পরে ।  
 হেরিলে সে দৃশ্য বহে আনন্দের ধারা  
 মুগ্ধপ্রাণে, মুনিগণ মঠ অভ্যস্তরে  
 পঠিতেছে শাস্ত্র গ্রন্থ, মুনি-পত্নীচয়  
 শুনিছে নীরবে যেন তম্বর হৃদয়ে  
 বসি কাছে তৃণাসনে, নয়ন সুন্দর  
 নীরবে লাগিয়া আছে মুনি মুখপানে ।  
 উত্তরে নিবিড় বন চিরশাস্তি-প্রদ,  
 কত শত মহাবৃক্ষ শাখা প্রশাখায়

আলিজিয়া পরস্পরে কি সুন্দর ভাবে  
রহিয়াছে একতাবে সে ঘোর কাননে ।  
দক্ষিণে বিছোর নিয়ে চারু নিকরিনী  
ছুটিয়াছে অবিচ্ছিন্ন কুল কুল রবে  
মাতাইয়া বস্ত্র পত্ন বন-বিহঙ্গিনী ।  
সরসী পশ্চিম প্রান্তে জবা বৃক্ষ পাশে  
একটি চঞ্চলনেত্রা বন-কুরঙ্গিনী  
পিইছে সলিল, শুক পত্রের পতনে  
উঠাইছে কর্ণ কতু সভয় অন্তরে ।  
কুবো পাখী একতানে “কুব কুব” করি  
আমোদিত বনরাজি, মধুর সুরে  
দয়েল পাপিয়া শ্রামা কানন-সজিনী  
গাইছে সাধন গীতি বসি ডালে ডালে ।  
সঞ্চরিছে ধীরে ধীরে স্নিগ্ধ সমীরণ  
কাঁপাইয়া বনলতা ; শীতল হাঁয়ায়  
এ মধু কানন মাঝে বনদেবী প্রায়  
একটি মূনির কণ্ঠা গাঁথিছে মালিকা  
বন-ফুলে, মুকুলিত যৌবন তাহার  
ফোটো ফোটো, অর্ধফুট কুসুমের মত  
দেবতা বহ্নিত স্থিত ; সৌন্দর্য্য ছটায়  
বিমলিন শশধর, বিহ্বল মদন ।  
সুগোল সুডোল দেহ, মরি কি সুন্দর  
কাঞ্চনে কাটিয়া যেন বিধাতা চতুর  
গঠিয়াছে এ মুরতি প্রেম-পদ্ম রাগে ।  
অর্ধ অনাবৃত কুচ-কমলের কলি  
কি সুন্দর শোভিতেছে বক্ষ-সরোবরে ।  
ঘন কৃক কেশরাশি এলো খেলো ভাবে  
কি সুন্দর থাকে থাকে পড়েছে ঢলিয়া  
মূলমিত্ত বর্ণোজ্জ্বল কপোল উপরে ।  
ভাগ্য নরন ছুটি চল চল করে

প্রভাত সরসে যেন নীন পঙ্কজিনী ।  
শোভে গলে কুলমালা, অলকা কুন্তলে  
ফুটন্ত গোলাপ এক বায়ু সনে খেলে ।  
মুনিদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিনটি বালিকা  
নীরবে দেখিতেছিল বসিয়া অদূরে  
কার্য্য তার, কণ পরে উঠিয়া সে বালা  
যাইয়া মাধবী কুঞ্জে ভয় এক মঠে  
পরাল মালিকা, তার স্বহস্তে গঠিত  
একটি মূরতি ক্ষুদ্র মূর্তির গলে ।  
তার পর পুষ্পাজলি দিয়া তার পদে  
ভক্তি ভরে সে মূর্তিরে করিলা প্রণাম ।  
একটি বালিকা তারে করিলা জিজ্ঞাসা  
“কার গলে মালা তুই দিলি লো হিরণ ?  
এ কোন্ দেবতা দিদি ? চরণে যাহার  
পুষ্প দিয়ে, তুই যারে করিলি প্রণাম ?”  
কহিলা হিরণ তারে “প্রাণের দেবতা  
সে আমার, অমরেন্দ্র নাম এর দিদি ?”  
হেন কালে যোগী এক আসিতে লাগিলা  
সেই দিকে, বাহিরিলা আশ্রম হইতে ।  
একটি বালিকা তারে দেখিয়া অদূরে  
কহিলা “হিরণ দিদি মহারাষ্ট্র গুরু  
আসিতেছে, অই দেখ শাস্ত্রজী পশ্চাতে ।  
গুরু জ্যেষ্ঠ সেই স্থানে আসি’ ধীরে ধীরে  
কহিলা “হিরণ তোর জ্যেষ্ঠা আসিয়াছে  
নিতে তোরে, আজি মোরা অতিথি তাহার  
ধাকিব আশ্রমে তার, চল যাই এবিবে ।”  
সকলেই তথা হতে করিলা প্রস্থান  
ধীরে ধীরে, শাস্ত্রজীর আশ্রমের দিকে ।  
কালীতার। এসে পথে কহিলা হিরণে  
এতক্ষণ হিলি কোথা ? সারা বে হ’য়েছি

খুঁজে খুঁজে? কার কথা ভাবিস্ বলিয়া  
সারাদিন? তুই যেম হলি আশ্রহারা।”  
সলাজে হিরণ বালা নত করি মুখ  
আঁচলে মুছিয়া চক্ষু, বলিলা না কিছু।  
অনুরে পিরাল-নাথে পল্লব আধারে  
লুকাইয়া শুামা, মরি করিল বর্ষণ  
সুকঠ পীযুষ ধারা সে নির্জল বনে।  
যুবক সজল নেত্রে ভাবিলা হৃদয়ে  
“হা লবঙ্গ! কোথা তুমি? সে দেশ কোথায়  
যে দেশে গিয়াছ তুমি? জানিলে এখনি  
তোমার চরণ প্রান্তে বাইত ছুটিয়া  
জনমের মত এই রত্নজী তোমার।”

অতীতের কত কথা ভাবিতে ভাবিতে  
চলিলা রত্নজী এক মঠ অভিমুখে  
সর:তীরে। অপরাহ্ন; স্নিগ্ধ সমীরণ  
সকরিয়া যুহু যুহু অভাগার প্রাণে  
করিল নীরবে কত স্তূধা বরিষণ।  
দেখিলা যুবক মরি সরসীর তীরে

একটি মাঠের পাশে মুক্ত নত-তলে  
বালক বালিকা ছুটি বলিয়া নীরবে  
দিতেছে পুতুল বিয়া, মরি কি সুন্দর  
সম্মুখে অতিথি বেশে কতগুলি শিশু  
শোভিছে সে সভাস্থলে শ্রাম দূর্বাপরে।  
অকুটস্থ পুষ্প প্রায় একমল বালা  
হাসিমুখে কি সুন্দর দাঁড়িয়ে পশ্চাতে  
ফুল-সাজে, পরস্পর কঁকে হাত রাখি,  
দিতেছে মধুরে অই কত হলুধনি।  
একপাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃগয় আধারে  
শোভিছে কৃত্রিম ভোজ কিবা মনোহর।  
নিরখি এ দৃশ্য হায় রত্নজীর প্রাণে  
বহিল শোকের ঝড়, উদিল মানসে  
লবঙ্গের হাসিমাখা চারু মুখ খানি  
ফুটন্ত কুসুম সম, স্বজাহত প্রায়  
নীরবে রত্নজী আহা বলিয়া পড়িল।  
তুই বিন্দু অশ্রু সেই কাতর নয়নে  
কত দুঃখ, কত ব্যথা, কত হা হতাশ  
বিচ্ছেদ মিলন প্রেম কত জানাইল।

## সপ্তবিংশ সর্গ

[ সেতারা ; রত্নধীর গৃহ ]

দিন গেল ; নিশি গেল ; পুনঃ দিন এ'ল—  
—সেও গেল ; এই ভাবে কত এ'ল গেল ।  
ধীরে ধীরে—অতি ধীরে কালের সাগরে  
অসংখ্য হিলোল গুলি উঠিল পড়িল,  
অসংখ্য বৃন্দ গুলি ফুটিল মিশিল ;  
এক দিক ভেঙ্গে গেল, হইল গঠিত  
অন্য দিক ; এক পত্র পড়িল ঝড়িয়া,  
অন্য পত্র ধীরে ধীরে হ'ল অঙ্কুরিত ;  
এক জন মরে গেল, লভিল জনম  
অন্য জন ; এক দল ছেঁড়ে গেল ধরা,  
অন্য দল ধরনীতে হ'ল উপনীত ।  
পুরাতন গেল, নব এ'ল ; কাল-চক্রে  
সংসারের বিবর্তন কতই ঘটিল ;  
প্রকৃতি আপন ক্ষতি পূরিয়ালইল ।  
কিন্তু হায় লবঙ্গের ভয় যদি খানি  
আর না যুড়িল ; সেই গোলাপ-গঞ্জিত  
ম্রিত মুখে হাসির সে স্বর্ণোজ্জ্বল রেখা  
আর না ফুটিল ; সেই চটুল নয়নে  
প্রণয়ের উদ্ভাসতা আর না খেলিল ।  
এ জনমে আর সেই রত্নধী তাহার,—  
—প্রাণাপেক্ষা অতি প্রিয় রত্নধী তাহার  
আর না আইল ; হায় লৈশবে ঘৌবনে  
কত হুঃখ কত কষ্ট সহিয়া নীরবে,  
কত চিন্তা কত কথা ভাবিয়া হৃদয়ে  
এ কচি বয়সে হায় ধরিল বালিকা  
কি এক বাতনাপ্রদ ঘোর মর্ষভেদি  
শোকের করুণ মূর্তি, কবি-ভুলিকায়  
কি সাধ্য আঁকিতে সেই নিরাশার ছবি ?  
সেই মূর্তি—সে দারুণ বাতনাব্যজক

নিরাশার সেই মূর্তি ?—হেরিলে বারেক  
পাষণ গলিয়া বার, এ দুর্বল কবি  
সে মূর্তি এ ভুলিকায় আঁকিবে কেমনে ?

অপরাহু ; প্রভাকর ক্লাস্ত কলেবরে  
উজ্জ্বল সুবর্ণ-রথে করি আরোহণ  
যাইতেছে অস্তাচলে, তিল তিল করি  
সন্ধ্যার শ্রামল ছায়া উঠিছে ভাসিয়া  
চারি দিকে, ভাস্করের সুবর্ণ কিরণ  
ঝলসিছে কি সুন্দর দূর তরু-শিরে  
অই যে নীরবে অই লবঙ্গ লতিকা  
সরসী-সোপানে বসি আকুল হৃদয়ে  
কি ভাবিছে, দলে দলে কুল-বধু কত  
আসিছে যাইছে, কক্ষে কলনী সুন্দর  
জলপূর্ণ ; নিরখিয়া এই হুঃখিনীকে  
কত জন কত কথা কহিতে লাগিল ;  
কেহ বা হুচারি বিন্দু স্নেহ-অশ্রুজল  
প্রদানিলা উপহার, কেহ বা মাদরে  
প্রবোধিলা গৃহ মাঝে যাইতে তাহারে ।  
দেখিতে দেখিতে নিশি আইল ভূতলে,  
ধীরে ধীরে স্বর্ণোজ্জ্বল তারকা নিকর  
হীরকের পুষ্পসম ফুটিতে লাগিল  
সুনীল গগনে, ক্রমে উদিল চন্দ্রমা,  
হাসিল সমগ্র বিশ্ব, হাসিল প্রকৃতি  
চন্দ্রের কনক-রশ্মি মাখিরা হৃদয়ে ।  
অন্য মনে অভাগিনী রহিলা বসিয়া  
একাকিনী ; অতিদূরে বৃক ছুড়ে বসি  
“বউ কথা কও” বলি সঙ্কল্প করে  
কানিতে লাগিল এক বন-বিহঙ্গিনী ;

যেন সে আকুলপ্রাণে বিবাদ-সঙ্গীত  
গাইতে লাগিল আহা স্মরিয়া হৃদয়ে  
লবঙ্গের প্রেম-স্মৃতি ; সে সঙ্গীত-স্বর  
বালিকার ডগ প্রাণে পশিয়া অজ্ঞাতে  
কি এক ভীষণ ঝড় দিল উঠাইয়া ।  
অজ্ঞাতে হু এক বিন্দু শোক-অশ্রুজল  
নীলবে কপোল বাহি পড়িল ঝরিয়া ।  
সহসা একটি কর অতি সুকোমল  
প্রকৃত পঙ্কজ সম পরশিল ধীরে  
বালিকার শিরোদেশে ; চমকিল বাল্য,  
দেখিল পশ্চাতে এক মূর্তি করুণার !  
সেই মূর্তি ধীরে ধীরে কহিল সাদরে  
“মা আমার, কেন তুই বসিয়া এখানে  
একাকিনী ? এতক্ষণ না দেখিয়া তোরে  
যে কষ্ট সয়েছি প্রাণে, বুঝিবি কি তুই ?  
এ বৃদ্ধ বয়সে মাগো রত্নজী বিহনে  
এ ছখিনী জীবন্ত, শুধু তোর লাগি  
এখনো জীবিত আমি, তোরি মমতার  
শত হুঃখ শত কষ্ট শত ঝগাবাত  
সহিতেছি অবিরত ; আধার জীবনে  
তুই মোর একমাত্র নয়নের মণি ।  
হা লবঙ্গ ! অবশেষে তুইও কি আমারে  
হেঁড়ে যাবি ? এ সংসারে কাহারে লইয়া  
ধরিব জীবন আমি ? চল গৃহ মাঝে  
রজনী হয়েছে বেশী । রত্নজী জননী  
ঘোর উন্মাদিনী প্রার কাদিতে লাগিল ।  
বাক্যমার কথা শুনি সকল নরনে  
উঠিয়া লবঙ্গ ধীরে গৃহ অভিমুখে  
চলিল, শরৎ-গৃহে প্রবেশি ছখিনী  
তুইলা শয্যার পরে, বাক্যমাতা তার

আহারার্থে কত যত্ন করিলা সাদরে ।  
কিন্তু হার অভাগিনী নাহি পরিশিলা  
জলবিন্দু ; রাখি শির শয্যা-উপাধানে  
নীলবে কাদিলা কত, নয়নের জলে  
তিতিল বসন শয্যা ; লুকায়ে গোপনে  
রত্নজীর পত্রখানি করিলা বাহির,  
ধীরে ধীরে আত্মোপাস্ত পড়িলা ছখিনী,  
একবার—হুইবার পড়িলা আবার,  
যত পড়ে আশা যেন মিটে না তাহার ।  
আবার—আবার বাল্য পড়িতে লাগিলা

“তাই মা সন্তান তোর চরণে ধরিয়া  
কাতরে বিদায় মাগে ভাসি অশ্রুজলে  
পাবে না আমারে তুমি জগত খুঁজিয়া  
প্রায়শ্চিত্ত হবে মাগো দূর বিদ্যাচলে ।”

আবার কাদিলা বাল্য, হৃদয়ের মাঝে  
কি এক তরঙ্গ যেন উঠিল নাচিয়া  
মর্মে মর্মে স্তরে স্তরে শিরায় শিরায়  
কি এক মদিরাময়ী চিন্তার লহরী  
ছুটিল সবেগে, বাল্য পড়িলা আবার

“সেই স্থানে—সেই ঘোর নির্জ্বল কাননে  
লবঙ্গের মুখখানি করিয়া সুরণ ।  
দেবাদিদেবের সেই পবিত্র চরণে  
বিসজ্জিব হাসিমুখে এ পাপ জীবন ।”

রুদ্ধ হ’ল কণ্ঠ, বাল্য পড়িলা মুক্তিয়া  
শয্যাপরে, বহুক্ষণ হইল অতীত ।  
ধীরে ধীরে অভাগিনী লজিয়া চেতনা  
দেখিলা, সমগ্র বিশ্ব নীরব নিদ্রিত ।  
ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগি উঠিলা লবঙ্গ  
ডগ হৃদে, অশ্রুজল মুহুরি আঁচলে  
বাহিরিলা গৃহাঙ্গনে, দেখিলা চাহিয়া  
পূর্ণিমার শশুর চ’লেছে ভাসিয়া

নীলাশ্বরে, সরোবরে রক্ত-কুমুদিনী  
হাসিতে হৃদয় খুলি প্রাণের উল্লাসে ।  
নিজিত অগতবাসী, নীরব অবনী,  
নীরবে যামিনী সতী হৃদয় খুলিয়া  
হাসিতেছে পতি সনে, প্রকৃতি সুন্দরী  
নীরবে চাহিয়া আছে গগনের পানে ।  
নীরবে প্রসূর প্রায় দূরে তরুরাজি  
দাঁড়াইয়া অচঞ্চল, হু'একটি পাতা  
কাঁপিতে কচিং অই নৈশ সমীরণে ।  
সহসা একটি পাখী নৈশ নীলাশ্বরে  
উড়িয়া ডাকিয়া গেল মধুর সুস্বরে  
বরষা পীষ্ম-ধারা প্রকৃতির প্রাণে ।  
হেন কালে অতি দূরে তরঙ্গে তরঙ্গে  
গগন প্রাবিত করি কে জানি গাইল ।—

তুনেছি গই বঁধু আমার

আসবে নাকি আজ রাতে ।\*

আমি—নুটিয়ে দিব প্রাণটি আমার

আসবে যখন এই পথে ।

আর কি লো গই এ জীবনে, দেখা হবে তাহার সনে,

আমি—মিশিয়ে যাব প্রাণে প্রাণে

তারি চরণ-ধুলির সাথে ।

সে যদি গই সদয় প্রাণে, চেয়ে দেখে আমার পানে

আমি—বেঁচে উঠব তখনি গই,

তারি কোমল পদাঘাতে ।

সঙ্গীতের প্রতি তান প্রত্যেক তরঙ্গ

সুগভীর রজনীর নিস্তরতা ঘোর

ভঙ্গ করি, ঘুম ঘোরে অলস অবশ

নৈশ প্রকৃতির সেই উদাস-হৃদয়ে

কি এক মদিরাময় ভাব-প্রস্রবণ

কুটাইল—আগাইল সুমন্ত-ধরণী ।

অভাগিনী তরুপ্রাণে দাঁড়ারে নীরবে

তুলিলা সে সঙ্করণ সঙ্গীত সহরী,

একে একে কত কথা উদিল হৃদয়ে—

শৈশবের মধুমাখা কত অভিনয়,

কত খেলা খেলা কত কলহ ঝগড়া

পুতুলের পরিণয়, কুসুম চয়ন,

কত মালা গাঁথা, কত প্রেম-আলাপন ।

আবার সারাহু কালে তটিনী-সৈকতে

দাঁড়াইয়া ছই জন প্রাণের উল্লাসে

ব'লে ছিলা কত কথা, প্রভাস্তরে তার

তুনেছিল। মধুমাখা কত সম্ভাষণ !

নীচে কক্ষা কি সুন্দর কুলু কুলু রবে

চলেছিল এবাহিয়া সারাহু-আধারে ।

উর্ধ্বে সৈকতের 'পরে দাঁড়ারে দুজন

নীরবে দেখিতেছিল। মলিন গোখুলি ;—

—প্রকৃতির অকৃত্রিম শোভা নিরুপম ।

হীরকের পুষ্প প্রায় একে একে একে

উজ্জল তারকারাজি সুনীল গগনে

নীরবে কুটিতেছিল, সন্ধ্যা সমাগমে ।

এইরূপে পূর্ব স্মৃতি স্রোতঃধারা প্রায়

বহিতে লাগিল হৃদে, নেত্র-প্রস্রবণে

কুটিল শোকাঙ্ক ধারা, ভাবিলা হৃদয়ে

কি আশে এখানে র'ব ? যাই বিদ্যাচলে,

পাই যদি একবার, জিজ্ঞাসিব তারে

কেন এই প্রায়শ্চিত্ত হুঃখিনীর তরে ?

অভাগিনী অকস্মাৎ চক্ষের আলোকে

হেরিলা মনের ভ্রমে প্রাস্তরের দিকে

সেই মূর্তি দাঁড়াইয়া আত্মানিহে তারে ;

অমনি আকুল চিন্তে উদ্গাদিনী প্রায়

চলিলা হুঃখিনী সেই নির্জন প্রান্তরে

একাকিনী ; যোগ-ময়া নিস্তর প্রকৃতি

লইল হৃদয়ে সেই হুঃখিনী কস্তারে ।

\* কামরূপী রামিনীতে দেখ ।



## অষ্টাবিংশ সর্গ

[ বিদ্যাচল ; বৃন্দেবের আশ্রম ]

“কি বলিব বাছা তোরে সে হৃৎ-কাহিনী ?”  
 বলিলা শান্তজী বসি সরোবর তীরে  
 শিলাগনে, মনোহর বিদ্যেব কাননে ।  
 “সংসারের মায়া-পাশ করিয়া ছেদন  
 এসেছি এই স্থানে, ছিলনা বাসনা  
 ভুক্তিতে সংসার-শুখ আর এ জীবনে ।  
 ছিল আশা বনে বনে করিব ভ্রমণ  
 সন্ন্যাসীর বেশে । ত্যজি সংসার কামনা  
 লভিতে সে দয়াময় যোগী-কুলেধরে ।  
 অদৃষ্টের দোষে তাহা হ’ল না সফল,  
 সংসারীর মত আমি পুত্র কন্তা সনে  
 আছি এই স্থানে, হায় কে বুঝিবে বাছা  
 আমার সে মর্মব্যথা ? এসেছি ত্যজিয়া  
 আমার সে স্নেহানুজ্ঞে পাষণ-হৃদয়ে ।  
 আমার সে ভাগিনেয়ী লবঙ্গ লতিকা  
 কুশলে ত আছে এবে ? বিবাহ তাহার  
 হ’য়েছে কি ? কও বাছা শুনিলে বারেক  
 জুড়াইবে এ-হৃদয় ; কত যে যতন  
 করিত সে তারে আমি তুলিব কেমনে ?”  
 লবঙ্গের নাম শুনি সজল নয়নে  
 কহিল রত্নজী “সে ত নাহি এ জগতে”  
 “নাহি এ জগতে ?” যেন প্রলাপের মত  
 বলিলা শান্তজী বোর বিষন্ন বদনে ।  
 নীরবে শৌকাস-ধারা করিতে লাগিল  
 মেঘে আর, যদি মাঝে বজা শুক্লধর  
 প্রবাহিল, কয় করে কহিলা আবার

“হৃৎখিনী শৈশব হ’তে পাষণ হৃদয়ে  
 কত হৃৎ কত আশা স’য়েছে নীরবে ।  
 তবুও ত একবার করেনি রোদন ?  
 নদী-কূলে কুঞ্জতলে ফুলরাগী প্রায়  
 সাজিয়া কুসুমেরে সদা করিত ভ্রমণ  
 তব সনে ! সে করুণ ম্লান মুখখানি  
 হেরিলে ফুটিত প্রাণে স্নেহ-প্রস্রবণ,  
 এমন সোনার পুষ্প কে জানিত হায়  
 অকালে ঝরিয়া যাবে,—হারাবে জীবন !”  
 কিছুক্ষণ পরে পুনঃ বিষন্ন হৃদয়ে  
 আবার কহিল তারে “কও দেখি বাছা  
 আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বালানাথ রাও  
 কি ভাবে যাগিছে দিন, স্নরে কি কখন  
 অভাগারে ? ইচ্ছা হয় দেখিতে তাহারে ।”  
 উত্তরিল ক্ষীণস্বরে রত্নজী তখন  
 “সতত স্মরণ করি কাঁদেন বিষাদে ।  
 আর এক কথা দেব নিবেদি চরণে  
 বুঝিতে নারিহুঁ আমি, উন্মিলা \* জননী  
 শম্ভুজীরে † সঙ্গে করি তীর্থ পর্য্যটনে  
 গিয়াছিল বহুদিন, কেমনে তাহার  
 আইল এখানে—এই বিদ্যেব কাননে ?”  
 উত্তরিল যোগী “তার পুত্র কন্তা সনে  
 বহুদেশ বহুস্থান করিয়া ভ্রমণ  
 সন্ধ্যাকালে একদিন ভীষণ ভূকানে  
 ডুবেছিল। নৌকাসহ নর্মদা জীবনে ।  
 সেই নদী তীরে এক বিটপীর মূলে

\* শান্তজীর কন্যার নাম উন্মিলা । † বালানাথের পুত্রের নাম শম্ভুজী ।

হিলা গুরুদেব মম, নিরখি এ দৃষ্ট  
রক্ষিলেন তাহাদের নিজ যোগবলে।”  
“তবু ভাগ্য, যোগীশ্রেষ্ঠ ছিলেন সেখানে।”  
কহিলা রত্নজী ঘোর মলিন বদনে।  
“ঈশ্বর সহায় যার” উত্তরিলা যোগী  
“কোন মতে সংসারের বিপদ সাগরে  
উত্তরে সে জন বাছা অক্লান্ত শরীরে ;  
ঈশ্বর যাহারে বাম লৌহের মন্দিরে  
নাহিক নিস্তার তার, কার সাধ্য বাছা  
রক্ষে সেই জনে এই অবনী ভিতরে ?  
তুমি কেন একাকী এ বিজ্ঞার কাননে  
আসিয়াছ বাছা, কও, শুনিতে বাসনা  
কেন ত্যজিয়াছ সব আত্মীয়-স্বজনে ?”  
রত্নজী সজল নেত্রে কহিতে লাগিলা  
“যোগীবর, কি ক’ব এ প্রাণের বেদনা ?  
স্বার্থপর জগতের ঘোর নিষ্পেষণে  
ভগ্ন এ-হৃদয় মম, জীবনের ভার  
বহিতে অক্ষম আমি, তাই বিক্যাচলে  
এসেছি ত্যজিতে প্রাণ শতুর চরণে।  
এ সংসার মোর কাছে নরক সমান,  
নরকের কীটগুলি পাপাত্মা মানব,  
দেশ-দ্রোহী, স্বার্থপর পশুর অধম।  
ইহাদের কাছে দেব থাকিতে অক্ষম  
এ অভাগা, স্বর্গ মোর শতুর চরণ।”  
গভীর বদনে যোগী কহিলা বিষয়ে—  
“আত্মহত্যা ?—মহাপাপ। হি হি বাছা তুমি  
আনিও না মুখে ইহা, ভাবিলেও হৃদে  
ভুবে যার মহাপাপে মানবের প্রাণ ;  
সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই এ ভূবনে।  
আত্মহত্যা কেন বাছা ?—দেশের কল্যাণে

কেন নাহি দেও মন ? পুণ্য-ব্রত ছাড়ি  
কে কবে অধর্ম-পথে করে বিচরণ  
সন্ধিতে কলুষ রাশি ? বিশ্বাসী মোসলেম  
দিনে দিনে মাসে মাসে যে অগ্নি ভীষণ  
ঢালিছে ভারত-বক্ষে, কেন নাহি বাছা  
হৃদয়ের উষ্ণ রক্তে কর নির্ধাপণ  
সেই অগ্নি ? আত্মহত্যা বল কি কারণ ?  
ছাড় এ সঙ্কল্প বাছা, হও অগ্রসর  
রণক্ষেত্রে, উদ্ধারিতে দুঃখিনী ভারতে।  
ভারত-সন্তান তুমি, বীরবংশোদ্ভব,  
ভারতের হিতব্রতে ধরি ভীমা অসি,  
ছাড় ঘোর হুহুকার, “জয় মহাদেও”  
বল বাছা রণরঙ্গে, স্বর্গ মর্ত্য শূন্য  
করিয়া কল্পিত, তার হ’ক প্রতিধ্বনি  
চারি দিকে, দেববন্দ করিবে বর্ষণ  
পুষ্প-বৃষ্টি বাছা তোর মস্তক উপরে।  
আমরা সন্ন্যাসী, বাছা, আমরাও সবে  
ধরি অসি দিব প্রাণ সম্মুখ সমরে  
মহিয়া মোসলেম-সৈন্য, অথবা নিশ্চয়  
মহারাত্রি ধর্ম পুনঃ করিব স্থাপন—  
ভারতের পুত্র বক্ষে ধ্বংসিয়া মোসলেমে।  
ভারতের চিরশত্রু আহম্মদ আকালী  
কতবার নরাধম ছাড়ি জন্মভূমি  
বৃশংস দস্তার বেশে পশিয়া ভারতে  
করিয়াছে ভারতের বক্ষ বিদারণ।  
মনে কি পড়ে না বাছা সেই সব কথা ?  
আজি সে আবার ভীম কৃতান্তের মত  
উপস্থিত এ ভারতে ; কেমনে নীরবে  
নিরখিবে জননী এত নির্ধাতন ?  
ভারতের পুত্র তোর, তাতার পায়তে

অবিলম্বে, বিষদন্ত করি উৎপাটন  
 আকালীর, রক্ষা কর হুখিনী ভারতে ।  
 মহারাষ্ট্র গুরু বাছা এই হিত-ব্রতে  
 নৈপিয়াছে প্রাণ, তিনি সমগ্র ভারতে  
 অমিয়া সত্তত দীন ভিক্ষকের বেশে  
 ভারত-সন্তান-বৃন্দে করি উত্তেজিত  
 ধর্মযুদ্ধে, স্থাপিবেন সমগ্র ভারতে  
 মহারাষ্ট্র ধর্ম বাছা ধ্বংসিয়া যোন্নেমে ।  
 বাহার চরণ স্পর্শে—যার পুণ্য বলে  
 পুণ্য-ক্ষেত্র এ ভারত, প্রতি ঘরে ঘরে  
 বাহার গৌরব-গাথা গাইছে সকলে ;  
 গুরু যার যোগিঅর্থে রামদাস স্বামী,  
 সেই গুরুদেব আজি ভারতের হিতে  
 নৈপিয়াছে প্রাণমন, আমরা সন্ন্যাসী  
 সমগ্র ভারত-বাসী আমরা সন্ন্যাসী  
 ভারতের হিতব্রতে ধরিব কৃপাণ  
 উদ্ধারিতে হিন্দুরাজ্য ধ্বংসিয়া যোন্নেমে ।  
 তুমিও আইস বাছা, করিব দীক্ষিত  
 জননীর হিতব্রতে, এস বীর দর্পে,  
 ধর অগ্নি, জননীর প্রাণের অনল  
 জ্বলয়ের উক রক্তে কর নির্বাণিত  
 জয় মহাদেও বলি সম্মুখ সমরে ।”  
 “অবস্ত” কাতর কণ্ঠে কহিল। রত্নজী  
 “ভারতের হিত-ব্রতে যার যদি প্রাণ  
 সার্থক জনম তবে ; করিহু প্রতিজ্ঞা  
 স্পর্শিয়া চরণ তবে, যোন্নেম-শোণিতে  
 করিব তর্পণ পিতঃ সম্মুখ সংগ্রামে ।”  
 “শত ধনু তোরে বাছা” উত্তরিল। যোগী  
 আদরে স্পর্শিয়া শির “আশীর্ব্বাদ করি  
 পূর্ণ হ’ক এ প্রতিজ্ঞা, হিন্দুর ভারতে

উড়ুক হিন্দুর কব্জা ধ্বংসিয়া যোন্নেমে ।  
 ভারতের কোটি পুত্র রণজয়ী বেশে  
 “জয় মহাদেও” বলি উঠুক গর্জিয়া ।”  
 নীরবিলা যোগিঅর্থে ; বলি কিছুক্ষণ  
 কি ভাবিল উদ্বৈগ্ধনেত্রে, ছই বিন্দু অশ্রু  
 নীরবে নয়ন হ’তে পড়িল ঝরিয়া ।  
 হেন কালে ধীরে ধীরে আইলা সেখানে  
 মহারাষ্ট্র-গুরু, তারে কহিল। শাস্ত্রজী  
 “গুরুদেব, রত্নজীকে করুন দীক্ষিত ।”  
 রত্নজী গুরুর পদে করিল। প্রণাম  
 গুরুজী কহিল। তারে “আশীর্ব্বাদ করি  
 বাছা তোরে, জন্মভূমি জননীর তরে  
 দে প্রাণ এ ধর্ম যুদ্ধে,—হবি স্বর্গবাসী ।  
 রত্নজী কহিল। দেব, হবনা কুণ্ঠিত  
 প্রাণ দিতে, এ প্রতিজ্ঞা করিলাম আজি  
 ছুঁয়ে তোমা ; হেনকালে আইলা সেখানে  
 মা ভৈরবী সঙ্গে নিয়া হিরণ বালারে ।  
 সন্ধ্যা সমাগতা হেরি গেলা চলি ধীরে  
 মহারাষ্ট্র গুরু আর শাস্ত্রজী আশ্রমে ।  
 ভৈরবী স্নেহের স্বরে কহিল। হিরণে  
 গাও না মা সাক্ষা স্তুতি ডুবু ডুবু রবি ।

হুখিনী হিরণ বাল। ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস  
 গেলা চলি বিদ্যোত্মরী মন্দির নিকটে  
 ধীরে ধীরে । সাক্ষ্য বায়ু বহিল মথুরে ;  
 রত্নজী বসিয়া সেই নিম্ন শিলাসনে  
 দেখিলা হিরণবালা বনদেবী প্রায়  
 দাঁড়াইয়া যুক্ত করে বিদ্যোত্মরী দ্বারে  
 গাইছে করুণ স্বরে, করিয়া প্রাণিত  
 সে মথুর সাক্ষ্যাকাশ ; সজল নয়ন

নীলবে লাগিয়া আছে বিদ্যোৎসবী পানে ।  
 বন কুক কেশ গুহ তরঙ্গে তরঙ্গে  
 চুইতেছে সুললিত নিতম্ব সুগোল ।  
 বালিকা একাএ চিত্তে তুলিয়া সংসার  
 গাইছে তকতি ভরে মধুর পকমে ।

মা তুমি বেলনা আঁধি ।

শূন্নে শূন্নে সেই স্বর তুলি প্রতিধ্বনি  
 আশ্বহার। প্রকৃতির অতৃপ্ত হৃদয়ে  
 কি এক মদিরা পূর্ণ অমৃতের ধারা  
 মুহূর্তে মুহূর্তে মরি দিতেছে ঢালিয়া ;  
 সাক্ষ্যানিলে সেই ধ্বনি ভেঁসে দূরে দূরে  
 বন হ'তে বনান্তরে ঘাইছে ভাসিয়া ।

মা তুমি বেলনা আঁধি ।

আঁধারে আঁধারে, ভাসি অশ্রু-ধারে  
 কত দিন মাগো  
 র'বে পড়ে  
 পথের এ ধূলা মাখি ।  
 মা তুমি বেলনা আঁধি ।

মা তোরে আগাতে  
 উষা এসে তোরে ডাকে প্রতি দিন,  
 শশী তোরে দুঃখে বাসে বাসে কীণ,  
 “মাগো মা মাগো মা”  
 বলে মোরা ।

সদা মা তোমারে ডাকি ।  
 মা তুমি বেলনা আঁধি ।

মা তোমার লাগি—  
 সর্ব্ব গোবতী পাগলিনী পারা,

ববুনা জাহ্নবী চালে অশ্রু-ধারা,  
 আগিবে না তুমি ?  
 নিশিরের ছলে প্রকৃতি কাঁদিয়ে,  
 স্রুতি কুহর কুটিছে ধরিছে  
 ভোমারি চরণ চুমি ।

গবি মা তোমারে ডাকিছে কাতরে ।  
 “উঠ আগো” বলে  
 মা তোমারে  
 কাননে ডাকিছে পাখী  
 মা তুমি বেলনা আঁধি ।

রক্তজী বিষৃক হৃদে বসিয়া নীলবে  
 শুনিতে লাগিলা সেই করুণ সঙ্গীত,  
 হৃদে যেন কি যে এক বিষাদের ছায়া  
 উঠিল ভাসিয়া, বুঝা তুলিয়া নয়ন  
 দেখিতে লাগিলা চারু প্রকৃতির শোভা  
 গিরি শূন্নে, দিবাকর লোহিত বরণে  
 রঞ্জিয়া গগন তল, রঞ্জিয়া তটিনী  
 নামিতেছে ধীরে ধীরে, শ্রবণ কিরণ  
 ত্যজি ভূমি, উঠিয়াছে বিটপীর শিরে ।  
 পাখিগণ ধীরে ধীরে করি কলধ্বনি  
 ছুটিয়াছে নীড় পানে, দেখিতে দেখিতে  
 তারকা-সিন্দূর-বিন্দু পরিয়া ললাটে  
 সন্ধ্যা-সতী ধীর পদে আইলা ভূতলে  
 শ্রামাঙ্গিনী, ঢাকি দেহ শ্রামল বসনে ।  
 পাখীদের স্রমধুর বৈতালিক ধ্বনি  
 সহসা মিলিয়া গেল মরি কি স্রমর  
 দেব-মন্দিরের শুভ আরতির সনে ।

## উনত্রিংশ সর্গ

[ নন্দিনী-নদী তীর ; তপস্বিনীর আশ্রম ]

অপরূপ ; এতাকর পশ্চিম গগনে  
বিরাজিছে বিজারিয়া প্রভু আপন ।  
প্রকৃতি গভীর। অতি স্নিহ সমীরণ  
নিকুন্তর তলা দিয়া বুর বুর করি  
বহিছে চুইয়া চারু তটিনী-জীবন ।  
বহিছে নন্দিনী এই কল কল করে  
নিরন্তর, সুললিত তরল কাঞ্চন  
শোভিছে কি মনোহর সূর্যের কিরণে  
কুজ কুজ উষ্ম শিরে ধাঁধিয়া নয়ন ।  
মরি কি প্রশান্ত মূর্তি, তরল সুন্দর,—  
যুগল প্রবাহে অঙ্গ ঢালিয়া তটিনী  
চলিয়াছে রঙ্গে ভঙ্গে সাগর-সঙ্গমে  
নেচে নেচে ; পর পাড়ে কানন ছায়ায়  
খেলিছে রাখালবৃন্দ, শ্যামল সৈকতে  
কত শত ধেয়ু আহা শোভিছে সুন্দর  
অখণ্ড ছায়ায় বসি কত সূত্রধর  
গড়িছে জরনী ; কেহ সূতীক করাত  
বিদারিছে কাষ্ঠ, কেহ বসিয়া নীরবে  
কত সুখে ভাস্কর্য করিছে সেবন ।  
কত তরুণায় সূত্র মাজিছে কলপে  
অনুরে বিটপী নিয়ে শীতল ছায়ায় ।  
পর পাড়ে তপস্বিনী-পুবিত্র আশ্রমে  
বকুল বকের তলে একটি বুরতী  
সুবর্ণ-সরোজ সম, কিবা সন্ধ্যা-ভায়া  
ভাবিছে বসিয়া, কণ্ঠ জাগিয়া নীরবে  
বায় করে, কেশ গুহ তরঙ্গে তরঙ্গে

আবরি গোলাপি গণ্ড ভূজ মনোহর  
ছলিতেছে পৃষ্ঠদেশে চুইয়া ভূতল ।  
মরি কি মোহিনী মূর্তি, রঞ্জিত পরাগে  
অনুপম স্বর্ণ দেহ, বিলোল কটাক্ষ  
লুকায়িত সুরদেব পঞ্চশর মনে ।  
সজীব প্রতিমা যেন, অথবা ভূতলে  
শাপভ্রষ্টা ত্রিদিবের অলরা-নন্দিনী ।  
পাশ্বেদেশে একখানি অজিন শয়নে  
একটি রমণী মূর্তি, তপস্বিনী-বেশ  
শিরে জটা, পরিধানে গৈরিক বসন,  
শায়িত বকুল তলে শীতল ছায়ায় ।  
অদূরে একটি শিল্পী কুটির সম্মুখে  
পুষ্প-বনে বিচরিছে আনন্দিত মনে ।  
একটি কুরঙ্গ-শিশু খেলিছে অদূরে  
নে'চে নে'চে, অগণিত তরল সুন্দর  
চলিয়াছে হেলে ছলে নন্দিনী-জীবনে ;  
তপনের স্বর্ণ-রশ্মি শোভিছে কেমন  
নন্দিনীর নীল-জলে ভাসিয়া গড়িয়া  
কত হৈম চাকুছবি প্রতি পলে পলে ।  
যুবতী আকুল-চিন্তে চাহি নদী পানে  
গাইছে সঙ্গীতে এক সঙ্কল্প-স্বরে  
মাতাইয়া বন-ভূমি, অমৃতের ধারা  
বসিয়া তটিনী-দলে নির্জন-সৈকতে—

আর কি দিবে না দেখা, কণ্ঠ বেধি ঘ্রাণ সখা,—

—আর কি দিবে না দেখা, বায়েক এ প্রবলারে ।

অতীতের স্মৃতিগুলি, আর কি দিবে না তুলি,



ভূমিবে না হুনি ধর প্রণয়ের অশ্রু-ধারে ।  
 এত কি কঠিন প্রাণ, দিবে নাকি হুঁই ভাস,  
 হবে নাকি কোথা আর থাকিবে কি হুঁই হুঁই ?  
 ভালবাস ভালবাসি, মুক্ত প্রাণে কাঁদি হাসি,  
 ক্রমের পুতুল প্রাণ বাঁধা তব প্রেম-ডোরে ।  
 কোথা আমি কোথা তুমি, এ চিত্ত যে মরুভূমি  
 জোয়ারি কারণে গধা আছি এ ধরণী পরে ।  
 এত প্রেম এত প্রীতি, এত সুখ স্বপ্ন-স্মৃতি,  
 সকলি কি ডুবে যাবে বিস্মৃতির পারাবারে  
 কও গধা একবার, এ প্রাণে সহেনা আব,  
 তুমি কি ভুলিবে তারে ভালবাসে যে জোয়ারে ?

নীরবিল সুধাধর ; সে বন-প্রদেশে  
 কি গভীর নিস্তরতা উঠিল জাগিয়া ।  
 নাহি শব্দ, চারিদিক গভীর নীরব ;  
 শুধু এ আশ্রয়-পদ করি প্রক্ষালিত  
 তরঙ্গিনী কল নাদে চলেছে বহিয়া ।  
 তীরে অগণিত তরু অশোক কিংশুক  
 পিয়াল তমাল শাল, কোথা নারিকেল  
 কোথা কাঁট, দেবদারু গুবাক খজুর ।  
 স্থানে স্থানে বন মাঝে দীন ছঃখীদের  
 ক্ষুদ্র পর্ণ-গৃহ, কোথা নির্জন প্রান্তর ।  
 সুদূরে মেঘের মত কাল রেখা প্রায়  
 শোভিতেছে বিক্ষাচল অতুল সুন্দর ।  
 তপস্বিনী সুধাধরে কহিলা সাদরে  
 “স্নেহের লবঙ্গ, তুই জীবনের মায়া  
 পরিহারি, এসেছিস্ যবে এ আশ্রমে  
 পতি-অবেশণে, আমি করিষু প্রতিজ্ঞা  
 তোর সেই শুভকার্য্যে করিব সাহায্য  
 প্রাণপণে, থাক তুই এ পুণ্য-আশ্রমে ।  
 আজি সন্ধ্যাকালে এই আশ্রমে আমার  
 আসিবেন শ্রী ভৈরবী, বিদ্যার কাননে  
 শত শত শিষ্য তার, তাদের সাহায্যে

পুরাইব আশা তোর, কি চিন্তা ভগিনি !  
 তপস্বিনী ধীরে ধীরে উঠিয়া তখন  
 চলি গেলা তিক্কা আশে দূর পল্লী মাঝে ।

ছঃখিনী লবঙ্গলতা বিষণ্ণ বদনে  
 বসি একাকিনী সেই আশ্রয়-প্রান্তরে  
 ভাবিলা কতই কথা, ভয় প্রায় হুঁই  
 কত যে চিন্তার স্রোতঃ বারিধারা প্রায়  
 চলিলা বহিয়া, বামা কহিলা কাতরে  
 উদ্বিগ্ননেত্রে, “ভগবান্, অবলা-হৃদয়ে  
 এ দারুণ শেলাঘাত কোন্ অপরাধে ?  
 কহ দেব, হেনভাবে কত কাল আর  
 বহিব এ গরলাগ্নি ? ছঃখের তামসী  
 হবে নাকি অবসান ? দয়াময় তুমি,  
 দীননাথ ! ছঃখিনীরে কেন নিরদয় ?  
 যার লাগি ত্যজি গৃহ—এসেছি চলিয়া  
 ভিখারিণী বেশে, নাথ পাবনা কি তারে ?  
 সহসা পশ্চাত হতে দম্ভা একজন  
 ভীমকায়, তীর বেগে ধরিল আসিয়া  
 ছঃখিনীরে, তীব্র স্বরে কহিল গর্জিয়া  
 পাপীয়সি, কার সনে এ হল চাতুরী  
 খেলেছিলি ? বল আজি কে রক্ষিবে তোর  
 সিংহের কবল হতে ? মুহূর্ত্তে লবঙ্গ  
 উদ্বিগ্ন মুখে দেখাইয়া আকাশের দিকে,  
 কাতরে সজল নেত্রে কহিতে লাগিলা  
 ভয়স্বরে “ভগবান্ রক্ষিবে আমারে ।”  
 হাসিয়া বিকট হাসি কহিলা সে দম্ভ  
 মিথ্যা সে ছরাশা তোর, পতঙ্গ হইয়া  
 সাগর লম্বিতে আশা ? তুই অত্যাশ্রিত  
 কার সাধ্য রক্ষে তোর আমার কবলে ?



মুহূর্তে নক্ষত্র হতে ধরিয়। বামার  
 আকর্ষিত নশ্বা, বামা ছাড়াইলা হস্ত  
 পূর্ণ বলে, স্মরি সেই বিপদ-ভঞ্নে ।  
 অধাৰ্ত্ত শাৰ্দ্ধূল সম বিছাড়ের বেগে  
 এক লক্ষে নরাধম ধরিল আবার  
 হুঃখিনীরে, ধরে যথা যুগেন্দ্র কেশরী  
 বিপন্ন কাতর যুগে, সজ্জাসিত প্রাণে  
 অভাগিনী উচ্চঃস্বরে উঠিল। কাঁদিয়া ।  
 মুহূর্তেকে পাষণ্ডের ধরিয়। চরণ  
 কহিতে লাগিল। বামা সঙ্কল্প স্বরে  
 “পিড়া তুমি, রক্ষা কর হুঃখিনী কণ্ঠারে ।”  
 “রেখে দে কণ্ঠামি” নশ্বা কহিল গর্জিয়া ।  
 হুঃখিনীরে দৃঢ় ভাবে করিয়া ধারণ  
 চলিল পাষণ্ড বেগে কাননের দিকে—  
 কাঁদিল। চীৎকারি বামা, ডাকিল। কাতরে  
 একচিন্তে সেই জনে রক্ষিতে বিপদে  
 বিপদ-ভঞ্ন যিনি বিপদের কালে ।  
 বিধির অনন্ত লীলা, সাধ্য কি মানব  
 বুঝে তাহা, মুনি ঋষি হতজ্ঞান যাহে ;  
 সে চক্ক করিতে ভেদ দানব মানব  
 সকলেই অসমর্থ, বুদ্ধির অগম্য  
 সেই স্থান, লুকায়িত ঘোর অন্ধকারে ।  
 অকস্মাৎ “ক্রম” করি একটি বন্দুক  
 গরজিল, প্রতিধ্বনি পুরিল কাননে ।  
 সেই সঙ্গে নরাধম পড়িল ভূতলে ।  
 হুঃখিনীর অর্ধোজ্জল দেহ-সভা থানি  
 পড়িল ছুটিয়া ধূরে বিটপীর মূলে  
 সজ্জা শূন্য, সে দারুণ ভীষণ আঘাতে  
 রক্ত-ধারা ক্রম-বয়ে ছুটিল স্রবকে  
 রক্তিয়া সে মনোহর দেহতা বাহিত  
 অর্ধোজ্জল হুঃ, আহা সিন্দূরে মণ্ডিত

কুটন্ত গোলাপ যেন, অধরা সরলে  
 অর্ধ প্রকুচিত শিত রক্ত কমলিনী ।  
 মুহূর্তেকে এককল অধারোহী সেনা  
 আইল সেখানে অতি ভীষণ দর্শন ।  
 অথ হ’তে অবতরি অতি ক্রতবেগে  
 দেখিল। নৈনিক পতি, চিহ্ন জীবনের  
 নাহি সে রমণী দেহে—স্পন্দহীন ছদ্ম ;  
 দেখিল। একটি সুকী সুবর্ণ-অঙ্গুরী  
 বামার অঙ্গুলি মাঝে, খোদিত তাহাতে  
 “লবঙ্গ-রত্নজী” অতি উজ্জল অঙ্করে ।  
 বিস্মিত হৃদয়ে বীর দেখিতে লাগিল।  
 রমণীর মুখ থানি, বিবর্ণ হৃদয়ে  
 একটি নিশ্বাস ছাড়ি লইলা খুলিয়া  
 অঙ্গুরীয়, তার সেই অঙ্গুলী হইতে ।  
 স্নান মুখে বীরবর কসিল। অদূরে  
 বিশাল বিটপী মূলে, শীতল ছায়ায় ;  
 একটি সেনানী আসি কহিল। সজ্জমে  
 “কি কাজ দিল্লীতে যে’য়ে ? শুনিবু এখন  
 অল্পসহরে বহু মোস্তেম সৈনিক  
 নিবসিছে, ভারতীয় সমগ্র মোস্তেম  
 মিশিয়াছে একলঙ্গে, কাবুল ইশ্বর  
 আমেদ আকালী মাত্র ভরসা তাদের,—  
 সঙ্গে তার অগণিত আক্গান সেনানী ;  
 সকলেই আপনার ঐত্ব স্থাপন  
 করিতে উৎসুক এবে, নহে পরাধীন,  
 সবাই স্বাধীন যেন সম্মুখ সংগ্রামে  
 বীতম্পৃহ, যদি মোরা ভীষণ বিক্রমে  
 আক্রমি সে বোদ্ধলে লুকায়িত গোপনে,  
 নিশ্চয় মোস্তেম হৃদ হবে পরাজিত  
 জয়লাভী আসিবেন কোণ্ডে আমাদের ;  
 একমাত্র মহারাত্রী-বিজয় কেমন

উড়িয়ে গৌরব করে সমগ্র ভারতে ।  
 হাসিয়া সৈনিক-পাতি করিল। “অন্তর্জি  
 মূর্খ তুমি, কি বুঝিবে যুদ্ধের কৌশল ?  
 যুদ্ধ নহে ছেলে খেলা, আমি এ বয়সে  
 বহু-যুদ্ধ, বহু বীর করেছি দর্শন,  
 কিন্তু এ জীবনে কঁড় তোমার মতন  
 এমন অনুরদর্শী নির্বোধ সেনানী  
 দেখিনি কোথাও, তুমি ভেবে দেখ মনে  
 যদি মোরা মূর্খ প্রায় যাইয়া সেখানে  
 আক্রমি সে যোদ্ধাদলে, যুদ্ধান্তে নিশ্চয়  
 একজন মহারাষ্ট্র কিরিবে না আর ।  
 আকালীর সে অসংখ্য ভীম যোদ্ধা মনে  
 এ অল্প সংখ্যক সৈন্য কেমনে বুঝিবে  
 সম্মুখ সমরে ? নহে তারা কাপুরুষ ;  
 সে হৃদয় যুদ্ধপ্রিয় ভীষণ আক্রমণ  
 উন্মুক্ত কপাণ হস্তে আক্রমিবে যবে  
 ভীম বলে, বল দেখি কেমনে রোধিব  
 সেই গতি ? এ কয়টি সৈনিক আমার  
 পারিবে কি সেই বেগ রোধিতে তখন ?  
 নিশ্চয় সসৈন্তে মোরা হইব নিহত  
 সেই যুদ্ধে, আমাদের নিজ বুদ্ধিদোষে ।  
 তোমার কথায় তুলে নির্বোধের প্রায়  
 কেন এ বিপদ রাশি আনিব ডাকিয়া ?  
 এ নহে বীরত্ব, ইহা দান্তিকতা ঘোর ;  
 এতাহিম \* মূর্খ নহে, তোমার মতন  
 নহে অন্ধ, যে পর্য্যন্ত সময় প্রাপ্ত  
 না আসিবে মহারাষ্ট্র সমগ্র সেনানী,  
 নাহি আক্রমিব শত্রু, আজ্ঞা পেশবার ।  
 দিল্লীর নিকটে কোন নির্জন স্থানে

লুকায়ে রহিব মোরা, এতাহ গোপনে  
 লইব সমস্ত তত্ত্ব, শুধু অল্পতর  
 অমিয়া নগর মাঝে করিবে নির্ণয়  
 কোন্ দিক হ’তে মোরা, আক্রমিব পুরি ।  
 বীরেন্দ্র আদিরা বেগ করিবে সাহায্য  
 এই কার্যে, সদাশিব আসিবে যখন  
 সসৈন্তে, প্রচণ্ড বেগে আক্রমিব দিল্লী  
 সিংহ প্রায় ; ছিন্ন ভিন্ন করিব নগরী  
 বজ্রবর্ষি কামানের অনল বর্ষণে ।”  
 নীরবিলা এতাহিম, নীরব অন্তর্জী,  
 নীরব সৈনিকবৃন্দ ; শুধু তরঙ্গিনী  
 তর তর তর রবে চ’লেছে নাচিয়া  
 শুনি এ বীরত্ব-গাথা ; অশ্বখের মূলে  
 বসেছে সৈনিকবৃন্দ ; প্রকাণ্ড বিটপী  
 প্রকৃতির ছত্র যেন, যুড়ি বহুদূর  
 বিশাল অসংখ্য করে প্রসারিয়া ছায়া  
 ব্যজনিছে জীবদলে সমীরণ-ছলে ।  
 অনূরে সু-উচ্চ বহু নারিকেল বৃক্ষ  
 শোভিছে অসংখ্য কলে, নিদাঘার্শ্ব জন  
 নিবারে পিপাসা যার অমৃত-সলিলে ।  
 তৃক্ষার্ত সৈনিক বৃন্দ সানন্দ স্বপ্নে  
 পাড়ি সে অমৃত ফল, তৃক্ষা ভয়ঙ্কর  
 নিবারিল। সেই কলে, বসি কিছুক্ষণ  
 তর-মূলে, হিল্লোলিত স্নিগ্ধ সমীরণে  
 বিদূরিয়া পথ আন্তি, চলিল আবার  
 প্রতজন বেগে, সঙ্গে অসংখ্য কামান  
 ভয়ঙ্কর বজ্র-বর্ষি ; দেখিতে দেখিতে  
 অদৃষ্ট হইল ক্রমে অরণ্য-আধারে ।  
 একজন অখারোহী চলিল কিরিয়া

\* এতাহিম, অর্থাৎ কামিনী, ইনি মহারাষ্ট্র সেনাপতি।

সেতারায় জুড় বেগে কটিকার মত  
সঙ্গে ল'য়ে লবঙ্গের সুবর্ণ অঙ্গুরী।  
আবার নির্জন ভাব জাগিল সে বনে।  
ভিল ভিল করি দিবা চলিল বহিয়া  
সমর-সাগর ঘোড়ে, স্বর্ণময় রথে  
ছুটিল রক্তিম তাম্র পশ্চিম গগনে  
পরিহারি উগ্রভাব ; তরল অনল  
বহিয়া সমস্ত দিন ক্রান্ত কলৈবরে  
দিনমণি, শান্ত বেগে শোভিল সুন্দর  
অস্তাচলে—সিন্দূরের কোটা নিরমল।  
সাজিল প্রকৃতি দেবী আরণ্য কুসুমে  
অল্পপম, সমীরণ বহিল মধুরে  
কাঁপাইয়া কুসুমিত কানন-বল্লরী  
কানন-কুসুম কলি করিয়া চুবন !  
সে চুবনে কত শত অফুটন্ত কলি  
উঠিল ফুটিয়া ; মরি উঠিল ফুটিয়া,  
সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে স্নিগ্ধ স্বর্ণোজ্জ্বল  
একটি রমণী-পুষ্প অতুল জগতে—,  
—মর্ত্যের কোমল রস ত্রিদিবের মণি।  
সে সৌন্দর্য্য সে সৌরভ কত সুধাময়,  
লজ্জিত যাহার কাছে অমর-বাহিত  
নন্দনের পারিজাত, কিংবা ভূতলের  
গোলাপ মতিয়া চাঁপা সুধাংশু-মোহিনী।  
মূর্ছাস্তে দেখিলা বামা ভাস্করের হটা  
মিনিয়াছে কি সুন্দর গগন-প্রাঙ্গণে,  
পড়িয়াছে প্রতিবিম্ব নন্দনার নীরে  
প্রকৃতির মনোহর সুন্দর দর্পণে।  
সুদূরে একটি তরী বগ্ন কলু করি  
বিদারিয়া নদীবক্স আসিছে সুন্দর  
হেলে হ'লে, অভ্যস্তরে একটি তৈরবী

সুগভীর ধ্যান মগ্না, গৈরিক বসন  
পরিধানে, কণ্ঠদেশে কজাকের মালা  
বিকৃতি ভূষিত অঙ্গ, এশত ললাটে  
চন্দনের কোটা, বিধে মূর্তিমতী যেন  
দেব কন্যা, আজি এই তপস্বিনী বেশে,  
আলুলায়িত কুন্তলা—পড়েছে ছলিঙ্গা  
ভরজিত কেশ গুচ্ছ পৃষ্ঠের উপরে।  
অর্ধ নিমিলিত আঁখি, চাহি নদী পানে  
যুক্ত করে সুধাধরে গাইছে তৈরবী  
কাঁপাইয়া নদী বক্স, সে স্বর-লহরী  
প্রাবিয়া তটিনী-তীর প'ড়েছে ছড়িয়ে  
চারিদিকে মোহিয়া সে নির্জন প্রকৃতি

পতিত পাবনী গড়ে।

নে'চে খে'লে হে'লে দু'লে কলু কলু তান তু'লে  
কোথা যাও বন-রঙ্গে।  
গড়ে।

শুভ সৌধমালা বিদিত তব বক্সে,  
অতীতের কত চিত্র হেরিয়াছ তুমি চক্রে  
মাগাঠা গোকুর ক্ষত্র  
নিব ছত্রি রাজ পুত্র  
যুঝিতে সমরঙ্গনে গ্রাণ পর্বে  
যোগল পাঠান গড়ে।

অসির বাকারে বীরের হত্যারে  
পঙ্কিত কামান মেঘমল্লৈ,  
দক্ষিণে কুমারী উত্তরে দিব দিগি  
কাঁপিত বৃহবৃদ্ধঃ ধর ধর অঙ্গে।  
তব সলিল তব, রক্তিত হ'ত যবে  
কোটি কোটি বোদ্ধার  
শোণিত ভরঙ্গে।

কল নাদীরী জলিনী পতিত পাবনী গড়ে।  
কোথা যাও বন-রঙ্গে।  
গড়ে।

নিরখিয়া তৈরবীর পবিত্র মূর্তি  
বিদ্যানে মলিন দু'বে বসিলা চুখিয়া

দুর্ভাগ্যেরে, কত কথা ভাবিতে লাগিল।  
 নীরব সারাতে সেই তটিনী সৈকতে।  
 তরঙ্গে তরঙ্গে কত বটিকা ভীষণ  
 বহিল সে ক্ষুণ্ণ হৃদে, ঝরিল নয়নে  
 “বিন্দু বিন্দু অশ্রুবারি—মুকুতা চঞ্চল।  
 কে বলে সমুদ্র-তলে জনমে রতন ?—  
 —কবির কল্পনা কথা, সংসার-সাগরে  
 ধোঁজ নর, বহুকষ্টে দেখিবে সেখানে  
 সরলতা শুভি মাঝে অতি মনোহর  
 রমণী প্রাণের প্রেম স্বর্গীয় রতন।  
 কাতরে কহিলা বামা চাহি উর্ধ্ব দিকে  
 লক্ষ্য করি সেই জনে, বিপন্ন জনের  
 একমাত্র বন্ধু যিনি নিখিল ভুঞ্জে।  
 “কোথা তুমি দয়াময় বিপদ ভঞ্জন ?—  
 —কোথা তুমি ? পাপী আমি, জনমের মত  
 তোমারি চরণে নাথ লইবু শরণ।”  
 নীরব্রিলা বামা, হৃদে কত যে যাতনা  
 একে একে স্মৃতি সহ উঠিল জাগিয়া  
 হুই বিন্দু অশ্রু জল পড়িল ঝরিয়া  
 কাতর নয়নে, মরি ফুটন্ত গোলাপে  
 প্রভাত-শিশির যেন—রতনে রতন।  
 গুমরে গুমরে বামা বসি কিছুক্ষণ  
 কাঁদিলা মনের হৃৎখে, কহিলা কাতরে  
 সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি, “কোথা প্রাণেশ্বর  
 হৃৎখিনীর হৃদি-রত্ন ? এ’স একবার  
 জুড়াইতে এ হৃদয় অস্তিম সময়ে।  
 দেখ এ’সে যে অনল ঢেলে ছিলে হৃদে,  
 আজি তাহে ভষ্মীভূত লবঙ্গ তোমার।  
 যদি নাথ, এই ভাবে বসিবে আমারে  
 ছিল মনে, কেন তবে হৃৎখিনী-হৃদয়ে

ঢে’লেছিলে এ মদিরা ? প্রাণেশ্বর, কিতরে,  
 কেন জ্বলিছিলে নাথ এ তীক্ষ্ণ দহন ?  
 বড় হৃৎখ প্রাণনাথ রহিল এ মনে,  
 না পাইবু এ জীবনে রাখি এই শির,  
 ও হৃদয়ে পুনর্ব্বার, হৃদয় ভরিয়া  
 নিরখিতে সেই মুখ অস্তিম সময়ে।  
 না পারিষু একবার জনমের মত  
 পূজিতে সে পা ছুখানি হৃদয়-কুসুমে  
 প্রাণনাথ, না পারিষু আর এ জীবনে  
 চুম্বিয়া সে পা ছুখানি, ধরিয়া গলায়  
 নিরখিতে প্রাণয়ের স্বপ্ন-মনোহর।  
 কার আশে প্রাণনাথ রাখিব জীবন,  
 এবে আর ? তাজি গৃহ ভিখারিণী বেশে  
 আসিয়াছি এ বিদেশে তোমারি কারণে।  
 ছিল আশা বিদ্যাচলে পাইব তোমারে  
 প্রাণনাথ, মহেশ্বরের পবিত্র চরণে।—  
 —সেই স্থানে এ হৃৎখিনী পাইবে তাহার  
 প্রাণের বাঞ্ছিত ধন, হুই জন মিলি  
 পূজিব শতুর পদ ভক্তির কুসুমে,  
 সে আশাও প্রাণনাথ ডুবিলা সাগরে।  
 আমার এ রূপ-রাশি এ ছার যৌবন  
 প্রতিপদে কত হৃৎখ দিতেছে আমারে।  
 সে দিন পাবও এক ধরিয়া আমার  
 দিয়াছিল যে লাজনা, ঝরিলে সে কথা  
 আতঙ্কে শিহরে হৃদি, মদিরার সনে  
 মিশায়ে ধুতুরা হায় না দিলে হৃৎখ  
 নরাধমে, প্রাণনাথ নিশ্চয় সে দিন  
 বাইত সতীষ ঘোর—বাইত জীবন।  
 আবার—আবার নাথ বিপদ ভীষণ।—  
 নিশাকালে একদিন ছিন্ন দুমাইরা

এক তিথারিণী-গৃহে, ভাগ্য দোষে পুনঃ  
 পাণাসক্ত ভীষকায় দম্ভ্য তিন জন  
 প্রবেশিয়া গৃহ মাঝে হরিল আশারে  
 বাঁধি হস্ত পদ মম, বধি বিনা দোষে  
 তিথারিণী ছঃখিনীর পবিত্র জীবন ।  
 কত কৈদে পায় ধ'রে দম্ভ্য-রমণীর  
 ল'তেছিল মুক্তি, পুনঃ অদৃষ্টের দোষে  
 পড়িলাম ধরা এই নর্যদা-সৈকতে ।  
 কত পুণ্যকলে সেই বিপদ-ভঞ্জন  
 রক্ষিছেন ধর্ম'মোর, সংসার নরকে  
 কত নরাকৃতি পশু পাপ-মদে মাতি  
 বিনাশিতে ধর্ম'মম সদা সমুৎসুক ।  
 কি ক'রে রক্ষিব আমি অবলা রমণী  
 ধর্ম'মোর ? কোন্ চক্রে কাহার কোশলে  
 পড়ি কবে, হারাইব সতীত্ব-রতন ।  
 রমণীর প্রাণ কতু নহে প্রিয়তর  
 সতীত্ব হইতে, সেই সতীত্ব-রতন  
 হারাইলে, রমণীর কি কল জীবনে ?  
 বিছ্যাচল বহু দূরে, পারিব না আর  
 যাইতে সেখানে, হারি নির্কোষের মত  
 সাহসে নির্ভর করি রমণী জীবনে  
 কেমনে সাধিব এই অসাধ্য সাধন ?  
 —পারিব না, অনর্থক অমিয়া কি কল ?

লক্ষ্যহীন তরী আর সংসার-মাগরে  
 কত কাল হেন ভাবে বেড়াব ঘুরিয়া ?  
 তবে কেন, কার আশে এ জীবন ভার  
 বহিব, মহিব এই যন্ত্রণা ভীষণ ?  
 আর না, সকল সাধ কুরা'য়েছে হার,  
 জীবনের যবনিকা ফেলিব এখন ।”  
 অভাগিনী ক্ষুণ্ণপ্রাণে রহিলা বসিয়া  
 নীরবে, দেখিল। চাহি তটিনী-জীবনে  
 ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উন্মিগুলি কি সুন্দর ভাবে,  
 ফুটিছে মিশিছে মরি সায়াহ্ন-পবনে ;  
 কে জানে সে তীব্র দৃষ্টি ভেদি কত জল  
 পলিয়াছে কোন স্থানে ? অধর-প্রসূন  
 বিকম্পিত ঘন ঘন, নয়ন সুন্দর  
 নিরাশা ব্যথিত ঘোর, বদন-কমল  
 অশ্রুসিক্ত, কাননের নিভৃত সরসে  
 সৌন্দর্যের মহামণি নিশির-মণ্ডিত  
 ফুটন্ত নলিনী যথা হেমন্ত প্রভাতে !  
 বিবাদে আকুল চিন্তে বিছাডের বেগে  
 ঝপ্প দিলা অভাগিনী নর্যদা-সলিলে,  
 ছিটিয়া উঠিল বারি, প্রতিমার প্রায়  
 ত্যজিয়া সংসার-মায়। ডুবিল। অভাগী  
 অনন্ত জলের তলে অনন্ত আধারে ।

ମହାଶୟାନ

ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଷ





## প্রথম সর্গ

[ সেতারা ; বিশ্বনাথের প্রমোদ কানন ]

এঁ'র গো কল্পনে দেবী কোবিদ-সঙ্গিনী  
 প্রেমময়ী, রক্ষা কর এ ঘোর বিপদে,  
 পথভ্রান্ত পাশু আমি ছাড়ি লক্ষ্য পথ  
 আসিয়াছি বহু দূরে, চল সঙ্গে মম  
 যাব আজি ভারতের সে মহাশ্মশানে  
 যথায় নিদ্রিত দেবি এ জন্মের মত  
 ভারতের কোটি কোটি বীর চুড়ামণি !  
 চল দেবি, এ পরাণ বাঁধিয়া পাশাণে  
 নিরখিব সেই স্থান, দিব না ঝরিতে  
 এক বিন্দু অশ্রু, আমি জিজ্ঞাসিব তাবে  
 কেন সে নিশ্চয় এত ? কৃতজ্ঞের প্রায়  
 ভারতের বক্ষে থাকি গ্রাসিল কেমনে।  
 ভারতের কোটি কোটি বীরেন্দ্র সম্মানে।

উদিল চন্দ্রমা ধীরে পূর্ব গগনে  
 হে'সে হে'সে ; বিভাবরী হাসিল নীরবে,  
 নীরবে হাসিল বিশ্ব ; হাসিল জলধি'  
 শৈল-শৃঙ্গ কুসুমিত নিকুঞ্জ-কানন।  
 চন্দ্রমার চাক্র কাস্তি পড়িল ছড়ায়  
 পড়ে পড়ে ফুলে ফুলে শ্রাম তুর্কাদলে।  
 অদূরে বিটপীকান্দ স্পন্দহীন দেহে  
 দাঁড়াইয়া সারি সারি নয়ন-রঞ্জন—  
 —নিমগ্ন যোগেশ-ধ্যানে বেন চন্দ্রচূড়  
 যোগীন্দ্র কৈলাস-শিরে মহাযোগী বেশে।  
 উন্মত্ত চকোর বন্দ উড়িয়া গগনে  
 পিইছে কৌমুদী-সুধা ; ছুটিছে সন্ধানে  
 কুজ কুজ মেঘগুলি প্রভঞ্জন-বেগে

নিধর গগন-তলে, কৌমুদী-কিরণে  
 রঞ্জিত-রঞ্জিত বর্ণে —সুশুভ্র তরঙ্গী  
 নির্ঝাত তরঙ্গ শূন্য নীলিম সাগরে।  
 উড়ানোর প্রান্তদেশ চুম্বিয়া সাদরে  
 ছুটিয়াছে কি সুন্দর কৃষ্ণ তরঙ্গিনী  
 বিমোহিয়া লতাকুঞ্জ মধুর স্মরণে।  
 নাহি জাগে জীব জন্তু, বসুধা সুন্দরী  
 নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে ঘোর অচেতন।  
 কি আশ্চর্য্য মহাদৃশ্য—মধুরে ভীষণ !  
 —শাস্তি যেন ভীতি সহ মাখামাখি ভাবে  
 সংমিলিত, ধরা যেন প্রকাণ্ড শ্মশান।  
 নীরব নিশ্চল সব, মানবের প্রাণে  
 এ ঘোর নিষ্কীর্ত দৃশ্য পলকে পলকে  
 জীবনের নশ্বরতা জাগায় নীরবে ;  
 আবার সাধক প্রাণে প্রেম-প্রস্রবণ  
 ফুটায় সহস্র ধারে, নির্ঝোধ মানব  
 কেমনে বুঝিবে তাহা, একই দৃশ্যের  
 দুই ভাব—সুখ দুঃখ আলো অন্ধকার  
 পাশা পাশি একবর্ণে সংসারের পটে !  
 অদৃশ্য প্রহরা প্রায় নৈশ সমীরণ  
 সঞ্চরিছে ধীরে ধীরে গভীর। যামিনী।

এ গভীর নিশাকালে অই যে উড়ানে  
 বসি অট্টালিকা ছাদে কে অই রমণী  
 চিন্তামগ্না ? প্রেমময় সুললিত দেহে  
 সুধাংশুর স্বর্ণরশ্মি মরি কি সুন্দর  
 বলসিছে, ধরাতলে অলরা নন্দিনী

কিথানবোদিত চারু বালার্ক কিরণে  
 অর্ধ প্রসুটিত স্মিত স্বর্ণসবোজিনী ।  
 পরিধানে শুভ্র বাস, প্রকৃতির মত  
 অচঞ্চল শান্তি ছবি মধুর উজ্জল !  
 এলো থেলো কেশ-পাশ, আভরণহীন  
 দেহখানি কত সুশ্রী, প্রকৃতির মত  
 যেন প্রেমময়ী চির কুমারী যোগিনী ।  
 প্রাসাদের চারি পাশে পুষ্প রাশি রাশি  
 বিকশিত বৃন্ত পরে, চন্দ্রের কিরণে  
 হাসিছে হৃদয় খুলি, নাচিছে পবনে ।  
 যুবতী আকুলপ্রাণে চন্দ্রমার দিকে  
 নিরখিয়া বহুক্ষণ কাঁদিল নীরবে ;  
 মরি কি স্বর্গীয় শোভা, বিলোলা নয়নে  
 ছুট বিন্দু অশ্রুবাণি—স্বর্ণ শতদলে  
 সূর্য্যকান্ত নীলকান্ত বিচিত্র মিলন ।  
 নীরবে উঠিল বামা লজ্জিয়া সোপান  
 সুনিশ্চুত, উদ্ভারিল শ্যামল প্রাঙ্গণে ।  
 দেখিল কেবাণি পাশে কত কুসুমিত  
 ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্প বৃক্ষ শোভিছে সুন্দর  
 জ্যেষ্ঠীমত ; স্থানে স্থানে কুসুম-বল্লবী  
 জড়াইয়া উচ্চশিব বিটপি নিচয়  
 রহিয়াছে মঞ্জু কুঞ্জ প্রাণ মাহ-কর  
 সম্মুখে রক্তময় ফোয়ারার মাঝে  
 উছলিয়া বারি রাশি ঝর ঝর করি  
 উপহাসি পুষ্প বন্দে তরল সন্মিলে  
 নিশ্বাইয়া নানাবিধ কুসুম সুন্দর  
 অধঃস্থিত নীরে যে'য়ে মিশেছে আবার ।  
 অদূরে উজ্জল খেত-ময়ূরে নিশ্চিত  
 একটি যুবতী মূর্তি অর্ধ উলজিনী,—  
 —সরমে বক্সিমভাবে টানিছে বসন

নতমুখে, চন্দ্রমার উজ্জল কিরণে  
 ফুটিয়া উঠেছে রূপ শুভ্র কলেবরে ।  
 নিনিড় পল্লব তলে উচ্চ বৃক্ষ শাখে  
 একটি পেচকরাজ বিহঙ্গম ঋষি  
 রজনীর শান্তি ভাজি সুগভীর স্বরে  
 উঠিল ঘোষিয়া “নিশি তৃতীয় প্রহর ।”  
 চিন্তাকুল প্রাণে বামা বসিলা যাইয়া  
 নিকুঞ্জ কানন-বাসি ঝাউ তরু তলে  
 শিলাসনে, স্বভাব গায়ক কুঞ্জ-কবি  
 মোহিল হৃদয় প্রাণ মধুর সুস্বরে  
 ধীরে ধীরে, সুললিত অরণ্য সঙ্গীতে ।  
 সম্মুখে বিশাল দীঘী কত মনোহর,  
 সুশোভিত কত শত কুমুদ কল্লারে  
 বিকশিত, বিকম্পিত নিরমল জলে  
 চন্দ্রের সুবর্ণ-রশ্মি শোভিছে সুন্দর  
 বলমলি—থণ্ড থণ্ড মণি সমুজ্জল !  
 পল্লবিত তরু তলে পল্লব বিচ্ছেদে  
 পড়িয়া সহস্র থণ্ড কোমুদা-রতন  
 শোভিছে কি অনুপম, কৃষ্ণ মক্মলে  
 চীবকের কার্য্য যেন নয়ন-রঞ্জন ।  
 নিরখিয়া প্রকৃতির শোভা অকৃত্রিম  
 যুবতীর চিত্ত মাঝে ফুটিতে লাগিল  
 অসংখ্য আবেগ পূর্ণ চিন্তার হিলোল  
 রাশি রাশি, সুখময় শৈশব জীবনে  
 কত খেলা খেলা, কত স্নেহ-সন্তোষণ ।  
 বাধা বিঘ্ন কোনরূপ ছিল না তখন  
 কাননে সৈকতে মাঠে অথবা ঋশানে  
 একাকিনী ধনুঃ হস্তে যেখানে সেখানে  
 বীর রমণীরা প্রায় করিতে ভ্রমণ ।  
 কত সুখময় সেই স্বাধীন জীবন !

যৌবন জীবনে হায় সকলি নূতন,  
আজি এ জীবন-বৃক্ষে শাখা প্রশাখায়  
অতৃপ্তি-গরলময় ভুজঙ্গ ভীষণ।

সুহৃৎ সঙ্গীত-স্বরে চমকিলা বামা,  
আনন্দের স্নিগ্ধ আভা উঠিল ভাসিয়া  
যুবতীর স্বর্ণোজ্জ্বল বদন-কমলে।  
নীরবে পাতিলা কর্ণ, শুনিলা সুদূরে  
প্রণয়ের মন্মথভেদী করণ উচ্ছ্বাস  
উঠিছে পড়িছে নৈশ গগনের তলে।

পাপিয়ারে, “পিউ পিউ” গাও।  
অতৃপ্ত প্রাণের তলে, নিবাণ-অনল সনে,  
শান্তির অমিত-ধারে সে আলা নিবাও।  
পাপিয়ারে “পিউ পিউ” গাও।

নেচে নেচে সেই স্বর চণ্ডিল ভাসিয়া  
শৃংখ কোলে ; বসুন্ধরা উল্লাসে বিফল।  
উঠিল জাগিয়া ধীরে ঘুমন্ত প্রকৃতি  
সেই স্বরে, প্রেমাবেশে নীরব নিশ্চল।  
নগরের প্রান্তে প্রান্তে ছুটিয়া ভাসিয়া  
ধীরে ধীরে সেই স্বর ছাইল গগন।

গাইলে না ? —ও পাপিয়া।  
গাইলে না ? — গাও গাও গাও।  
উত্তপ্ত হৃদয় মূলে প্রেমের তরঙ্গ তুলে  
এ মুগ্ধ পাগল প্রাণে আনাব নাচাও।  
পাপিয়ারে “পিউ পিউ” গাও।

“পিউ পিউ” গাও।  
নিবিড় কানন তলে, মেঘময় নভস্তলে  
কেন এ উন্মাদবেশে ছুটিয়া বেড়াও ?  
পকমে তুলিয়া তান, গাওরে ললিত গান,  
প্রেমের মোহন ভাসে হৃদয় যুড়াও ?  
ভোর এ করুণ স্বরে, প্রাণ বে কেমন করে,

পাপিয়ারে সেই স্বর আবার শুনাও।  
আবার সে পিউ তানে, মদিরা চালিয়া প্রাণে  
সে উন্মত্ত গ্রন্থি-ছিন্ন-হৃদয় বাতাও।  
পাপিয়ারে “পিউ পিউ” গাও।

“পিউ পিউ” গাও।  
কেবে তুমি প্রিয় পারি গগনে লুকায়ে থাকি  
এ নখুর পিউ নবে ভুবন ভুলাও।  
দেব কি গুরুত্ব নব, কোন্ আতিকোথা স্বর,  
পারি সেজে বুঝি তুমি উড়িয়া বেড়াও ?  
তাই তব পিউ স্ববে পবাণ পাগল করে,  
যে হও সে হও তুমি “পিউ পিউ” গাও।  
যাবে সুবি দিবা নিশি অকুল সাগরে ভাসি,  
কাতরে করুণ স্ববে পিউ গীত গাও।  
সে বুঝি তোমার পানে ফিরিয়া না চায় মানে,  
তাবি তবে তুমি পারি কাঁদিয়া বেড়াও।  
পণয় পিনুখ দিয়া, সে বুঝি তোবে না ছিয়া  
তাই সদা কেঁদে কেঁদে অগত কাঁদাও।  
ওনে তোব সুখাশ্রয়, ভুলি নু আপনা পর,  
পাগল পরাণ মোর হইল উধাও।  
পাপিয়ারে “পিউ পিউ” গাও।

নীরবিল কণ্ঠস্বর ; নীরব অবনী।  
জীবন-প্রবাহ যেন শেষ তান সহ  
মিশে গেল অকস্মাত গগন-সাগরে  
বিষাদিনী মুগ্ধ মনে নসিয়া নীরবে  
শুনিলা সে দূর গান, শেষের হিল্লোলে  
একটি নিশ্বাস দীর্ঘ ফেলিলা নীরবে ;  
নীরবে ভাবিলা বামা “এত যত্ন করি  
আলিলাম যে অনল ভারত-গগনে  
দক্ষিতে মোস্তেসম-বৃন্দে, কে জানে কোথায়  
হইবে ইহার শেষ ? বুঝিবা অদৃষ্ট  
জন্ম শোধ এ অনলে যাইবে জলিয়া।”  
সহসা চমকি বামা চাহিলা পশ্চাতে  
মানবের পদ ধনি শুনিয়া অদূরে।

ক্রমেই নিকটে অতি, যুগ্মের মাঝে  
 দেখিলা সম্মুখে এক বীরেন্দ্র মুরতি  
 সজ্জিত সমর সাজে, কহিলা যুবতী  
 কোথা গিয়াছিলে নাথ ? না হে'রে তোমারে  
 হুই দিন, যে যখন সহিয়াছি প্রাণে  
 কেমনে বুঝিবে তুমি ? নয়নে আমার  
 নাহি নিজ্জা, ভেবে ভেবে সমস্ত রজনী  
 যাগিয়াছি, প্রাণনাথ, কোথা ছিলে তুমি ?”  
 বামার দক্ষিণ কর ধরিয়া যুবক  
 কহিলা সাদরে “প্রিয়ে, পুজিতে মায়েরে  
 গিয়াছি গিরি চূড়ে শক্তির মন্দিরে।”  
 কণ পরে বিশ্বনাথ কহিলা আবান  
 “চলিহু সমর ক্ষেত্রে, কি আছে অদৃষ্টে  
 কে জানে ? বিজয়ী বেশে মহানার্টে পুনঃ  
 আসিলে পাইবে দেখা, নতুবা কৌমুদী  
 এই দেখা শেষ দেখা জনমের মত।”  
 কাতরে সজল নেত্র কহিলা কৌমুদী  
 “প্রাণনাথ ! এ দাসীরে কর আশীর্বাদ  
 তোমার কৌমুদী যেন তোমারি চরণে  
 লভে স্থান জীবনের অন্তিম সময়ে।  
 চায় না সে স্বর্গ, যেন জন্ম জন্মান্তরে  
 পতিরূপে তোমারেই পায় অভাগিনী  
 তুমি বিনে এ সংসারে কে আছে তাহার  
 প্রাণনাথ ! সুখে দুঃখে জীবনে মরণে  
 অভাগিনী সততই তোমার সঙ্গিনী।  
 যদিও মোহনম যুদ্ধে মহানার্টে ভাগ্য  
 যায় অলি, যদিও সে ভীষণ আহবে  
 হারাই তোমারে নাথ—কোন্ দুঃখ তাহে,  
 কল্পতরু জননীর সাধিতে কল্যাণ  
 যত্না ত সামান্য কথা,—স্বর্গের সোপান।

আমি যে অদলা নারী হুণিত অধম,  
 নাহি শক্তি এ শরীরে, আমিও এ প্রাণ  
 তুচ্ছ গণি প্রাণনাথ স্বদেশের তরে।  
 তুমি বীর, কোন্ ভয় মরণে তোমার  
 প্রাণনাথ ? মহানার্টে জননী তোমার  
 সাধিতে কল্যাণ তার, যদিও সমরে  
 যায় প্রাণ, তাও ভাল, তথাপি কখন  
 দেখিব না জননীর এত নির্যাতন।  
 হও অগ্রসর ; অসি খোল তীক্ষ্ণ ধার,  
 ধ্বংস কর একে একে সমগ্র মোহনমে।  
 যুদ্ধান্তে বিজয়ী বেশে এসে প্রাণনাথ  
 মহানার্টে-ধর্ম যবে করিবে স্থাপন  
 এ ভারতে, যবে তার সমগ্র সম্মান  
 “জয় মহাদেও” রবে করিবে কল্পিত  
 আসমুজ্জ হিমাচল, সেই শুভ দিন—  
 সে পবিত্র শুভ লগ্নে হৃদয় খুলিয়া  
 পূজিব চরণে তব ভকতি-কুসুম,  
 প্রেমের কোমল পুষ্প গাঁথিয়া মালিকা  
 পরাইব কণ্ঠে তব,—এ বাসনা মনে।”  
 “কেন এ আকাক্ষা প্রিয়ে ?” উত্তরিলে যুব।  
 “কেন এ কঠোর ব্রত, প্রতিজ্ঞা ভীষণ ?  
 কোমল কুসুম সম রমণী-রতন  
 এ জগতে, বিধাতার স্নেহের নবনী ;  
 সে হৃদে কেন এ বহি প্রতিজ্ঞা ভীষণ !”  
 সহসা বামার মুখ হইল গম্ভীর,  
 কহিলা সগর্ব্ব,—নাথ কি কাজ জীবনে  
 যদি না ধ্বংসিতে পারি বিধর্ম্মী মোহনমে  
 ভারতের চির শত্রু ? মানব-জনম  
 শুধু কি জগতে ভোগ-বিলাসের তরে ?  
 মহানার্টে বামা নহে কুসুম কোমল।

বাতাসে ঝরিয়া যাবে, অথবা গলিবে  
তপনের প্রজ্জ্বলিত অনল কিরণে !  
শত বজ্রা শত বজ্র লইবে মস্তকে  
অরোহে ; বীরেন্দ্র-পত্নি, বীরেন্দ্র-জননী  
মহারাজী বামা নহে পুষ্প কমনীয়  
ভোগ বিলাসের বস্তু কামের পুতুল ।  
কহ নাথ, করেছ কি সমর উত্তোগ  
এবে তুমি ? অথবা কি আলস্ত-নিজ্রায়  
এখনো নিদ্রিত ? হায় অভাগার আশা  
হবে না কি পূর্ণ নাথ ? মোস্তেম শোণিতে  
প্রতিহিংসা-বহ্নি হায় হবে না নির্বাণ ?”  
“অবশ্য হইবে, —পূর্ণ হবে তব আশা”  
কহিল। বিশ্বাস রাও “কেন বৃথা তুমি  
চিন্তার সাগরে মগ্না ? কি আছে জগতে  
এমন কঠিন কার্য সাধিতে অক্ষম  
এ ভূজ ? লইতে পারি বজ্রাঘ্নি ভীষণ  
ছনয় পাতিয়া আমি তোমারি কারণে ।  
কি ছার মোস্তেম প্রিয়ে ? সমগ্র পৃথিবী  
মোস্তেমের অনুকূলে ধরিলে কৃপাণ,  
স্বর্গের দেবতাবৃন্দ কিহা যক্ষ রক্ষ  
করিলে অনল বৃষ্টি, বর্ষিলে দন্তোলি  
ফিরিব না—ফিরিব না থাকিতে জীবন,  
যুঝিয়া বীরের মত সম্মুখ সংগ্রামে  
মোস্তেমের ধ্বংস প্রিয়ে করিব সাধন ।  
ইহা যদি নাহি পারি, কাপুরুষ আমি,  
নহি বীর, নহি আমি পেশবা-নন্দন ।  
শাস্ত হও প্রিয়তমে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল,  
পূরিবে তোমার আশা, সৈন্ত অগণিত  
প্রেরিয়াছি হুই ভাগে দিল্লী-অভিমুখে

সম্রাটের কোষাগার করিতে লুণ্ঠন ।  
দ্বাদশ সহস্র সৈন্ত এব্রাহিম সনে  
গিয়াছে কানন পথে, আজি সদাশিব  
লক্ষাধিক সৈন্ত সহ গিয়াছে আবার  
সেই দিকে, অন্য পথে চলিলাম আমি,  
বিংশতি সহস্র সৈন্ত, অসংখ্য পায়গা \*  
চলিয়াছে সঙ্গ মম, সম্মুখ সমরে  
ধ্বংসিয়া দিল্লীর দুর্গ ধ্বংসিব মোস্তেমে;  
উড়াইব মহা দর্পে ত্রিশূল অঙ্কিত  
বৈজয়ন্তা ভারতের নগরে নগরে ।”  
নীরবিলা বিশ্বনাথ, কহিল। কৌমুদী  
“পূর্ণ হ’ক প্রিয়তম প্রতিজ্ঞা তোমার !  
কিন্তু নাথ তব সনে সমর প্রাঙ্গণে  
আমিও যাইব ধ্বংস করিতে মোস্তেমে ।”  
উত্তরিল। বিশ্বনাথ সন্তোষ বচনে  
যে’তে পার, কিন্তু আমি থাকিতে জীবিত  
তুমি কেন যুঝিবে সে মোস্তেমের সনে ?  
নারী তুমি, এ প্রতিজ্ঞা সাজে না তোমার ।”  
“না নাথ যাইব আমি, যুঝিব না রণে”  
বলিল। কৌমুদী বাঈ মধুর বচনে  
“তব সনে রণক্ষেত্রে থাকিয়া সতত  
নিরীখিব যুদ্ধ, সদা করিব তোমারে  
উৎসাহিত, এ মিনতি চরণে তোমার ।”  
নীরবিলা শশিমুখী, কহিল। যুবক  
“আর এক কথা প্রিয়ে বলিনি তোমারে,  
নিহত লবঙ্গ লতা নন্দ্যদার তীরে  
দম্ব্য করে ; এব্রাহিম দে’খেছে তাহারে  
নদী তীরে, এই দেখ অসুরীয় ভার ।  
একজন মহারাজীয় সৈনিক প্রধান

\* মহারাজী পক্ষীয় এক প্রকার দুর্ভর্য সৈন্য ।



এনেছে এ অসুখীয়ে দেখাঠিতে সবে ।  
 বিমাতার মোখে হায় হুখিনী লবঙ্গ  
 হারাল জীবন প্রিয়ে এ কচি বয়সে ।”  
 অকস্মাত পথপার্শ্বে দেখিলে ভুজঙ্গ  
 চমকে পথিক বখা, ভেমতি কোমুদী  
 চমকিলা এ দারুণ ভীষণ সংবাদে ।  
 কাতরে করুণ-কণ্ঠে কহিলা কোমুদী  
 “রক্তজীর প্রেমে হায় হুখিনী লবঙ্গ  
 ভুবেছিলি নিশাকালে কুমার জীবনে,  
 বিধাতার অশুভ্রে বাঁচিয়া হুখিনী  
 সে ঘোর সঙ্কটে, হায় বহু পুণ্য ফলে  
 লভিলা সে রক্তজীরে, সেই নাকি শেষে  
 তেয়াগিলা, শোকে হুখে হুখিনী লবঙ্গ  
 বিদেশে বিপাকে হায় হারাল জীবন । ‘  
 ছিছি নাথ পুরুষের হৃদয় কঠিন  
 মরুপ্রায়, মরোচিকা—ছলনা চাতুরী,  
 প্রেমের অঙ্গুর নাহি জনমে সেখানে ।  
 বাধা দিয়া বিশ্বনাথ কহিতে লাগিলা ;—  
 “কে বলিল প্রিয়তমে পুরুষ-হৃদয়  
 মরুভূমি ? ভ্রম তব, পুরুষ-হৃদয়  
 পুষ্পবন, শ্রীতি ভক্তি স্নেহ ভালবাসা  
 প্রকৃটিত অবিরত সে প্রেম-উজ্জানে,  
 রমণী-হৃদয় প্রিয়ে মার্তণ্ডের প্রায়  
 অবিরত দহ করে সে প্রেম-উজ্জান  
 ছলনা চাতুরী রূপ প্রচণ্ড কিরণে ।”  
 কহিলা কোমুদী-বান্ধে মধুর বচনে  
 “কে জানিত যৌবনের প্রথম প্রকাতে  
 এমন সোনার পুষ্প পড়িবে ঝরিয়া

প্রাপনাথ ? মামা তার উদ্ভাদের প্রায়  
 “লবঙ্গ লবঙ্গ” বলি করিছে রোদন ।  
 পিতাও আকুল চিত্ত, এ ঘোর বিপদে  
 না মুছিতে সে অশ্রু কেমনে যাইবে  
 রণক্ষেত্রে ? নাহি জানি এ ঘোর সঙ্কটে  
 কি লিখেছে জগদীশ মহারাক্ষ-ভালে ।”  
 উত্তরিল বিশ্বনাথ গভীর বদনে  
 “যা’ক প্রিয়ে, সে চিন্তায় নাহি কোন ফল  
 আমি কে ? সমগ্র বিশ্ব বাধা নিয়তির,  
 অখণ্ড বিধির লিপি কে খণ্ডায় ভবে ?  
 যাও প্রিয়ে, অতি নীত্রে সে’জ্ঞে এস তুমি  
 এখন যাইতে হ’বে ; সবাই প্রস্তুত,  
 বিলম্ব নাহিক আর, দুর্গের বাহিরে  
 সৈন্যদল সুসজ্জিত, মম প্রতীক্ষায়  
 বিলম্বিছে সবে, প্রিয়ে তুমিও এখন  
 সে’রে এস সব কার্য্য, মুহূর্ত্তের মাঝে  
 বাহিরের কার্য্যগুলি সে’রে আসি আশি ।”  
 মুহূর্ত্তেকে কোমুদীর কণ্ঠদেশ ধরি  
 সে চারু মলিন মুখ চুখিলা সাদরে  
 বিশ্বনাথ, অশ্রুধারা পড়িল ঝরিয়া  
 এক সঙ্গে উভয়ের বদন-কমলে ।  
 উভয়ে উভয়-পানে রহিলা চাহিয়া  
 আত্মহারা, সে অতৃপ্ত নিরাশ-নয়নে  
 কি এক মাধুর্য্য আছা উঠিল ফুটিয়া  
 মুহূর্ত্তেকে, কত বখা বহিতে লাগিল  
 উভয়েরি মুখ প্রায় আকুল অন্তরে;  
 মরি কি স্বর্গীয় শোভা—উভয়েই বহু  
 দৃঢ়তর, উভয়ের প্রেম-আলিঙ্গনে !

## দ্বিতীয় সর্গ

[ মোস্লেম শিবির, অনুপ সহর, গজাভীর ]

অনুপ সহর প্রান্তে গঙ্গার পুলিনে  
অসংখ্য শিবিররাশি যুড়ি বহুব্র  
শোভিছে নগর সম, উত্তরে কানন  
সীমান্ত, ভয়াবহ নিবিড় নির্জন ।  
একটি শিবির অই অট্টালিকা প্রায়  
শোভিতেছে মধ্যস্থলে, সশস্ত্র প্রহরী  
ভ্রমিছে কৃতান্ত বেশে প্রতি দ্বারে দ্বারে ।  
শিবিরের উর্ধ্বদেশে অবলম্বি চূড়া  
একটি বৃহৎ ধ্বজা উড়িছে গগনে  
ধরি ছন্দে “অর্ক চন্দ্র” মোস্লেম-গৌরব ।  
শিবিরের অভ্যন্তরে সুবর্ণ আসনে  
যোদ্ধা বেশে সমাসীন আমেদ দোরাণী ;  
সুদীর্ঘ লোহিত চক্ষু প্রলয়ের অগ্নি  
বর্ষিছে সন্তত যেন ধ্বংসিতে অবনী ।  
বাম পার্শ্বে মন্ত্রিবর্গ, দক্ষিণে তৈমুর\*  
আর কত সভাসদ ঘেরি চক্রাকারে  
বীরবরে, বসিয়াছে ক্রোধাক্রমুরতি ।  
চারিদিকে অগণিত সৈন্য, সেনাপতি  
যোদ্ধা বেশে সুসজ্জিত ভীষণ দর্শন ।  
উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে দাঁড়ায়ে নীরবে  
নিমকোটি, কৃতান্তের কিঙ্কর ভীষণ ।  
নীরব শিবির, শুক বীরেন্দ্র নিচয় ;  
কিছুক্ষণ পরে ক্রোধে কহিলা আকালী  
শিবিরের নিস্তরতা ভাঙ্গিয়া সজোরে  
“এত স্পর্ধা ? সদাশিব কত শক্তি ধরে  
এইবার দেখা যাবে, কৃপাণে কৃপাণে

হইবে পরীক্ষা তার, দেখিব এবার  
কে আনিয়া রক্ষে এই পাষণ্ড সকলে ?  
আকালীর শৌর্য্য বীর্য্য জানেনা নিশ্চয়  
দস্যুদল, জানিলে কি পতঙ্গের মত  
স্ব ইচ্ছায় উড়ে এসে পড়ে এ অনলে ?  
— মূর্থ তারা, আপনার পদের গৌরব  
জানেন না রক্ষিতে, তাই নিজ বুদ্ধি-দোষে  
চলিয়াছে অধঃপাতে, বিধির কৃপায়  
উঠে ছিল উন্নতির সর্বোচ্চ সোপানে  
কিন্তু কর্মদোষে পুনঃ চলেছে নরকে ;  
আর কত ?—জন্ম মৃত্যু উত্থান পতন  
প্রকৃতির গুণতত্ত্ব সৃষ্টি-রক্ষ ভূমে,—  
—বিধাতার গুণনীতি এ জৈব জগতে ।  
বিধর্ম্মী কাকের তাহা বুঝিবে কেমনে ?  
চিরদিন সমভাব ?—ভ্রম, শত ভ্রম,  
না বুঝে পাষণ্ড দল করেছে খনন  
যে গহ্বর, উহাতেই পড়িবে নিশ্চয় ;  
পরের অনিষ্ট চিন্তা করে যেই জন,  
নিজের অনিষ্ট-বীজ করে সে রোপণ ;  
পৌত্তলিক মহারাষ্ট্রী মূর্খের অধম,  
এ গুণ রহস্ত বল বুঝিবে কেমনে ?  
যাক তাহা, সে কথায় নাহি প্রয়োজন,  
নহি কাপুরুষ আমি, ডরি না শমনে,  
কাকেরের সত্তরাক্ত কৃপাণের তুষা  
নিবারিব, ডুবাব সে অস্পৃশ্য শোণিতে  
রণস্থল, অগণিত শৈবালের প্রায়

\* আহামদ সা দোরাণীর পুত্র

কাফেরের ছিন্ন মুণ্ড তালিবে তাহাতে  
রাশি রাশি, সেই রক্তে ইল্লামের জয়  
লিখিব ভারত-বক্ষে এ তীক্ষ্ণ কৃপাণে ।  
ইহা যদি নাহি করি, কাপুরুষ আমি,  
দেখাবনা মুখ আর বীরেন্দ্র সমাজে ।  
এ প্রতিজ্ঞা—আঙ্গালীর কৃপাণের তলে  
হার সেই মহারাষ্ট্রী, সমগ্র পৃথিবী  
আসে যদি, বিচূর্ণিত করিব নিশ্চয় ।  
এই ভুক্ত বলে আমি হয়েছি উন্নত  
বিচূর্ণিয়া কত শক্তি, কত সেনাপতি ;  
এই ভুক্ত বলে আমি ধ্বংসিব কাফেরে  
রণস্থলে, কোন্ বলে যুঝে মম সনে  
দেখিব সে মহারাষ্ট্রী তরুর অধম ।  
সদাশিব, জাহ্নরাও, পেশবা-তনয় ?—  
—এই সব বীরবৃন্দ ? যুঝিবে সংগ্রামে  
আঙ্গালীর সনে, ছিছি শৃগালের রবে  
লুকায় যাহারা ভয়ে রমণী অঞ্চলে ?  
অসম্ভব, যার তীক্ষ্ণ কৃপাণ প্রহারে  
বিকম্পিত দেব দৈত্য, সমগ্র পৃথিবী  
কাঁপে ধর ধরি যার একটি হুকারে ।  
সামান্য তরুর বৃন্দ সম্মুখ সংগ্রামে  
যুঝিবে তাহার সনে, এ ও কি সম্ভব ?  
তুণ তুল্য গনি আমি এসব কাফেরে ।  
আদিনার বক্ষ চিড়ি এ তীক্ষ্ণ কৃপাণে  
নিইব শোণিত তার, বিচূর্ণিব মুণ্ড  
পদাঘাতে, প্রদানিব শৃগাল কুকুরে ;  
তবে আমি আহমদ, নতুবা নিশ্চয়  
কুকুর হইতে আমি কুকুর অধম ।”  
মুহূর্ত্তে শাণিত অসি নিকোষিলা বীর

ক্রোধ ভরে, বীর অসি উঠিল বলিয়া  
বিছাণের মত, ভীত করিয়া সবারে ।  
নীরব সেনানীবৃন্দ, নীরব শিবির ;  
কিছুক্ষণ পরে ধীরে কহিলা ছন্দি ধী \*  
“কি-আর বলিব আমি সে দারুণ কথা ?  
বলিতে বিদরে হৃদি, যে দিল্লীর শৌর্য্যে  
কাঁপিত সমগ্র বিশ্ব, নাম মাত্র যার  
অবগে, আতঙ্কে হৃদি উঠিত কাঁপিয়া  
মুহূর্ত্তে প্রমাদ গনি, অদৃষ্টের দোষে  
সেই দিল্লী—হায় সেই স্বর্গ সম-পুরী  
কাফেরের অস্ত্রাঘাতে মুগ্ধু জীবন ।  
সে সৌন্দর্য্য শৌর্য্য বীর্য্য গিয়াছে সকলি,  
নাই সেই পূর্ব্ব ভাব, শ্মশানের প্রায়  
ধরেছে কি মর্মান্তিক মূর্ত্তি ভীষণ ।  
মহারাষ্ট্র-দস্যুদল নিশ্চয় হৃদয়ে  
বর্ষিয়া অজস্র গোলা ভাজিয়াছে হায়  
সম্রাটের সুবহু প্রাসাদ সুন্দর ।  
ভাজিয়াছে ভারতের সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার  
মন্দির নির্মিত সেই ‘আরঙ্গ মহল’  
অনুপম, স্তম্ভ ছাদ প্রাচীর যাহার  
স্বর্ণ কার্য্যে বিভূষিত বিবিধ রতনে  
নানাবর্ণ, অনুপম সমগ্র ভূদনে ।  
সে সবি বিনষ্ট হায় দস্যুদের করে ।  
ভয় সে ‘দেওয়ান খাস’ সৌন্দর্য্য আধার,—  
—নির্মিত যে রম্য গৃহ সুস্তম্ভ প্রস্তরে,  
ভিতরে সুবর্ণ-তরু সুবর্ণ-লতিকা  
শোভিছে সুবর্ণ-ফুল, হাসিছে সতত  
সুবর্ণের চিত্রগুলি অতুল সুন্দর  
মোহিয়া নয়ন মন মন্দির প্রাচীরে ;

বারেক মুহূর্ত মাত্র নিরখিলে যারে  
ধরাভলে ইন্দ্রপুরী ভ্রম হয় মনে,—  
—সেও ভয়প্রায়, হায় হুঃখ ক'ব কারে।  
সে 'মতি মহল' মরি অতুল জগতে,  
সুশোভিত যার স্তম্ভে মন্দির-প্রাচীরে  
উজ্জ্বল মুকুতামালা স্বর্ণ বস্তু পরে।  
অসংখ্য হীরক পুষ্প স্তবকে স্তবকে  
বহু মূল্য প্রস্তরের পল্লব শ্যামলে;  
যেখানে বেগমবৃন্দ শতদল সম  
শোভিত সম্মিত মুখে, হায় সে মহল  
ভয় এবে—পরিণত ভীষণ শ্মশানে।  
আরো কত শত আঁহা প্রাসাদ সুন্দর  
'সাহাবোজ', 'নেজামদী-সমাধি-মন্দির'  
ভয় প্রায় দস্যুদের গোলা বরষণে"  
নীরবিলা বীরবর, কহিলা বঁজ্জেস \*  
“কেমনে, ভুলিব হায় সে দিনের কথা ?  
সেই দিন,—হায় সেই তৃতীয় প্রহর  
চিরদিন মোস্তেমের থাকিবে স্মরণ,  
যে দিন পাষাণদল দিল্লী বিনাশিয়া  
মোস্তেমের বীর্যপূর্ণ শুভ্র ইতিহাসে  
করিয়াছে ভীকৃতার কালিমা লেপন।  
জগতের কোন জাতি অত্যাধি হায়  
হেন পৈশাচিক কার্য করেনি কখন;  
যে কুকার্য করিয়াছে নিম্নম হৃদয়ে  
পাণিষ্ঠ বিজোহী দল, স্মরিলে সে কথা  
হৃদয় শিহরি উঠে, ক্রোধে অঙ্গ অলে  
দিল্লীর সদর পথে নৃশংসের মত  
বিজোহী কাকের দল আনিয়া সবলে  
মোস্তেম পুরুষ আর রমণী সকলে

করেছিল বেত্রাঘাত সবার সম্মুখে !  
সে দারুণ শেলাঘাত ভুলিয়া মোস্তেম  
কেমনে করিবে সন্ধি ? অসম্ভব তাহা,  
পশি কেহ বীরবেশে সিংহের বিবরে  
বধিলে শাবকে তার, বিনা প্রতিশোধ  
কেশরী কি সখা ভাবে ছেড়ে দেয় তারে ?  
সদাশিব ঘোর মূর্থ, ভীকু কাপুরুষ,  
নহিলে এ সন্ধিপত্র পাঠাইবে কেন ?”  
“সন্ধিপত্র ?” উত্তরিলো রোহিলা-গৌরব  
বহমত † “ভ্রম তব, কে বলে ইহারে  
সন্ধিপত্র ?—এ ঘোর চাতুরী কেবল।  
সদাশিব মহাদম্ভা ছলনা-নিগড়ে  
বাঁধি সবে, কে'ড়ে নিবে দিল্লী-সিংহাসন।  
কেমনে রক্ষিবে বল সে ঘোর সঙ্কটে  
জাতি ধর্ম, রমণীর সতীত্ব-রতন ?  
সদাশিব সৈন্ত বলে মহা বলীয়ান,—  
—মহারাষ্ট্র সৈন্তদল অগণ্য অসংখ্য,  
নাহি সংখ্যা, তাহে পুনঃ খাঁসী মালবের  
হুর্দ্বৈ সৈনিক বৃন্দ বহু অস্ত্র সনে  
মিশিয়াছে মহারাষ্ট্র সৈন্তের সাগরে।  
দোরাণী সাহার সৈন্ত গেলে নিজ দেশে  
কার সাধ্য দাঁড়াইবে এ শক্রব কাছে ?  
অচিরেই এ ভারত দলিয়া চরণে  
ধ্বংসিবে মোস্তেম দলে, দিল্লী-সিংহাসনে  
শোভিবে সম্রাট বেশে পেশবা তুঙ্গর।  
উত্তরে তিমাজি, আর দক্ষিণে সাগর  
বল দেখি এ বিস্তৃত ভূভারত মাঝে  
কে আছে এমন বীর যুহুস্তের তরে  
দাঁড়াইবে রণক্ষেত্রে পেশবার সনে ?

\* আহামদ খাঁ বঙ্গের মুসলমান পক্ষীয় একজন সেনাপতি

† হাকিম রহমত

সমগ্র ভারতবর্ষ বিকম্পিত আজি  
মহারাষ্ট্র-নামে, এক হুঙ্কারে তাহার  
ভীষণ ঝটিকা বহে বিশাল ভারতে।  
ভুলেছ কি সেই দিন? ভারতের বুকে  
কি কার্য্য না সাধিয়াছে এই দস্যাদল?  
“ঠিক কথা” সিংহপ্রায় গজিয়া ভৈরবে  
বলিলা নজিবদৌলা মোস্লেম-গৌরব,  
“ঠিক কথা, দস্যাদের ঘোর অত্যাচারে  
ভারতে মোস্লেম কুল অর্ধ যুত প্রায়।  
নাহি শক্তি তাড়াইতে পাবণ্ড সকলে  
এ ভারতে? তাই তারা অসম সাহসে  
দিল্লী আক্রমিয়া, ভাজি অসংখ্য প্রাণাদ  
লুপ্তিয়াছে রাজপুরী তক্ষরের মত  
প্রবেশিয়া দিল্লী দুর্গে ক’রেছে হরণ  
ধনরত্ন, প্রতিশোধ ল’বে না কি তার?  
পাপিষ্ঠ বিজ্রোহী দল ছলে ও কোশলে  
ধ্বংসিয়া মোস্লেম রাজ্য, হিন্দুর সাম্রাজ্য  
স্থাপিতে উৎসুক হ’দা, তেন দস্যাদলে  
ছে’ড়ে দিলে, পরিণামে ফলিবে কুফল!  
জানেন না সে রাজজ্রোহী পাবণ্ড সকল  
কারণ ভারতবর্ষ? ভারতের রাজা  
কোন্ জাতি? কারণ স্বার্থ সংজড়িত এবে  
ভারতের অন্ধ অন্ধ? জানেন না কি তারা  
ভারত মোস্লেম-রাজ্য, ভারতের রাজা  
মুসলমান,—মহারাষ্ট্রী? চির পদানত।  
সেই মহারাষ্ট্রী? সেই তক্ষর অধম  
মহারাষ্ট্রী? দস্যাবৃত্তি বাবসা বাহার,  
সেই মহারাষ্ট্রী? সেই কৃত্তর কাফের  
পবিত্র মোস্লেম রাজ্যে ধুমকেতু সম  
সমুখিত, কোন্ জন্মে ভারতের রাজা

ছিল তারা? স্মরিলেও ঘৃণা হয় মনে!  
আব্বরের সেনাপতি যত্নর অধীন  
সামান্য বেতনভোগী মালকী ভোমলা,  
তারি পুত্র কাপুরুষ সাহসী তক্ষর,  
সেই শিবাজীর পিতা তারি বংশধর  
মহারাষ্ট্র অধিপতি, তারি দাসাধম  
ঘণিত পেশবা, আজি অদৃষ্ট-চক্রের  
আবর্তনে সত্ৰাটের অনীকিনী মনে  
যুঝিতে সম্মুখ যুদ্ধে এত অগ্রসর।  
সেই কাপুরুষগণ ভুজঙ্গের মত  
আফালিয়া ভারতের নগরে নগরে  
বধিছে কি হলাহল, সমগ্র ভারত  
যুত প্রায় দস্যাদের কঠোর দংশনে।  
দূর্ব বঙ্গভূমি, আর পাঞ্জাব প্রদেশ,  
ভারতের যেই দিক করিবে দর্শন  
দেখিবে কেবলি হায় প্রতি ঘরে ঘরে  
শোক-দৃশ্য, পতিহীনা বিধবা ক্রন্দনে,  
পুত্রহীনা জননীর ঘোর মন্মথভেদী  
সকরণ আর্তনাদে ধ্বনিত অস্থর।  
দস্যাদের অত্যাচারে ঘোর প্রপীড়নে  
সমগ্র ভারতভূমি ভীষণ শাশান।  
ভারতের বীর জাতি রোহিলা পাঠান,  
কি হৃদশা দস্যাগণ করেছে তাদের,  
এখনো স্মরিলে তাহা ক্রোধে অঙ্গ অলে;  
উচ্চা হয় পশুদের বকের শোণিতে  
নিবাই সে ক্রোধানল, প্রতিশোধ তার  
লই এবে দস্যাদের জননী ভগিনী  
পিতা পুত্র কণ্ঠা জায়া করিয়া হনন,  
—ঘরে ঘরে মহারাষ্ট্র করিয়া শাশান।  
তেবে দেখ, কোন্ দিন সম্মুখ সমর



ক'রেছে এ দস্যাদল ? কেবলি দস্যুতা  
লুটপাট ইহাদের কার্য চিরন্তন ।  
ইহাদের নারকীয় পাশব আচারে  
দিন দিন স্বর্ণপ্রসূ ভারত এখন  
যাইতেছে রসাতলে এ জন্মের মত ।  
এ যুদ্ধ ধর্মের যুদ্ধ, পরের সাম্রাজ্য  
হরিতে, অথবা নিজ রাজ্যের বিস্তৃতি  
বাড়াইতে লিপ্ত মোরা নহি এ সমরে ।  
সম্রাটের মহারাষ্ট্র হিন্দু প্রজাগণ  
সম্রাটে দুর্বল হেরি বিদ্রোহ-অনল  
জালিয়াছে, বধিতেছে সমগ্র মোসলেমে ।  
সেই রাজদ্রোহীদের অস্পৃশ্য শোণিতে  
নিভাইব সে অনল, — রক্ষিব উল্লামে ।  
অতথা এ দস্যাদল বধিয়া সম্রাটে  
কাড়ি ল'বে সিংহাসন, ত্রোপের অনলে  
পবিত্র মসজিদ গুলি চূর্ণ চূর্ণ করি  
তুলিবে সে ভূমে কত দেবতা মন্দির ;  
কোন্ মুসলমান বল পাষণ ছদয়ে  
হেরিবে সে পাপ-দৃশ্য মুহূর্ত্তের তরে ?  
অমনি ভীষণ স্বরে কহিল নাসির \*  
“ইহাদের গুরুশ্রেষ্ঠ পাষণ্ড শিবাজী  
নিশাকালে গুপ্তভাবে তৎকারের মত  
নবাব সায়েস্তা খাঁর আবাস-ভবনে  
প্রবেশিয়া বিনা যুদ্ধে করেছিল হত্যা  
প্রাণাধিক পুত্র তার, তারি বংশধর  
পাপিষ্ঠ কাফের বুল, সুবিধা পাইলে  
এরা যে মোসলেম রাজ্য করিবে না ধ্বংস  
কি বিশ্বাস তার ? এরা নিশ্চয় ভারতে  
আজি হ'ক, কালি হ'ক কিম্বা বহু পরে •

ধ্বংসিয়া মোসলেম রাজ্য করিবে স্থাপন  
হিন্দু রাজ্য ; অতএব সম্মুখ সমরে  
ধ্বংসিয়া বক্সরকূলে মোসলেম সাম্রাজ্য  
দৃঢ় করি পুনর্বার কর সংস্থাপন ।”  
আবার ভীষণ স্বরে গজিল নজীব  
“সময় থাকিতে হবে হও অগ্রসর  
রক্ষিতে ইসলামধর্ম, স্বজাতি স্বগণ, —  
—রক্ষিতে সে ভারতের স্বর্ণ সিংহাসন  
মুহূর্ত্তের তরে আমি ডরি না কাহারে,  
হ'ক কোটি কোটি শত্রু, যক্ষ রক্ষ নর  
আশুক সমর-ক্ষেত্রে, ভয় কি আমার,  
নহি কাপুরুষ আমি, ধর্মের সমরে  
মত্ত আমি, কোরাণের শুভ আশীর্বাদ  
লইয়া মস্তক' পরে, খুলেছি কৃপাণ,  
—রাখিব না কোষে আর, নিশি দিন সন্ধ্যা  
এ বাহু প্রস্তুত মম ধ্বংসিতে কাফেরে ।  
ধর্মের বিধান ইহা— সব শাস্ত্রে আছে  
যে জাতি হউক রাজা, পিতৃ তুল্য তারে  
মানিবে, আদেশ তার করি পালন  
সতত, পূজিবে তারে ভক্তির কুশুমে ;  
হ'ক না সে ভিন্ন জাতি, কি ক্ষতি তাহাতে ?  
মহারাষ্ট্র দস্যাগণ দলিয়া চরণে  
এই নীতি, প্রজা হ'য়ে রাজার বিরুদ্ধে  
করি সবে বড়যন্ত্র ধরেছে কৃপাণ ।  
প্রজা হ'য়ে ভারতের নগরে নগরে  
জালিয়াছে বিদ্রোহের ভীষণ অনল ।  
অতএব হে মোসলেম এস রণক্ষেত্রে  
ধ্বংসিব সে রাজদ্রোহী পাষণ্ড সকলে ।”  
অমনি গজীব স্বরে কহিল মোরাদ †

\* নাসির খাঁ বেগোজী, মুসলমান গভীর একজন সেনাপতি ।

† একজন মুসলমান সেনাপতি ।



“অবশ্য সন্মুখ যুদ্ধে পাশও সকলে  
না ধ্বংসিলে মোস্লেমের নিশ্চয় পতন।”  
মুহুস্তে নজিবদৌলা গর্জিয়া আবার  
“না ধ্বংসিলে কেন? যুদ্ধে অবশ্য ধ্বংসিব’  
অবশ্য মোস্লেম-ভাগ্য করিব পরীক্ষা  
রণস্থলে এ ভীষণ উলঙ্গ কৃপাণে।”  
মুহুস্তে ভীষণ অসি উঠিল বলিয়া  
বিছাডের মত সেই নজিবের করে।  
“আমারো ইহাই মত” সুগভীর স্বরে  
কহিল দোরানী সাহা কাবুল-ঈশ্বর  
“মহারাজ্ঞি আক্রমণেরা বিশ্বাস-ঘাতক,  
হলনা চাতুরী নিত্য নৈমিত্তিক কার্য  
ইহাদের, নরহত্যা দম্ভাতা ভীষণ  
ধর্ম কার্য বলি গণে এমন বকব’র।  
ইসলাম-বিদ্বেষী, ঘোর নিষ্ঠুর হৃদয়,  
ধর্ম কার্যে ক্ষণ তরে নাহি অনুরক্তি,  
সদা পাপ-পথে মতি, ঘোর পৌত্তলিক,  
ভ্রমেও ঈশ্বর-কথা কবে না শ্রবণ;  
এমন বকব’র বৃন্দে যে করে বিশ্বাস,  
সেও মূর্খ, এই বেলা সন্মুখ-সংগ্রামে  
না ধ্বংসিলে, মহারাজ্ঞি বিজয়-কেতন  
উড়িবে ভারত-বক্ষে বিপুল বিক্রমে  
ধ্বংসিয়া মোস্লেম-শক্তি জনমের মত।”  
নীরুবিলা বীর শ্রেষ্ঠ, মুহুস্তের পরে  
আবার ভীষণ স্বরে কহিল গর্জিয়া  
“ছিঁড়ে ফেল সন্ধিপত্র, সন্মুখ সমরে  
মোস্লেমের ভয় ভাগ্য করিব পরীক্ষা  
তরবারে, বিচূর্ণিরা কাকের বকব’রে;  
কিংবা বীর-বেশে আমি বীরেন্দ্রের মত  
শুইব সমর-ক্ষেত্রে এ জন্মের স্বরে।”

“অবশ্য” গভীর ভাবে কহিল আবার  
বীরেন্দ্র নজিবদৌলা “সব মুসলমান  
বাধ্য আজি প্রাণ দিয়া এ ধর্ম-সমরে  
রক্ষিতে ইসলাম ধর্ম, রক্ষিতে স্বজাতি,  
রক্ষিতে জননী ভগ্নী জীবন-সজিনী।  
সাধিতে কস্তব্য যদি এ জীবন যায়  
ভিল মাত্র নাহি ছুখ, জন্মিলে মরণ  
বিধাতার অনিবার্য অখণ্ড লিখন।”  
“সত্য বটে,” ভীম স্বরে কহিল আদালী  
পুনর্ব্বার, “এ ভারতে যে আছে যেখানে  
মোগল পাঠান সেখ সৈয়দ আকগান  
শিয়া সুন্নি, দীন ধনী সব মুসলমান  
কি আমি কি নবাব কস্তব্য সবার  
মিশিতে সসৈন্তে আজি এ ধর্ম-সমরে  
আমার এ সৈন্ত সই ভীষণ বিক্রমে।  
সম্রাটের মন্ত্রি পদে সুজা অধিষ্ঠিত  
সে যদি সসৈন্তে মিশে পেশবার সনে।  
বিষম অনর্থ তবে ঘটবে দিশ্চয়।  
অতএব প্রথমেই আনিতে তাহারে  
সপক্ষে কস্তব্য মম, কিন্তু সুজাউদৌলা  
নাহি বিশ্বাসিবে মোরে, বহু দিন গত  
এ ভারত আক্রমণ করেছিল যবে  
মহাবলে, আমার সে ভীষণ বিক্রমে  
কে আঁটিত, যদি এই সুজার জনক  
না রোষিত গতি মম, শুক তৃণ প্রায়  
দক্ষিণাম আমি সবে তোপের অনলে।  
অতএব নিজ পক্ষে আনিতে তাহারে  
করগে উত্তোগ এবে, অপরের দ্বারা  
হবে না সমাধা ইহা, কস্তব্য তোমার  
যাইতে অযোধ্যা দেশে, তুমি ভিন্ন আর

এ কার্যের উপযুক্ত নহে কোন জন ।  
 এ যুদ্ধের মূল তুমি, তোমারি উপরে  
 এ যুদ্ধের ফলাফল করিছে নির্ভর ।  
 অশ্রান্ত ?—দর্শক বই নহে কোন জন  
 যুদ্ধার্থী, ইহারা শুধু হুজুগের দাস ।  
 তোমারি দায়িত্ব বেশী, তুমি সাবধানে  
 প্রতি পদে ধীরে ধীরে হও অগ্রসর ;  
 অশ্রদ্ধা সকল যত্ন যাইবে বিফলে ।”  
 “অবশ্য যাইব আমি” অতি দৃঢ় স্বরে  
 কহিল। নজিবদৌলা “এ ধর্ম সমরে  
 মরিলে রহিবে কীর্তি, স্বর্গের দ্বার  
 খুলিয়া যাইবে তবে অভাগার তরে ।  
 বাচিলে মোস্লেম রাজ্য করিব স্থাপন  
 দৃঢ় ভাবে, অপহৃত জাতীয় গৌরব  
 লইব কাড়িয়া বধি কাফেরতঙ্করে ।  
 আমিও শুনেছি মম গুপ্তচর মুখে  
 অত প্রাতে, সদাশিব আনিতে সপক্ষে  
 নবাব সুজারে, নারুশঙ্কর \* বক্সরে  
 পাঠাইয়াছিল সেই অযোধ্যা প্রদেশে ।  
 সেও নাকি ক্ষুণ্ণ মনে এসেছে ফিরিয়া ;

\* মহারান্টি পক্ষের কাম্ৰচারী

মোস্লেম বিরুদ্ধে সুজা ধরিবে না আমি  
 সুনিশ্চিত, তবু কিন্তু কর্তব্য মোদের  
 আনিতে সপক্ষে তারে, কেননা এ যুদ্ধ  
 ইসলাম ধর্মের যুদ্ধ—নহে বাস্তবিকত,  
 এ যুদ্ধে প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে নিহিত  
 সমগ্র মোস্লেম-স্বার্থ, এ নহে সামান্য,  
 এ যুদ্ধের ফলাফলে করিছে নির্ভর  
 ভারতীয় মোস্লেমের উত্থান পতন ।  
 যা'ক তা', সে সব কথা কি হবে ভাবিলে ?—  
 —যা আছে অদৃষ্টে হ'বে, সময়-প্রাকণে  
 মোস্লেমের ভগ্ন ভাগা হবে পরীক্ষিত  
 এইবার, কিন্তু ভিক্ষা সন্ধির নিগড়ে  
 নাহি বাঁধিবেন তারে, তা হ'লে নিশ্চয়  
 মোস্লেমের সব আশা যাইবে ডুবিয়া  
 এ জন্মের মত হায় অতল সাগরে ।”  
 হেন কালে সুধাশ্বরে মাতায়ে ধরনী  
 মাতায়ে মোস্লেম দলে বীরেন্দ্র সকলে  
 আকালীর নহবত উঠিল বাজিয়া  
 ছাউনির প্রান্তদেশে গজার পুলিনে ।

## তৃতীয় সর্গ

[ দিল্লীর প্রান্তদেশ;—মহারাক্ষ্ট শিবির ]

গভীরা যামিনী ; স্তব্ধ দিকদিগন্তের  
সুন্দর প্রকৃতি, ধরা গভীর নীরব !  
মারাঠা শিবির শ্রেণী দিল্লীর নিকটে  
শোভিতেছে স্তরে স্তরে ক্ষুদ্র শৈল প্রায় ।  
এক পার্শ্বে কিছু দূরে একটি শিবিরে  
বসিয়া পর্য্যট' পরে এতাদৃশ কাণ্ড  
নত আঁখি, পার্শ্ব দেশে একটি রমণী  
দাঁড়াইয়া যুক্ত করে করিছে কাতরে  
“হে বীরেন্দ্র ! তব পদে এ মম মিনতি  
প্রগল্ভতা কমা চাই—আমি দানী তব !  
তোমার সে অর্দ্ধাঙ্গিনী জোহরা বেগম  
প্রভু মম, আসিয়াছি তাহারি আদেশে !  
জোহরা বিনীত ভাবে ব'লেছে তোমারে  
হিন্দু পক্ষ ত্যাগিয়া মোস্লেমের সনে  
মিলিতে—যুঝিতে রণে স্বধর্মের তরে !  
মোস্লেম হইয়া তুমি ইসলাম-বিক্রমে  
কেমনে ধ'রেছ অপি ? ঘৃণা নাহি তব,  
এ কেমন ব্যবহার ? জোহরা বেগম  
দ্বিত্য দিয়া অনুরোধ করেছে তোমারে  
ভুক্তিতে হিন্দুর পক্ষ ; পদাশ্রিতা দাসী  
সে তোমার—তুমি তার আরাধ্য দেবতা !  
স্বামী হ'য়ে অনুরোধ রাখিবে না তার ?  
সে তোমারে ভালবাসে প্রাণের সমান,  
তোমা ভিন্ন অস্ত কিছু জানে না বেগম  
এ জীবনে, মিশিদিন তোমারি চিন্তায়  
বিমলিন, হাসিটুকু নাহি মুখে তার,  
করে অশ্রু অনিবার, তোমার বিচ্ছেদে

অলিছে হৃদয়ে তার অনল ভীষণ ।  
বহুদিন তুমি তারে এসেছ ছাড়িয়া,  
কি হুঃখ, আজিও তা'রে দিলেনা দর্শন ।  
এ কেমন ব্যবহার ? নিজ ভাৰ্য্যা ব'লে  
এতটুকু স্নেহ তব হ'লনা কি মনে ?  
অতএব এ মিনতি রাখ তুমি এবে,  
ছাড় এ মারাঠা পক্ষ, বীর হ'য়ে তুমি  
কেমনে বধিছ বল দয়িতা আপন ?  
—সে তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী, হৃদয়ের রাণী,  
নারী বধে মহাপাপ, এ কথা কি তুমি  
ভুলে গেছ ? কোন্ প্রাণে বল দেখি তবে  
এহেন নিষ্ঠুর কার্য্য করিছ সাধন ?  
কোন্ শাস্ত্রে হে বীরেন্দ্র আছে হেন বিধি  
যার বলে তুমি আজি নৃশংসের প্রায়  
আপন পত্নীর প্রাণ করিছ হনন !  
জগতের কোন্ বীর জায়া'রে আপন  
বধিয়াছে হেন ভাবে ? নাই কি মমতা  
তব ও হৃদয়ে,—তুমি নহ কি মানব ?  
মোস্লেম সন্তান তুমি—কাফেরের দাস,  
কাফেরের অঙ্গজলে শরীর তোমার,  
ছি ছি ছি এ কথা হৃদে হইলে স্মরণ  
ভাসে চক্ষু অশ্রু জলে, শ্রায় অশ্রায়  
চিনেও চিন না তুমি, কোরাণের বিধি  
নাহি মান, কি উত্তর প্রদানিবে তুমি  
বিধাতার সমীপে সেই বিচারের দিন ?  
মোস্লেম হইয়া তুমি কাফেরের অঙ্গ  
খাইতেছ, বহিতেছ পাহুকা তাহার,

কোরাণের কোন্ স্থানে আছে এ বিধান ?  
 অতএব বীরবর মিনতি ও পদে  
 ছাড় তুমি হিন্দু পক্ষ, নহিলে নিশ্চয়  
 ভূবিষে তোমার পত্নী কালের সাগরে  
 চির তরে ; অতএব অনুরোধ তার  
 রাখ তুমি, বধিও না হুঃখিনী বেগমে ।”  
 উত্তরিলো এব্রাহিম “বৃথা বাক্য ব্যয়ে  
 অমূল্য সময় নষ্ট করিও না মম,  
 আমার কর্তব্য আমি ভালরূপে জানি ;  
 তুমি কেন অনর্থক বৃথা আলাপনে  
 আমার হৃদয়ে কষ্ট করিছ প্রদান ?  
 যাও তুমি, বল যে’য়ে বেগমে তোমার  
 সে কেন কঠিন প্রাণে হুঃখ দেয় মোরে ?  
 আমি স্বামী, সে আমার প্রাণের সজিনী,  
 সে কেন আমার কাছে নাহি আসে তবে ?  
 কত পত্র লিখেছিলাম আসিতে তাহারে ;  
 নিজেও তাহার কাছে যেয়ে কতবার  
 কত অনুনয় করে বলেছিলাম তারে,  
 তবুও সে আসিল না আমার নিকটে ।  
 এই কি সত্যের ধর্ম ? পতি-পদ-তলে  
 জানে না সে স্বর্গ তার ? তবু’কেন সদা  
 বিচ্ছেদের তীক্ষ্ণ বাণে দহিছে আমারে ।  
 যাও তুমি পুনর্ব্বার বল যে’য়ে তারে  
 আসিতে আমার কাছে, প্রাণের সমান  
 ভালবাসি তারে আমি, সে যেন আমারে  
 নাহি বধে হেন রূপ বিচ্ছেদের বাণে ।”  
 নীরবিলো এব্রাহিম, উত্তরিলো দাসী  
 “বীরবর, সেও তোমা প্রাণের অধিক  
 বাসে ভাল, কিন্তু তুমি মোস্লেম হইয়া •  
 কাকেরের অনুরাগত, তাই মন-খেদে

বেগম তোমার কাছে নাহি আসে এবে ।  
 দাসী আমি অপরাধ কমিও আমার ;  
 বেগমের অনুরোধ—দয়া করে তুমি  
 ছেঁড়ে দেও হিন্দু পক্ষ, তোমার বিচ্ছেদে  
 অর্জয়তা সে এখন, ধর্ম বিগর্হিত  
 কার্য্য করি, কেন তারে বধিছ জীবনে ?  
 বিধর্মীর পক্ষ ছেড়ে, বীর ঞ্জিষ্ঠ তুমি,  
 ইসলামের পক্ষে ধরি স্মৃতিস্ত কৃপাণ  
 ভাসাও কাকের রক্তে সমগ্র ধরণী ।  
 অবশ্য বেগম মম ভক্তির কুশ্রমে  
 পূজিবে তোমারে শূর দিবস যামিনী ।  
 তুমি তার এক মাত্র আরাধ্য দেবতা  
 এ জগতে, সে কি তোমা পারে ভুলিবারে ?”  
 এব্রাহিম রুদ্ধ ভাবে উঠিলো গর্জিয়া  
 “পুনর্ব্বার সেই কথা ? কেন বার বার  
 সেই এক কথা বলি হৃদয় আমার  
 করিতেছ অর্জরিত ? জান না কি তুমি  
 পেশবার ভৃত্য আমি, যেই দেহ মম  
 তাহারি লবণ খে’য়ে হ’য়েছে বর্জিত,  
 —তাহারি স্বার্থের তরে সেই দেহ মম  
 সম্মুখ সমরে আমি করিব বিনাশ ।  
 মোস্লেম সন্তান আমি, নহি ধর্মজোহী,  
 প্রভুর বিপক্ষে আমি ধরিব না অসি  
 এ জীবনে, নহি আমি কৃত্রিম অধম,—  
 —নিমক হারাম নহি, লবণের ধার  
 আমার এ ভূজধর—প্রতি রক্ত-কণা  
 তাহারি স্বার্থের লাগি যুঝিয়া সমরে  
 শোধিবে বীরের মত,—দিব এ জীবন !  
 নাহি আমি কাপুরুষ কাণ্ডুক বর্ব্বর  
 ভুলিব রমণী প্রেমে কর্তব্য আপন ।”

অগত্যা মলিন মুখে প্রেমিয়া তারে  
 মুহূর্তে কুলসুম বাদী করিল প্রস্থান ।  
 এতাহিম কিছুক্ষণ বিবগ্ন হৃদয়ে  
 প্রস্তরের মূর্তি প্রায় রহিল বসিয়া  
 সেই স্থানে, হৃদে তার টকা ভীষণ  
 বহিতে লাগিল, প্রাণ প ডল ভাঙ্গিয়া ;  
 ভাবিতে লাগিল। পুনঃ “হ’ক তারা পানী,  
 হ’ক তারা রাজজোহী কাকের অধম,  
 তথাপি—তথাপি তারা অন্নদাতা মোর  
 তাহাদেরি অন্ন খেয়ে এ দেহ আমার,  
 —কেমনে বিপক্ষে আজি ধরিব এ অসি  
 তাহাদের ? আমা হ’তে হ’বেনা সে কাজ  
 বরং বীরের মত সন্মুখ সমরে  
 তাহাদের স্বার্থ লাগি প্রাণের শোণিতে  
 সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব বিধান ।  
 জোহরারে প্রাণাধিক ভালবাসি আমি  
 সেও মোরে ভালবাসে প্রাণের সমান ;  
 কিন্তু কি করিব, এই পার্থিব জীবনে  
 অসম্ভব, আমাদের হ’বে না মিলন ।  
 আমাদের ভালবাসা পবিত্র নির্মল,  
 কামনা কলুষ ছাড়া স্বর্গীয় রতন,  
 নহে তাহা কামকের প্রেমের পিপাসা  
 ইন্দ্রিয় ভোগের জন্ত ; বিধির কণায়

লারলি-মজবুর মত জিদিব-উচ্চানে  
 জোহরার সনে যম হইবে মিলন ?  
 স্বপক্ষে পতিত আমি, অদৃষ্টের দোষে  
 মোস্লেম বিপক্ষে অসি করিয়া ধারণ  
 শত অপরাধী আমি, উদ’রার তরে  
 পেশবার সেবা ব্রত করেছি গ্রহণ ।  
 তাহারি লবণ খেয়ে যে দেহ আমার  
 হ’য়েছে বর্জিত, তাহা ইসলাম সেবার  
 নহে উপযোগী, হি হি কোন্ মুখে আমি  
 সে দেহ লইয়া যাব মোস্লেম সমাজে ?  
 সে দেহ প্রভুর কার্য্যে করিয়া বিনাশ  
 পবিত্র আত্মাটি শুধু লইয়া আনন্দে  
 জোহরার সনে স্বর্গে হইব মিলিত ।  
 অগদীশ, তুমি মোরে দাও পদাশ্রয়,  
 দেও বল এ হৃদয়ে, সন্মুখ সমরে  
 এই পাপ দেহ যেন করিয়া বিনাশ  
 তোমারি চরণ প্রান্তে হই উপনীত,  
 তুমি বিনে অভাগার কে আছে সহায় ।”  
 নীরবিলা বীর ঐষ্ঠ ; বিহগ নিচয়  
 হেনকালে বনপ্রান্তে উঠিল গাইয়া  
 ভজন সজীত স্ব স্ব সুমধুর স্বরে  
 জাগায়ে প্রকৃতি দেবী ; প্রভাত-পবন  
 বহিল চুড়িয়া চারু কুসুমের কলি ।

## চতুর্থ সর্গ

[ অযোধ্যা নগরীর প্রান্তদেশ ; স্বৰূপ নদীর তীর ; সুজাউদৌলার প্রবোধ-কানন ]

এই কি সে মহামতি রামের অযোধ্যা ?  
 এই সেই মহাতীর্থ—এই স্থানে সেই  
 যুজ্জিষ্ঠ রামচন্দ্র জনকীর সনে  
 ধরেছিল অভিনয় ? অমূল্য লক্ষণ  
 এই স্থানে জনকীর চরণ যুগল  
 প্রকালি নয়ন-জলে নিয়াছিল হায়  
 সুদীর্ঘ বিদায়, যেতে অগ্রজের সনে  
 বনবাসে শিখাইয়া সমগ্র জগতে  
 অকৃত্রিম ভ্রাতৃত্বের মধুর কেমন ।  
 এই স্থানে রামচন্দ্র খুলি রাজ বেশ  
 ধরেছিল ছিন্ন করী ? এই স্থানে হায়  
 জনক নন্দিনী সীতা চির অভাগিনী  
 খুলি রাজ আভরণ, তিতি অশ্রু নীরে  
 চলেছিল পতি সনে গহন কাননে ।  
 এই স্থানে কেঁদে কেঁদে শ্রদ্ধা মাতা তার  
 বলেছিল কত কথা, কত প্রতিবেশী  
 দিয়াছিল কত বাধা, তথানি হুঃখিনী  
 না শুনিয়া সেই বাধা গিয়াছিল বনে,  
 স্বামী সঙ্গে পা হুখানি পূজিতে তাহার  
 প্রান্ত হবে ; এই স্থানে অমূল্য লক্ষণ  
 তাজি রাজ-তোগ হায় গিয়াছিল বনে  
 ভ্রাতা ভ্রাতৃ-বধু সনে রক্ষিতে তাদের  
 বনবাসে শত্রুদের ভীম আক্রমণে ।  
 সেই নিদারুণ দৃষ্টে, কাতর ক্রন্দনে  
 রমণী-কণ্ঠের সেই ঘোর আর্তনাদে  
 কি যে এক মর্মভেদি দৃশ্য সাক্ষর  
 হয়েছিল অভিনীত, স্মরিলে সে কথা

গভীর বিষাদে ডুবে বাজালীর মন ।  
 আবার সুদীর্ঘ কাল করিয়া ভ্রমণ  
 বনে বনে, বহুকষ্টে রাক্ষস-কবলে  
 উদ্ধারিয়া সীতা, রাম এঁসেছিল যবে  
 এই অযোধ্যায়, হায় কি আনন্দ রোল  
 হ'য়েছিল সমুখিত, কি দৃশ্য তখন  
 হ'য়েছিল প্রদর্শিত প্রতি ঘরে ঘরে ।  
 লোক-অপবাদ ভয়ে আবার যখন  
 নিষ্পাপা সীতারে রাম ব্যথিত হৃদয়ে  
 দিয়াছিল বনবাস, বিচ্ছেদ সীতার  
 ধরেছিল কি করুণ দৃশ্য মর্মভেদি  
 এহ পুরী, ঘরে ঘরে নর-নারী-কণ্ঠে  
 উঠেছিল কি দারুণ হাহাকার ধনি ।  
 বহুদিন পরে পুনঃ বাল্মীকি যখন  
 এঁনেছিল হুঃখিন র রাম-সন্নিধানে,  
 সে তপস্বিনী বেশ কাতর নয়নে  
 সেই শোক-অশ্রুজল, বিষন্ন বদন,  
 সেই জীর্ণ শীর্ণ দেহ, কি ঝড় ভীষণ  
 তুলেছিল রামের সে মরুময় প্রাণে ।  
 অতীতের কত স্মৃতি জাগিয়া তখন  
 হৃদি মাঝে করেছিল কি ঘোর দংশন ।  
 হা অদৃষ্ট ! বিধাতার ভবিষ্য লিখন  
 ক পারে খণ্ডাতে তবে কে আছে এমন ?  
 কর্তব্যের অমুরোধে রত্নকুল-রবি  
 রামচন্দ্র সাক্ষনেতে বলেছিল যবে  
 হুঃখিনী সীতার দিতে পরীক্ষা বিষম ।  
 তুনি সে কঠোর আজ্ঞা সজল নয়নে



অভাগিনী সীতা হার পড়েছিল। ক্রমে  
 সংজ্ঞাহীনা, সে দলিত সুবর্ণ-কুমুদ  
 জলবুদ্বদের মত চক্কের নিরিখে  
 মিশে গিয়াছিল এই মুক্তিকার সনে ।  
 চারিদিকে কি করুণ হাহাকার ধ্বনি  
 উঠেছিল, কেঁদেছিল আকুল হৃদয়ে  
 সমগ্র ভারতবাসী, গগনে কিয়র  
 করেছিল পুষ্প বৃষ্টি ; পুত্র লব কুশ  
 মা মা বলে উঠেঃ করে কেঁদেছিল। কত ।  
 সেই অশ্রুবিন্দু, ছায় সে বিলাপ-ধ্বনি  
 কি এক যাতনা পূর্ণ শোক-প্রত্যয়  
 ফুটাইয়াছিল সেই রামের হৃদয়ে !  
 বিবাদে স্তম্ভিত রাম, স্বর্ণ সিংহাসন  
 ত্যাগিয়া, ভেঁসেছিল। শোক-অশ্রুণীরে ।  
 এই কি অযোধ্যা সেই ? এই সে সরযু—  
 —যে সরযু রাম-কীৰ্ত্তি গাইয়া সতত  
 বেড়াইছে দেশে দেশে ? হুঃখিনী সীতার  
 শোক হুঃখ পরিপূর্ণ সারা জীবনের  
 অশ্রুরাশি মিশিয়াছে যার নীল নীরে ?  
 এই সে সরযু ?—এই সরযুর জলে  
 ডুবেছিল। রামানুজ শ্রমিত্রা-বন্দন ?  
 এই সরযুর বুকে—এই নীল জলে  
 নীল পঙ্কজের মত ডুবেছিল। হার  
 রামচন্দ্র আধারিয়া সমগ্র ভুবন।  
 “হা রাম হা সীতে” ব’লে ব্যথিত হৃদয়ে  
 এই সরযুর তটে কেঁদেছিল। হার  
 সমগ্র অযোধ্যাবাসী নর নারী ।  
 এই কি সরযু সেই—এই সে তটিনী ?  
 সে রাম সে সীতা নাই, নাই সে লক্ষণ  
 নাই সে পুরবাসী, আছে শুধু হেথা

অতীতের সাক্ষী সেই-সরযু এখন ।  
 আর সেই শোক-স্মৃতি মাথিয়া হৃদয়ে  
 মরুপ্রায় উদাসিনী অযোধ্যা নগরী ।  
 অভাগা ভারতবাসী আজিও এখানে  
 অযোধ্যার প্রান্তে প্রান্তে সরযুর তটে  
 “হা রাম হা সীতে,” ব’লে করিছে রোদন ।  
 সেই হাহাকার-ধ্বনি প্রকৃতির প্রাণে  
 কি এক শোকের চিত্র করিয়া অঙ্কিত  
 নিরাশ্রয় বিপন্নের ঘোর মন্যভেদী  
 বিলাপ-ধ্বনির মত যাইছে মিশিয়া  
 আকাশের দূর প্রান্তে শূন্ডের সাগরে ।  
 এই কি অযোধ্যা সেই ?—এই সেই পুরী ?  
 রামের অতীত স্মৃতি, জানকীর অশ্রু,  
 লক্ষণের ভ্রাতৃ-স্নেহ জড়িত বেখানে  
 অহে অহে,—এই সেই অযোধ্যা নগরী ?  
 বিহগের কল কণ্ঠে, বায়ুর নিশ্বনে  
 ধ্বনিত সতত সেই করুণ-সঙ্গীত  
 জলে স্থলে শূন্ডে এই অযোধ্যা নগরে !  
 আর সেই শোকময়ী সরযু তটিনী  
 অযোধ্যার পাদদেশে করিয়া বিধৌত  
 কেঁদে কেঁদে যান মুখে যাইছে বহিয়া ।  
 সেই কুলু কুলু শব্দে, বিবাদ সঙ্গীতে  
 রামের অতীত স্মৃতি, হুঃখিনী সীতার  
 দীর্ঘশ্বাস যেন ছায় রয়েছে মিশিয়া ।

সেই অযোধ্যার, সেই সরযুর তীরে  
 অই যে পুষ্পিত কুঞ্জ, মুখরিত সদা  
 কল-কণ্ঠ বিহগের মধুর সঙ্গীতে ।  
 সেই লতাকুঞ্জে, অই বকুলের তলে  
 শিলাসনে সমাসীন অযোধ্যা-সৈবর

সুজাউদ্দৌলা মোস্লেমের জীবন্ত খোরব ।  
 বাম পার্শ্ব কাঠামনে বলিয়া নীরবে  
 বীরেন্দ্র নজিবদৌলা রয়েছে চাহিয়া  
 সুজা পানে, উর্ধ্বদেশে বকুল-বিভানে  
 নিলজ পাণিয়া এক থাকিয়া থাকিয়া  
 গাইতেছে “পিউ-পিউ,” সে স্বর তরল  
 হু’লেছে কি প্রতিধ্বনি সে বনপ্রদেশে ।  
 কিছুকণ পরে সুজা গভীর বদনে  
 কহিল। “যেহিঁদিঘাটে বলেছি সে দিন  
 আমার সমস্ত কথা, এ সঙ্কট-কালে  
 যাইব না কোন পক্ষে, নিরপেক্ষ ভাবে  
 থাকিব এখন আমি ; এই ত সে দিন  
 এ’সেছিল পেশবার দূত একজন  
 অযোধ্যার, তাহারেও এই কথা বলি  
 দিয়াছি বিদায়, আজি তুলিয়া সে কথা  
 কেমনে আকালী সনে হইব মিলিত ?  
 বিশেষতঃ সে আমার নহে স্বদেশীয়,  
 দূরদেশী অজানিত কুটিল প্রকৃতি  
 দোরানী সাহার সনে মিলিয়া কি’শেবে  
 প্রতি পদে পদে আমি হইব লাহিত ?  
 আমা হ’তে হ’বে না তা, কিরে যাও তুমি  
 বীরবর, বল যেয়ে দোরানী সাহারে  
 পেশবা বিপক্ষে আমি ধরিব না অসি  
 রণক্ষেত্রে, বিশেষতঃ জয় পরাজয়  
 অনিশ্চিত, পরাজয়ে বিষম বিপদ  
 আমাদের, আকালীর কোন্ কতি বল ?  
 বিদেশী সে, নিজ দেশে যাইবে চলিয়া ;  
 আমাদের পদে পদে বিষম বিপদ  
 হ’বে শেষে, এ বিপ্লবে যাইব না আমি  
 অনর্থক শত্রু সংখ্যা করিতে বর্জন।” •

নীরবিলা সুজাউদ্দৌলা, বীরেন্দ্র নজীব  
 কিছুকণ মৌনভাবে রহিল। বলিয়া ।  
 নীরব নিকুঞ্জ বন, শুধু দূর প্রান্তে  
 ছ’ একটি বন পাখী বসি তরু শিরে  
 বরষিছে থেকে থেকে সুস্বর-লহরী  
 জাগাইয়া প্রতিধ্বনি সে নির্জন বনে ।  
 অনেক চিন্তার পরে সুগভীর স্বরে  
 বলিল। নজিবদৌলা “দস্যু সদাশিব  
 শত্রু মোর, নিরাপদ কোথায় আমার ।  
 আজি হ’ক কালি হ’ক নিশ্চয় সে মৃত  
 একদিন যুগপাত করিবে আমার ।  
 আমি কেন—ভারতীয় সমগ্র মোস্লেম  
 শত্রু তার, অবসর পাঠবে যখন  
 নিশ্চয় ধ্বংসিবে পাপী সমগ্র মোস্লেমে ।  
 কি আশ্চর্য্য, আপনি কি ভেবেছেন মনে  
 বিধর্মী তত্ত্বগণ করিবে না কতি  
 আপনার ?—অম তাহা, নিশ্চয় তাহার।  
 ধ্বংসিয়া ইস্লাম শক্তি, সমগ্র ভারতে  
 উড়াইবে মহারাষ্ট্র-বিজয় কেতন ।  
 আপনার পূজনীয়া জমনী বেগম  
 বড় বুদ্ধিমতী, তিনি অবশ্য মোদেরে  
 দিবেন সুপরাশ্রম, চলুন আমরা  
 জিজ্ঞাসি তাঁহারে, তিনি কি বলেন শুনি ।”  
 “তাল, তাই হ’ক ভবে,” বলিল। নবাব  
 সুজাউদ্দৌলা, উভয়েই উঠিয়া তখন  
 চলিল। প্রাসাদ পানে, গভীর চিন্তায়  
 নজিবের চিত্ত যেন সতত অস্থির ।  
 প্রবেশিল। হু’জনেই প্রাসাদ ভিতরে,  
 মরি কি সুন্দর দৃশ্য মর্ম্মরে গঠিত  
 অট্টালিকা, অত্যন্তরে লতাপাতা কুল

নামা বর্ণ সুরঞ্জিত ধবল প্রাচীরে ।  
 একপার্শ্বে মন্দিরের পর্য্যন্ত উপরে  
 সুবর্ণ খচিত শর্যা, সম্মুখে তাহার  
 সুবর্ণ-মণ্ডিত ছুটি মন্দির আসন ।  
 অস্ত পার্শ্বে মনোহর চাকু যবনিকা  
 মকমল নির্মিত স্বর্ণে খচিত সূন্দর ।  
 ধীরে ধীরে সূজাউদ্দৌলা বসিলা নীরবে  
 সেই পর্য্যন্তের পরে, সুবর্ণ আসনে  
 বসিলা নজিবদ্দৌলা বীর কুলধ্বজ ।  
 আদেশিলা সূজাউদ্দৌলা খোজা অমুচরে  
 ডাকিয়া আনিতে তার জননী বেগমে ।  
 যুহুর্ন্তেক অস্তঃপুরে প্রবেশিয়া খোজা  
 প্রধানা দাসীয়ে ডাকি নবাবের আজ্ঞা  
 জানাইল, পাঠাইতে অগৌণে তখনি  
 নবাবের কাছে বৃদ্ধা জননী বেগমে ।  
 অণ পরে রাজ মাতা বসিলা আসিয়া  
 যবনিকা পাশে সেই প্রাসাদ ভিতরে ।  
 সন্তোষে নবাবে ডাকি কহিলা জননী  
 “কেন বাছা অসময়ে ডেকেহিস্ মোরে ?”  
 সসম্মুখে সূজাউদ্দৌলা বসিলা মায়েরে  
 “বিষম সঙ্কটে আজি পড়েছি জননী ।  
 কেমনে উদ্ধার পাব না দেখি উপায় ।  
 দোরানী সাহ এ ভারতে এসেছে আবার  
 পেশবার সনে তার ভীষণ সংগ্রাম  
 বাধিবে অচিরে, আমি এ মহাসমরে  
 কোন্ পক্ষে থাকিব মা না পারি বুঝিতে ?  
 পেশবা সে দিন এক মহারাষ্ট্রী দূত  
 পাঠাইয়াছিল, আমি বলেছি তাহারে  
 কোন পক্ষে যাইব না ; নিরপেক্ষ ভাবে

থাকিব এ মহাযুদ্ধে ; কিন্তু বুঝা সব  
 এ যে দেখি পদে পদে বিষম সঙ্কট ।  
 দোরানী সাহাৰ দূত এসেছে আবার  
 নিয়া যেতে মোরে সেই সাহাৰ শিবিরে ।  
 এ ঘোর সঙ্কটে মাগো কি করি এখন ?”  
 “কোথা দূত” যুহুর্ন্তেরে সুধাইলা রানী ; \*  
 “এই মা চরণে দাস” বলিলা নজীব  
 সসম্মুখে, বৃদ্ধা রানী কহিলা আবার  
 “কেন বাছা নিতে চাও সূজারে আমার  
 এ ভীষণ যুদ্ধ কালে আদালী-শিবিরে ?”  
 উত্তরিলা সসম্মুখে নজিব আবার  
 “জননী। দেখুন তেঁবে বড়ই দুর্দিন  
 আমাদের, মহারাষ্ট্র তুস্কর নিচয়  
 ভারতীয় মোসলেমের কোমল হৃদয়ে  
 আঘাতিছে বার বার, ঘোর অত্যাচারে  
 কাঁদাইছে ভারতীয় সমগ্র মোসলেমে  
 নিশি দিন, দস্যুদের তীক্ষ্ণ তরবারে  
 সমগ্র মোসলেম আজি কণ্ঠাগত শ্রোণ ।  
 ইষ্ট্রামের চির-শত্রু পেশবা তুস্কর,  
 তারি অস্ত্রে এ বিপুল ভারত সাম্রাজ্য  
 ছিন্ন ভিন্ন, ধরে ধরে ঘোর আর্ন্তনাদ ।  
 দুর্ভিক্ষ পাষণ্ডগণ দিল্লী-সিংহাসন  
 নিয়াছে কাড়িয়া, হায় বিদরে হৃদয়,  
 স্মরিলে সে কথা আজি ধরে হৃদয়ন ।  
 বিধর্মী কাকেরবৃন্দ আক্রমিয়া দিল্লী  
 ভেঙ্গেছে সে মনোহর মন্দির-নির্মিত  
 রাজ-অটালিকা ; কত প্রাসাদ সূন্দর  
 ভগ্ন প্রায়, কামানের গোলা বরিষণে ।  
 হায় সে বর্ষরগণ নৃশংস হৃদয়ে

দরবার গৃহস্থিত চাঁদি বিনির্মিত  
 চত্ৰাভূষণ, বিখচিত বিবিধ রতনে  
 নানা বর্ণ, পুষ্প লতা কুজ কুজ পাখী  
 স্থানে স্থানে, ভয় করি করেছে নির্মিত  
 সপ্ত দশ লক্ষ মুজা, নিয়াছে লুটিয়া  
 সজ্জাটের ধন রত্ন, রৌপ্য-দীপাধার  
 হরিয়াছে নেজামদী \* সমাধি মন্দিরে ;  
 কালি যে তাহার নাহি লুটিবে লখণু  
 কে বলিল ? অবশ্যই পায়ণ্ড সকল  
 আজি দিল্লী, কালি আশ্রা পরশ লখণু  
 লুটিবে, অবশ্য তারা বলে ও কোশলে  
 সমগ্র মোস্লেম রাজ্য ধ্বংসি একে একে  
 হিন্দুর সাম্রাজ্য-ভিত্তি করিবে স্থাপন ।  
 ইহাদের পশু তুল্য ঘোর শৈরাচারে  
 দিন দিন ভারতীয় সমগ্র মোস্লেম  
 উৎপীড়িত ; পথে ঘাটে যেখানে সেখানে  
 মুসলিম রমণী বৃন্দ ঘোর নির্যাতিত ;  
 পায়ণ্ডেরা বেজাঘাত করিছে তাদের  
 হিংস্র পশু প্রায় সদা ধরিয়া স বলে ।  
 এত অত্যাচার মাগো সহিব কেমনে ?  
 —এর চেয়ে শত গুণে মৃত্যু জেয়দর ।  
 তাই মোরা ভারতীয় সমগ্র মোস্লেম  
 মিলি এক সঙ্গে, করি একতা স্থাপন  
 ধ্বংসিব সমুখ যুদ্ধে সমগ্র কাকেরে ।  
 আজি এ নবাব সুল্লা আমাদের সঙ্গে  
 না মিলিলে, যদি মোরা অদৃষ্টের দোষে  
 হই পরাজিত, হায় বলুন জননি  
 ছাড়িবে কি সদাশিব অযোধ্যা-নবাবে ?  
 নিশ্চয় পায়ণ্ডগণ ধ্বংসিয়া অযোধ্যা—

\* নেজামদ্দিন আওজিরা

ধ্বংসিয়া মোস্লেম-শক্তি ভারতের বুকে  
 নতুন রাজত্ব পুনঃ করিবে স্থাপন ।  
 অতএব এ নবাবের কর্তব্য এখন  
 মিলিতে এ ধর্মযুদ্ধে দোরাণীর সনে ।”  
 উত্তরিল। বৃদ্ধাঙ্গী শূন্যস্তীর করে  
 “অবশ্য সুল্লাউদ্দৌলা এ ধর্ম সমরে  
 মোস্লেমের পক্ষে অসি করিবে ধারণ ।  
 নারী আমি—বৃদ্ধা আমি, আবশ্যক হ’লে  
 যাইব সে রণ-ক্ষেত্রে, স্বধর্মের তরে  
 তুচ্ছ গণি আমার এ অনিত্য জীবন ।  
 সুল্লাউদ্দৌলা পুত্র মম, বীরের সম্ভান,  
 সে যদি এ ধর্ম যুদ্ধে নাহি যায় তবে  
 কি কাজ জীবনে তার ? মৃত্যু জেয়দর ;  
 অযোধ্যা-নবাব বংশে কলঙ্ক-কালিমা  
 নারিব দেখিতে আমি থাকিতে জীবন ।  
 অবশ্য যাইব আমি সর্বসঙ্গে সমরে,  
 উল্লাম ধর্মের তরে যুদ্ধি প্রাণপণে  
 ধ্বংসিব কাকের বৃন্দে, অস্ত্রধা নিশ্চয়  
 কামানের গোলা নিয়ে বকের উপরে  
 শুইব সমর ক্ষেত্রে, বীরপত্নী প্রায়  
 হাসিয়া করিব আমি আশ্রয় বলিদান ;  
 অযোধ্যার রাণী আমি, পত্নী সফদরের,  
 কি ভয় আমার সেই কাকের-কুকুরে ?  
 মহারাষ্ট্র কোন্ হার ? সমগ্র পৃথিবী  
 আমার বিপক্ষে যদি ধরে তরবার  
 তথাপি প্রতিজ্ঞা মম প্রাণের শোণিতে  
 রঞ্জিব সমর ক্ষেত্রে, অযোধ্যার রাণী  
 এক পদ না ফিরিবে থাকিতে জীবন ।  
 ইহা যদি নাহি পারি অযোধ্যার রাণী

নহি আমি, নহি আমি পদী সঙ্গের  
 কণ সঙ্গ গণি আমি আমার এ প্রাণ ।”  
 মুহুর্তে মুজাউদৌলা কহিতে লাগিল  
 “কেন মা যাইবে যুদ্ধে থাকিতে এ দাস ?  
 তব আশীর্বাদে মাগো নহে কাপুরুষ  
 মুজাউদৌলা, বিদ্রুমাঙ্গ শোণিতের কণা  
 যতক্ষণ এ হৃদয়ে বহিব জননি,  
 প্রতিজ্ঞা আমার, আমি কিরিব না গৃহে  
 না বধিয়া মোসুলেমের অরাতি সকলে ।  
 বীরের সন্তান আমি, জন্ম বীর-বংশে  
 কৃপাণ সহায় মোর, ডরিব কাহারে ?  
 আশীর্বাদ কর মাগো তব এ সন্তানে,  
 সন্মুখ সমরে যেন ধ্বংসিয়া কাকেরে  
 অযোধ্যা-নবাব-বংশ করি সমুজ্জল  
 অস্তথা বীরের মত যুঝি প্রাণ পণে  
 সন্মুখ সমরে মাগো প্রাণের শোণিতে  
 স্বজাতির হিত ত্রুড় করিয়া সাধন  
 চির নিজা যাই যেন সমর প্রাঙ্গণে” ;  
 “ধন্য বাছা, জগদীশ সহায় তোমার”  
 উত্তরিল নবাবের জননী বেগম  
 ‘আশীর্বাদ করি তোমা, বধিয়া কাকেরে  
 জয়ী বেশে অযোধ্যার আসিও আমার,  
 অস্তথা সমর ক্ষেত্রে নিজা যেও তুমি ।  
 বীর পদী বীর প্রসূ তোমার জননী

অক্ষর দেলে রক্ত করিবে বর্ষণ  
 তোমার সমাধি ক্ষেত্রে, শোকে বদলে  
 প্রতিশোধ লইবে সে বিধর্মী-শোণিতে,  
 যাও বাছা, যাও তুমি দোরানী-শিবিরে,  
 আজি এ ধর্মের যুদ্ধে সমগ্র মোসলম  
 মিলি এক সঙ্গ, শক্তি করিয়া সঙ্গর  
 প্রাণ পণে রক্ত ঘেয়ে জাতীয় গৌরব  
 ধ্বংসিয়া বিজোহীপণে সন্মুখ সমরে ।  
 পরিবার বর্গ তব করিয়া প্রেরণ  
 লখণু নগরে, রাজা বেণী বাহাচ্চরে  
 সমর্পিয়া রাজ্য-ভার, যাও বাছা মুজা  
 নজীবের সঙ্গে তুমি দোরানী-শিবিরে”  
 “জননি ! তোমার আজ্ঞা নিরোধার্থ মম”  
 বলিল মুজাউদৌলা অযোধ্যা-ঈশ্বর ।  
 অমনি নজীবদৌলা স্থাপিল সন্মুখে  
 দোরানী প্রদত্ত এক স্বর্ণ বিমণ্ডিত  
 পবিত্র কোরাণ গ্রন্থ সজ্জি পত্র সনে ;  
 সসজ্জমে মুজাউদৌলা সে পবিত্র গ্রন্থ  
 চুম্বিয়া মস্তক পরে করিল ধারণ ।  
 অদূরে কটক পার্শ্বে সম্রাট প্রদত্ত  
 মধ্যাহ্নের নহবত মাতাইয়া ধরা  
 মধুর বসন্ত সুরে উঠিল বাজিয়া  
 নবাবের জয়ধ্বনি করি বিবোধণ ।

## পঞ্চম সর্গ

[ লখনৌ ; সুজাউদৌলার প্রমোদ কানন ]

এই না সে লখনৌ ? —সুরমা নগরী ।  
 অযোধ্যার রাজধানী ? সৌন্দর্য্য-গৌরবে  
 তুলনা নাহিক যার—আনন্দ সাগরে  
 রহিত ছবিয়া যেই দিবস শরৎকরী ?  
 সঙ্গীতের সুধাধরে, জন-কোলাহলে  
 ছিল সেই মুখরিত, হেরিলে যাহারে  
 কাদে মোস্তেমের প্রাণ, অতীতের স্মৃতি  
 জেগে উঠে হৃদি মাঝে—ঝরে ছনয়ন ?  
 নাই সৌন্দর্য্য তার, নাই সে গৌরব,  
 নাই তার মুখে আর মধুমাখা হাসি,  
 নীরব সেতার বীণা, মুরজ মন্দির।  
 আর ত বাজেনা তার সুমধুর বাঁশী ।  
 তে'জে গেছে হৃঃখিনীর সাধের স্বপন ;  
 উদাসিনী বেশে আজি নীরবে নীরবে  
 কাঁদিতেছে, ঝরিতেছে নয়ন যুগল ।  
 চারিদিকে মরু দৃশ্য—হৃঃখিনীর বক্ষে  
 সমাধির পরে হায় সমাধি কেবল !  
 মোস্তেম-সমাধি-ধূলা মাখিয়া হৃদয়ে  
 অভাগিনী শোকে হৃঃখে আত্মহার্য্য প্রাণ ।  
 কি আর বর্ণিবে কবি ?—অচল লেখনী,  
 সাধের লখনৌ আজি মোস্তেম শ্মশান ।

এই স্থানে কত রাজা কত যে নবাব  
 মিলিয়া গিয়াছে এই ধূলা বালি সনে ।  
 সে কথা স্মরিলে হায় কে'টে যায় হৃদি  
 বহে অশ্রু শত ধারে মোস্তেম নয়নে ।  
 এই সেই স্থান ?—হায় এই সে নগরী ?

মোস্তেমের মহাতীর্থ ? যার চিতা-ভস্ম  
 মোস্তেমের ভাগ্য-লক্ষী গভীর নিমজিত !  
 এই সেই স্থান ?—হায় এই সে শ্মশান ?  
 হিন্দুর অযোধ্যা এই—যার ধূলি সনে  
 রামচন্দ্র সীতা দেবী লক্ষ্মণ ভরত  
 জনমের মত হায় ল'তেছে নির্ঝাণ ।  
 দূর দুঃশাস্তর হ'তে সত্যত সমীর  
 বহিয়া আনিছে সেই বিধাদের স্মৃতি ।  
 পাখীগুলি ক্ষুণ্ণ প্রাণে রহিয়া রহিয়া  
 গাহিছে সে অতীতের সাক্ষর স্মৃতি ।  
 সেই শোক বিজড়িত গোমতী-সৈকতে  
 হিন্দুর অযোধ্যা এই—মোসলেম জাতির  
 চিরপ্রিয়—এই সেই লখনৌ নগরী ।

ডুবু ডুবু রবি, সাক্ষা একুতির ভাল  
 ফুটেছে একটি তারা, শীতল সমীর  
 কুলের সৌরভ নিয়া বহিছে মধুরে  
 জুড়া'য়ে প্রাণের আলা তপু ধরশীর ।  
 হেনকালে সুজাউদৌলা সুগন্ধি কুলের  
 একটি মালিকা হস্তে পশিলা নীরবে  
 উদ্যানের সুশোভিত প্রমোদ ভবনে,  
 দেখিলা সেলিনা তথা রয়েছে বলিয়া  
 একটি পর্য্যঙ্ক পরে বর্ণ বিমণ্ডিত ।  
 নবাবে হেরিয়া বালা উঠিলা সজ্জমে  
 ক্রতবেগে স্মিত মুখে নবাব তখনি  
 সাদরে ধরিয়া হৃদে সে বর্ণ-কুসুমে  
 চুইলা সুখখানি তার, আনন্দে বালিকা



আমীর হৃদয় মাঝে পড়িলা চলিয়া ।  
 নবাব সে বক্ষঃস্থিত স্বর্ণ-প্রতিমার  
 স্নকণ্ঠে পুষ্পের মালা দিলা পরাইয়া  
 সাদরে কহিলা তারে “নজীবের সাথে  
 যাব প্রিয়ে আজ রাতে আকালী-শিবিরে ।  
 মহারাষ্ট্রী দম্ভাগণ অনলে অসিতে  
 মোসলেমের রাজ্যগুলি করিছে বিধ্বস্ত  
 নিশিদিন, আকালী সাহ এঁসেছে ভারতে  
 নজীবের অনুরোধে রক্ষিতে স্ববলে  
 ভারতীয় মোসলেমের রক্ত-সিংহাসন ।  
 নিশ্চয় তাদের সনে বাধিবে এখন  
 মহাযুদ্ধ, পাশেওরা দিল্লী আক্রমিয়া  
 ডাঙ্গিয়াছে অগণিত সুরম্য প্রাসাদ  
 সজ্জাটের ; অর্থাভাবে সজ্জাট এখন  
 শক্তিহীন, নাহি শক্তি যুক্তিতে সমরে ।  
 তাই এবে ভারতীয় সমগ্র মোসলেম  
 লিয়া সুরী শেখ্ সৈয়দ্ মোগল্ পাঠান  
 হইয়াছে একত্রিত বধিতে কাফেরে  
 ধর্ম-যুদ্ধে ।” নবাবের কণ্ঠ জড়াইয়া  
 কহিলা নবাব-পত্নী সেলিনা বেগম  
 “আমিও যাইব নাথ সমর প্রান্তরে  
 তব সাথে, আমি হস্তে তব পার্শ্বে থাকি  
 রক্ষিব তোমারে নাথ শত্রু আক্রমণে ।”  
 “যেও প্রিয়ে !” উত্তরিলা নবাব তাহারে ।  
 মুহূর্ত্তে নবাব-পত্নী হীরকের হার  
 উন্মোচিয়া কণ্ঠ হতে সজল নয়নে  
 অর্পিয়া নবাব করে কহিলা সদর্পে  
 “এ লক্ষ টাকার হার নেও প্রিয়তম  
 দিহু আভি, হার ভূষা-রত্ন আভরণ  
 যা আছে আমার, আমি সকলি তা’ দিব

মোসলেমের সাহায্যার্থে এ ধর্ম-সমরে ।”  
 বাধা দিয়া সূজাউদ্দৌলা কহিতে লাগিলা  
 “ছি প্রিয়ে, তোমার ভূষণ করিবে বিক্রয়  
 সূজাউদ্দৌলা, অর্থ মম নাহি কোষাগারে ?  
 আমি কি ভিক্ষুক তবে ? সফদরের পুত্র  
 এমনি কি কাপুরুষ ? পত্নীর ভূষণ  
 করিবে বিক্রয় ছি ছি বণিকের কাছে ?  
 হেন অনুরোধ তুমি কর’না আমারে  
 সেলিনা ? ইহার চে’য়ে মৃত্যু মোর ভাল,  
 সূজা ত কাতর নহে কোটি মুজা দিতে ?”  
 “কমা কর প্রাণ নাথ ছঃখিনী দাসীরে”  
 কহিলা নবাব-পত্নী “স্বজাতির তরে  
 কাদে প্রাণ, কিছুই ত ভাল নাহি লাগে ।  
 তাই এ প্রার্থনা আজি ক’রেছিহু পদে,  
 মোসলেম সম্মান যিনি, উচিত তাহার  
 আপনার প্রাণ দিয়া এ ধর্ম-সমরে  
 রক্ষিতে স্বজাতি—ধর্ম—প্রিয় জন্মভূমি !  
 কি হবে এ ধন-রত্নে ? হৈম অলঙ্কারে ?  
 সেলিনা এ ধনরত্ন তুচ্ছ গণে মনে ।  
 স্বজাতি—স্বধর্ম আর মাতৃভূমি সম  
 কি আছে জগতে ? যদি না থাকিল তাহা  
 কি লাভ এসব দিয়া ?—কি লাভ জীবনে ?”

নবাব সাদরে তার চুম্বিয়া মুখখানি  
 কহিলা “সেলিনা আমি যাত্রার উদ্যোগ  
 করি যে’য়ে, রাজ্য ভার করেছি অর্পণ  
 রাজা বেগী বাহাদুরে ; সে’জেরে সবাই  
 অভিযান তরে, আমি সে’রে আসি ঘেয়ে  
 কার্য্য মোর, আজি রাতে যে’তে হবে প্রিয়ে ।”  
 নবাব চলিয়া গেলা তখন বাহিরে ।

## ষষ্ঠ সর্গ

[ লঙ্ঘণো ; স্বর্গাউদ্যোক্তার প্রমোদ ভবন ]

দ্বিতীয় প্রহর নিশি ; সুমন্ত ধরণী ।  
বিমল চন্দ্রমালোকে শোভিছে লঙ্ঘণো  
স্বর্গ সম—প্রকৃতির নন্দন কানন ।  
শীতল সুস্বিক্ত বায়ু বহিছে মধুরে  
সুগন্ধি কুলের বাস করিয়া হরণ ।

কুসুমিত কুঞ্জবন, দ্বিতল প্রাসাদে  
সুসজ্জিত কক্ষ ; শ্বেত মন্দির-প্রাচীরে  
সুবর্ণের লতা পাতা কত মনোহর ।—  
স্থানে স্থানে পুষ্প-গুচ্ছ, কোথা বা মুকুল ।  
কোথা বা পুষ্পিত লতা, কোথা বা মঞ্জুরী  
দর্শকের প্রাণে সদা মে'খে দেয় ভুল ।  
প্রাচীরে বিবিধ চিত্র সুবর্ণ আরসী,  
ফানুস দেওয়ালগীর আলোকের ঝাড়  
ঝলসিছে কি সুন্দর মোহিয়া নয়ন,  
ইন্দ্রের অমরাবতী নহে তার তুল !  
কক্ষ যুড়ি নানা বর্ণ বিচিত্র গালিচা  
তত্পরি স্থানে স্থানে চারু স্বর্ণাসন ।  
এক পাশে অত্যাশ্চর্য সুবর্ণ পর্য্যঙ্কে  
একটি বালিকা, রূপে কক্ষ আলোকিত,  
বালিকার নিক্করূপে, মধুর সৌন্দর্য্যে  
বিমলিন পূর্ণচন্দ্র, সৌন্দর্য্য-সরসে  
এ অতুল রূপময়ী বালিকা-রতন  
অর্ধসুট প্রেমময়ী সোনার নলিনী !

কিছুক্ষণ পরে বালা চিন্তিত হৃদয়ে  
সে বর্ণ পর্য্যঙ্ক ত্যজি আসিলা নীরবে

গবাক্ষের কাছে, নিম্নে দেখিলা চাহিয়া  
অগণিত পুষ্পবৃন্দ রয়েছে ফুটিয়া  
বৃন্ত পরে, চন্দ্র করে হাসিছে যামিনী  
প্রেমময়ী, জীব জন্তু গভীর নিদ্রিত ।  
সুশীতল নৈশ বায়ু রহিয়া রহিয়া  
সঞ্চরিছে, নানাবিধ পুষ্পের সৌরভে  
আমোদিত চারিদিক—স্বর্গপুরী যেন ।  
দূরে দূরে তরু রাজি চিত্রিতের মত  
শোভিতেছে কি সুন্দর অ কাশের পটে ।  
অদূরে অসংখ্য হর্ম্য মন্দির মসৃজিদ  
ঝলসিছে কি সুন্দর চন্দ্রের আলোকে ।  
বালিকা গবাক্ষ পাশে দাঁড়ায়ে নীরবে  
নিরখিলা কিছুক্ষণ বিমুগ্ধ হৃদয়ে  
নৈশ প্রকৃতির এই শোভা নিরূপম ।  
প্রেমময়ী প্রকৃতির এ নয় সৌন্দর্য্যে  
বালিকার হৃদি যেন হইল পূর্ণিত  
পবিত্র স্বর্গীয় প্রেমে, গবাক্ষ ত্যজিয়া  
আসিলা বালিকা পুনঃ পর্য্যঙ্কের পরে ।  
একটি তানপুরা লয়ে গাইতে লাগিলা  
প্রেমময়ী, মুক্তা যেন ঝরিতে লাগিল  
কণ্ঠে তার, সুধা-স্রোতে সে নৈশ গগন  
হইল প্রাবিত, স্বর তরঙ্গে তরঙ্গে  
উঠিয়া নামিয়া মরি প্রকৃতির প্রাণে  
কি যে এক মাদকতা দিল ছড়াইয়া ।  
তানপুরার সঙ্গে কণ্ঠ মিশায়ে বালিকা  
গাইতে লাগিলা মরি মধুর পঞ্চমে ।

সে কেন সই এ'ল না ।  
 সারা নিশি তার আশে, ব'লে আছি শয্যাপাশে  
 কুলগুলি বাসি হ'ল তারে দেওয়া হ'ল না ।  
 আশার আশ্রাসে আনি  
 দণ্ড গণি পল গণি  
 সে আশা কুরায়ে গেল দিয়া নোরে যাতনা ।  
 কোকিলা প্রভাতী গায়,  
 উষা বুঝি এ'ল হায়,  
 বন দুঃখ বনে'রল না পুথিল বাগনা ।  
 নিশি ত পোহা'য়ে গেল  
 সে কেন সই এ'ল না ?  
 এ তার কেমন নীতি,  
 নাই প্রেম,—নাই প্রীতি,  
 কঠিন হৃদয় তার সদা করে ছলনা ।

গরল চাঁপিয়া বুকে  
 "আসি আসি" বলে বুকে  
 সে কেন আসিবে সখি সেত ভাল বাসে না ।  
 আমার পাগল প্রাণ,  
 সদা কবে আন চান্  
 বুঝানে বোঝে না সখি একি হ'ল যাতনা ।  
 নিশি ত পোহায়ে গেল  
 সে কেন সই এ'ল না ?

সুখ তারা নীলাকাশে  
 অই যে উদিল হেসে,  
 আমার এ ভাঙ্গা প্রাণে বাড়াইয়া যাতনা ।  
 প্রভাত-সমীর হায়,  
 বৃন্দ বৃন্দ ব'য়ে যায়  
 পাণিরা ভৈরবী গায়, এ প্রাণ ত মানে না ।  
 পুরবে রক্তিম রেখা,  
 অই সখি দিল দেখা,  
 চক্রবাক চক্রবাকী করে প্রেম বাচনা ।  
 নিশি ত পোহায়ে গেল,  
 সে কেন সই এ'ল না ?

সমাপি সজীত বালা রহিলা বসিয়া  
 নীরবে, হৃদয়ে তার তরঙ্গ তুমুল  
 উঠিতে লাগিল, বালা জাবিলা হৃদয়ে  
 চতুর্ধ প্রহর নিশি, এখনো নবাব  
 আসিল না, বুঝি বা সে সিন্ধায়ে চলিয়া

নজিবদৌলার সাথে আকালী-শিবিরে  
 তবে না সে প্রাণাধিক ভালবাসে মোরে ?  
 আমারে না সঙ্গে নিয়া হেন ভাবে তার  
 যাওয়া কি উচিত ছিল ? বোধ হয় মোর,  
 সঙ্গে নিলে মোরে তার হ'ত অশ্রুবিধা ;  
 তাই সে চলিয়া গেছে কেলিয়া আমারে  
 একাকিনী, আজি এই লঞ্চে নগরে ।  
 হেন কালে দাসী এক পশিয়া সে গৃহে  
 কহিল "বেগম তুমি কেন আগিতেছ  
 এত রাত্রি ? অশ্রু যে হইবে তোমার ।"  
 সেলিনা কহিলা তারে সজল নয়নে  
 "নবাব গিয়াছে চলি আকালী শিবিরে  
 ভাল নাহি লাগে মোর থাকিতে একাকী  
 এই স্থানে, অচিরেই বাধিবে সময়  
 মারাঠা দস্যুর সনে, ছিল ইচ্ছা মম  
 একত্র স্বামীর সহ বীরাজনা প্রায়  
 পশিয়া সমরাজ্ঞে বধিতে কাকেরে ।"  
 "অবশ্য পারিতে তাহা," উত্তরিল দাসী  
 "নবাবের সঙ্গে তবে কেন নাহি গেলে ?  
 তার সঙ্গে গেলে তুমি উৎসাহ তাহার  
 হ'ত বৃদ্ধি ।" উত্তরিল সেলিনা তাহারে  
 "স্বামী মোর বিশ্বজয়ী অযোধ্যা-নবাব  
 সুজাউদৌলা, সে কি কভু ডরায় কাকেরে ?  
 সে কেন ?—আমি যে নারী ডরিনা তাদেরে ।  
 অযোধ্যার রাণী আমি, বীরের গৃহিণী  
 হৃদয়ে আমার মন্ত মাতঙ্গের মন্ত  
 মহাবল,—আমি কেন ডরিব কাকেরে ?"  
 কহিল সে দাসী পুনঃ "সকলি তা' সত্য,  
 কি সাধ্য, তোমার সনে বৃদ্ধিবে আহার  
 রণ-ক্ষেত্রে ? অচিরেই আসিবে নবাব"

চূর্ণিয়া তাদের গর্ভ সমুখ সমরে ।  
 কেন বুঝা ভাবিতেছ ?—নিজা যাও এবে ।”  
 আবার সেলিনা তারে কহিতে লাগিল।  
 “কত অল্পনয় ক’রে বলেছিহু তারে  
 নিয়া যে’তে সঙ্গ মোরে সমর প্রাঙ্গণে,  
 প্রাণেশের পাশে থাকি যুঝিতাম আমি  
 রণ-স্থলে, সারা বিশ্ব দেখিত চাহিয়া  
 মোস্লেম রমণীগণ কত শক্তি ধরে ।  
 নহে তাবা ভীক, তারা ধর্মের লাগিয়া  
 তুচ্ছ গণে এ পার্থিব নগর জীবন ।  
 যদি মোরে নিয়া যে’ত সমর প্রাঙ্গণে  
 স্বামী মোর, কত সুখী হইতাম আমি  
 সঙ্গ সঙ্গ থাকি তার মুক্ত অসি হাতে ।  
 স্বামীর উপরে যদি করিত আঘাত  
 বিধর্মী সৈনিক কেহ, অলক্ষ্যে থাকিয়া  
 ক্রিষ্ট বেগে অগ্রসর হইয়া তখন  
 নিবারিয়া সে আঘাত বধিতাম তারে ।  
 কত সুখ হত মোর হৃদয়ে তখন ?  
 সমুখ সমরে যদি মরিতাম আমি  
 স্বামীর সাহায্যে যে’য়ে কত সুখ হত  
 সে সময়ে, আজি আমি গৃহ-কোণে প’ড়ে  
 একাকিনী, জলিতেছি অন্তর-অনলে  
 তার কথা মনে ক’রে, অদৃষ্টের দোষে  
 সে কোথায়, আমি কোথা ? আমারি মতন  
 না জানি সে কত কষ্ট সহিছে বিদেশে ।”  
 বাধা দিয়া দাসী পুনঃ কহিল। তাহারে  
 “ভে’বনা বেগম তুমি, তব সে প্রাণেশ  
 শীঘ্রই আসিবে হেথা বধিয়া কাকেরে ।”  
 দাসীর প্রবোধ বাক্য বেগমের কর্ণে  
 পশিল না, সে আবার কহিল। দাসীরে

মান মুখে, “যাব আমি নবাবের কাছে ;  
 কত যে’য়ে তুমি রাজা বেনী বাহাছরে  
 প্রস্তুত করিয়া দিতে অগৌণে আমার  
 যাত্রা উপযোগী সব সৈন্ত রসদাদি ।  
 কালি আমি ব’লে ক’য়ে জননী বেগমে  
 সম্মতি লইব তার ।” আকুল হৃদয়ে  
 অভাগিনী ছইকটে করিতে লাগিল।  
 আবার গবাক পাশে গেলা চলি ক্রত  
 প্রাণের অশান্তি হেতু, বসিলা সেখানে  
 রক্তাসনে, রাখি শির গবাক-কপাটে  
 অভাগিনী, চিন্তাক্রিষ্ট হৃদয়ে তখন  
 দেখিতে লাগিল। সেই উজানের শোভা  
 মনোহর, ফুলগুলি শোভিছে কেমন  
 চন্দ্র করে, এ গভীর নিশীথ সময়ে ।  
 বহুকণ দেখে দেখে আঁখি ছুটি তার  
 আসিল মুদিয়া ক্রমে, দেখিলা বালিকা  
 তন্দ্রাবেশে স্বামী তার রক্তের সমুদ্রে  
 ভাসিতেছে, কত দেহে ভীম অস্ত্রাঘাতে,  
 নিরখি এ মন্মভেদী স্বপ্ন ভয়ঙ্কর  
 “প্রাণ নাথ” ব’লে বালা উঠিল। কাঁদিয়া,  
 ভেঙ্গে গেল স্বপ্ন তার ; দেখিলা চাহিয়া  
 গত প্রায় নিশীথিনী, ছে’য়েছে খেতাত্তা  
 নভস্তলে ; পাখীগুলি উঠিল কুজিয়া,  
 বনপ্রান্তে, প্রভাতের নিকট সমীরণ  
 সঞ্চরিল যুহু যুহু হিরলোল খেলিয়া  
 মৃত সজীবনী-সুধা করিয়া বর্ষণ ।  
 ধীরে ধীরে—অতি ধীরে উঠিল তালিয়া  
 আশ্রমের সুখ স্বর নিখিল মানবে  
 জাগাইয়া—প্লাবিত। সে নিখর গগন ।

## সপ্তম সর্গ

[ দিল্লী ; মহারাষ্ট্র-শিবির ]

এই কি সে দিল্লী ?—হায় এই সে নগরী ?  
 যাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ নিখিল ধরণী ?  
 ভূতলে দ্বিতীয় স্বর্গ, অমর-বাহিত  
 মুসলমান সম্রাটের প্রিয় রাজধানী ?  
 এই সেই দিল্লী ?—সেই কনক-রঞ্জিত  
 মণি-মুক্তা শ্বেতোত্তিত, কুমুদ-সজ্জিত  
 শ্বেত মন্দিরের চারু হৃদয় অগণিত  
 বিভূষিত বক্ষ যার ? আলোকের হারে  
 কুমুদ স্তবকে, রত্নে চির উজ্জলিত  
 যে নগরী ; কুমুদিত নিকুঞ্জ কাননে  
 প্রস্রবণে, ফাঁড়াভূমে শোভিত যে পুরী  
 স্বর্গ সম ; কলকঠ কোকিল কুঞ্জে  
 দরেল শ্রামার তানে, পালিয়া-পঞ্চমে,  
 রমণী কণ্ঠের চারু ললিত সপ্তমে  
 মুখরিত দিবানিশি, সৌন্দর্য্যে যাহার  
 ইন্দ্রের অমরাবতী সতত লজ্জিত,  
 এই সেই দিল্লী ?—হায় এই সে নগরী ?

এই সেই দিল্লী ?—হায় এই সে নগরী ?  
 যাহার-প্রতাপে শৌর্য্যে কাপিত অবনী ?  
 মুসলমান গৌরবের বিজয়-কেতন  
 উজ্জিত যে দিল্লী দুর্গে \* যার সিংহ-নাগে

বহিত ভীষণ ঝড় সমগ্র ভারতে ।  
 অতুল মোস্লেম-কৌণ্ডি-মুকুট উজ্জল  
 শোভিত যাহার শিরে কনক-রঞ্জিত  
 অমুপম, ইসলামের পবিত্র কিরণে  
 ছিল যেই সমুজ্জল দিবস রজনী,  
 এই সেই দিল্লী ?—হায় এই সে নগরী ?  
 যাহার সৌন্দর্য্য-শোভা সমগ্র জগতে  
 আনন্দ বিশ্বয় প্রীতি করে উৎপাদন,  
 কি সাধ্য বর্ণনা তার করিবে এ কবি  
 ক্ষুদ্রপ্রাণ, দীন হীন বঙ্গভাষা অতি ।  
 ওই দেখ দাঁড়াইয়া মন্দির-নির্ম্মিত  
 কি সুবন্দ্য অট্টালিকা “জুমা মসজিদ” † ।  
 স্বর্গ হ’তে আনি যেন অবনী মাঝারে  
 স্থাপন ক’রেছে কেহ নয়ন-রঞ্জন ।  
 এ হেন সুরমা হৃদয় অতুল জগতে,  
 একবার নিরখিল মোস্লেম-হৃদয়  
 অপূর্ব আনন্দ-স্রোত হয় নিমগন ?  
 উচ্চতায় এ প্রাসাদ সমগ্র দিল্লীতে  
 ঐচ্ছতর, সৌন্দর্য্যেও অমুপম ভবে  
 বিভূত প্রাক্ষণ মরি, সম্মুখে তাহার  
 মনোহর স্তম্ভদ্বয়, উঠিলে তাহাতে  
 দিল্লীর অপার শোভা মানব হৃদয়ে

\* সহরের পূর্বদিকে এই দুর্গ । এই দুর্গেই সম্রাটের আবাস-ভবন । সম্রাট সাজাহান ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া আত্মা দুর্গের অনুকরণে এই দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন । এই দুর্গেই দেওয়ান আম, দেওয়ান বাম, বাদশাহের হেরদ, কামরুদ, মন্দির মন্দির, মন্দির মসজিদ ইত্যাদি মনোহর প্রাসাদগুলি মুসলমান-গৌরবের অজীত স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া বীরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে ।

† সম্রাট সাজাহান ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে এই মসজিদের নিৰ্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করিয়া ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে শেষ করেন । এই মসজিদ নিৰ্ম্মাণ করিতে দশলক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল । ইহা মুসলমান গৌরবের একটি উজ্জ্বল রত্ন ।



কি এক স্বপ্নের ছায়া করে আনয়ন ।  
 দৃশ্যগুলি কি সুন্দর নয়নাভিরাম  
 কমনীয় পটে যেন রয়েছে চিত্রিত ।  
 মসজিদ প্রাঙ্গণে এক মন্দির আধারে  
 সুনির্মল পূতোদক রক্ষিত যতনে  
 ওজু \* তরে ; হায় এই মসজিদ ভিতরে  
 একটি মন্দিরবেদী, আজিও তাহাতে  
 সাজাহান সম্রাটের হস্তলিপি হায়  
 রয়েছে অঙ্কিত চারু উজ্জল অক্ষরে ।  
 উত্তর পূর্ব কোণে একটি প্রকোষ্ঠে  
 পবিত্র কোরান এক রক্ষিত যতনে ।  
 এ পবিত্র মহাগ্রন্থ অমূল্য জগতে,—  
 —মহাশ্রী মোর্তজা আলী লিখিত অক্ষরে  
 সুশোভিত পৃষ্ঠা যার কি আছে জগতে  
 মূল্য তার, ধর্মপ্রাণ মোস্তেমের কাছে ।  
 আজিও উন্নত শিরে এ মহাপ্রাসাদ  
 ইসলাম-গৌরব-গীতি, অতীতের স্মৃতি  
 গাইছে নীরবে সদা, গভীর বিষাদে ।  
 বসন্তে শরতে কিম্বা গ্রীষ্ম বর্ষা শীতে  
 প্রতি নিশি অবসানে উষার প্রাকালে  
 অই উচ্চ মনোহর পবিত্র মিনারে  
 দাঁড়াইয়া মোয়াজ্জিন আজানের রবে  
 জাগাইতে মোহম্মদ নিদ্রিত মানবে ।  
 যাহার সুশুভ্র চারু মন্দির চত্বরে  
 অগণিত ছাত্রবৃন্দ সানন্দ হৃদয়ে  
 পঠিত কোরান গ্রন্থ সুমধুর স্বরে ।  
 কত যে পারসী কাব্য, দর্শন বিজ্ঞান  
 হইত পঠিত এই মসজিদ প্রাঙ্গণে,  
 কত যে পণ্ডিতগণ করিত আনন্দে  
 ইসলাম ধর্মের ব্যাখ্যা ; আজানের রবে •  
 প্রতিদিন পঞ্চবার মোস্তেম নিচয়

আসিত ছুটিয়া যেথা, আপনি সম্রাট  
 আসিয়া যে স্থানে নিত্য ভক্তনের তরে  
 দাঁড়াইত সমভাবে ভিখারীর সনে  
 ইসলামের সাম্য ভাব করি প্রদর্শন ।  
 পবিত্র রমজান মাসে নিশীথ সময়ে  
 তারাবীর সুধীষর তরঙ্গে তরঙ্গে  
 প্রাবিয়া মসজিদ গৃহ কেমন মধুরে  
 উঠিত আকাশ পথে, কোরাণের শ্লোকে  
 কি এক অতুলিময় মাদকতাপূর্ণ  
 আশ্ব বিস্মৃতির সুরা করিত বর্ষণ  
 ধর্মপ্রাণ মোস্তেমের হৃদয়-কন্দরে ।  
 এক ভিন্ন অণু নাই উপাশ্রয় জগতে  
 এ পবিত্র পুণ্য কথা হইত ধ্বনিত  
 যেই স্থানে,—এই সেই পবিত্র নগরী ?

এই স্থানে নাসিরদী—সম্রাট প্রধান  
 রাজস্ব হইতে বড় এক কপদক  
 করিত না নিজ ব্যয়, কত পরিশ্রমে  
 গ্রন্থ লিখে নিশিদিন, যাহা পে'ত কিছু  
 তাই দিয়া করিত সে জীবন যাপন ।  
 নাহি ছিল দাস দাসী, বাহ্য আড়ম্বর ;  
 একমাত্র পত্নী তার করিত সাধন  
 সংসারের সব কার্য, গিয়াছিল পুড়ে  
 একদা অঙ্গুলী তার করিতে রক্ষন ।  
 করেছিল প্রার্থনা সম্রাটের কাছে  
 নিতান্ত কাতরভাবে “পারিনে সাধিতে  
 সব কার্য একা আমি, রাখিলে এখন  
 বাদী এক, পারিতাম লভিতে বিশ্রাম  
 কিছুদিন, এর মধ্যে অঙ্গুলী আমার  
 সারিলে, সকল কার্য পারিব করিতে ।”  
 তার্যার অঙ্গুলী আর সজল নয়ন

\* নামাজ পদ্ধতির জন্য হস্তপদ প্রক্ষালন



হেরি তার, দিল্লীর কহিল। বিবানে  
 “কল্য হ’তে আমি নিজে করিব রক্ষন  
 সন্ততি বিজ্ঞান লভ’ কিছুকাল তুমি।  
 সত্য বটে রাজা আমি, কিন্তু রাজকোষে  
 যে ধন রতন আছে—নহে তা’ আমার।  
 প্রজার হিতের জন্য হতেছে সঞ্চিত  
 রাজ-কোষে, প্রজা-হিতে হইবে তা’ ব্যয় ;  
 কেন না এ ধন রত্ন সকলি প্রজার।  
 ইহর কর্তৃক আমি রক্ষক ইহার  
 হইয়াছি নিয়োজিত, যদি আমি ইহা  
 করি ব্যয় নিজ কার্যে, ইহর-সমীপে  
 হব আমি অপরাধী বিচারে তাহার  
 পরধন আত্মসাৎ করিয়াছি ব’লে ?  
 কেন অনর্থক মোরে পাণ্ড পথে নিয়া  
 নরকের কারাগারে ফেলিবে আমারে ?  
 সামান্য কষ্টের লাগি কেন প্রিয়ে তুমি  
 করিতেছ হুঃখ আজি, ধৈর্য্য ধর প্রাণে ;  
 ডাক সেই বিশ্বস্ত সর্বশক্তিমান,  
 বিপদ-ভঞ্জন তিনি, রক্ষিবে তোমারে  
 অশান্ত হৃদয়ে করি শান্তি বরিষণ।”  
 এই সেই দিল্লী ?—হায় এই সে নগরী ?

যে দিল্লীর মনোহর টাননি চওকে  
 রাজপথে, সত্রাটের নিভৃত নিকুঞ্জে  
 কত সৈন্ত সেনাপতি করিত ভ্রমণ  
 কুলপ্রাণে, কত ছাত্র খেলিত আনন্দে  
 যশোর তীরে কুজ শ্যামল প্রান্তরে।  
 হর্নের তিতরে মরি কত মনোহর  
 সুবহু অটালিকা ‘দেওয়ান আম’  
 কি খোজার উৎস, আহা তিন দিক দূর,

সারি সারি স্তম্ভগুলি রয়েছে দাঁড়িয়ে  
 ধরি শিরে সে মনোহর ছাদ অশুলম।  
 পশ্চাত প্রাচীর পার্শ্বে অতি মনোহর  
 সাজাহান সত্রাটের মন্দির আসন ;  
 আসনের চারি কোণে কেমন সুন্দর  
 কারুকার্য বিখচিত ধবল উজ্জল  
 চারিটি মন্দিরসুন্দর, হায় তত্পরি  
 মন্দির নির্মিত রম্য খেত চত্ৰাতপ  
 কারুকার্য বিখচিত নয়ন-রঞ্জন।  
 আসন-সম্মুখে এই স্তম্ভ পাদদেশে  
 আমার ওমরাহ আর দেশীয় নৃপতি  
 লভিল আসন স্ব স্ব পদ অনুসারে,  
 সেই দিল্লী এই ?—হায় এই সে নগরী ?

এই সেই দিল্লী ? যার হৈম কলেবর  
 মোস্লেম সত্রাটবৃন্দ ক’রেছ সজ্জিত  
 চিরকাল সৌধে কুঞ্জে রতনে কাঞ্চনে।  
 যাহার সুরম্য বৃকে কত অটালিকা  
 মণিময়,—‘সাহার্বোজ’ ‘আরঙ্গ-মহল’  
 সৌন্দর্যের মহাসিদ্ধি, ‘মতি মসজিদ’  
 সৌন্দর্য-অগতে যেন উজ্জল রতন।  
 ‘আসাদ’ ‘মজিল’ মরি কত মনোহর !  
 কত মনোহর সেই হেরম সাহার  
 অসংখ্য রমণী-পুষ্প থাকিত ফুটিয়া  
 যেই স্থানে, উজলিয়া রূপের ছটায়  
 দশ দিক,—সরোবরে পদ্মিনী যেমন।  
 মন্দির নির্মিত স্তম্ভ সে “দেওয়ান খাস”  
 মনোহর স্তম্ভ পরে দাঁড়িয়ে নীরবে  
 কাঁদিতোছে, আগাইয়া ভাবুক-হৃদয়ে  
 মোস্লেমের শৌর্য বীর্য্য অতীত গৌরব।

এমন সুন্দর গৃহ নাহি এ জগতে  
 ভূতলে দ্বিতীয় সর্গ, প্রাচীরে যাহার  
 চুনি-পারী সুশোভিত পুষ্পিত বল্লরী  
 রঞ্জিত কনকে, কোথা নানা বর্ণ ফুল  
 কোথা বা হীরক-পদ্ম, কোথা বা মুকুল ।  
 উর্ধ্বে চাক চন্দ্রাতপ চাঁদি-বিনির্মিত  
 শোভায় সৌন্দর্যে সদা ঝলিত নয়ন !  
 যার অভ্যন্তরে হৈম 'ময়ূর আসন'  
 বিনির্মিত বহু মূল্য রতনে কাঞ্চনে  
 শোভিত সুধাংশু প্রায় নয়ন-রঞ্জন ।  
 উজ্জল প্রভায় যার প্রভাতের সূর্য  
 পূর্ণিমার শশধর মলিন বদন ।  
 কি দিব তুলনা তার ? স্থানে স্থানে যার  
 হীরকের পুষ্পগুলি নক্ষত্রের মত  
 বিকীর্ণ করিত জ্যোতিঃ যাহার সৌন্দর্যে  
 বিমুক্ত দেবতাবন্দ মানব কিয়র !  
 মণি মুক্তা বিখচিত সুবর্ণ-ঝালরে  
 কপোতের ডিম্ব সম মুক্তা মনোহর ।  
 উপরে সুবর্ণ ছাদ মরি কি সুন্দর  
 বিখচিত মনোহর উজ্জল রতনে ।  
 মণি মুক্তা বিনির্মিত নক্ষত্র নিচয়  
 জড়িত কাঞ্চনে, জ্যোতিঃ করি বিকীরণ  
 সুশোভিত স্থানে স্থানে সম ব্যবধানে ।  
 বেগমের লীলাক্ষেত্র সে 'মতি মহল'  
 যাহার তুলনা নাই এ তিন ভুবনে ।  
 অভ্যন্তরে কত শত কুসুম-বল্লরী  
 সুশোভিত মনোহর শ্যামল পল্লবে ;

স্থানে স্থানে নানাবর্ণ কুসুম নিকর  
 প্রস্কুতিত, অর্ধকুট, কোথা বা মুকুল  
 রাশি রাশি, মনোহর পল্লবের তলে ।  
 কুদশিয়া \* মঞ্জুল কুসুম ভূতলে নন্দন,  
 নানা জাতি পুষ্প বন্দ কুটিছে ঝরিছে  
 \* সমীর হিলোলে, কত ক্ষত্র প্রস্রবণে  
 অবিরত বারি রাশি ঝরিছে মিশিছে  
 ঝর ঝর, সৌন্দর্যের প্রিয় নিকেতন ।—  
 —মোসলেম গৌরব-চিহ্ন স্মৃতির প্রাস্তরে  
 অপার্থিব স্বপ্নময় কুসুম-কাঞ্চন ।  
 এই সেই দিল্লী ?—হায় এই সেই নগরী !

মহামতি আকবর ভ্রমি ছদ্মবেশে  
 যেই স্থানে, দে'খেছিল প্রজার অবস্থা  
 কত দিন, র'ক্ষেছিল একদিন হায়  
 একটি মেথর শিশু মাতঙ্গ-কবলে  
 হেরি যেই দৃশ্য এক বীর রাজপুত  
 প'ড়েছিল বিলুপ্তিয়া যার পদতলে  
 অস্ত্র পরিহরি ; † যেথা মাতঙ্গের সনে  
 করেছিল মল্লযুদ্ধ ভীষণ বিক্রমে  
 শের আফগান,—হায় এই সেই নগরী ?

সাজাহান, জাহাঙ্গীর যেখানে সতত  
 শোভিত দেবেস্ত্র প্রায় শত পারিষদে  
 সুবেষ্টিত ; শত শত ওমরাহ সকল  
 বেষ্টিয়া যাদেরে হায় শোভিত সুন্দর,—  
 —আকাশে তারকা যথা চন্দ্রমার পাশে ।

\* এখন ইহা Queen's Garden নামে অভিহিত হইয়া থাকে ।

† এই রাজপুত বীরের পিতাকে সম্রাট আকবর যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন । তিনি উহার প্রতিশোধ  
 লইবার জন্য সম্রাট ছদ্মবেশে সম্রাটের পাছে পাছে থাকিয়া সুযোগ অনেক করিতেছিলেন । একদিন আকবর

যেই স্থানে আরজীব মার্ভের আর  
বসি রত সিংহাসনে বিপুল বিক্রমে  
শাসিত ভারতবর্ষ, উদ্ভিত যেখানে  
মোসলেমের “অর্ধচন্দ্র” বিজয়-কেতন  
উৎপাদিয়া মহা জ্ঞান শক্রর হৃদয়ে।  
যেই স্থানে কোটি কণ্ঠে হইত ধ্বনিত  
“দিল্লীর বা জগদীশ্বর,”—এই সেই স্থান ?  
মুসলমান সম্রাটের যতনের ধন ?  
যেই স্থানে মনোহর শুভ্র সৌধশ্রেণী  
পথের হৃদারে, কত সুরমা বিপনি  
সুসজ্জিত মনোহর সামগ্রী সম্ভারে  
কত জাতি ধনবান্ বণিক নিচয়  
রহিত বসিয়া এই বিপনি ভিতরে।  
বিদেশী পথিক কত করিত ভ্রমণ  
রাজপথে, যেই স্থান জন কোলাহলে  
ছিল সদা প্রপূরিত, পথের হৃদারে  
অসংখ্য দরিদ্র লোক মনের আনন্দে  
সাজাইয়া নানাবিধ আহাৰ্য্য বিপনি  
সাজায়ে শোভিত যেথা নয়নরঞ্জন।  
যেই স্থানে দলে দলে মোসলেম নিচয়  
শোভিত মসজিদে, পথে একার উপরে,  
হাস্যমে বিপনি গৃহে চাঁদনি চওকে।  
সকলেরি হাসিমুখ, সানন্দ হৃদয়ে  
ভাসিত সবাই যেন সুখের সাগরে।  
অসংখ্য মোসলেম মরি হাসিত খেলিত—

প্রত্যাহে মধ্যাহ্নে রাত্রে বসি দলে দলে  
এই সব মনোহর বিপনি ভিতরে।  
সদর বাজারে কত সুরমা বিপনি  
শোভিত বিবিধ দ্রব্য নয়ন রঞ্জন।  
বিপনি-অলিন্দে কত ক্রেতা ও বিক্রেতা  
দাঁড়াইয়া আলাপিত কত সম্ভাষণ  
করিত দালালবৃন্দ নব আগন্তকে।  
চাঁদনি চকের সেই বিটপীর তলে  
কত মনোহর দ্রব্য স্নিগ্ধ সরবতে  
সজ্জিত বিপনি ক্ষুদ্র ; কোথা বা নির্ঝনে  
সন্ন্যাসী ককির বৃন্দ ; কোথা বা গবাক্ষে  
ফুটন্ত গোলাপ সম চাক্ষু মুখগুলি  
রহিত কুটিয়া যেন স্থিরা সৌদামিনী।  
কোথা বা ঔষধালয়, কোথা নাট্য শালা  
সুত্রধর-কর্ম্মক্ষেত্র বিজ্ঞালয় কত,  
কোথা মল্ল যোদ্ধাদের ক্ষুদ্র রঙ্গভূমি।  
আনন্দের ধরাত্রেতে, শাস্তির হিল্লোলে  
যে দিল্লী ভাসিত সদা বিমুক্ত হৃদয়ে ;  
জানিত না দুঃখ-লেশ দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসী  
ভ্রমেও যাহার কাছে আসিত না কভু ;  
অমর আধার রাত্রে দিবসের মত  
ধরিত যে অতুলিত শোভা মনোহর  
উজ্জল প্রদীপালোকে ; কত শত হৃদয়  
রমণী-কণ্ঠে নৈশ ললিত বন্ধারে  
হইত-ধ্বনিত,—হায় এই সে নগরী ?

হৃদয়বশে নগর পরিভ্রমণে বাহির হইয়া দেখিলেন একটি ক্ষিপ্ত হস্তী হুটিয়া নাগরিকদিগকে ভাড়া করিতেছে, আর  
তাহারা প্রাণভয়ে যে যে-দিকে পারে সেই দিকে দৌড়াইয়া পলাইতেছে। একটি মেঘের নিম্ন হস্তীর সন্মুখ হইতে  
পলাইতে অক্ষয় হইয়া প্রার হস্তীর পদতলে পড়ে পড়ে সমস্ত আকবর দৌড়িয়া সেই নিম্ন হস্তীকে ক্রোধে মইয়া একটি  
পজির ভিতরে প্রস্তবেশে প্রবেশ করিয়া উহাকে রক্ষা করিলেন। এই রাজপুত্র বীর এই দৃশ্য দেখিয়া অতি  
হইলেন। তাহার হিংসানর আকবরের এই সংকটস্থান ব্যাপ্তি খববে মিতিয়া গেল। আকবরকে তিনি স্বপ্নের  
দেখিয়া মনে করিয়া তাহার নিকটে অকণ্ঠে চিত্তে মনের ভণ্ড কথাগুলি প্রকাশ করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন।  
অল্প আনিও তাহার পদতলে রাখিয়া দিলেন।

যেই স্থানে রমজানের মধুর সারাছে  
জুমা মসজিদের পার্শ্বে চাঁদনি চওকে  
সুরমা বিপণিগুলি হইত সজ্জিত  
বিবিধ সুখাদ খাচ্ছে, হেরিলে নয়নে  
কি এক আনন্দ-স্রোতঃ হ'ত প্রবাহিত  
দর্শকের প্রাণে, হায় আজি তা' স্বপন ।  
পাঠক, এখনো যদি চাও দেখিবারে  
যাও সেই পুণ্যস্থানে, দেখ গিয়ে হায়  
দিল্লীর শ্মশান হ্রদে, দেখ নাই যাহা  
এ মর জীবনে তুমি, অতীতের স্মৃতি  
উঠিবে জাগিয়া তব আকুল মরমে ;  
বুঝিবে তখন তুমি হুঃখিনী দিল্লীর  
কি সুখ-সৌভাগ্য আহা গিয়াছে ডুবিয়া  
চিরতরে অতীতের অনন্ত আধারে ।  
বুঝিবে তখন তুমি কি যে শোক-স্মৃতি  
মাখিয়া হৃদয়ে হায় দিল্লী অভাগিনী  
সাজিয়াছে আজি এই চির উদাসিনী ?  
এই সেই দিল্লী ? —হায় এই সে নগরী ?

যেই স্থানে সাজাহান আনন্দিত প্রাণে  
মাতিয়া উঠিত ঈদ গুলাবী উৎসবে,  
আমির ওমরাহ কত এ মহা উৎসবে  
অতীতের সুখ হুঃখ হইয়া বিস্মৃত  
ডুবিয়া বাইত সেই আনন্দ-সাগরে ।  
হায় সে পবিত্র ঈদে মোস্লেম নিকর  
উঠিত মাতিয়া লভি নূতন জীবন  
নব বেশে, কি সুন্দর ছুটিত সকলে  
জুমা মসজিদের পানে ; বালক বুঝক  
বৃদ্ধ প্রৌঢ় সকলেই নব নব সাজে  
শোভিত মসজিদে পথে কেমন সুন্দর ।

এমাম নমাজ অস্তে পড়িত খোদবা,  
ভক্ত মোস্লেম গণ শুনিত বসিয়া  
মসজিদ ভিতরে তাহা তদ্রূপ হৃদয়ে ।  
দিল্লী যেন নব বেশে উঠিত হাসিয়া  
ফুল প্রাণে, নহবত বাজিত মধুরে  
ইসলামের জয়ধ্বনি করিয়া ঘোষণা ।  
অতীতের হিংসা ঘেঁষ শত্রুতা ভীষণ  
ভুলিয়া মোস্লেমগণ একতার পাশে  
হ'ত বন্ধ পথে ঘাটে যেখানে সেখানে  
গলাগলি —কি পবিত্র দৃশ্য মনোরম ।

পবিত্র রমজানে আর ঈদ মোহরমে  
ধনাঢ্য ও মধ্যবিত্ত মোস্লেম সকল  
সানন্দে করিত দান দীন হুঃখী জনে  
সাধ্যমত ; মুক্ত হস্তে আপনি সম্রাট  
বিলাইত একে একে ভিখারী নির্ধনে  
করি তুষ্ট অর্থে আর অন্ন বস্ত্র দানে ।  
ফাতেহা দোরাজ দাহমে, —এ পবিত্র দিনে  
রাজ-গৃহে —নগরের প্রতি ঘরে ঘরে  
মৌলুদ হইত পাঠ, ভক্ত মুসলমান  
সারা রাত্রি জে'গে জে'গে পড়িত কোরান  
এক মনে, সম্রাটের রাজ কোষ হতে  
সহায় সম্পদ হীন বৃদ্ধ নর নারী  
পিতৃ মাতৃহীন সব বালক বালিকা  
বিধবা, পাইত বৃত্তি এই শুভ দিনে ।  
কবি গণ যথোচিত পেত পুরস্কার ;  
অধ্যয়ন-বৃত্তি পে'ত বিদ্যার্থী সকল,  
কেহবা পাইত স্থান অনাথ আশ্রমে ।  
হুজিৎ পীড়িত সব নর নারীগণ  
সাহায্য পাইত কত রাজ কোষ হতে ।

কুমারের জন্মদিনে সানন্দে সজাট  
 মাপি তারে ফুলদণ্ডে দেহের সমান  
 করিত সুবর্ণ দান, তিথারী নির্ধনে।  
 মৌলভী মৌলানা গণ রাজ বৃত্তি পে'য়ে  
 প্রচার করিত ধর্ম দেশ দেশান্তরে।  
 অত্যাচারী পেত দণ্ড নৃপ স্ববিচারে;  
 ব্যাধিত পাইত অর্থ, হিন্দু মুসলমান  
 জাতি নির্বিশেষে স্ব স্ব সুকন্মের ফলে  
 পে'ত কত পুরস্কার—নিষ্কর জাগীর।  
 এই সেই দিল্লী ছায় ?—হায় এই সে নগরী ?

যেই স্থানে কুমুদিত নিকুঞ্জ কাননে  
 অসংখ্য রমণী-পুষ্প উঠিত ফুটিয়া  
 খোশরোজে, শত শত অনিন্দ্য সুন্দরী  
 সাঙ্কীর্ষিত যাত্র কত সুরমা বিপণি  
 নানাবিধ পুষ্পদামে রতনে কাঞ্চনে।  
 মরি কি সুন্দর দৃশ্য, অতুল জগতে;  
 কুতলে স্বর্গীয় শোভা, আপনি সজাট  
 ফুলিয়া যাইত যার সৌন্দর্য্য-গৌরবে।  
 এই সেই স্থান ?—যেথা মেহেরউরেনসা  
 যানিয়াছে শৈশবের মধুর জীবন  
 কুমার সেলিম সনে; কত মনোহর  
 তাহাদের বাল্য লীলা, অরিলে বারেক  
 আনন্দের উৎস কুটে ভাবুকের প্রাণে।  
 একদা কৈশোর কালে কুমার সেলিম  
 সৌন্দর্য্যের প্রতিযুক্তি মেহেরের সনে  
 গিয়াছিল। মনোহর নিকুঞ্জ কাননে  
 ধরিতে পাখির হানা, মেহেরের করে  
 ছিল হুটি পারাবত, অতর্কিত ভাবে  
 দিখিল হুঁলে হুটি, একটি তাহার

গিয়াছিল উড়ে কিন্তু সেলিম যখন  
 সুধাইলা হাসিমুখে সে স্বর্ণ-কুমুদে  
 “কোথা সেই পারাবত।” হাসিয়া বালিকা  
 বলিল “উড়িয়া গেছে,” আবার সেলিম,  
 সুধাইলা বালিকারে স্নেহ বচনে  
 “কেমনে উড়িয়া গেল ?” উত্তরিল। বাল।  
 হাসিমুখে শ্রীবাখানি করিয়া বঙ্কিম  
 “এই ভাবে উড়ে গেল,” মুহূর্ত্তে বালিকা  
 হাত নেড়ে ছেড়ে দিল। অস্ত পারাবত;  
 সেলিম অবাক হ'য়ে দেখিতে লাগিল।  
 মতুষ্য নয়নে সেই সৌন্দর্য্য তাহার,  
 সেই হাত নাড়া, সেই মুখ ভার ভার  
 সৌন্দর্য্য-জগতে যেন দেবেন্দ্র বাহিত  
 কি এক নূতন সৃষ্টি—শ্রীতি বিধাতার।  
 বহু দিন পরে পুনঃ বধি শের খাঁরে  
 মেহেরে বন্দিনী করি এনেছিল। যবে  
 রাজ-অস্তঃপুরে, মাত্র পাঁচসিকা বৃত্তি  
 দিয়াছিল। জাহাঙ্গীর জীবিক। তাহার।  
 পঞ্চ বর্ষ পরে পুনঃ জাহাঙ্গীর হৃদে  
 অতীতের স্মৃতি যবে উঠেছিল জাগি;  
 অপরাহু একদিন মেহেরের ঘরে  
 গিয়াছিল। জাহাঙ্গীর, দেখিল। মেহের  
 একটি পর্য্যক পরে রয়েছে শুইয়া  
 দীন হীন বেশে, নিয়ে কতগুলি দাসী  
 সুসজ্জিত বহু মূল্য রতনে ভূষণে  
 করিতেছে শিল্প কার্য্য বসিয়া নীরবে।  
 জিজ্ঞাসিল। দিল্লীখর মধুর বচনে  
 ইহাদের কর্তা তুমি এত দাসী তব,  
 কি আশ্চর্য্য। বেশ ভূষা এত মূল্যবান  
 ইহাদের কর্তা তুমি আতরণ হীন



দেহে তব পরিগ্রাহ সামান্য বসন ।  
উত্তরিল। শশীমুখী সজল নয়নে  
ভয় স্বরে জাহাপনা । “আমি দাসী তব,  
তুমি প্রভু মোর তুমি যে ভাবে রেখেছ  
এ দাসীরে, দাসী আজি আছে সেই ভাবে ।”  
আমি কর্তী ইহাদের, এরা দাসী মোর  
যে ভাবে রেখেছি আমি আছে সেই ভাবে ।”  
এই সেই দিল্লী ?—হায় এই সে নগরী ?

যেখানে বেগমবন্দ মধুর সায়াছে  
যমুনার স্নিগ্ধ বায়ু করিত সেবন  
বসিয়া আনন্দে উচ্চ প্রাসাদ-শিখরে ।  
মোমতাজ কুদসিয়া মূর সেলিনা জেরিনা  
জেরান জেরত জেব যোধ যোধ মতি  
অসংখ্য বেগম মরি শোভিত যেখানে  
ফুটন্ত নলিনী প্রায়, যে দিল্লীর বুকে  
আরঞ্জীব, জাহাঙ্গীর শের ও বাবর  
আরো কত পরাক্রান্ত মোস্তফা সত্ৰাট  
ধর্মের পবিত্র জ্যোতিঃ করি বিকীরণ  
প্রবল প্রতাপে বিশ্ব করিয়া কম্পিত  
শাসিত ভারতবর্ষ ; এই সে নগরী ?  
—তুলনা নাহিক যার সমগ্র জগতে ;  
এই সেই ? ইসলামের পবিত্র গৌরবে  
ছিল যেই পরিপূর্ণ ; অন্ধে অন্ধে যার  
মোসলেমের সুখ দুঃখ রয়েছে অঙ্কিত  
চিরতরে, মোসলেমের উত্থান পতন  
অতীতের স্মৃতি, হায়, জড়িত যেখানে  
সবকে সবকে এই ধূলা রাশি সনে ।  
সেই দিল্লী এই ? কত আনন্দের হাসি  
বিবাদের দীর্ঘশ্বাস, শোক-অশ্রুজল

যে দিল্লীর স্তরে স্তরে রয়েছে মিশিয়া  
কাঁদাইতে ভারতীয় সমগ্র মোসলেমে !  
এই সেই দিল্লী ?—হায় এই সে নগরী ?  
আজি সে মুমূর্ষু প্রায় গভীর নীরব ।  
নীরব মোলানা মুন্সি কারী ও এমাম—  
—ইসলামের গুচতরু—সুন্দর কথাগুলি  
কেহই করেনা ব্যাখ্যা মোস্তফা-সমাজে  
আজি আর ; সবই যেন ঘোর অচেতন !  
নীরব দামামা ভেরী, বীরের হুকার,  
নীরব সেতারা বীণা কামিনীর কণ্ঠ,  
নীরব পাণিয়া শামা, কোকিলা নীরব ;  
নিরানন্দ চারিদিক, স্পন্দহীন সব ।  
দিল্লীর সে রাজ-লক্ষ্মী ভস্ম মাখি দেহে,  
সাজিয়াছে আজি যেন ঘোর উদাসিনী ।  
ঐশ্বর্য্য সম্পদ খ্যাতি সব হারাউয়া  
আজি যেন মন্মথঃখে করিছে রোদন  
উদ্যাদিনী প্রায় হায় দিবস যামিনী ।  
দিল্লী যেন জ্ঞান-শূণ্য ঘোর অচেতন ।  
কে আছে মোসলেম হেন সমগ্র ভারতে  
দিল্লীর হৃদশা হায় করিলে দর্শন  
নাহি কাঁদে যার হৃদি, শোক-অশ্রুজলে  
নাহি ভাসে যার বক্ষ ;—হায় অভাগিনী ।

অসংখ্য শিবির এই দিল্লীর জন্মরে ।  
চারি দিকে অগণিত মহারাষ্ট্র-সেনা  
অমিছে কুপাণ হস্তে মূর্ত্তি ভীষণ ।  
নাহি আজি “অর্ধ চন্দ্র”, দিল্লী-দুর্গ শিরে  
উড়িতেছে মহারাষ্ট্র-বিজয় কেতন  
শিবিরের অভ্যন্তরে মন্মথ-আসনে  
অসি হস্তে সদাশিব কালসূর্য্য প্রায়



সমানীন, চারিদিকে সেনা, সেনাপতি  
 অগ্নিত, মধ্যস্থলে পেশবা-ভনর  
 বিশ্বনাথ রাজবেশে ভীষণ-দর্শন।  
 উলঙ্গ কপাণ হস্তে পায়গা সৈনিক  
 দাঁড়াইয়া বোদ্ধবেশে গভীর বদন।  
 কে বুঝিবে বিধাতার রহস্য কুটিল ?  
 আজি যথা সিদ্ধ, কালি মরু ভয়ঙ্কর ;  
 কালি যথা মরু, আজি ভীষণ সাগর।  
 তাঁরি কুটনীতি বলে উখান পতন  
 মানবের আলো তম: তাঁহারি কলিত,  
 তাঁহারি ইচ্ছার আজি হিন্দুর সাম্রাজ্যে  
 মোস্লেমের আধিপত্য মোস্লেম-দিল্লীতে  
 রাজবেশে প্রতিষ্ঠিত, পেশবা নন্দন।  
 এ নীতি বুঝিবে কিসে অজ্ঞান মানব ?  
 ভাঙ্গা গড়া, গড়া ভাঙ্গা এ মরু জগতে  
 বিধাতার গুপ্ত নীতি—রহস্য হুর্গম ?  
 মূর্খ নর একবার ভেঁবে দেখ মনে  
 কি সূন্দর ছটি চিত্র পাশাপাশি ভবে  
 বিধাতার সে ভীষণ শক্তি নিদর্শন।  
 মানব শক্তিতে বল কি হয় জগতে ?  
 মানবের শক্তি যদি হ'ত কার্যকরী,  
 তা হ'লে কি দেখিতাম হিন্দুর সাম্রাজ্যে  
 মোস্লেমের আধিপত্য ? মোস্লেম দিল্লীতে  
 রাজবেশে তুচ্ছ-সেই পেশবা-নন্দন।  
 আমরা করণ মাত্র সমস্ত কর্মের  
 কর্তা তিনি, তাঁরি ইচ্ছা হইছে পূরণ।  
 আমাদের সাধ্য নাহি করিতে অস্তথা  
 ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর, যে দিকে চালান  
 বাই মোরা সেই দিকে, হেঁলে কেঁদে কিরি

কীড়নক প্রায় তাঁরি সংসার ভিতরে।  
 সদাশিব ক্রুদ্ধ ভাবে বলিতে লাগিল।  
 “কতর মোস্লেম কাছে এর চেঁয়ে আর  
 কোন্ আশা ? কতবার জনকে তাহার,  
 সাহায্য করেছি মোরা, প্রতিফল তার  
 দিল আজি অকৃতজ্ঞ মোস্লেম বর্বর।  
 আগে যদি জানিতাম কতর এমন  
 পাপিষ্ঠ অযোধ্যাপতি, তবে কি কখন  
 মুহূর্ত সাহায্য করি সেই নরাধমে ?  
 হতভাগা দূতে মম করিয়া বধনা  
 মিলিয়াছে এবে সেই দোরাণীর সনে  
 এমন পষণ্ড আর কে আছে জগতে ?  
 কি আশ্চর্য্য, পাপিষ্ঠের সন্তোষের তরে  
 দিয়াছিনু ধন রত্ন কত উপহার  
 নার নহরের \* সাথে, প্রতিফল তার  
 দিল হাতে হাতে সেই কতর পামর।  
 কি কতি আমার তাতে ? সন্মুখ সমরে  
 অবশ্য ধ্বংসিব আমি সমগ্র মোস্লেমে।  
 ডরিনা কাবুল-পতি, দোরাণী সাহারে।  
 কি করিবে নরাধম পাষণ্ড নজীব  
 সন্মুখ সমরে মম, সেই নরাধম  
 মূল নেতা দোরাণী যে কলের পুতুল ;  
 তারি অনুরোধে আজি সমগ্র আফগান  
 রণোন্মত্ত ভারতীয় সমগ্র মোস্লেম  
 অসি হস্তে সুলভিত, তারি মন্ত্রণার  
 করোকা বাঘের সেই চুর্চুর্ষ পাঠান  
 মিলেছে দোরাণী সনে সমর প্রাঙ্গণে ;  
 তর কি তাহাতে ? আমি নহি কাপুরুষ,  
 বীরবংশে জন্ম মম, জন্মিলে মরণ

\* নার নহর, পেশবার দূত। নবাব মুজাউদুদ্দৌলার একজন আনিয়ার জন্য সদাশিব ইচ্ছাকেই অনুমোদিত করেছিলেন।

বিবির অঞ্চল লিপি ; সমুখ সমরে  
 যুঝিব বীরের মত, যদি যদি তাহে  
 নাই হুঃখ। স্বদেশের উদ্ধারের তরে  
 যুজ্য ত বীরের পক্ষে স্বর্গের সোপান।  
 কিন্তু হুঃখ, চিরকাল কত যে সাহায্য  
 করিয়াছি মোরা এই সুজার জনকে,  
 আজি কি না নরাধম অকৃতজ্ঞ সুজা  
 তুলি সেই উপকার, দিয়াছে কিরা'য়ে  
 দূতে মম,—আজি তার এই প্রতিদান ?  
 যুদ্ধান্তে দেখিব আমি কত বলীয়ান  
 নবাব সুজাউদ্দৌলা, এর প্রতিশোধ  
 নিশ্চয় স্বহস্তে আমি করিব প্রদান।  
 “সুজার কি দোষ ?” ধীরে বলিল রাঘব  
 সকলি তোমার ভ্রম, জান না কি তুমি  
 আদালী নজীব মত সেও মুসলমান ?  
 এও কি সম্ভব, বল মোস্লেম হইয়া  
 মোস্লেম বিক্রমে অসি করিবে ধারণ ?  
 আদিনাও মহাত্মা ঘোর প্রবঞ্চক  
 তার মত নরাকৃতি পশু অশ্রু আর  
 নাই এ ভারতবর্ষে, তুমি কেন তারে  
 বিশ্বাস করিছ এত ? সেও যে তোমায়  
 ছলিবে না, কি বিশ্বাস বল দেখি মোরে ?  
 তোমারি বুদ্ধির দোষে কত যে অনর্থ  
 ঘটতেছে, সূর্যামল \* তোমারি কারণে  
 চ'লে গেছে, বল দেখি হয়নি কি ক্ষতি  
 তাহার গমনে ? তুমি না বুঝে এ সব  
 নিজ নির্বুদ্ধিতা দোষে মজিছ আপনি  
 আর মজাইছ সবে ? কোন্ দোষে দূরী  
 সূর্যামল ? না বুঝিয়া কেন তবে তারে

করেছিলে অপমান ? শিবির ভিতরে  
 রেখেছিলে বন্দী প্রায় প্রহরী বেড়িত।  
 এ তোমার কোন্ নীতি ? শুধু খেচ্ছাচার ;  
 তোমারি হিতার্থে রাজা সূর্যামল জাঠ  
 বলেছিল। “যে ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত,  
 তাহাতে সমর-ক্ষেত্রে সৈন্য দল সনে  
 ভার্য্যা কণ্ঠা ধন রত্ন রাখা অসঙ্গত।  
 সম্রাটের সৈন্যাপেক্ষা তোমাদের সৈন্য  
 শক্তি শালী সত্য বটে, কিন্তু শতগুণে  
 তোমাদের সৈন্যাপেক্ষা দোরাণী সৈনিক  
 লঘুহস্ত, রণক্ষেত্রে দুর্ব্বল ভীষণ !  
 অতএব এদারুণ সঙ্কট সময়ে  
 দাস দাসী ভার্য্যা কণ্ঠা অতিরিক্ত অব্য  
 চত্বলের অশ্রু ভীরে নিজ অধিকারে  
 রাখা কিম্বা অশ্রু হর্গে রাখা সুসঙ্গত।  
 অশ্রুধা সংগ্রাম-ক্ষেত্রে ঘোর ব্যতিব্যস্ত  
 হতে হবে ; মোস্লেমের ঘোর আক্রমণে  
 ছত্রভঙ্গ হ'য়ে সব পড়িবে সমরে।  
 ইহাও কি মিথ্যা কথা ? কেন তবে তারে  
 ক'রেছিলে অপমান আগ্রার শিবিরে ?  
 “নহি কাপুরুষ আমি” বলিল গজিয়া  
 সদাশিব, “কেন তবে রমণীর মত  
 মোস্লেমের ভয়ে আমি রাখিব স্নানুরে  
 পুত্র কণ্ঠা পরিবার ? এ কি বীর-ধর্ম ?  
 কি আশ্চর্য্য সে আমারে ভয় দেখাইছে ?  
 সূর্যামল কাপুরুষ, সামান্ত কৃষক  
 তাহারি মন্ত্রণা নিয়ে চলিবে কি শেষে  
 রণক্ষেত্রে সদাশিব ? হিহি ! কোন্ মুখে তুমি  
 আনিলে এ পাপ কথা ? বৃদ্ধ মলহর

শক্তিহীন, সেও এবে তোমারি মতন  
মোস্লেমের ভয়ে ভীত, কিন্তু সদাশিব  
নহে ভীত কাপুরুষ, দেশের কল্যাণে  
হাসিয়া জীবন দান করিবে এখনি ।  
পাঠায়েছি সন্ধিপত্র, হয় হবে সন্ধি,  
নহিলে দেখাব আমি সমর-প্রাঙ্গণে  
এ ভূজে বিক্রম কত, দেখাব তখন  
সদাশিব নহে ভীত, মোস্লেম-শোণিতে  
রঞ্জিবে এ অসি তার, করিবে তর্পণ ।”  
মুহূর্তে লাগিত অসি নিক্ষেপিল। বীর,  
বিহ্বলের মত অসি উঠিল ঝলিয়া ।  
আবার মুহূর্তে বীর কহিল গর্জিয়া  
“ভয় কি ? কপাণ মোর, শেষের সহায়  
উরিনা তোমার মত দোরাণী নজীবে ।  
চ’লে যাও মহারাষ্ট্রে, এত ভয় যদি  
কি কাজ থাকিয়া তবে সমর প্রাপ্তরে ?”  
“ও সব সামান্য কথা কহিল গভীরে  
বলবন্ত \* “সূর্যমল সামান্য কৃষক,  
কি ক্ষতি গমনে তার ? নহে শক্তিহীন  
মহারাষ্ট্রী, কেন তবে হইলে বিহ্বল ?  
লক্ষ লক্ষ বীর পুত্র মহারাষ্ট্র-হৃদে  
সজ্জিত সমর-সাজে, মোস্লেমের ভয়ে  
কেন হ’ব আতঙ্কিত ? শক্তি উপাসক  
মহারাষ্ট্রী, শক্তি পূজা করিবে নিশ্চয়  
আপের শোণিত দিয়া সমর-প্রাপ্তরে ।  
সূর্যমল পলায়েছে শূকার ইজিতে  
জানি সব, সে কথার নাহি প্রয়োজন,  
এখন কর্তব্য বাহ্য কর নির্ধারণ,  
অনর্থ সন্ধির চেষ্টা ক’রেছি আমরা,

নজীব থাকিতে সন্ধি হবে না নিশ্চয় ।  
দিল্লী বিলুপ্তিয়া বাহা করেছি অর্ধজন  
সে অতি সামান্য, তাহে কি হ’বে মোদের ?  
চল সব একে একে সব দুর্গগুলি  
ধ্বংসিয়া মোস্লেম-শক্তি করি উৎপাটন ।  
হয় ত অনেক অর্থ পাইব আমরা  
লুপ্তিলে সে দুর্গগুলি, অবশেষে মোরা  
সম্রাটের গৃহগুলি ধ্বংস করি তোপে  
গুপ্ত অর্থ কোথা আছে করিব সন্ধান ।”  
“আমারো ইহাই মত” বলিয়া জাহাজী †  
বজ্রনাদে, “তাহা হ’লে নিশ্চয় আমরা  
মোস্লেমের বিষদন্ত পারিব ভাঙ্গিতে  
অবিলম্বে!” “ঠিক কথা কি সংশয় ইথে ?”  
বলিল গভীরে রাজা সুদেব পাটল । ‡  
“এ’স সব বীরদর্পে ধ্বংসি গে মোস্লেমে ;  
কি সাধা সন্মুখ যুদ্ধে আঁটিবে তাহারা  
মহারাষ্ট্র-মৈত্র সনে ? অসম্ভব তাহা ।  
মোস্লেমের মৈত্রগুলি ভীত কাপুরুষ  
কে করিবে যুদ্ধ ? তারা বিলাসী কামুক,  
তারা কেন সুশিক্ষিত মহারাষ্ট্রী সনে  
পারিবে যুদ্ধিতে এবে সন্মুখ সমরে ?  
এস সব বীরবেশে “হর হর” রবে  
কাঁপাইয়া দিগন্তর করি আক্রমণ  
কুঞ্জপুর, মনোবাহা হইবে পূরণ ।”  
উত্তরিল হাসিমুখে রাঘব আবার  
বুঝিলাম বহুদর্শী সেনাপতি তুমি ।  
নহিলে বলিবে কেন দোরাণী সৈনিকে  
কামুক বিলাসী ?—তারা মূর্তিমান্ বম !”  
“হ’ক বম্, আমাদের কি ভয় তাহাকে ?”

\* সদাশিবের শ্যামক বরবত্তরাঙ।

† মহাবাহু সেনাপতি । ‡ মহারাষ্ট্র সেনাপতি ।

বলিলা তৈরবে বীর যশোবন্ত রাও \*  
 “নিশ্চয়—নিশ্চয় মোরা ধ্বংসিব অচিরে  
 মোস্লেমের দুর্গগুলি, লইব লুপ্তিয়া  
 ধন রত্ন, কি করিবে মোস্লেম বর্কর ?  
 শক্তিহীন হ’য়ে ক্রমে, সম্মুখ সমরে  
 অবশ্যই তাহাদের হইবে পতন ।  
 চল সবে, কুঞ্জপুরে অসংখ্য রোহিলা  
 ছাউনি করিয়া আছে, ধ্বংসিব তাদের ।  
 অস্ত্রধা সুবিধা নাহি হইবে মোদের  
 আক্রমিতে নরাধম দোরানী সাহারে ।  
 বিশেষতঃ কুঞ্জপুর করিলে বিধ্বস্ত  
 আফালী সাহার পক্ষে বিষম বিপদ  
 ঘটবে অচিরে, তারা পারিবে না আর  
 সাহায্য রসদ কিছু লভিতে নিশ্চয় ।  
 কুঞ্জপুরে অগণিত রোহিলা পাঠান  
 নিবসিছে, তাহাদের করিলে হনন  
 কে করিবে সহায়তা আফালী সাহারে ।”  
 “আমারো তাহাই মত” বলিলা আত্মাজী † .  
 “কুঞ্জপুর দুর্গ ধ্বংসি পাইব আমরা  
 বহু অর্থ, এ মন্ত্রণা অতি সুসঙ্গত ।”  
 “কুঞ্জপুরে বহু অর্থ রয়েছে সঞ্চিত”  
 বলিলা জাহ্নন ‡ “চল ধ্বংসিয়া সে দুর্গ  
 আপনার শক্তি আরো করি দৃঢ়তর ।  
 অনেক রসদ মোরা পাইব সেখানে,  
 মাতঙ্গ বলদ অশ্ব কত যে পাইব  
 কে জানে তা’ ? ইহা ভিন্ন বহু ধন রত্ন  
 আমাদের হস্তগত হইবে নিশ্চয় ।  
 এইরূপে দুর্গগুলি হলে হস্তগত  
 একে একে, আমাদের শক্তির নিকটে

কি সাধা যুঝিবে এসে আফালী বর্কর ?”  
 “কে যুঝিবে মহারাষ্ট্র শক্তির নিকটে  
 এই বিধে ?” বাজ স্বরে কহিলা গর্জিয়া  
 সমসের † “সে দিনের দিল্লীর সংগ্রামে  
 মোস্লেমের যে বীরত্ব জানা গেছে সব ।  
 সেনাপতি এয়াকুব x কাপুরুষ প্রায়,  
 সাহাবুদ্দিন § পরামর্শে গিয়াছে ছাড়িয়া  
 দিল্লী দুর্গ, তাহারাই যুঝিবে সংগ্রামে  
 আমাদের সৈন্য সনে ? অসম্ভব তাহা ;  
 যদি যুঝে, আমাদের তোপের সম্মুখে  
 ভস্ম হ’বে অচিরেই পতঙ্গের মত ।  
 অনর্থক বাক্য ব্যয়ে নাহি কোন ফল,  
 চল সবে কুঞ্জপুরে, সিংহ পরাক্রমে  
 ধ্বংসিব সে দুর্গ মোরা তোপের অনলে ।”  
 এব্রাহিম তীব্রস্বরে কহিলা গর্জিয়া  
 “বৃথা বাক্য ব্যয়ে বল কোন্ প্রয়োজন ?  
 যুঝিতে বাসনা যদি এস রণ-ক্ষেত্রে  
 এই দণ্ডে, দেখাইব ভীষণ বিক্রম  
 তরবারে, তর্ক যুদ্ধে বৃথা পরিশ্রম !  
 “কি বল অস্ত্রাজী” ? ০ ধীরে কহিলা অস্ত্রাজী  
 “ভাণ্ডের আদেশ পেলে কল্যাই আমরা  
 ছুটিব সে দুর্গপানে বধিতে মোস্লেমে,—  
 —বধিতে সে যুদ্ধপ্রিয় রোহিলা পাঠানে ?”  
 “তথাস্তু বলিলা ধীরে পেশবা-তনয়  
 বিশ্বনাথ ; সদাশিব বলিলা গভীরে  
 তথাস্তু, সৈনিকবৃন্দ সাজ বীর-সাজে  
 আক্রমিব কুঞ্জপুর ।” উৎসাহে তখন  
 কাঁপাইয়া দিল্লী-দুর্গ কাঁপায়ে নগরী  
 সমস্ত সৈনিকবৃন্দ উঠিল গর্জিয়া  
 “হর হর মহাদেও” দূরের প্রতিধ্বনি  
 জাগিল, বিষয়ে ভয়ে কাঁপিল অবনী ।

\* যশোবন্ত রাও পুন্ডার মহারাষ্ট্রীয় গজের সেনাপতি ।

† আত্মাজী সৈকরার মহারাষ্ট্রীয় গজের সেনাপতি ।

‡ বজ্রজী জাদুন মহারাষ্ট্রীয় গজের সেনাপতি ।

† সমসের বাহাদুর মহারাষ্ট্রীয় গজের সেনাপতি ।

x দিল্লীদুর্গ রক্ষক । § উজির সাহাবুদ্দিন খাঁ ।

০ অস্ত্রাজী মান কেশর মহারাষ্ট্রীয় গজের সেনাপতি ।

## অষ্টম সর্গ

[ বিদ্যাচল ; ভৈরবী মন্দির ]

বিদ্যা-কটিদেশে চারু নির্জন কানন  
যদি কি সুন্দর দৃশ্য, সুধাঃসু-কিরণ  
শূন্যে শূন্যে বিভাসিত সুবর্ণের সনে  
সুশোভিত যেন বহু উজ্জল রতন !  
সুনীল গগন-তলে প্রভঞ্জন বেগে  
মেঘপুঞ্জ প্রধাবিত নয়ন-রঞ্জন !  
ভারাদল হীনপ্রভ, সুধাঃসুর রূপে  
লুকচিত্ত, সঙ্কচিত্ত শোভা অমুপম !  
নির্ব্যাত নির্জন বন, জীবন-সাগরে  
নাহি উন্মি, বসুন্ধরা ঘোর অচেতন !  
স্তব্ধ যামিনী, স্তব্ধ প্রকৃতি সুন্দরী  
হেরিছে নিদ্রার ঘোর অনন্ত স্বপন ।

কাননের একপ্রান্তে অতি পুরাতন  
একখানা ক্ষুদ্র বাড়ী, যুগ্ম কাল সনে  
বহুকাল, অতি জীর্ণ হ'য়েছে এখন ।  
ভগ্ন প্রায় কক্ষগুলি . প্রাচীর সকল  
পতন উদ্ভূত, কোথা প'ড়েছে ভাঙ্গিয়া ;  
কত ভূগুণ গুল্মলতা জন্মিয়াছে তায় ।  
স্থানে স্থানে অর্ধ ভগ্ন ইষ্টকের স্তূপে  
কত বন-বৃক্ষ কত কানন বর্জরা  
শোভিছে সুন্দর বন-কুসুম স্তবকে ।  
অগুরে একটি রম্য ক্ষুদ্র উপবনে  
কত কুসুমিতা লতা নব অল্পরূপে  
আলিজিয়া দৃঢ় ভাবে তমাল বকুলে  
রচিয়াছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঞ্জ মনোহর ।  
গভীর নির্জন স্থান, মির শান্তি প্রদ ;

সংসারের কোলাহল না পারি সহিতে ,  
এই ক্ষুদ্র রাজ্য ল'য়ে প্রকৃতি সুন্দরী  
করিছে রাজত্ব সদা, সৃজিলা যতনে  
লতাকুঞ্জে আপনার বিজ্ঞান-ভবন ।  
কত শত কলকণ্ঠ স্বভাব গায়ক  
মোহিছে হৃদয় তার আরণ্য-সঙ্গীতে  
ঢালিয়া পীযুষ ধারা এ নির্জন বনে ।  
একপার্শ্বে কালিকার একটি মন্দির  
অতি উচ্চ, ভগ্নচূড় ; বিদীর্ণ প্রাচীরে  
একটি অশ্বখ বৃক্ষ প্রহরীব প্রায়  
দাঁড়াইয়া ; নিকটেই অতি পুরাতন  
বাগী এক, নানারূপ তৃণ লতা জালে  
আচ্ছাদিত, সুশোভিত কুমুদ কল্লারে ।  
বাগীর সোপানগুলি কাল-অঙ্গাঘাতে  
ভগ্নপ্রায়, স্থানে স্থানে গিয়াছে কাটিয়া  
উঠেছে শেওলা, ভূগুণ ; ক্ষুদ্র তরুরাজি  
উঠিয়াছে স্থানে স্থানে সোপান ভেদিয়া ।  
সম্মুখে প্রাঙ্গণ ক্ষুদ্র অতি পরিষ্কার ;  
মানবের অবস্থিতি আজিও নীরবে  
বিজ্ঞাপিছে, একপ্রান্তে অতি দীন ভাবে  
সুশুভ্র বসন পরা ধূতুরা হুঃখিনী  
তুকাইছে অনাদরে, তুকায় যেমতি  
অথবো বজ্রের গৃহে বিধবা রমণী ।  
কত কুসুমিত তরু প্রাঙ্গণের পাশে  
দাঁড়াইয়া চক্রকরে শোভিছে সুন্দর  
জ্যেষ্ঠবৃক্ষ ; একধারে স্তম্ভের উপরে  
একটি তুলসী বৃক্ষ, মন্দিরের পাশে



একখানি ক্ষুদ্র গৃহ, অভাস্তরে তার  
ছটি কক্ষ পাশাপাশি, একটির মাঝে  
ছইটি যুবতী মূর্তি — যৌবনে যোগিনী ।

একজন শ্রাম বর্ণা বোড়শী যুবতী,  
নয়নে বিষাদ-রেখা সদা প্রকটিত  
নিরাশার ছায়া সনে, আকৃতি মধ্যমা  
গৈরিক বসন পরা যোগিনীর ছবি ;  
এলো থেলো কেশরাশি কক্ষ তৈলহীন ।

অন্য জন শয্যা পরে শুইয়া বিষাদে  
নিরখিছে শশধরে, নয়ন অচল,  
যেন কোন যোগে মগ্না, অচেতন প্রায় ;  
দেহ খানি অতি কক্ষ বিষাদের ছবি ;  
হৃদয়ের অনিবার্য চিন্তা-মেঘ-ছায়া  
প'ড়েছে ললাট-পটে অমল দর্পণে ।  
মুক্ত বাতায়ন পথে পশিয়া কৌমুদী  
চুখিতোছে যুবতীর হৈম কলেবর ।

তরঙ্গিত কেশগুচ্ছ সুধাংশু কিরণে  
শোভিছে কি অনুপম, উজ্জ্বল বদন  
কৌমুদী রঞ্জিত কুল গোলাপ বিমল ।  
তারাসহ তারানাথ চ'লেছে ভাসিয়া  
গগন-সাগরে, বামা বিকোভিত প্রাণে  
নিরখিয়া সেই দৃশ্য অচল বিহ্বল ।  
প্রথমা যুবতী বসি ক্ষুদ্র কুশাসনে  
অবলম্বি চাক্র পৃষ্ঠ মন্দির প্রাচীরে  
নীরবে চাহিয়া আছে দ্বিতীয়ার পানে ।  
নীরবে শুনিলা দৌহে একাধি হৃদয়ে  
সুদূর হইতে এক সঙ্গীত লহরী  
বধিয়া শীঘ্র ধারা সে নৈশ গগনে

ধীরে ধীরে অতিনূরে যাইছে মিশিয়া  
গিরি শৃঙ্গে, সে নির্জ্ঞন বিদ্যার কাননে ।

১

আ ছি ছি ঘটপদ ছু'ওনা উহারে ।  
ওয়ে বড় অভাগিনী আজন্ম বিষাদিনী,  
আছে পড়ে অযতনে কাননের ধারে ।  
ফোটে না একটি কথা, প্রাণে যেন কত ব্যথা,  
হাসে না প্রেমের হাসি তোষে না কাহারে ।  
সদা অভিমান ভরা, বিশ্বাস বৈশ পরা,  
মুখ খানি ভার ভার চোখে জল ঝরে,  
আ ছি ছি ঘটপদ ছু'ওনা উহারে ;

২

ছু'ওনা উহারে ।  
ও বড় কঠিন মেয়ে কখনো আসে না ধৈ'য়ে  
শোভেনা প্রেমিক-হৃদে মুকুতার হারে ।  
চুমনা উহারে কেহ দেয় না প্রাণের সৌহ  
তুমি কেন ঘটপদ যাও ও'র ধারে ?  
ছু'ওনা উহারে তুমি, ও যে চির বিষাদিনী  
পাবেনা সুধার উৎস উহার অন্তরে ।  
আ ছি ছি ঘটপদ ছু'ওনা উহারে ;

৩

ছু'ওনা উহারে ।  
তুমি হে নির্লজ্জ বড়, এ কেমন ভাব ধর,  
যেখানেই দেখ কলি যাও সেথা উড়ে ।  
ছি ছি ছি এ কোন্ রীতি, এ নহে সরল প্রীতি,  
ঘটপদ পায়ে ধরি ক্ষমা কর তারে ।  
যেওনা উহার কাছে, না জানি কি হবে পাছে,  
ভাবিলে সে কথা মম হৃদয় শিহরে ।  
এ'স ভাই কথা রাখ, যেওনা—দূরেই থাক,  
কি জানি সে অভাগিনী যদি ঝ'ড়ে পড়ে ?  
আ ছি ছি ঘটপদ ছু'ওনা উহারে ।

৪

ছু'ওনা উহারে ।  
ছুইলে বাজিবে ব্যথা, সার হবে ব্যাকুলতা  
গরল পনিবে তব কোমল অন্তরে ।  
উহার কঠিন প্রাণ, শুধু ভরা অভিমান

“আ” শব্দটি দীর্ঘ করিয়া পড়িতে হইবে।



কোবলভা নাহি সেখা হলাহল ধরে ।  
ভালবাগা সুখ আশা, প্রেমের সরল ভাষা  
পাবেনা —পাবেনা তুমি বৃহৎর তরে ।  
আ ছি ছি ঘটপদ ছু'ওনা উহারে ।

৫

ছু'ওনা উহারে ।

তোমার পরশে ওয়ে হবে কলঙ্কিনী ।  
এস এস ফিরে যাই, তুমি কি জাননা ভাই,  
ও যে চির মানসখী বন-নিবাসিনী ?  
জানেনা প্রেমের হাস, জানেনা মধুর ভাষা,  
জানেনা গভীর কত প্রেম তরঙ্গিনী ।  
মনের আবেগ ভরে, আছে এক ধানে পড়ে  
নাহি ওন বেশ ভূষা চটুল চাহনি ।  
কক্ষ কেশ বায়ু ভরে, চোখে মুখে উড়ে পড়ে  
বিষাদের ছবি যেন চির উপস্থিত ।  
ঘটপদ ক্ষমা কর, আর কেন, কণা ধন  
এ নহে তোমার সেই ফুটন্ত নলিনী ?

৬

ছু'ওনা উহারে ।

এ নহে গোলাপ বেলী চামেলী বজ্রিনী ।  
যাচার স্রবতি শ্রাবণ প্রেমের অক্ষুণ্ণ ভাষে,  
তোমার সময়ে ফুটে প্রেম নির্ঝরিনী ।  
ঘটপদ চেয়ে দেখা, প্রেম অভিমান শিখ,  
এ যে চির মানসখী বৃত্তুরা যোগিনী ।  
তোমার মধুর গানে, প্রেমের মোহন ভানে,  
এ নহে ভুলিবে কভু, —এ যে উপস্থিত ।  
হাসি নাই, খুসি নাই, সময়ে শূন্য ছাই  
গোধলি-আঁধারে মাঝা শুভ্র সুগন্ধি  
ঘটপদ যাও, যাও আর কেন — মাঝা যাও  
এ নহে তোমার সেই স্বর্ণ কমলিনী ?

৭

ছু'ওনা উহারে ।

ঘটপদ পারে ধরি ছু'ওনা উহারে ।  
শেকালী বকুল আছে, যাও তুমি তার কাছে,  
বালতী বল্লিকা বতি তুমিবে তোমারে ।  
বিষবার কাছে কেন? — ছি ছি অলি এ কেমন,  
সরবে বরষ কাটে কথা নাহি মরে ।  
বে'ওনা বে'ওনা ভাই বিধবারে কুতে নাই,

ছুইনে কাটিবে যদি বাইবে সে মরে ।  
আ ছি ছি ঘটপদ ছু'ওনা উহারে ।

নীরবিল সুধাকর্ষ ; বিজ্ঞার কাননে  
কি এক অপূর্ব ভাব উঠিল জাগিয়া ।  
উভয়েই মুগ্ধপ্রাণে রহিল। বসিয়া  
নীরব, দেখিল। নৈশ প্রকৃতি সুন্দরী  
কি এক অপূর্ব বেশ করেছে ধারণ  
বিজ্ঞা-বন্ধে, চন্দ্রমার স্নিগ্ধ কিরণে  
পত্রে পত্রে কুলে ফলে কি শোভা মাধুরী ।  
স্নিগ্ধ কোমুদী-স্নাত নিকষাক বিটপী  
দাঁড়াইয়া অচঞ্চল, সুবর্ণ মুকুট  
শিরোদেশে ঝলিতেছে সুধাংশু কিরণে ।  
কণ্ঠে কুমুমের মালা পুষ্পিত বল্লরী  
শোভিছে কি মনোহর নয়ন রঞ্জন ।  
বহুক্ষণ পরে ধীরে প্রথমা যুবতী  
একটি নিখাস ছাড়ি কহিল। সাদরে  
দ্বিতীয়ারে “একাকিনী কেমনে ত্যজিয়া  
আলি গৃহ ভাসাইয়া শোকের সাগরে  
বৃদ্ধ পিতা মাতা আর স্বজ্ঞা হুঃখিনীয়ে ?  
কি আশ্চর্য্য, দিদি তোর অসীম সাহস ।  
নর্যদার তীরে সেই কালিকা-মন্দিরে  
যদি মা ভৈরবী নাহি যেতেন সে দিন  
হার দিদি, কি চক্ষুশা হইত যে তোর  
ভাবিতে শিহরে যদি কেঁদে উঠে মন,  
নিশ্চয় জীবন তোর যাইত সে দিন  
নদী-গর্ভে অনর্থক নিজ বুদ্ধিদোষে  
এসেহিস্ এ বিদেশে, কিছুদিন পরে  
অবশ্যই স্বামী তোর যাইতেন দেশে ।  
কি লজ্জার কথা, ছি ছি কুলবধু তুই,

তোর কি সাজে লো সখি এ নব যৌবনে  
 গৃহত্যাগ ?—এ কলঙ্ক রাখিব কোথায় ? —  
 —কেমনে দেখাবি মুখ স্বজাতি-সমাজে ?  
 লবঙ্গ ! বারেক তুই ভেবেছিস মনে  
 কত লোকে কত কথা বলিবে তখন  
 কত ঠারে, কত হাসি বর্ষিবে নীরবে  
 কত শ্লেষ, সে গঞ্জন। সহিবি কেমনে ?”  
 উত্তরিল। সুধামুখী লবঙ্গ লতিক।  
 “বাসন্তী ! কেন লো বৃথা হুঁসিস্ আমারে ?  
 পতি বিনে রমণীর কে আছে জগতে  
 আরাধ্য ? দেবতা পতি সংসার-নরকে !  
 পতি ধর্ম, পতি স্বর্গ, পতি-পদ-রেণু  
 একমাত্র রমণীর মঙ্গল নিদান ;  
 পতির পবিত্র সেই চরণ যুগল  
 একমাত্র স্বরগের পবিত্র সোপান ।  
 কহ সখি অবহেলা সাজে কি তাহারে ?  
 সেই যবে বনবাসী— আমারি কারণে  
 সেই যবে বনবাসী তিথারী সন্ন্যাসী,  
 কার আশে আমি আর থাকিব লো ঘরে ?  
 সে বিনে জীবনে হয় কোন্ প্রয়োজন  
 বাসন্তি ? এসেছি আমি এ জন্মের মত  
 খুঁজিতে তাহারে দিদি, পাই যদি তারে  
 এ জীবনে, একপ্রাণে পূজিব তাহার  
 পবিত্র চরণ দুটি ভকতি-কুশুম্বে ।  
 নাহি পাই যদি, হয় এ ছার জীবন  
 দিব বলি দিদি আমি শত্ৰুর চরণে,  
 যে পদে রক্তজী মোর ক’রেছে উৎসর্গ  
 পবিত্র জীবন তার আমারি কারণে ।  
 এ বাসনা ভিন্ন আর অভাগীর মনে  
 নাহি কোম আশা, তাই মিনতি ও পদে

আশীর্বাদ কর দিদি পাই যেন তারে ।”  
 “অবশ্য পাইবি” ধীরে কহিল। বাসন্তী  
 একটি নিশ্বাস ছাড়ি মলিন বদনে ;  
 তুই বিন্দু অশ্রুবাবি শোভিল তাহার  
 নেত্র কোণে, না জানি কি অজ্ঞাত কারণে ।  
 নীরবে আঁচলে চক্ষু মুছিয়া যোগিনী  
 কহিল। কাতর স্বরে “মৈর্য্য ধর দিদি,  
 কেন লো উত্তলা এত ? রমণী জীবনে  
 সহিষ্ণুতা-মহারত্ব অপার্থিব ধন ;  
 যে নারী বঞ্চিত তাহে, কালভুজঙ্গিনী  
 সে হুঃখিনী, এ সংসারে রমণী-কুশুম  
 বিধাতার সুধা-সৃষ্টি, পরিমল তাহে  
 সহিষ্ণুতা স্নেহ-লজ্জা” সৌরভে যাহার  
 বিমুক্ত দেবতা নর ; কোমল পরশে  
 অমৃতের উৎস কুটে মানবের ঘরে ।”  
 নীরবিল। ইন্দুমুখী, কহিল। লবঙ্গ  
 “বাসন্তী, কেমনে তুই আইলি এখানে ?  
 এত দিন ছিলি কোথা ? তাহে একাকিনী  
 কেমনে থাকিস এই নির্জন কাননে ?”  
 উত্তরিল। হাসি মুখে বাসন্তি হুঃখিনী—  
 “কেন সখি, এ জীবনে কি ভয় আমার ?  
 নির্জন আমার পক্ষে ভূতলে নন্দন ;  
 বিধাতার দীর্ঘশ্বাস তপ্ত অশ্রুজল  
 নির্জন কানন বিনে কোথা পাবে স্থান  
 এ জগতে ? সংসারের ঘোর কোলাহল  
 পশে না অবগে মম ; যোগিনীর বেশে  
 ভৈরবীর পদে সেবা করিয়া সতত  
 স্বাধীন। বিহগী প্রায় এ নির্জন বনে  
 অমিয়া প্রাণের আলা করি নিবারণ !  
 নাহি আশা, নাহি লিঙ্গা, সংসারের মায়া

তেয়াগিয়া, ভগবানে ক'রেছি অর্পণ  
 জীবনের সুখ দুঃখ সাধ আকিঞ্চন।  
 আমার কি ভয় সখি নির্জন কাননে ?  
 কেমনে এসেছি তেথা ? শুনিতে বাসনা  
 সেই কথা ? শোন্ তবে, শোন দিদি বলি  
 “আদিনা পাপিষ্ট ঘোর, মোস্লেম-সমাজে  
 নাহি কেহ তার মত কামুক বর্বর  
 সেই পাপী, মিথ্যাবাদী ঘোর প্রবঞ্চক,  
 বহুতার ভাণ করি কত যে অনিষ্ট  
 করিতেছে, মহারাষ্ট্র না বুঝিয়া তার  
 কুট চক্র, হায় দিদি নির্বোধেন মত  
 করিতেছে আপনার অনিষ্ট সাধন।  
 একদা প্রহ্লাদে উঠি কৃষ্ণা নদী জলে  
 গিয়াছিল স্নান আশে, সেই স্থানে দিদি  
 আদিনার কতগুলি দম্ভা ভয়ঙ্কর  
 গোপনে ধরিয়া মোরে মে'তেছিল নিয়া  
 ফতেপুর সিক্রি সেই পাষাণের কাছে।  
 পখি মাঝে নিদারুণ ওলাউঠা নোগে  
 হয়েছিল যুগ প্রায়, তাই অভাগীরে  
 নন্দদার তীরে তারা গিয়াছিল ফে'লে।  
 বিধাতা সহায় যার, সিদ্ধ বৈদ্যনর  
 কি করিতে পারে তার ? সহস্র বিপদ  
 যুদ্ধে ঘুচিয়া যায় ; মহারাষ্ট্র গুরু  
 নিরখি আমারে সেই নন্দদার তীরে  
 ঠিক যে কি দৈব বলে জানি না কেমনে  
 আরোগ্য করিয়া মোরে, ভৈরবীর করে  
 দিয়াছিল সমর্পিয়া, সেই চ'তে দিদি  
 আজি আমি এইখানে যোগিনীর বেশে  
 আমার কি ভয় সখি নির্জন কাননে ?”  
 নীরবিল। শশীমুখী উত্তরে নীরব ;

নীরব সে বিজ্যাচল, শুধু মাঝে মাঝে  
 হ'একটি পর্বতীয় পক্ষী মনোহর  
 গাইতেছে দূরে দূরে সুললিত স্বরে  
 জাগাইয়া প্রতিধ্বনি সে নির্জন বনে।  
 কণপরে জিজ্ঞাসিল। লবঙ্গ লতিকা  
 “আজি কি পূর্ণিমা দিদি ?” কহিল। বাসন্তী  
 “হঁ। দিদি পূর্ণিমা আজি, দেখনা রজনী  
 কেমন জ্যোৎস্নাময়ী, হাসিছে অবনী ;  
 কেন দিদি পূর্ণিমায় কোন্ প্রয়োজন  
 আমাদের— আমরা যে বন-নিবাসিনী ?”  
 লজ্জায় রক্তিম রাগে হইল রঞ্জিত  
 লবঙ্গের স্বর্ণ-মুখ, রহিল। বসিয়া  
 অধোমুখে, স্পন্দহীন নীরব নিশ্চল।  
 আবার বাসন্তী ধীরে করিল। জিজ্ঞাসা  
 “কেন দিদি পূর্ণিমায় কোন্ প্রয়োজন ?”  
 উত্তরিল। সুধাস্বরে লবঙ্গ লতিকা  
 অধোমুখে ‘মা ভৈরবী ক'রেছে প্রতিজ্ঞা  
 আজি মোরে নিয়া যাবে পবিত্র আশ্রমে  
 তাঁর কাছে, আজি দিদি বহুদিন পরে  
 দেখিব চরণ তার, পূজিব আনন্দে  
 সে পবিত্র পাটুখানি ভক্তির কুসুমে।  
 আশীর্বাদ কর দিদি পাই যেন তাঁরে,  
 কি জানি সত্য দিদি ভয় হয় মনে  
 যদি বা না পাই তাঁরে অদৃষ্টের দোষে ?”  
 কহিল। বাসন্তী “দিদি কেনলো উড়ল।  
 তুই এত ? ধৈর্য্য ধর এখনি আসিবে  
 মা ভৈরবী, যাবি তুই রত্নজীর কাছে  
 ত্যজিয়া এ দুঃখিনীরে, কে জানে ভগিনী  
 হয়কি না হয় দেখা আর এ জীবনে ?  
 কিন্তু দিদি তোর কথা হইলে স্মরণ

বিষম ঘটনা পাব এ পাষণ্ড প্রাণে”  
 হেন কালে উভয়েই শুনিলা প্রাঙ্গণে  
 মানবের পদধ্বনি, মুহূর্তের মাঝে  
 ত্রিশূল-ধারিণী এক বৃদ্ধা তপস্বিনী  
 প্রবেশিলা গৃহ মাঝে, সতৃষ্ণ নয়নে  
 রহিলা চাহিয়া দৌহে সন্ন্যাসিনী পানে ।  
 তপস্বিনী সুধাধরে কহিলা সাদরে  
 উঠ মা লবঙ্গ, যাব বিদ্যাচল-শিরে  
 পবিত্র আশ্রমে, তোর রত্নজীর কাছে ;  
 উঠ, স্বরা করি, আর বিলম্ব না সহ  
 মা আমার,” শব্দবাস্তে উঠিলা লবঙ্গ  
 শয্যা ত্যজি, তপস্বিনী কহিলা আবার  
 “চল তবে” অভাগিনী সম্মিত বদনে  
 বাসস্তীরে স্নেহভবে করি আলিঙ্গন  
 লইলা বিদায়, কত আশার তরঙ্গ  
 বহিতে লাগিলা হৃদে, মুহূর্তে মুহূর্তে  
 দেখিলা বিমুক্ত প্রাণে জাগ্রত-স্বপন ।  
 অভাগিনী মায়াবিনী আশার কুহকে  
 সৃজিলা হৃদয়ে এক নন্দন-কানন ।  
 তৈরবীর পদ-রেণু লইলা বাসস্তী  
 শিরোপরে, তপস্বিনী কহিলা সাদরে  
 থাক মা বাসস্তী, আমি আসিব আবার ;  
 গুরুদেব কালি প্রাতে আসিবে এখানে ।  
 তপস্বিনী ক্রতপদে করিলা প্রস্থান ।  
 আনন্দে উৎফুল্ল-হৃদে চলিলা লবঙ্গ  
 তৈরবীর পাছে পাছে সেই বন-পথে,  
 হৃৎধিনীর ক্রত গতি রোধিতে লাগিলা  
 কত বন-লতা, কত কানন-কণ্টকে  
 চিড়িতে লাগিল সেই চরণ কোমল ।  
 কতবার অভাগিনী পড়িলা ভূতলে,

উঠি পুনঃ ক্রত বেগে চল্লের আলোকে  
 হেরি পথ, সাবধানে চলিতে লাগিলা  
 তৈরবীর পাছে পাছে ঘুরিয়া ফিরিয়া ;  
 বহু কষ্টে ধীরে ধীরে পর্বত-শিখরে  
 উত্তরিলা ; অকস্মাৎ শুনিলা অনূরে  
 বীণার মধুর ধ্বনি রুণু রুণু করি  
 উঠিছে পড়িছে কত তরঙ্গে তরঙ্গে  
 নিস্তরু নিরুন্ম নৈশ নিথর গগনে ।  
 কিছু দূর অগ্রসরি দেখিলা উভয়ে  
 একটি মন্দির পাশে সরসী-সোপানে  
 বসিয়া তপস্বী এক স্নিগ্ধ জোছনায়  
 বাজাইছে বীণা, তপ্ত কাঞ্চনের মত  
 তপস্বীর রূপ রাশি উঠেছে ফুটিয়া  
 চন্দ্র করে, পরিধানে গৈরিক বসন,  
 কণ্ঠে রত্নাকর মালা, রুক্ষ-কেশগুলি  
 তৈল হীন, থে’কে থে’কে উড়িছে পবনে ।  
 মহর্ষি নারদ যেন দেব যুবা রূপে  
 অবতীর্ণ ধরাতলে বিষ্ণোর কাননে ।  
 নিয়ে সরসীর জলে সুধাংশু-কিরণ ।  
 ঝলসিছে কি মধুর দৃশ্য মনোরম ;  
 চারিদিক স্তব্ধ, শুধু বীণার স্বর  
 খেলিছে কোমুদী-স্নাত স্নিগ্ধ সমীরণে ।  
 “রুণু রুণু রুণু রুণু” শব্দ সুমধুর  
 বাজিতেছে কি সুন্দর অবিরল ধারে  
 বর্ষিয়া পীযুষ-ধারা প্রকৃতির প্রাণে ।  
 খান্ধাজ ঝিঝিট কত মধুর-রাগিনী  
 বাজিল বর্ষিয়া সুধা বসুধা-মরমে ।  
 পরজ কালোড়। গৌরী উদাস রাগিনী  
 কহু কেঁদে, কহু হে’সে কহু নে’চে থে’লে  
 জাগাইল প্রতিধ্বনি সুমন্ত কাননে ।

আশ্রয়হারা পত পাখী, নির্ঝাঁক বিটপী  
 দাঁড়াইয়া অচঞ্চল ; চন্দ্রমা-কিরণ  
 নীরবে ঝরিতেছিল রঞ্জিয়া যতনে  
 গিরিশৃঙ্গ বনভূমি চারু নিখ'রিনী ।  
 উভয়ে প্রচ্ছন্ন ভাবে শুনিলা নীরবে  
 বীণার মধুর তান কিছুক্ষণ পরে  
 নীরবিল বীণা, মরি মুহূর্তের মাঝে  
 নৈশ নিস্তকতা পুনঃ উঠিল জাগিয়া  
 বিছোর কাননে, বামা জিজ্ঞাসিলা ধীরে  
 তৈরবীরে “ও কি শোভে স্বর্ণ-রেখা প্রায়  
 গিরি অঙ্গে ?” উত্তরিল তৈরবা তখন  
 “নিখ'রিনী উদ্ভাসিত সুধাংশু-কিরণে,  
 এই ধারা ঘুরে ঘুরে বেষ্টি' এ শেখর  
 মিশিয়াছে বহুরে নন্দ্যদার সনে ।”  
 তেনকালে বিক্ষাচল করিয়া ধনিত  
 উদ্ঘাটিয়া প্রকৃতি নৈশ নিস্তকতা  
 ভাসিল অনুরে এক সঙ্গীত লহরী —  
 বিক্ষোবরী দ্বার দেশে মধুর পঞ্চমে । —  
 এমন চাঁদনী, এমন যানিনী  
 এমনি মধুর হাসি ।  
 এমনি তটিনী, প্রেম-পাগলিনী  
 এমনি সঙ্গীত রাশি ।  
 এমনি স্নানর, নিখর অধর  
 এমনি তারকা যেনা !  
 এমনি প্রকৃতি, নৈশবের স্মৃতি  
 এমনি প্রেমের খেলা ।

কে দেখেছে কবে      কে শুনেছে তবে,  
 আছে কি এ ধরাতলে ?  
 আররে বাজক, আররে বাজিক,  
 কে দেখি তোরা, আর একে একে  
 স্বরগ সুবনা,      প্রেমের উপমা  
 দেখাব তোদেরে  
 আর আর তোরা, আররে চ'লে ।

কাননে কাননে,      বদুল পবনে  
 ফুটেছে কুসুম রাশি ।  
 চাঁদের কিরণে,      প্রকলিত মনে  
 হাসিছে কি প্রেম হাসি ।  
 কোকিল বকুলে,      দয়েল তমালে  
 দিতেছে মধুরে সাড়া ।  
 আনন্দে পাপিয়া ;      রহিয়া রহিয়া  
 চানিছে পীযুষ ধারা !  
 জাগিল প্রকৃতি,      শুনি সেই গীতি  
 উল্লাসে অবশ হৃদি ।  
 আয়রে যুবক,      আয়রে যুবতী,  
 দেখ এ'ঙ্গে তোরা এ নৈশ প্রকৃতি,  
 এ মধুর শোভা      কত মনলোভা  
 দেখাব তোদেরে  
 আয় আর তোরা দেখিবি যদি ।  
 এই নদী-জলে নিবে আর অলে  
 স্বরগের সুধা-বাতি !  
 আর এ জীবনে পাবিনে পাবিনে  
 এমন মধুর রাতি !  
 নিখুম ভুবনে নিখুম গগনে  
 শুধু নীরবতা রাজে !  
 তটিনীর তানে বিহগের গানে  
 প্রেমের সঙ্গীত বাজে !

প্রকৃতি রঞ্জিনী কুমারী যোগিনী  
 কুন্তনের মালা গলে ।  
 কে দেখিবি তোরা আর দলে দলে,  
 প্রেমিক প্রেমিকা আর সব চ'লে,  
 প্রণয়-যাতনা,      বিরহ-বেদনা  
 রবে না রবে না  
 দেখিলে অমনি যাইবি ভুলে ।

উজলি গগন      বহুধি কিরণ  
 বোহিয়া সকল প্রাণী ।  
 সৌরভ ছড়িয়ে      পিযুষ বিনায়ে  
 এসেছে অগত-রাণী ।  
 এ সুখদ কালে      মিলি দলে দলে  
 পূজিবে সকলে তারে ।  
 প্রণয়-চন্দন      করিয়া লেপন  
 ভকতি-কুসুম দ্বারে ।



আয় কে শুনিবি,      আয় কে দেখিবি,  
এ সুখা সঙ্গীত এ মধুর ছবি,  
দেখিলে হৃদয়      হবে প্রেমময়  
জুড়াবে জীবন জ্বালা !  
জেগেছে চক্ৰমা,      জেগেছে তারকা  
জেগেছে বসুধা,      জেগেছে অলকা  
গিরেছে হেমন্ত,      জেগেছে বসন্ত  
সাজায়ে ফুলের ডালা ।

আয়রে বালক, আয়রে বালিকে  
যুবক যুবতী আয় একে একে  
কে দেখিবি তোরা      সুখা রাশি ভরা  
এমন সুঘমা রাশি !  
শয়নে স্বপনে জীবনে মরণে  
পাবিনে পাবিনে আর এ ভুবনে  
এমন চাঁদনী,      এমন ষানিনী  
এমনি মধুর হাসি ।

সে মধুর প্রীতিপূর্ণ ললিত ঝঙ্কারে  
সুন্নিধ কোমুদী স্নাত নিস্তক বিক্লোর  
শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিধ্বনি উঠিল জাগিয়া ।  
বন-ভূমি যেন এক মধুর আবেশে  
মুহূর্তে ভরিয়া গেল ; মুহূর্তে মুহূর্তে  
অসংখ্য মুকুতা যেন ঝরিতে লাগিল  
সঙ্গীতের স্বরে সেই নীরব কাননে ।  
লবঙ্গ বিমুক্ত প্রাণে করিলা জিজ্ঞাসা  
ভৈরবীয়ে “কে গাইছে বিক্লোর কাননে  
এমন করুণ স্বরে নিশীথ সময়ে ?”  
উত্তরিলা স্নেহ স্বরে ভৈরবী তখন  
“চিনিস নে এরে তুই ? এ তোরা ভগিনী  
ছঃধিনী হিরণ বালা, বালানাথ-মেয়ে ;  
তোরা সেই মাতুলানী মরিবার আগে,  
দিয়াছিল যোগাশ্রমে পাঠাইয়া এরে  
শিক্ষা দিতে ব্রহ্মচর্যা ; অমরেন্দ্র নামে

গুরুজীর শিষ্য এক ছিল সে আশ্রমে ।  
উভয়েই উভয়েই বেসেছিল ভাল,  
ভাব দে'খে তাহাদের গুরুজী তখন  
বেধে ছিল। উভয়েই বিবাহ বন্ধনে ।  
অবশেষে সে অভাগা ফেলিয়া ইহায়ে  
হইয়াছে নিরুদ্দেশ, ছঃধিনী হিরণ  
সেই হাতে কোন কার্যো নাহি দেয় মন !  
সে-ই আজি গাইতেছে এ সুখা সঙ্গীত  
বর্ষিয়া অমৃত ধারা বিজ্ঞ্যাবাসী-প্রাণে ।  
কভু গিরি শৃঙ্গে, কভু মুনির আশ্রমে,  
কভু নিঝরিণী তীরে, নন্দাদা সৈকতে  
ভ্রমিয়া সতত, সে যে গাইছে মধুরে  
প্রেমের করুণ তান, সে স্বর-লহরী  
তুলিছে কি প্রতিধ্বনি বিক্লোর কাননে ।  
তাহাদের প্রেম-স্মৃতি, সঙ্গীত লহরী  
রেখেছে জাগা'য়ে এক শোক-অভিনয়  
নরন্তরে, মহারাষ্ট্র নর নারী প্রাণে ।”  
সহসা সঙ্গীত স্বরে থামিলা ভৈরবী  
আবার, — আবার সেই মধুমাখা স্বর  
প্রাবিয়া সে বিজ্ঞ্যচল, মোহিয়া প্রকৃতি  
উঠিল ভাসিয়া নৈশ নিথর গগনে ।

উভয়ে স্তম্ভিত প্রাণে শুনিলা সে গান  
কিছুক্ষণ, হৃদিপটে কি জানি কেমন  
একটি অম্পট ছায়া উঠিল ভাসিয়া  
নীরবে, মোহিয়া প্রাণ আশার পুলকে  
লবঙ্গের, সন্ন্যাসিনী রত্নজীর কাছে  
যাইলা, মধুর স্বরে ডাকিলা তাহারে  
“রত্নজি” বিস্ময়ে বুবা দেখিলা চাহিয়া  
মা ভৈরবী, সঙ্গে এক মলিনবসনা



যুবতী, কীণালী অতি, কাঁপছে তাহার  
 স্বর্ণ-দেহ বাতাহত লতিকার মত ।  
 কহিল। সম্মুখে যুবা “কে সঙ্গে জননী ?—  
 —কি উদ্দেশ্যে এ নিশীথে আনিলে ইহারে  
 এই স্থানে ?” স্নেহ স্বরে কহিল। ভৈরবী  
 “এখনি চিনিবে বাছা” মুহূর্তের মাঝে  
 লবঙ্গ লতিকা যেয়ে ধরিল। চকরে  
 রক্তজীর পাখ্যানি, ছিন্ন লতা প্রায়  
 অমনি সে অভাগিনী পড়িল। চলিয়া  
 রক্তজীর পদমূলে, মরি কি সুন্দর—  
 —শোভিল কনক-পদ্ম দেব-পদ-তলে ।  
 বিষয়ে দেখিল। যুবা চির প্রেমময়ী  
 হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী, যাহার বিচ্ছেদে  
 তাজিয়া জনম-তুমি জননী হুঃখিনী  
 আজি বনবাসী ; যেই কুমার সলিলে  
 তাজিয়াছে প্রাণ এই অভাগার তরে ;  
 এই তার প্রেত মূর্তি, বিষয়ে যুবা  
 ঝটিকা বহিল হৃদে, উন্মাদের প্রায়  
 দাঁড়া'য়ে, কহিল। শোক-উন্মুদিত-প্রাণে  
 “তুমি ? —লবঙ্গের প্রেত-মূর্তি ? এস তবে

এ হৃদয়ে এস এস, যুড়াবে হৃদয়  
 তোমার পরশে ; তুমি এ'সেছ যখন  
 সশরীরে, এ'স হৃদে—কেন আর দূরে ?”  
 মুহূর্তকে অভাগীরে দৃঢ় আগ্রহনে  
 বাধিল। যুবক, পুনঃ দেখিতে লাগিল।  
 চন্দ্রকরে সেই মুখ অতি সাবধানে ;  
 সেই মুখ, সেই চক্ষু সেই বিবাহধর  
 সেই মুনি-মনোলোভা চিবুক সুন্দর,  
 সেই কুমার কেশ রাশি, স্বর্ণ-কলেবর ;  
 অমনি মুদিল। চক্ষু, দেখিল। আবার  
 স্পষ্টতর সেই মূর্তি, —হৃদয়ের মাঝে  
 স্মৃতি-পটে কি সুন্দর প্রতিবিম্ব তার ।  
 দেখিল। নয়ন তুলি নাই সে ভৈরবী,  
 অমনি আনন্দে যুবা আত্মহারা প্রাণে  
 বক্ষস্থিত যুবতীর অলঙ্কৃত অধরে  
 সাদরে চুম্বিল। মরি, সে স্নিগ্ধ চুম্বনে  
 যুবতী মেলিল। আঁখি, ঘুমন্ত নলিনী  
 মেলে যথা মুগ্ধ আঁখি হানিয়া প্রভাতে  
 প্রেমোন্মত্ত মধুপের প্রথম চুম্বনে ।

## নবম সর্গ

[আগ্রা ; যমুনা তীর—নজিবদৌলার প্রমোদ কানন]

এই কি সে আগ্রা ?—হায় আকবর যাহারে  
সাজায়ে'ছে দিবা নিশি রতনে কাঞ্চনে  
অমরাবতীর সম, হেরিলে যাহারে  
কত যে অতীত স্মৃতি জে'গে উঠে মনে ।  
মোস্তফা-গৌরব গাথা র'য়েছে মিশিয়া  
অঙ্কে অঙ্কে যে আগ্রার ধূলা বালি সনে ?  
এই স্থানে মহামতি সম্রাট আকবর  
বসি রাজ সিংহাসনে প্রবল প্রতাপে  
শাসিত ভারতবর্ষ, হইত কম্পিত  
আসমুদ্র হিমাচল যার হৃদয়কারে ।  
হিংসা ও বিদ্বেষ যারে ছোঁয়নি কখনো  
এ জীবনে, মিলনের স্নেহের নিগড়ে  
বৈধেছিল যে মহাত্মা হিন্দু-মুসলমানে ।  
এই স্থানে সাজাহান আওরঙ্গজেব  
আরো কত পরাক্রান্ত মোস্তফা সম্রাট  
শাসিত ভারতবর্ষ প্রবল প্রতাপে  
বীর দর্পে, যাহাদের দরবার গৃহে  
পণ্ডিত মৌলানাগণ জাতি নির্বিশেষে  
করিত ধর্মের ব্যাখ্যা ; শোভিত যেখানে  
কত সৈন্ত সেনাপতি বীরেন্দ্র কেশরী ।

হৃভিক্ষে প্রজার জন্য খুলি রাজ-কোষ  
যাহারা সানন্দ চিন্তে করিত সাহায্য  
লক্ষ লক্ষ অগণিত দরিদ্র প্রজারে ।  
আন্তরে কবিত রক্ষা উৎপীড়ন হতে  
জালেমের, হেরিয়া যা' দেশী ও বিদেশী  
পথিক নিচয় হ'ত বিমুক্ত হৃদয় ।

কত কুসুমিত কুঞ্জে—নিকুঞ্জ বীথিতে,  
কত অগণিত চারু মন্দির প্রাসাদে,  
মসজিদ-মিনারে কত ফলের বাগানে,  
রাজবাগ্গে, ক্রিয়াভূমে ছর্গে ও ছেবেমে  
সজ্জিত ক'রেছে যারা রতনে ভূষণে  
ইন্দের অমরাবতী—নন্দনের সম  
যে আগ্রারে দিবা নিশি—এই সেই আগ্রা ?  
মুসলমান সম্রাটের প্রিয় রাজধানী ?  
—যাহাব সৌন্দর্য্য মুগ্ধ সমগ্র ধরণী ?

এই সেই আগ্রা ?—হে প্রিয় ভারতবাসি,  
দেখ এ'সে আগ্রার সে অতুল সৌন্দর্য্য,  
বিমুক্ত হইবে যদি—জুড়াবে নয়ন ।  
শোক তাপ দূর হবে, আনন্দ সাগরে  
ডু'বে যাবে তোমাদের সস্তাপিত মন ।  
বুঝিবে তখন তুমি বারেক ভাবিলে  
কি রত্ন যে তোমাদের জনমের তরে  
ডু'বে গেছে অতীতের অতুল সাগরে ।  
অজ্ঞাতে তোমার চক্ষে ছুই ফোটা অশ্রু  
ঝরিবে তখন, তুমি কাঁদিবে বিষাদে ;  
আর উদিবে না সেই সৌভাগ্য তপন ।

বসন্ত-পূর্ণিমা নিশি ; কোয়ুদী-সাগরে  
নিমগ্ন নীরব বিশ্ব ; প্রস্তরের প্রায়  
অচঞ্চল তরুরাজি স্নাত চন্দ্র-করে ।  
চন্দ্রিকা শালিনী নিশি—প্রকৃতি-সুন্দরী  
হাস্তময়ী, রূপরাশি প'ড়েছে উছলি

বিমল চন্দ্রমালোকে—কত শোভা মরি !  
 গোলাপ চামেলী বেলী মতিয়া মালতী  
 হাসিতেছে বৃন্তে বৃন্তে বিতরি সৌরভ  
 মলয় সমীরে , শিখ চন্দ্রমা-কিরণে  
 সবি যেন আশ্বহারা—মাতোয়ারা ভবে !  
 পত্রপত্র ফুলে ফুলে মঞ্জরী মুকুলে  
 জলে স্থলে চন্দ্র-রশ্মি পড়িয়া নীরবে  
 সজিয়াছে কি সৌন্দর্য্য, হেরিলে সে দৃশ্য  
 কবিত্বের উৎস কুটে মানব-হৃদয়ে ।

নীরব আগরা ; সবি ঘুমে অচেতন,  
 নাহি জাগে জীবজন্তু, শুধু সমীরণ  
 সৌরভ মাখিয়া দেহে, চন্দ্রের কিরণে  
 বহিতেছে বুক বুক—দৃশ্য অনূপম ।

এ হেন নিশীথ কালে যমুনার তীরে  
 তাজের অনতিদূরে ছুইটি রমণী  
 বসি এক উচ্চ চূড় অট্টালিকা-ছাদে  
 হেরিতে এ নৈশ শোভা, অদূরে যমুনা  
 বহিতেছে কি মধুরে কল কল তানে  
 গাইয়া প্রেমের গাথা—অতীতের স্মৃতি ,  
 বিমল চন্দ্রমালোক কি সুধা সৌন্দর্য্য  
 উঠেছে কুটিয়া সেই তাজের মন্দিরে ।  
 কুটম্ব নলিনী প্রায় সে দুটি রমণী  
 অতি সুখী—ধরাডলে অঙ্গরা নন্দিনী,  
 —অনূপম রূপরাশি ; অতি মনোহর  
 সুগোল সুবর্ণ-দেহ হাসি ভরা মুখ,  
 কপোলে সুধার সিঁদু—স্বর্গের নবনী ।  
 প্রেমের মদিরা মাখা আঁখি-নীলোৎপলে  
 কত শোভা—খেলে সদা চকলা দামিনী ।  
 সুশিখ কৌমুদী স্নাত সুধা রূপরাশি

উইলে যেন প'ড়েছে গড়া'য়ে  
 সে কুল কোমল দেহে, তাজের প্রাবনে  
 কুলে কুলে ভরা যেন সুধা-তরঙ্গিনী ।  
 অধরে অমিয়া, বক্ষে কুসুমের কলি  
 অর্ধফুট—অনায়াত। যেন কমলিনী ।  
 বিমুক্ত কবরী, কেশ তরঙ্গে তরঙ্গে  
 ছলিতেছে পৃষ্ঠদেশ—সুগোল নিতম্বে  
 সৌদামিনী-পাশে যেন কাল কাদম্বিনী ।

তাজের নিকুঞ্জ নিয়ে যমুনা-হৃদয়ে  
 একটি বজ্রার ছাদে পরী কণ্ঠা প্রায়  
 একটি বালিকা বসি চন্দ্রের কিরণে  
 আশ্বহারা, অতীতের সুধামাখা স্মৃতি  
 জাগাইয়া গাইতেছে করুণ সঙ্গীত  
 সুধাকণ্ঠে মোহিয়া সে নির্জ্বল প্রকৃতি ।

আমি—বেসেছি তাহারে ভালো ।

আমার—আঁধার জীবনে—

—সে মোব প্রাণের আলো ।

সঙ্গীতের সুধাস্বর তাজের মন্দিরে  
 প্রবেশিয়া, বিমোহিয়া সে নৈশ প্রকৃতি  
 শোভাময়ী কি'য়ে এক তীব্র মাদকতা  
 দিল ছড়াইয়া নৈশ নিখর গগনে ।  
 তরঙ্গে তরঙ্গে স্বর উঠিয়া নামিয়া  
 তাজের নির্জ্বল কক্ষ করিয়া ধ্বনিত  
 মিশিয়া যাইতেছিল অতি দূরে দূরে  
 যমুনার মধুমাখা “কুলু কুলু” তানে ।

আমি—বেসেছি তাহারে ভালো !

আমার—আঁধার জীবনে

• সে মোব প্রাণের আলো ।

আমি—পাগলিনী প্রায় সদা খুঁজি তারে,  
জানিনা সে কোথা, আছে কোন্ দূরে,  
ভুতলে পাতালে, কিবা স্বরপুরে,  
কেমনে তাহারে ভুলি।

আমি—ভুলে গেছি কুল, ভুলে গেছি মান,  
ভুলেছি অগণ, হ'য়েছি পাষণ,  
ভুলি নাই তারে, সে আমার প্রাণ,  
সুখা আশে বিষ ভুলি।

এ মোর করমে ছিল—  
আমার—স্বপ্নের আশা, স্বপ্নে রহিল—  
—কাঁদিয়া জনম গেল।

আমি—বেসেছি তাহারে ভালো।

আমার—আকুল পরাণ ব্যাকুল হইয়া  
কোথায় ছুটিয়া গেল।  
আমার—প্রেমের গাথনা প্রাণের কামনা  
সকলি ফুরায়ে এ'ল।

আমি—বেসেছি তাহারে ভালো।

সখি।—গভীর নিঝুম রাতে।  
উদাস পবন করে ছুটা ছুটি  
কুল গুলি ফুটে পড়ে ভূমে লুটি  
তাহার চরণ পে'তে।

সখি।—সে কেননা এ'ল।  
এত সাধ ;— এত আশা,  
এত গ্লোহ, ভালবাসা,  
সকলি বিফলে গেল।  
আমি—বেসেছি তাহারে ভালো।

সখি।—আমারি মতন  
সে কি ভালবাসে,  
যদি সে বাসিত  
কেন নাহি আসে,  
আমি—জানিনা, বুঝিনা  
বুঝিতে চাহি না,  
শুধু তারে বাসি ভালো।  
তারি প্রেমে কাঁদি  
তারি প্রেমে হাসি,

তারি প্রেমে ম'জে  
তারে ভালবাসি,  
এ মর্ষ বেদনা, কেউ ত বুঝে না  
ভেবে ভেবে তনু  
হয়ে গেছে কানো।  
আমি—বেসেছি তাহারে ভালো।

নীরবে উভয় বামা শুনি সে সঙ্গীত  
মুগ্ধ প্রাণ, একজন কহিল। অপরে  
“দেখ দিদি প্রাণের কি করণ তান  
গাইছে না জানি কোন্ নিরাশ বালিকা  
কৈদে কৈদে আজি অই বিশ্বল হৃদয়ে  
যমুনার নীল বক্ষে বজরার ছাদে।  
না বুঝে মানবগণ পড়ি প্রেম-কাঁদে  
আপনারে ডুবাঠিয়া পরের অস্তিত্বে  
সুখের জীবন ভুলে বিষময় করি।”  
“হাঁ জোহরা” সুধাস্বরে কহিল। দ্বিতীয়া  
“পুরুষের দোষ কত, আমরা রমণী  
সব বুঝি, বুঝেও ত পারিনে থাকিতে ;  
আমরাও প্রাণ দিয়ে কত ভালবাসি,  
ভালবে'সে অবশেষে কত আলা সখি,  
তবুও ত তারে দিদি পারিনে ভুলিতে ?  
পাষণ পুরুষগুলি কত যাহু জানে,  
কি যে এক মন্ত্র বলে রমণীর প্রাণ  
কে'ড়ে নেয় দিদি, শেষে কাঁদিয়া কাঁদিয়া  
সারাটি জীবন যায় ঘোর হা হতাশে।”  
“ঠিক কথা” মৃদু হে'সে কহিল। জোহরা  
নারীর জনম শুধু কাঁদিবার তরে ;  
কি হবে সে হুঃখ করি ? পুরুষের প্রাণ  
নিরোট পাষণে গড়া, প্রেমের অমিয়া  
পাবে না সে যদি মাঝে অণেকের করে।

বজ্রার ছাদে বসি সে গারিকা দালা  
আবার—আবার অই প্রাণিয়া গগন  
গাউলা করণ কঠে মধুর সঙ্গীত  
মাতাউয়া প্রকৃতির প্রেমের উচ্চাসে।

কি সুখ হইত হৃদয়ে তখন  
সে যদিবে ভাল বাসিত।  
জীবনে কখন কণেকের তবে  
সে যদিবে পুনঃ আসিত।  
তারি স্তব্ধ-স্মৃতি বুক ভরা প্রীতি  
সদা প্রাণে যোর আগিত।  
নয়নে স্বপনে জীবনে মননে  
তারি কথা মনে পড়িত।  
সে যদিবে ভাল বাসিত।

বালিকার সুধামাখা সুবর লহরী  
কহু উঠি, কহু নামি সপ্তমে পঞ্চমে  
প্রাণিয়া সে নৈশাকাল মোহিয়া প্রকৃতি  
স্বর্গীয় পীযুষ-ধারা দিল ছড়াইয়া—

কি সুখ তখন হইত হৃদয়ে  
সে যদি আমার হইত।  
তারি কপ রাশি, তারি স্তব্ধ হাসি,  
সদা প্রাণে যোর ভাসিত।  
সে যদি সোহাগে, যৌহ-অনুরাগে  
নন্দনের ঢায়া প্রাণে আনিত।  
আকুল পিপাসা, তারি ভালবাসা  
প্রাণে প্রাণে যোর ছুটিত।  
সে যদিবে ভাল বাসিত।

সখাণি' এ প্রেম গীতি ছুঃখিনী বালিকা  
ছাড়িয়া নিশ্বাস দীর্ঘ সজল নয়নে,  
ভাবিয়া হৃদয়ে "কই হ'ল না ত দেখ।

তার মনে, হা অমর কোথা তুমি এবে ?  
মোসলেমের গতি বিধি হেরিতে গোপনে  
শুকদেব ছদ্মবেশে বজ্রবা লইয়া  
অমিতেছে নানা স্থানে, আমিও এসছি  
স্বইচ্ছায় তার সঙ্গে, কানী বিক্যাচল  
আগ্রা প্রয়াগ দিল্লী—বহুদেশ আমি  
বহু মোসলেমের মানে হয়ত নিশ্চয়  
পাইব সে অমরেন্দ্রে ছিল আশা মনে !  
বৃথা সব, কত দেশে কত খুঁজিলাম,  
কোন স্থানে হয় আমি না পাইবু তাবে।  
নাহি জানি সে এখন মৃত কি জীবিত,  
হয়ত সে কোন যুদ্ধে হয়েছে নিহত।  
সে যদি মরিয়া থাকে অদৃষ্টের দোষে,  
ছুঃখিনী হিবণ বালি চিরদাসী তার—  
—অচিরে যাইবে তার চরণ সমীপে!"  
বজ্রার ভিতর হতে স্নেহমাখা স্বরে  
কে জানি কহিল ডাকি "এখনো বাহিরে ?  
হিবণ ভিতরে এ'স হিম যে লাগিবে।"  
নীরবে উঠিল বালি সজল নয়নে  
ছাড়িয়া নিশ্বাস দীর্ঘ, চলি গেলা ধীরে  
বিষম হৃদয়ে সেই বজ্রা ভিতরে।

অদূরে আসাদ শীর্ষে জোহরা জেরিণা  
তুনি এই প্রেম-গীতি বিশ্বত বিহ্বল।  
উভয়ে অনেককণ বসি সেই ছাদে  
মুহু প্রাণে, এক দৃষ্টে হেরিতে লাগিলা  
যমুনার নীল বক্ষে লহরে লহরে  
চন্দ্রের বিমল রশ্মি বল্ মল্ করি  
স্বজিয়াছে কি সৌন্দর্য্য। যমুনা সুন্দরী  
কি সুন্দর স্বর্ণোজ্জ্বল বানারসী পরি

তাজের চরণ চুপি কুলু কুলু তানে  
 প্রেমের সঙ্গীত গেয়ে বাইছে বহিয়া ।  
 একটি সুন্দর বীণা শোভিছে অপূরে  
 বিমল চন্দ্রমালোকে ছাদের উপরে ;  
 জোহরার দিকে চেয়ে কহিল। জেরিণা  
 সুধাশ্বরে “দেখ দিদি কি মধু-যামিনী,  
 উপরে হাসিছে চন্দ্র—নিম্নে ফুল রাশি  
 হাসিছে কি সুধা হাসি বিতরি মৌরভ  
 সমীরণে, তাহে পুনঃ যমুনা সুন্দরী  
 গাইছে কি প্রেম-গাথা “কুলু কুলু” তানে ।  
 আজি দিদি এ মধুর টাঁদিনী নিশিতে  
 তোর সেই মধুমাখা প্রেমের সঙ্গীত  
 মিশাইয়া, দে ছড়ায়ে প্রকৃতির প্রাণে  
 স্বর্গের অমিয়-ধারা চিত্ত বিমোহিনী” ;  
 “কি গাব জেরিনা দিদি” কহিল। জোহরা  
 “বহিছে ভীষণ ঝড় হৃদয়ে আমার ।”  
 “না দিদি মাথার দিবা গাও একবার ।”  
 উত্তরিল। সুধাশ্বরে জেরিনা আবার ।  
 জোহরা লইলা ভুলি কর-কোকনদে  
 সে সুধা বর্ষিণী বীণা—উঠিল ঝড়ার  
 বরষি অমিয় বামা ধরিল। সঙ্গীত  
 বীণা সঙ্গে আপনার কণ্ঠ মিশাইয়া

“যব্ সে লাগি তেরি আঁখিয়া  
 দিল্ হোগায়া দিওয়ানা ।”

যামিনীর বিস্তরতা করি উদঘাটিত  
 বামার সে সুধা মাখা সঙ্গীত লহরী  
 উঠিল সে নৈশাকাশে তরঙ্গে তরঙ্গে  
 বর্ষিয়া পৌষ-ধারা প্রকৃতির প্রাণে ।

অমিয়া বর্ষিণী বীণা কাঁদিয়া কাঁদিয়া  
 গাইতে লাগিল সেই মধুর সঙ্গীত  
 বিমোহিয়া জীব জন্তু মধুর পঞ্চমে ।

“যব্ সে লাগি তেরি আঁখিয়া  
 দিল্ হোগায়া দিওয়ানা  
 তুম্ লায়লা হো—মৈ মজনু  
 তুম্ নিরি হো—মৈ খসরু  
 তুম্ ওল্ হো—মৈ বুল বুল  
 তুম্ শামা হো—মৈ পরওয়ানা ।  
 দিল্ হোগায়া দিওয়ানা ।”

সে সুধা-সঙ্গীতে বিশ্ব আকুল হৃদয়ে  
 রহিল আপনা ভুলি, প্রাণে যেন তার  
 কি এক দারুণ ব্যথা উঠিল জাগিয়া  
 স্পন্দহীন বসুন্ধরা, নীরব আগরা  
 নাহি কোন সাড়া শব্দ, যমুনা সুন্দরী  
 কুলু কুলু তানে শুধু প্রাণের আবেগ  
 জানাইয়া, চন্দ্র করে যে'তেছে বহিয়া  
 কি সুন্দর, আশ্বহারা নীরব প্রকৃতি ।  
 জেরিণা আবার তারে স্নেহ বচনে  
 কহিতে লাগিল। “দিদি একটি সঙ্গীত  
 গাও আর, বড় ইচ্ছা শুনিতে আমার ।”  
 জোহরা বীণার সুরে সুর মিলাইয়া  
 গাইতে লাগিল। পুনঃ মধুর পঞ্চমে—

“জনম অবধি রূপ নেহারিনু  
 নয়ন না তিরপিত ভেল ।  
 সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনি  
 শ্রুতিপটে পরণ না গেল ।”

এ সুধা সঙ্গীত স্বর তরঙ্গে তরঙ্গে  
 উদার। মুদার। তার। ঘুরিয়া ফিরিয়া



তাজের মন্দিরে পশি প্রতিধ্বনি তুলি  
কুটাইয়া রাশি রাশি কুম্ভের কলি  
ছুটাইয়া সুধা রাশি প্রকৃতির প্রাণে  
যমুনার “কল” তানে গেল মিলাইয়া ।  
আবার সে গীত ধ্বনি উঠিল ভাসিয়া—

“কত মধু যামিনী রঙগে গোঁয়ায়নু  
না বুঝনু কৈছন না কেল !  
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু  
তবু হিয়া জুড়ান না গেল ।  
জনম অবধি রূপ নেহারিনু  
নয়ন না তিরপিত ভেল ।”

প্রেমের এ মধুমাখা সুখের লহরী  
বীণার মধুর স্বর চন্দ্রমা কিরণ  
ফুলের সৌরভ বাহি যুহু যুহু বায়ু  
যামিনীর হাসিমাখা জীবন্ত মাধুরী  
মিলি এক সঙ্গে এই নব্বর ভুবনে  
কি এক সৌন্দর্য্য সভা করিল গঠন ।  
তাজের নিকুঞ্জে বসি বিমুগ্ধ পাণিয়া  
“পিউ পিউ পিউ” রবে উঠিল ঝঙ্কারি  
অমনি উভয় বামা রহিলা চাহিয়া  
সেই দিকে, ছুদি মাঝে চিস্তার লহরী  
বহিতে লাগিল, ক্রমে উঠিল জাগিয়া  
অভ্যন্তর কত স্মৃতি উভয়ের প্রাণে !  
বহু কণ চেয়ে চেয়ে মন্দিরের পাণে  
কহিলা জোহরা “দিদি, দেখ্ দেখি চেয়ে  
তাজের কেমন শোভা—আদর্শ প্রেমের !  
উপরে চন্দ্রমা, নিম্নে বুরু বুরু বায়ু  
কি সুন্দর বাজনিছে দম্পতী যুগলে ।

তাহে কুল কুল রাশি তাজের চরণ  
পূজিছে এ দৃষ্ট আর আছে কি ভুলে !  
পদ-প্রান্তে আকুলিতা যমুনা সুন্দরী  
লুটাইছে, কি সুন্দর “কল কল” তানে  
গাইয়া প্রেমের গাথা—উদাস সঙ্গীত ;  
উত্তরিলা প্রেমময়ী জেরিণা বেগম  
“কি বলিব দিদি, আজ যে শোভা দেখিনু  
ভুলিতে নাশিব কভু, জগতে ইহার  
কি আছে তুলনা দিদি, ইচ্ছা হয় মোর  
এই দণ্ডে—হায় অই যমুনার মত  
লুটাইতে এ পরাণ তাজের চরণে ।”  
জেরিণার ছুই চক্ষে ছুই বিন্দু বারি  
শোভিল মুক্তার মত, পড়িল গড়ায়ে  
সে স্বর্ণ কাপোল বাহি, কি শোভা আ মরি—  
—নীহার সলিলে সিক্ত কুল কুমুদিনী !  
জোহরা মধুর স্বরে জিজ্ঞাসিলা তারে  
“কেনলো কাঁদিস দিদি ? কোন্‌ ছুখে তোর  
ঝরিছে নয়নে অশ্রু ?” কহিলা জেরিণা  
“বহুদিন গত দিদি আনিতে সজারে \*  
গিয়াছে যে ভ্রাতা তোর অযোধ্যানগরে  
আজিও ত ফিরিল না, তয় হয় মনে  
মহারাত্রি দম্পাগণ যদি কোন স্থানে  
গোপনে লুকায়ে থেকে অতর্কিত ভাবে  
করে তারে আক্রমণ, তা হলে অদৃষ্টে  
কে জানে কি আছে মম, সেই আশঙ্কায়  
অধীর হ’য়েছে দিদি হৃদয় আমার,  
বিশেষতঃ মহারাত্রি সমুখ সমরে  
অসমর্থ, গুপ্ত ভাবে তব্বরের প্রায়  
অস্ত্রাংখা মোল্লৈম সদা করিছে নিহত !

জগতে কুকার্য হেন নাহি কিছু আর  
 যাহা সেই পাপিষ্ঠেরা না পারে করিতে ।  
 দস্যুতা গোপন-যুদ্ধ ব্যবসা তাদের  
 হেন, নরধর্ম গণে কি বিশ্বাস দিদি ?  
 “এত ভয় কেন দিদি” কহিল জোহরা  
 সুধাম্বরে “বীর তিনি, স্বধর্মের তরে  
 যায় যদি প্রাণ তার, কি দুঃখ তাহাতে ?  
 রক্ষিতে ইসলাম ধর্ম আমি যে রমণী  
 দিতে পারি এ পরাণ সম্মুখ সমরে,  
 আমিও ডরি না সেই দস্যু সদাশিবে ;  
 সদাশিব কোন্ হার ? সমগ্র জগৎ  
 আমার বিপক্ষে অসি করিলে ধারণ  
 ফিরিব না এক পদ, শত্রুর শোণিতে  
 মিটাব প্রাণের তৃষা—করিব তর্পণ ।  
 ছি জেরিণে তব মুখে সাজেনা এ কথা,  
 মোস্লেম রমণী তুমি—বীরের গৃহিণী  
 দস্যুদের ভয়ে তুমি কেন আতঙ্কিত ?”  
 “না দিদি ডরি না আমি” কহিল জেরিণা  
 বজ্রম্বরে “এ জগতে কে আছে এমন  
 জেরিণা ডরিবে যারে ? সদাশিব কেন,  
 স্বর্গের দেবতা বুল করিলে বর্ষণ  
 বজ্রাগ্নি, জেরিণা কহু হবেনা শঙ্কিত ?  
 এ তুচ্ছ প্রাণের মায়া রাখে না সে দিদি,  
 যদিই প্রাণেশ মম হত হ’ন রণে,  
 ধর্মসাক্ষী—এ প্রতিজ্ঞা করিলাম আমি  
 যাইব সমরাজনে, স্তম্ভীকৃত কপাণে  
 বধি সেই ধর্মজোহী অম্পৃশ্য কাকেরে  
 লইব সে প্রতিশোধ, সে উচ্চ শোণিতে  
 মিটাব নিপাতা মোর, অথবা এ প্রাণ  
 বীর-পত্নী প্রায় দিব সম্মুখ সমরে !

বহির্দেশে গগনগোল তুলিয়া জোহরা  
 কহিল দাসীরে ডাকি “ভূতা পাঠাইয়া  
 জেনে এস এত গোল কিসের কারণ ?”  
 আজ্ঞা মাত্র গেল চলি দাসী একজন ;  
 কিছুক্ষণ পরে এসে কহিল সে দাসী  
 “জনৈক সন্ন্যাসী এক সন্ন্যাসিনী সহ  
 মহারাষ্ট্র-চর বলে হইয়াছে ধৃত ।  
 কিন্তু সে সন্ন্যাসী এক গুপ্তির আঘাতে  
 করিয়াছে হত্যা এক মোস্লেম সৈনিকে ।  
 পঞ্চজন মুসলমান নিরখি সে দৃশ্য  
 আক্রমিয়া তাহাদের অসির আঘাতে  
 তীক্ষ্ণধার, করিয়াছে আহত ভীষণ ।”  
 জোহরা কহিল “ছি ছি নারীর উপরে  
 অত্যাঘাত ? কোন্ পাপী করিল এ কাজ ?  
 জগতের কোনো ধর্ম নাহি এ বিধান ।  
 যাও শীঘ্র বল যে’য়ে আনিতে তাদের  
 এই স্থানে ।” গেল চলি দাসী পুনর্ব্বার  
 জেরিণা জোহরা মহা উৎকণ্ঠিত হৃদে  
 ছাদ হতে অবতরি আসিলা প্রাঙ্গণে ।  
 সকলে আনিল তথা ধরাধরি করি  
 উভয়েরে, ক্ষীণ স্বরে আহত সন্ন্যাসী  
 “জল—জল—জল” বলি উঠিল চীৎকারি ।  
 জোহরা দাসীরে ডাকি কহিল তখন  
 “কতটুকু জল এনে দেহ সন্ন্যাসীরে ।”  
 সন্ন্যাসী কাতর কণ্ঠে কহিল তাহারে  
 “তোমরা ছু’ওনা তাহা, ব্রাহ্মণের দ্বারা  
 আনিলে কিঞ্চিৎ জল পিইতাম আমি ।”  
 দাসী যে’য়ে একজন ব্রাহ্মণের দ্বারা  
 আনা’য়ে কিঞ্চিৎ জল দিল সন্ন্যাসীরে ।  
 জল খে’য়ে হলে শান্ত, করিল জিজ্ঞাসা

জোহরা স্নেহে “তব নাম কি সন্ন্যাসী ?”  
 জোহরার বাক্য শুনে মেলিয়া নয়ন  
 আহত সন্ন্যাসী তারে কহিল। কাতরে  
 “সমরেন্দ্র !” “কোথা হ’তে এসেছ এখানে”  
 সুধাইল। পুনঃ বামা “যোগাশ্রম হতে  
 এসেছি এখানে মোরা” কহিল। সন্ন্যাসী।  
 “কোথায় সে যোগাশ্রম ?” জোহরা আবার  
 জিজ্ঞাসিল। “বহুদূরে মলয় পর্বতে”  
 উত্তরিল। কীণ স্বরে সন্ন্যাসী তাহারে।  
 “মিথ্যা কথা” পুনর্ব্বার কহিল। জোহরা।  
 সন্ন্যাসী কহিল। তারে অতি শ্লেষ ভাবে  
 “সন্ন্যাসীরা মিথ্যা কথা বলেন। কখন,  
 মায়া ও মাৎস্যর্য হতে বিমুক্ত তাহারা  
 চিরকাল, স্বার্থপর তোমাদের মত  
 নহে তারা” বাধা দিয়া কহিল। জোহরা  
 “যোগী নও, তবু তুমি, সন্ন্যাসীর বেশে  
 পেশবার গুপ্তচর, এসেছ জানিতে  
 আমাদের গুপ্ত কথা মন্ত্রণা-কৌশল।”  
 বিকৃত করিয়া মুখ কহিল। সন্ন্যাসী  
 “গুপ্তচর বটি, কিন্তু স্বদেশের জন্ত—  
 —আমার সে প্রাণাধিক মাতৃভূমির জন্ত—  
 পরের অনিষ্টে জন্ত গুপ্তচর নহি।  
 মোসলম কবল হতে করিতে উদ্ধার  
 আমার সে মাতৃভূমি—গুপ্তচর আমি।”  
 কহিল। জোহরা তারে “শত্রু তুমি মোর ;  
 হৃদয়েশে গুপ্তচর দন্ডা পেশবার।  
 রাজা নও—প্রজা তুমি, রাজার শাসন  
 মানিয়া চলিবে, কিন্তু বিরুদ্ধে রাজার  
 করি বড়বড়, তুমি হরেক বিক্রোহী।  
 শাস্তি তব প্রাপকও ; অস্তিত্ব আমার

আজি তুমি, সবদোষ মার্জনীয় তব।  
 মিত্রবৎ ব্যবহার করিলাম আজি  
 তব সনে, মুসলমান নহে পাপাচারী।”  
 দাগীরে কহিল। বামা “যাও তুমি ক্রত  
 বল যে’য়ে ভৃত্য মম আনিতে হেকিমের।”  
 কিছুক্ষণ পরে দাসী আসিল তথায়  
 সঙ্গে ল’য়ে হেকিমেরে, হেকিম তখনি  
 উভয়ের ক্ষত স্থানে দিলা বেঁধে পট্ট  
 প্রদানিয়া মহৌষধি সেবনের তরে,  
 দিলা দোহে চূর্ণ এক—মৃত সঞ্জীবনী।

হেকিম জোহরা কাছে কহিল। গোপনে  
 “অব্রাঘাত গুরুতর পে’য়েছে সন্ন্যাসী,  
 বোধ হয় বাঁচিবে না, সংশয় জীবন।  
 সন্ন্যাসিনী—বেঁচে যাবে, শরীরে তাহার  
 পায়নি আঘাত বেশী, দক্ষিণ বাহুতে  
 সামান্য আঘাত সে যে পাইয়াছে শূলে  
 হুঁদিনে তা যাবে সেরে।” হেকিম তখনি  
 গেলা চলি রাত্রি শেষে সন্ন্যাসীর প্রাণ  
 অনন্তে মিশিয়া গেল জনমের তরে।

পরদিন প্রাতঃকালে বসিয়া নিভৃত  
 জোহরা কহিল। ডাকি সেই যোগিনীকে  
 “কি নাম তোমার বাছা বল দেখি মোরে ?”  
 ‘চকলা আমার নাম’ কহিল। যোগিনী।  
 আবার জোহরা তারে করিল। জিজ্ঞাসা  
 “এ মৃত সন্ন্যাসী বৃদ্ধি স্বামী ছিল তব ?”  
 নিবেদিত। কহিল। সে “আমি সন্ন্যাসিনী  
 অনুচ্চা, সজিনী মোর আরো। তিন জন  
 অনুচ্চা হিরণবালা জ্যোৎস্না কালীতারা;

আমরা সবাই শিষ্য মারাঠা গুরু ;  
 মৃত সন্ন্যাসীও ছিল শিষ্য যে তাহারি ।  
 একত্র সবাই মোরা থাকিতাম মাগো  
 যোগাশ্রমে—বহুদূরে, মলয় অচলে ।  
 শিষ্য চারিজন মোরা দিতাম তুলিয়া  
 সত্তত পূজার ফুল, মা ভৈরবী নিত্য  
 পূজিত তাহার সেই ইষ্ট দেবতারে ।”  
 জোহরা আবার তারে করিলা জিজ্ঞাসা  
 “তোমরা মারাঠা জাতি পূজা কর কার ?”  
 উত্তরিলো রান মুখে চঞ্চলা তাহারে  
 “শক্তি ও শিবের পূজা করি মা আমরা ।”  
 কহিলা সম্মিত মুখে জোহরা আবার  
 “তাহাদেরি দিব্য বাছা, সত্য কথা বল,  
 কার গুপ্তচর হ’য়ে এসেছ তোমরা  
 এই দেশে ? সমরেন্দ্র বলেছে আমাদের  
 এই কথা, অতএব জিজ্ঞাসি তোমারে  
 লুক’ওনা, সব কথা ভেঙ্গে বল মোরে  
 শক্তি ও শিবের দিব্য দিলাম তোমারে ।”  
 কহিলা চঞ্চলা পুনঃ সজল নয়নে  
 “শক্তি ও শিবের দিব্য দিয়াছ যখন  
 কেন মিথ্যা ক’ব আমি ? বিশেষতঃ মাগো  
 তুমি মোর প্রাণদাত্রী, তোমার নিকটে  
 এতটুকু মিথ্যা কথা বলিব না আমি ।  
 তোমাদের গতিবিধি করিয়া নির্ণয়  
 গুরুজী সৈনিক বহু করিতে সংগ্রহ  
 কাশী ও প্রয়াগ দিল্লী বিজ্ঞা নীলগিরি  
 ভ্রমিয়া, বজরা ল’য়ে এসেছি এখানে ।  
 পদব্রজে সারাদিন ঘুরে ঘুরে মোরা  
 নানাস্থানে, সব তত্ত্ব দিতেছি তাহারে  
 নিশা কালে । কল্য প্রাতে বজরা হইতে  
 নেমে মোরা, পার্শ্ববর্তী সমস্ত গ্রামের  
 সংবাদ লইয়া যবে ঘাইব কিরিয়া

বজরায়, মুসলমান সৈন্যদের হস্তে  
 পথিমধ্যে ভাগ্য দোবে পড়িয়াছি ধরা ।  
 সজিনী আমার সেই কালীভারা বাই  
 হেরিয়া মোদের দশা গেছে পলাইয়া  
 বজরায়, মহারাষ্ট্র গুরুজীর কাছে ।”  
 জোহরা দাসীকে ডাকি কহিলা তখনি  
 “যাও শীঘ্র, দে’খে এ’স বজরা কি ঘাটে  
 আছে বাঁধা ? কিংবা ভয়ে গেছে পলাইয়া ।”  
 কণ পরে দাসী আসি বলিল তাহারে  
 “বজরা গিয়াছে চলি, নাহি বাঁধা ঘাটে ।”  
 জোহরা স্নেহের স্বরে করিলা জিজ্ঞাসা  
 চঞ্চলারে, “কও এবিধ কি করিব তুমি ?  
 বজরা ত গেছে চলি ।” কহিলা যোগিনী,  
 “বন্দিনী এখন আমি তোমাদের হস্তে  
 যা ইচ্ছা করিতে পার, কি করিব আমি ?  
 কোন্ শক্তি আছে মোর—আমি সন্ন্যাসিনী ।”  
 কাতরে জোহরা পানে রহিল চাহিয়া  
 অভাগিনী ; স্নেহস্বরে কহিলা জোহরা  
 “কি করিব ? আজি তুমি অতিথি আমার  
 এখানে ; যদিও তুমি শত্রু আমাদের  
 তথাপি অতিথি তুমি, অতিথির প্রতি  
 যা’ কর্তব্য, আজি বাছা করিব তা’ আমি ;  
 কেননা সে মুসলমান ধর্মের বিধান,—  
 —শত্রুরে যে ভালবাসে সেই যে মানুষ  
 ধরাতলে, অতিথিও শত্রু হয় যদি  
 মিত্ররূপ ব্যবহার ক’র তার প্রতি ।  
 দুর্বল শত্রুর প্রতি কেন হবে আজি  
 দয়া না করিব আমি মোহনম হইয়া ?”  
 জোহরা দাসীকে ডাকি দণ্ডকের মাঝে  
 শিবিকা বেহারী এনে তুমি মধু ভাবে  
 একজন ভৃত্য সহ দিলা পাঠাইয়া  
 চঞ্চলারে যোগাশ্রমে ভৈরবীর কাছে ।

## দশম সর্গ

### কুজপুর ছুগ

[বৃদ্ধ]

“ক্রম ক্রম” কি ভীষণ প্রলয়ের ধ্বনি  
উঠিল সহসা নৈশ নিধর অধরে  
কাঁপাইয়া দিগন্তর, কাঁপায়ে মেদিনী  
ছুটিল কাননে পশু, নীড়ে বিহঙ্গম  
কুজিল সতয়ে, স্বর্গে কাঁপিল অমর ;  
দূর প্রান্তে প্রতিধ্বনি উঠিল জাগিয়া  
“ক্রম ক্রম” ; মহারাষ্ট্রী গজিল তৈরবে  
“হর হর মহাদেও” জাগিল গগনে  
প্রতিধ্বনি, মুহূর্ত্তেক বিম্বিত হৃদয়ে  
জাগিল মোস্তেম সৈন্ত সে ভীষণ স্বরে,  
গজিল অশ্বনি মস্ত্রে “আলা আলা হো—ও”  
কাঁপাইয়া রণক্ষেত্রে ; কাঁপায়ে ধবলী  
আবার উঠিল সেই “ক্রম ক্রম ক্রম” ।

আবার,—আবার—সেই ‘ক্রম ক্রম ক্রম’  
ভোপের ঘর্ঘর রব, তুরঙ্গের হ্রেষা  
সৈন্তদের কোলাহল কি এক আতঙ্ক  
ডেলে দিল নিজোখিত প্রকৃতির প্রাণে ।  
গ্রামবাসী ছুগবাসী নরনারীগণ  
সকলেই উর্ধ্বকর্ণে শুনিতে লাগিল  
কামানের মুহূর্ত্ত ভীষণ গর্জন ।  
অসংখ্য কামান গুলি গর্জিতে লাগিল  
কাঁপাইয়া কুজপুর ;—কাঁপায়ে অবনী  
আবার,—আবার সেই “ক্রম ক্রম ক্রম” ।

মুহূর্ত্তেক কাঁপাইয়া সে নৈশ প্রকৃতি  
মোস্তেমের রণ বাহ্য উঠিল বাজিয়া  
ভীম স্বরে, অককারে অতিক্রম বেগে  
সাজিল মোস্তেম সৈন্ত কুপান ফলকে  
বীর সাজে, চারিদিকে অসংখ্য প্রদীপ  
উঠিল অলিয়া মরি মুহূর্ত্তের মাঝে  
সম ভাবে যোদ্ধাদের বীৰ্য্য-বহ্নি মনে ।  
মুহূর্ত্তে উভয় দল সিংহ পরাক্রমে  
আক্রমিল পরস্পরে, ভোপের ঘর্ঘরে  
কাঁপিল প্রান্তর ছুগ, নর নারীগণ  
প্রমাদ গণিলা হ্রদে, জীবজন্তুগণ  
উর্ধ্ব শ্বাসে চারি দিকে ছুটিল সতয়ে ।  
সুদূর গগন প্রান্তে ঘন ঘোর রোলে  
প্রকৃতিরে মুহূর্ত্ত করিয়া কম্পিত  
যোদ্ধাদের বীৰ্য্যপূর্ণ হৃদয় মনে  
আবার,—আবার সেই “ক্রম ক্রম ক্রম”

মোস্তেম-সেনানী বৃন্দ “দীন দীন” রবে  
মাতিল সে নৈশ যুদ্ধে, উঠিল জাগিয়া  
প্রতিধ্বনি দূরে দূরে তরঙ্গিণী নীরে  
নৈশাকাশে ; মহারাষ্ট্রী গজিল তৈরবে  
“হর হর মহাদেও” সে ঘোর হুকারে  
জড়িল বনুধা, ভরে উঠিল কাঁপিয়া  
আকাশে দেবতা, মর্ত্ত্যে সূত্র প্রাণী মর ।



দেখিলা মোল্লের সৈন্ত অতি কীশালোকে  
সৈন্তদের অগ্রভাগে দীপ্ত তরবার  
খলিছে তৈরবে এক বীরেন্দ্রের করে  
লোলজিহ্ব, বিপক্ষের সৈন্তের সাগরে !  
হেরি সে বীরেন্দ্র যুঁজি অলস হৃদয়ে  
গর্জিলা কুতুব \* বলী জীমূত গর্জনে  
“কেরে তোরা, নিশাচর পাপিষ্ঠ হুর্জেন  
এ’সেহিস নিশাকালে তুস্করের বেশে  
কুতুবুরে ?—এত স্পর্কি ? সিংহের বিবরে  
সামান্য শৃগাল হ’য়ে এত আফালন ?  
দিবসের ঘোর যুদ্ধে না পারি আঁটিতে  
আসিলি কি ছদ্মবেশে করিতে দস্যুতা  
গভীর নিশিতে ওরে তুস্কর অধম ?”  
“কি বলিলি নরাধম পাপিষ্ঠ বক্কর,  
‘তুস্কর ?’—শমন তোরা, আয় যুঁজমতি  
সম্মুখ সমরে, আজি দেখাইব তোরে  
শৃগাল-তুস্কর নহি, —সদাশিব আমি।”  
“সদাশিব তুই ? পাপী ভীক কাপুরুষ,  
সদাশিব তুই ?—সেই পাষণ্ড কাকের  
দস্যুদের অধিপতি তুস্কর অধম ?—  
—জঘন্ত দস্যুতা যার জীবিকা প্রধান,  
সেই কাপুরুষ তুই ? আয় তবে যুঁজ  
সংগ্রামের সাধ তোরা মিটাইব আমি।”  
“আয় পাপী,” সদাশিব গর্জিয়া তৈরবে  
নিষ্কেপিল ভীক শর, যুহুর্ভে কুতুব  
দাঁড়াইলা দূরে সরি. উন্নতের মত  
কিপ্রকারে নিষ্কেপিল বর্শা তরঙ্গর  
সদাশিবে লক্ষ্য করি, যুহুর্ভের মাঝে  
কলকে ঠেকিয়া অস্ত্র বন্ বন্ রবে

পড়িল ছুটিয়া এক সৈনিকের শিরে,  
পড়িল সে ধরাডলে, আবার আফালি  
নিষ্কেপিল সদাশিব আয়ুধ ভীষণ  
খরধার, এইবার কুতুবের ডুজে  
বিঁধিল সে ভীম অস্ত্র অমনি বীরেন্দ্র  
আহত শাদ্দুল প্রায় ভীষণ বিক্রমে  
আক্রমিল সদাশিবে, কপাণে কপাণে  
বাঁধিল তুমুল যুদ্ধ—ঘোর ছহকারে  
যুঁজিতে লাগিল দৌছে ভীষণ বিক্রমে।  
বহুক্ষণ হেন ভাবে ঘুরিয়া কিরিয়া  
যুঁজিলা বীরেন্দ্র দয়, ঘাত প্রতিঘাতে  
অসি গুলি শত খণ্ডে পড়িল ছুটিয়া  
চারি পাশে, এক লক্ষে ধরিল কুতুব  
সদাশিবে, মল্ল যুদ্ধে মাতিলা উভয়ে  
ছহকারি, ধরাধরি টানাটানি করি  
কত যে যুঁজিলা দৌছে, কেহই কাহারে  
পারিল না পরাজিতে,—সমান উভয়ে।  
আবার দ্বিগুণ বলে ধরিল বীরেন্দ্র  
সদাশিবে, আছাড়িয়া ফেলিল তুতলে ;  
এক লক্ষে বন্ধ পরে বসিয়া সবেগে  
নিষ্কেপিল তরঙ্গর অসি খরধার  
দেব জাস, মহাতর্কে পুরিল বসুধা ;  
কাঁপিল প্রকৃতি, শুক সমর প্রাঙ্গণ।  
অদ্ভুত শিকার বলে আশ্চর্য্য কৌশলে  
বন্ধস্থিত কুতুবেরে ফেলিয়া তুতলে  
যুহুর্ভেকে সদাশিব উঠিল আফালি  
এক লক্ষে, হারাইলে শিকার আপন  
সিংহ যথা ভীম স্বরে উঠে গরজিয়া,  
তেমতি ভীষণ স্বরে উঠিল গর্জিয়া

\* মোল্লের গজের সহকারী দুর্গ রক্ষক



কুতুব 'সাবাসি তোরে হিন্দুকুল গ্রানি  
 দম্ভাপতি, বীর ভাবে যুঝিবি রে তুই  
 বীর সনে দম্ভা হ'য়ে সম্মুখ সমরে ।  
 সাবাসি সাহস তোরা, তুই কুজ প্রাণী,  
 কুজ তোরা হিন্দুকুলে, কে শিখাল তোরে  
 বীরপনা ? কে আছেরে বীর হিন্দুকুলে ?'  
 "কি বলিলি নরাদম পাষণ্ড হুম্মতি,  
 হিন্দু কিরে কাপুরুষ ? দেখাইব তোরে  
 হিন্দুর বীরত্ব আজি,—দেখাইব তোরে  
 দম্ভা নহে সদাশিব বীর সেনাপতি ।"  
 "বীর সেনাপতি ? ভীক পাণিষ্ঠ কাফের,  
 কে বলেরে বীর ?—তুই তক্ষর অধম ।  
 তু'লেহিস্ গত কথা ? মনে কর্ আজি  
 সপ্তদশ অশ্বারোহী কেমন বিক্রমে  
 নিয়াছিল এ ভারত শৃগালের মত  
 খেদাইয়া তোরা মত কত শত বীরে ।"  
 "সকলি তা জানি মুখ, বাক্যবীর তুই,  
 তোরা কি সাজেরে এই সম্মুখ সমর  
 বীর সনে ? রমণীর তক্ষরনী তাড়নে  
 সজ্জাসিত তুই, কুজ মণ্ডুবের রবে  
 কাঁপে তোরা বীর হিয়া রে মুখ অধম ।  
 বুধা দম্ভ, বীরের এ বজ্র প্রহরণ  
 কেমনে সহিবি তুই সম্মুখ সংগ্রামে ?"  
 এত বলি সদাশিব ভীক তরবার  
 আঘাতিল পূর্ণ বলে, ঝলিয়া উঠিল  
 বীর অসি সেই সঙ্গে পড়িল। ভূতলে  
 আহত কুতুব, রক্ত ছুটিল সবেগে  
 ভাসাইয়া বক্ষস্থল, মুহুর্তে জাহ্নবী  
 বাধিল। সে বীরবরে লৌহের শৃঙ্খলে  
 রক্ত বিমতিত অসি সকালিয়া বেগে

চারি দিকে, সদাশিব চলিল ছুটিয়া  
 চূর্ণ অভিযুখে, কাটি উল্লভের মত  
 অসংখ্য মোসলেম সৈন্য; অদূরে সম্মদ  
 নিরখি এ অভিনয় প্রভঞ্জন বেগে  
 দাড়াইলা অসি হস্তে পথ আঙুলিয়া ;  
 'ছাড় পথ নরাদম' গর্জিল। ভৈরবে  
 সদাশিব, তুলি উর্কে অসি ধরধার ।  
 "দূর হ' পাণিষ্ঠ" রোষে কহিলা গর্জিয়া  
 সম্মদ "চোরের মত কেন এসেহিস্  
 নিশাকালে ধর্মজোহী কাফের বর্বর ?  
 এই কিরে শ্রায় যুদ্ধ ? শত ধিক তোরে  
 বিধর্মী তক্ষর তুই, ধর্ম'ধর্ম' জ্ঞান  
 নাহি তোরা, দিবসের সম্মুখ সংগ্রামে  
 না পারিয়া, এসেহিস্ তক্ষরের মত  
 নিশাকালে কুজপুরে করিতে লুণ্ঠন ?  
 দূর হ' এখনি, ন'লে শমন-সদনে  
 এখনি প্রেরিব তোরে কাফের অধম ।  
 এখনি দেখাব তোরে নরক ভীষণ  
 এই ভীক লোলজিহ্ব কপাণের তলে ।"  
 সদাশিব মেঘমস্ত্রে কহিলা গর্জিয়া  
 "এত স্পর্ধা ?—রে পাণিষ্ঠ বিধর্মী পামর  
 এখনি শোণিত তোরা হৃদয় চিড়িয়া  
 পিইব, মস্তক তোরা চূর্ণ চূর্ণ করি  
 দলিব এ পদতলে, হৃদ পিণ্ড তোরা  
 শৃগাল গৃধিনী কুল খাইবে এখনি ।"  
 "কি বলিলি রাজজোহী পাণিষ্ঠ হুম্মতি,  
 সামান্য বামন হ'য়ে ছরাশায় বশে  
 চক্ষুমা ধরিতে সাধ ? প্রতিকূল তার  
 এই নেরে ছুটমতি কাফের বর্বর ।"  
 মুহুর্তে বিদ্যুৎবেগে সকালিয়া অসি

ভয়ঙ্কর, বীরবর মারিলা সজোরে  
 সনাশিবে, ভেদি তার ছুঁতে কলক  
 কুপাণের অগ্রভাগ বিঁধিল যাইয়া  
 কর্ণ মূলে, মহাক্রোধে ঝারিলা ফলক  
 মহাবলী, ভগ্ন অসি পড়িল ভূতলে  
 শত খণ্ডে, ক্রোধোন্মত্ত শাক্ত লৈর প্রায়  
 আক্রমিলা বীর দর্পে বীরেন্দ্র সমেদে ।  
 বাধিল তুমুল যুদ্ধ, ভীষণ বিক্রমে  
 যুঝিতে লাগিলা দৌহে, ইরশ্বদ বেগে  
 কত উঠি, কত বসি ঘুরিয়া ফিরিয়া  
 সিংহ সম, দীপ্ত অসি নিশার আধারে  
 ঝলিতে লাগিল যেন বিদ্যুৎ ভীষণ ।  
 সহসা অলক্ষ্যে এক বন্দুকের গুলি  
 লাগিল ভীষণ বেগে জজ্বার উপরে  
 যুদ্ধোন্মত্ত সমেদের, বিষম আঘাতে  
 “আল্লাহো” বলিয়া বীর পড়িলা ভূতলে ;  
 মোস্তফা সৈনিকবৃন্দ বিপুল বিক্রমে  
 আক্রমিল শত্রুপক্ষে, উন্মত্তের মত  
 হুঁও দল প্রাণ পণে যুঝি বহুকণ  
 পড়িতে লাগিল ক্রমে,—কি দৃশ্য ভীষণ ।  
 এক দিকে যোদ্ধাদের বীরত্ব ব্যঞ্জক  
 হুহুকার, অন্যদিকে আহত সৈন্তের  
 আর্ন্তনাদ ;—মুর্খের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর  
 মিশিতে লাগিল আহা মুহূর্তে মুহূর্তে  
 ক্রোধোন্মত্ত সৈন্তদের ভৈরব হুকারে ।  
 মোস্তফার “দীন দীন” ভীষণ হুকার,  
 মহারাষ্ট্র-সৈন্তদের উৎসাহ ব্যঞ্জক  
 “হর হর মহাদেও” বিকট চীৎকার  
 মুহূর্তে মুহূর্তে মরি হইল ধ্বনিত  
 সে নৈশ গগনে, তাহে বিশ্বধ্বংসকারী

তোপগুলি মুহূর্তে গর্জিতে লাগিল  
 বর্ষিয়া অনল বৃষ্টি কাঁপায়ে অবনী ।  
 হেন কালে দুর্গ মাঝে দেব বৈশ্বানর  
 বায়ু সঙ্গে রণ সঙ্গে নাচিতে লাগিল  
 বিস্তারিয়া লোলজিহ্বা, ঘোর আর্ন্তনাদে  
 মুহূর্তে পুরিল পুরী, হ’ল ভস্মীভূত  
 কত গৃহ, কত প্রাণী সে ভীম অনলে ।  
 কত বংশ ভীম রবে কুটিতে লাগিল  
 ছড়াইয়া উদ্ধারশি নিশীথ গগনে ।  
 সহসা আবার সেই দুর্গের পশ্চাতে  
 ভীষণ কামান গুলি উঠিল গর্জিয়া  
 বর্ষিয়া অনল বাশি ;—মরি কি ভীষণ,  
 মৃতিমান বৈশ্বানর দুর্গের ভিতরে  
 নাচিছে উন্মত্ত বেশে, সম্মুখে পশ্চাতে  
 দুইদিকে অগ্নি ক্রীড়া, ডাকিনী যোগিনী  
 নাচিছে ভৈরবে যেন রণচণ্ডী পাশে ।  
 নিরখি এ ভয়ঙ্কর আসন্ন বিপদ  
 • অন্ধের মোস্তফা সৈন্ত ঘোর কোলাহলে  
 ছুটিল রক্ষিতে পুরী, না যাইতে হায়  
 অন্ধ পথ, মহারাষ্ট্র সৈন্ত একদল  
 আক্রমিল ভীর বেগে, সংগ্রাম তুমুল  
 বাধিল আবার সেই দুর্গের নিকটে ।  
 মোস্তফা সেনানীবৃন্দ উন্মত্তের মত  
 বিপদের সৈন্ত সহ যুঝিতে লাগিল  
 স্থানে স্থানে, করি পণ জীবন নশ্বর  
 এ আহবে ; বিপদের সৈন্তের সাগরে  
 ডুবিতে লাগিল ক্রমে এক দুই করি  
 ধীরে ধীরে ; দুই দিকে শত্রু সেনা দল,  
 মধ্যস্থলে দুর্গ-সৈন্ত হ’ল নিষ্পেষিত  
 নিষ্পেষণ-যন্ত্রে আহা গোষ্ঠের মত ।

একটি মোয়েম লৈল না রহিল যবে  
রগস্থলে, হুর্গপতি হলি বঁ। তখন  
পলাইল ভয় মনে গভীর বিখাদে  
ভাজি হুর্গ ; মহারাত্রী বিজয় উল্লাসে  
এবেশিল। হুর্গমাঝে করি একল্লিত  
জল স্থল “হর হর মহাদেও” রবে।  
চমকিল বিশ্ব ; ভয়ে কাঁপিল প্রকৃতি  
সে ভীষণ স্বরে ; নিশি পোহাইল যবে  
কুজপুর-নরনারী দেখিল। বিশ্বয়ে  
গভীর শয়ান-দৃশ্য — মরি কি ভীষণ

শবের উপরে শব, শবের উপরে  
অর্থ গজ অগণিত র'য়েছে পড়িয়া  
হস্ত হীন, পদ হীন, মূর্ত হীন কেহ।  
আরো নিরখিল। সবে গভীর বিশ্বয়ে  
হুর্গ-শিরে, যেই স্থানে উড়িত পবনে  
“অর্দ্ধচন্দ্র” সূশোভিত পতাকা। সুন্দর  
আজি তথা বায়ু সনে নাচিয়া নাচিয়া  
উড়িতেছে গর্জতরে উপহাসি সবে  
'ত্রিশূল' অঙ্কিত এক খবজা মারাঠার।

## একাদশ সর্গ

[ পুরাতন দিল্লী ;—তপসীর আশ্রম ]

পুরাতন দিল্লী প্রান্তে কানন ভিতরে  
একটি প্রকাণ্ড বাড়ী কাল-অল্লাঘাতে  
জীর্ণতম, অগণিত চূড়া মনোহর  
ভগ্ন প্রায়, গত প্রায় শোভা অল্পমম ।  
স্থানে স্থানে কক্ষে ছাদে প্রাচীর উপরে  
সুদীর্ঘ অশ্বখ বৃক্ষ বাহু প্রসারিয়া  
ক্রমশঃই উর্দ্ধ শিরে ছুইছে গগন ।  
গৃহ মাঝে তুপাকারে আবর্জনা সহ  
মৃষিক-মৃত্তিকা রাশি, জম্বুক-পুরিবে  
বিমিশ্রিত, অকুরিত তৃণ-গুল্ম কত  
মাঝে মাঝে, অবিজ্ঞানত ঘনবৃষ্টি জলে  
প'ড়েছে শেওলা ভগ্ন প্রাচীরের গায় ।  
কোথা বা আস্তর চূর্ণ প'ড়েছে খসিয়া,  
কোথা উর্গনভ-জাল, কোথা টিকটিকি  
কোথা বিছা, চর্মচর্টা নির্জ্বল প্রহরী ;  
পেচক বাহুর ঘুঘু বহু বিহঙ্গম  
বৃক্ষ পরে, ক্ষুদ্র ঝোপে প্রাচীর কোটরে  
নির্বিবাদে পাতিয়াছে রাজহু আপন ।  
প্রাঙ্গণে বিবিধ বস্ত্র কণ্টকিত তরু  
ঝোপাকারে, এক পার্শ্বে ইষ্টক নির্মিত  
অসংখ্য সমাধি ভগ্ন, গহ্বরে তাহার  
কঙ্করূপ হিংস্র জন্তু বিকট দর্শন ।  
সরসী কর্দমময়, অবিচ্ছিন্ন দলে  
হ'একটি কল্মীপুষ্প, স্থানে স্থানে মরি  
বিহঙ্গ পতঙ্গ কীট ভুজঙ্গ ভীষণ ।  
সরসীর তীরে ঘন দামের উপরে

একটি সুশুভ্র ক্রৌঞ্চ রয়েছে বসিয়া ।  
অদূরে মরুট দুটি ভীষণ আকৃতি  
খেলিছে বাদাম বৃক্ষে ; আরণ্য বিড়াল  
রয়েছে বসিয়া এক সহকার-শাখে  
স্থির ভাবে অতি ঘন পল্লবের তলে ।  
সরসীর অন্ত তীরে ভুজঙ্গ একটি  
ধরেছে মণ্ডুক এক, ঘোর আর্তনাদে  
অভাগার, এ নির্জ্বল কানন-প্রকৃতি  
বিকল্পিত, সম্ভ্রাসিত মণ্ডুক নিচয়  
লুকায়িত প্রাণ ভয়ে পঙ্কিল সলিলে ।  
সরসীর চারি ধারে বহু পুরাতন  
ভগ্ন সোপানের শ্রেণী, গিয়াছে কাটিয়া  
স্থানে স্থানে, উঠিয়াছে কত বন-লতা  
কত বন বৃক্ষ সেই সোপান ভেদিয়া ।  
সোপানের দুই পার্শ্বে বকুল বিটপী  
যুগল প্রহরী প্রায় শোভিছে সুন্দর ।  
তাল বিটপীর নিম্নে ভগ্ন ইটগুলি  
তুপাকারে, অগণিত শলক নকুল  
নিবসিছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বরে তাহার ।  
চারি পাশে কত শত ক্ষুদ্র বৃক্ষ পরে  
প্রক্ষুটিত বন-পুষ্প হাসিছে নীরবে  
আপন মনের সুখে, প্রকৃতি ভাণ্ডারে  
অমূল্য রতন যেন স্নিক মনোহর ।  
জনশূন্য পুরী, নাহি লোক-সমাগম,  
তাড়াইয়া সংসারের ঘোর কোলাহল  
আগিছে চৌদিকে শুধু গভীর নবরী ।

অনুরে উত্তর প্রান্তে সরসীর কোণে  
 একটি শালসী তরু ভীষণ আকৃতি,  
 পল্লব মুকুল শূন্য নয় কলেবরে  
 প্রদারি অসংখ্য শাখা যমদণ্ড প্রায়  
 দাঁড়াইয়া, ভীষ্মবাহু দানবের মত  
 প্রদর্শিছে উর্ধ্ব নিরে ক্রকৃতি ভীষণ ।  
 নিম্নে ইষ্টকের স্তূপ, গৃধিনীর মলে  
 রঞ্জিত ধবল বর্ণে, বিক্লিপ্ত চৌদিকে  
 ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিরাজি, শ্মশানে যেমতি  
 বৃত্ত অস্ত্রদের বহু কঙ্কাল ভীষণ ।  
 সম্মুখেই ছাদ শূন্য একটি প্রাসাদ  
 পুরাতন,—উর্ধ্বশির ; ত্রিশারে প্রাচীর  
 অর্ধভগ্ন, জন্মিয়াছে গুল্মসংগ কত  
 রাশি রাশি, নিপতিত ২ ১র প্রাচীর  
 অস্ত্রধারে—পরিণত ইষ্টকের স্তূপে  
 ধুতুরা শেওরা কত কটকিত তরু  
 উঠিয়াছে স্থানে স্থানে, নিকটে তাহার  
 একটি মসজিদ ভগ্ন, অতি উচ্চতর  
 চূড়া তার, শোভাকৃতি গম্বুজের পরে  
 পুন্নিভ কাকর-বল্লী ক্ষুদ্র পুষ্প তরু  
 সুশোভিত বন কূলে কিরীটের মত ।  
 ভগ্ন কার্ণিশের নিম্নে কোটর ভিতরে  
 অসংখ্য কপোত স্বয়ং কপোতিনী সনে  
 বিরাজিছে ; এক পার্শ্বে ছাদের উপরে  
 ক্ষুদ্র অশ্বখের মূলে একটি আতায়ী  
 বাধি নীড় নিবসিছে মনের হরষে ।  
 অভ্যন্তরে অর্ধভগ্ন একটি কলসী  
 মুগ্ধর, মাহুর ছিন্ন র'য়েছে পড়িয়া  
 জীর্ণ এক কন্যা সনে বেদীর উপরে ।  
 প্রান্তরে নিশ্চিন্ত ভিত্তি, গিয়াছে খসিয়া

স্থানে স্থানে, এ মসজিদ কত পুরাতন  
 কে বলিবে ? মানবের দৃষ্টি কীণতর  
 অক্ষয় পশিতে সেই দূর্ভেদ্য আধারে ।

পার্বদেশে ক্ষুদ্রাকৃতি মসজিদেরি মজ  
 একটি অশুচি গৃহ, অভ্যন্তরে তার  
 একটি সমাধি ভগ্ন । গিয়াছে খসিয়া  
 আন্তর, বৃষ্টির জলে পড়েছে শেওলা ।  
 সম্মুখে প্রবেশ দ্বার, কালের কুঠারে  
 ভগ্ন সে কপাট এবে, পরিবর্তে তার  
 ( মানব নির্মিত ক্ষুদ্র যবনিকা প্রায় )  
 শোভা জাল এবে স্থাপিত সে দ্বারে ।

প্রকৃতির যবনিকা, ক্ষুদ্র বুদ্ধি নর  
 কেমনে বুঝিবে বল এ তরু গভীর  
 বোধাগম্য ; উর্ধ্ব কৃষ্ণ প্রস্তর ফলকে  
 খোদিত পারশ্রু ভাবে এ ক্ষুদ্র কবিতা

১

কে তুমি পথিকবর চ'লেছ কোথায় ?

একবার চেয়ে দেখ এ সমাধি পানে  
 আমি সে কিরোজ সাহা নিদ্রিত হেথায়  
 কাঁপিত এ ধরা যার বিপুল বিক্রমে ?

২

আমিও তোমারি মত অর্থ প্রলোভনে  
 দরিদ্র প্রজার বক্ত কয়েছি শোষণ ।  
 উপেক্ষি সত্যের কায়্যাপা আচরণে  
 কলঙ্কিত করিয়াছি পবিত্র জীবন ।

৩

আবার সে ভীম অস্ত্রে শোণিত-সাগরে  
 কত মানবের মৃত গিয়াছে ভাসিয়া ।  
 আবার এ ভূজবলে জনকের তরে  
 কত রাজঘরের চিহ্ন গিয়াছে উড়িয়া ।

৪

কত বে কুকার্য্য আমি করিয়াছি ভবে  
আজি তার প্রাশ্চিত—এ কুত্র গহ্বরে  
কত কষ্ট, সহিতেছি সকলি নীরবে ।  
পাপের অনুতাপে আজি হৃদয় বিদরে ।

৫

আমার সে পুত্রকন্যা জননী ভগিনী  
আনি না কোথায় তারা,—মৃত কি জীবিত ।  
আনি না কোথায় সেই দুঃখিনী রমনী ।  
যাহাব প্রীতির মন্ডলে ছিনু বিরোধিত ।

৬

তুমিও একদা হায় এ আঁধার কূপে  
আসিয়া আমার মত করিবে রোদন ।  
মৃত অনুতাপ-পাপ ভুজ্জ্বলিনী রূপে  
তোমার হৃদয়-মূলে করিবে দংশন ।

৭

অতএব বিভূষণে বাঁধ এ হৃদয়  
যুঁর না স্বার্থের লোভে তরুর বশে  
সম্মুখে পরীক্ষা তব, থাকিতে সময়  
এখনি প্রস্তুত হও আসিতে এ দেশে ।

শীর্ষ দেশে ভয় ছাদ, মসজিদেদি মত  
একটি গম্বুজ ক্ষুদ্র, জন্মিয়াছে তাহে  
দীর্ঘ এক বটবৃক্ষ, প্রাচীর ভেদিয়া  
অসংখ্য শিকরগুলি অতি বক্রভাবে  
নামিয়াছে নিয়মিত বেষ্টিয়া সমাধি ।  
মরি কি ভীষণ দৃশ্য,—উর্ধ্বে মহাতরু  
অর্গীয় দুতের মত, কিংবা ছিন্নমস্তা,

\* হিন্দুগণ ইহাকে ভীষের গদা ও মুসলমানগণ ইহাকে কিরোজ সাহার ভক্ত বলেন ।

নিরে পদতলে ভয় সমাধি গহ্বরে  
মানব কঙ্কাল রাশি । সমীর স্বননে  
কে জানি অদৃষ্ট ভাবে কহিছে মানবে  
এ শ্মশানে, “এ জগত নিশার স্বপন  
সকলি অনিত্য ভবে, শুধু নিত্য তিনি  
যাঁহার নিয়তি-ভয়ে বাঁধা এ ভুবন ।”  
প্রাঙ্গণ-পশ্চিমে এক বৃহৎ তোরণ  
পতন উন্মুখ, শিরে নহবত গৃহ  
চতুর্কোণাকৃতি, চারি স্তম্ভের উপরে  
ছাদ যেন শূন্য হাঃ স্থাপিত সুন্দর ।  
পার্শ্বে অশ্বশালা, এবে পেচক আশ্রম,  
স্থানে স্থানে ভয় ; কত বেতসবলরী  
উঠিয়াছে পাদপের কণ্ঠ-জড়াইয়া ।  
কল্পনে, আইস দেবি হৃদয় ভরিয়া  
দিল্লীর শ্মশান দৃশ্য দেখি একবার ।

হায় এ কিরোজাবাদে কিরোজ সাহার  
কত কীর্তি ইতস্ততঃ রয়েছে পড়িয়া  
ভয় স্তূপাকারে, আজি হেরিলে নয়নে  
এ ভয় হৃদয়ে বহে ঝটিকা ভীষণ ।  
অই যে অদূরে অই মিনার জেরিণ \*  
কিরোজের কত স্মৃতি মাখিয়া হৃদয়ে  
আজিও কাঁদিছে হায় গভীর নীরবে ।

উত্তর পশ্চিমে এক বিস্তৃত প্রান্তর  
ভয়াবহ, একটিও মনুষ্য-বসতি  
নাহি তথা, রাশি রাশি ইটকের স্তূপ  
ইতস্ততঃ, মাঝে মাঝে ভয় অট্টালিকা,  
ভয় চূর্ণ, ভয় কূপ, ভয় দেব-গৃহ,



কোথাবা মসজিদ ভগ্ন, কোথাবা মিনার  
 পতন উন্মুখ, ভগ্ন প্রাচীর সকল ।  
 কোথাবা রক্তন-গৃহ ভগ্ন নিপতিত  
 ধরা পৃষ্ঠে, অর্ধ ভগ্ন কোথা অশ্মশালা ।  
 কোথা ভগ্ন পাঠাগার, কোথা সরোবর  
 কর্দমাক্ত, ভগ্ন প্রায় সোপান তাহার ।  
 কোথা ভগ্ন পাহাশালা পতন উন্মুখ ।  
 স্থানে স্থানে ভগ্ন প্রায় অসংখ্য সমাধি  
 বেষ্টিত লতিকা জালে তৃণ গুল্ম দলে ।  
 গভীর নির্জন স্থান, ভ্রমেও মানব  
 আসে না এখানে কভু, শিবির চীৎকারে,  
 বায়ু-শব্দে, শবুনির পক্ষ সঞ্চালনে  
 ধ্বনিত দিবসে এই ভীষণ প্রান্তর ।  
 কত শত প্রাসাদের ধ্বংস অবশেষ  
 এখনো র'য়েছে পড়ি, স্থানে স্থানে কত  
 ইষ্টকের ভূপাকার, চারি পাশে কোথা  
 নাহি মানবের চিহ্ন প্রহরের পথে ।  
 কত রাজা কত প্রজা, কত যে সম্রাট  
 হিন্দু মুসলমান, হায় এ জন্মের মত  
 র'য়েছে মিশিয়া এই ভীষণ শ্মশানে  
 অই ধূলা বালি সহ ; মুহূর্তে মুহূর্তে  
 এ মহাশ্মশান-দৃশ্য বীভৎস বরণে  
 কত বিভীষিকা মূর্তি করি প্রদর্শন  
 উৎপাদিছে মহাভীতি মানব হৃদয়ে ।  
 একবার দাঁড়াইলে মুহূর্তের ভরে  
 এ শ্মশানে, আপনার অস্তিত্ব ভুলিয়া  
 মিশিয়া বাইবে তুমি অনন্তের সনে ।  
 হিন্দুর সৌভাগ্য-লক্ষী মহাপরাক্রমে  
 প্রতিষ্ঠিতা আরাধ্য ভারতের বৃকে

মিশিয়া গিয়াছে এই চিত্তাক্ষয় সনে  
 সেই শ্মশানের পরে, সেই চিত্তা ভস্ম  
 মোসলেমের নবরাজ্য হইল স্থাপিত  
 নব ভাবে, এই আতি ভীষণ বিক্রমে  
 উত্থানের শীর্ষদেশে করি আরোহণ  
 শাসিল ভারত যবে, শত জয়ধ্বনি  
 উঠিল আকাশ পথে দ্রাবিয়া ভারত  
 ইসলামের সুপবিত্র বিমল কিরণে ।  
 “এক ভিন্ন অন্ন নাই উপাস্ত এ ভবে”  
 এ পবিত্র মহামন্ত্রে হইল দীক্ষিত  
 ভ্রমাক্ত ভারতবাসী, হইল তখন  
 ভারতে নূতন যুগ, সেই দিন হতে  
 ভারতে ইসলাম-ভিত্তি হইল পত্তন ।  
 বিধির অনন্তলীলা, পশ্চিম আকাশে  
 সাজিল প্রবল মেঘ, বর্ষিল ভীষণ  
 বিজাত্যায়ি, সে অনলে হ'ল দক্ষীভূত  
 ইসলামের মহাশক্তি, দেখিতে দেখিতে  
 হইল পতন তার, সেই ভস্ম স্তূপে—  
 সেই দক্ষীভূত পুত ভীষণ কঙ্কালে  
 কত সম্বর্পণে যত্নে হইল গঠিত  
 ইংরাজের রক্তময় স্বর্ণ সিংহাসন ।  
 এই দিল্লী হিন্দুদের ভীষণ শ্মশান,  
 এই স্থানে মোসলেমের পাঁচটি সাম্রাজ্য  
 মিশিয়া গিয়াছে এই ধূলা বালি সনে ।  
 মোসলেমের ইতিহাস উত্থান পতন  
 অন্ধ অন্ধ বিকড়িত এ মহাশ্মশানে  
 আজি সেই দিল্লী রক্ত মলিন বদনে  
 পাঁচটি সাম্রাজ্য-ভস্ম মাখিয়া হৃদয়ে  
 হিন্দু গৌরবের ভস্ম মাখিয়া ললাটে

থ'রেছে কি শোকময়ী মূর্তি উদাসিনী ।  
 এ গভীর মহাত্ম্য কেমনে বুঝিবে  
 ক্ষুদ্র বুদ্ধি নর ? শত উত্থান পতন  
 অতি সূক্ষ্ম ক্রম-সূত্রে এখিত এখানে ।  
 এ শ্মশান মানবের মহাশিক্ষা-স্থল  
 ভগ্নভূপ মহাকাব্য, প্রতি রেণু সনে  
 সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের মহাত্ম্য রাশি  
 সংজড়িত, সুনির্মল দর্পণের মত  
 মানব-অবস্থা রাশি বিস্থিত এখানে ।  
 মূর্খ নর পাপে মত্ত, পারে না দেখিতে  
 সেই দৃশ্য, ভক্তি ভাবে পবিত্র হৃদয়ে  
 নিরখিলে এ শ্মশান, জ্ঞানের নয়নে  
 দেখিবে তখনি হায় প্রতি স্তরে স্তরে  
 পাপ পুণ্য ভিন্ন ভিন্ন চিত্রিত স্তম্ভর ।  
 দেখিবে তখনি সেই প্রতি রেণু সনে  
 বিধাতার ধ্বংস নীতি, সৃষ্টি কর্তা যেন  
 মানব শিক্ষার তরে এ মহাশ্মশানে  
 লিখেছেন ধ্বংস-কাব্য, সে ভাবার মর্ম  
 কে বুঝিবে ? সে যে নর-জ্ঞানের অতীত,  
 কেমনে বুঝিবে তুমি ক্ষুদ্র বুদ্ধি নর  
 সে অজ্ঞেয় ধ্বংস নীতি ? এ নীতির গর্ভে  
 বিধাতার কি উদ্দেশ্য র'য়েছে নিহিত ?  
 একবার চেয়ে দেখ জ্ঞানের নয়নে  
 যে দিল্লীর পরাক্রমে, ভীষণ বিক্রমে  
 কাঁপিত সমগ্র বিশ্ব, আজি কেন তার  
 এই দশা ? —বক্ষে তার শ্মশান ভীষণ ।  
 বাহার পবিত্র বক্ষে কত সৌধমালা  
 কত হর্ম্মা, দেবগৃহ নিকুঞ্জ কানন  
 সুরম্য মসজিদ কত, অসংখ্য বিপনী  
 শোভিত, শকট কত করিত ভ্রমণ

যে প্রশস্ত রাজ পথে, ঘোর কোলাহলে  
 কত অশ্ব, কত গজ, শিবিকাই কত  
 আসিত যাইত, কত পথিক নিচয়  
 নানাদেশী, সুসজ্জিত নানা পরিচ্ছদে  
 যে পথের শোভা সদা করিত বর্জন  
 পথিকের সমাগমে নর কোলাহলে  
 ডুবিয়া রহিত যেই সুদৃশ্য নগরী  
 দিবস রজনী,—কেন এ দশা তাহার ?  
 আজি তার বক্ষে হায় অসংখ্য সমাধি  
 অর্ধ ভগ্ন, ভগ্ন প্রায় কোথা, বা বিলুপ্ত  
 চিরুমাত্র কোন স্থানে র'য়েছে পড়িয়া  
 ভগ্ন ইট, ভগ্ন শেখ সমাধি গহ্বরে ;  
 কে বলিবে কেন আজি এ দশা তাহার  
 এই স্থানে—এ গভীর ভীষণ শ্মশানে  
 কত কবি, কত বীর, কত রাজ্যেশ্বর  
 ধর্ম্মাত্মা, পাপাত্মা কত, প্রেমিক প্রেমিকা  
 নিহিত জন্মের মত,—দিল্লীর অদৃষ্টে  
 সমাধির পরে হায় সমাধি কেবল !  
 ইহাই ত ধ্বংস নীতি ? এ নীতি বিহনে  
 জগৎ উন্নতি পথে যাইবে কেমনে ?  
 ধ্বংস বিনা জগতের ঘোর অমঙ্গল ।  
 এই ধ্বংস গর্ভে সৃষ্টি লভিছে জনম ।  
 এই নীতি জগতের সৃষ্টির কারন ;  
 ভেবে দেখ, এই ধ্বংস নীতির উপরে  
 বিধাতার বিশ্বরাজ্য হ'য়েছে স্থাপিত ।  
 এই নীতি জগতের উন্নতি সোপান ;  
 এই নীতি জীবাত্মার মুক্তির বিধান ।  
 এ নীতিতে বিধাতার অনন্ত কৌশল  
 নিহিত প্রচ্ছন্নভাবে, রহস্যকর স্বদে  
 নিহিত যেমতি হায় অসংখ্য রতন ।

এ নীতি ত্রয়ো ব্যাপী অড়ে ও অজড়ে  
চেতনে উদ্ভিদে হয় সর্বত্র সমান ।  
এই মহানীতি আজি দিল্লীর জুদয়ে  
অড়ে অড়ে একটিত, কত সাজাজোর  
উখান পতন হয় এখিত এখানে  
ক্রম-সুখে ;—মানবের কি শিক্ষার স্থল ।

প্রান্তরের একপ্রান্তে নির্জন কাননে  
হুমায়ুন-স্মৃতিস্তম্ভ সমাধি তাহার  
চতুর্দোশাকৃতি এক প্রাসাদ ভিতরে ।  
চারি দিকে কুজবন, কত পুষ্প তরু  
শোভিছে সুটক্ক ফুলে নবীন মুকুলে ।  
নাহি মানবের চিহ্ন, গভীর নির্জন,  
শান্তির আবাস-ক্ষেত্র ; সুত্র পথ-ধারে  
কত পুষ্প ধরে সদা স্নিগ্ধ সমীরণে ।  
স্থানে স্থানে মনোহর কত ফল-তরু  
শোভিছে বিবিধ ফলে, স্নিগ্ধ ছায়াতলে  
অসংখ্য কুরঙ্গ-শিশু খেলিছে সুন্দর  
কানন-প্রকৃতি-প্রাণ করিয়া হরণ ।  
সেই তরু পাখে কত নির্জন সজিনী  
বন পাখী, সুমধুর করুণ সঙ্গীতে  
বহিছে কি শান্তি-ধারা প্রকৃতির প্রাণে  
প্রাণিয়া সে মনোহর নির্জন কানন,—  
—বহিছে কি প্রেমপূর্ণ অমৃতের ধারা  
সমাধিস্থ দম্পতীর জুদয় যুগলে ।  
উভানের মধ্যস্থলে মর্ম্মর নির্মিত  
মনোহর অটালিকা, তাহার গঠনে

সুগঠিত, শীর্ষে এক গম্বুজ সুন্দর ।  
দুই পার্শ্বে দুটি কক্ষ কি শোভা সদন ।  
শীর্ষদেশে কুত্র কুত্র কতকগুলি স্তম্ভ  
গম্বুজের চারি পার্শ্বে নয়ন-রঞ্জন ;  
প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রস্তর সমাধি ।  
এ নির্জন বনে, এই নিভৃত নিবাসে  
বিধগুণ্য হুমায়ুন নিদ্রিত গভীর ।  
সংসারে আকর্ষণ মোহ মায়া স্নেহ  
কাটাঁইয়া, এ নিভৃত শান্তির সদনে  
আত্মা তার, চিরতরে লভিছে বিশ্রাম ।  
কক্ষান্তরে হয় এই সমাধি মন্দিরে  
সৌন্দর্য্যের প্রকৃতিমূর্ত্তি চির পতিত্বতা  
সম্রাজ্ঞী হামিদাবানু খামীর নিকটে  
অনন্ত নিদ্রার কোলে শায়িত এখন ।

হায় এই মন্দিরের বিপরীত দিকে  
ইসর্খা-মসজিদ \* আজি কাল-অস্বাধাতে  
ভগ্ন প্রায়, লুপ্ত প্রায় সৌন্দর্য্য তাহার ।  
অদূরে “চৌবাট খায়া” † সুরম্য প্রাসাদ  
বিনির্মিত মনোহর সুশুভ্র মর্ম্মরে,  
মুহূর্ত্ত দেখিলে তাহা প্রাণের ভিতরে  
কি এক অতীত স্মৃতি ভেগে উঠে হয় ।  
চৌবাটী স্তম্ভের পরে এ সুরম্য গৃহ  
সুগঠিত, অভ্যন্তরে একটি সমাধি  
অভাগা কুকুলতুষ ‡ এ নিভৃত বাসে  
নিদ্রিত জন্মের মত, আরো কত শত  
অর্ধ ভগ্ন, ভগ্ন প্রায় অসংখ্য সমাধি

\* এই মসজিদকে লোকে ইসা খাঁর কোতরা বাজিরা থাকে । ইসা খাঁ সের সাহার দরবারের একজন ওমরাহ ।

† ১৬০০ খৃষ্টাব্দে এই প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছে ।

‡ ভোগদার পুর মির্জা আজিম কুকুলতুষ খাঁ, ইনি আদম খাঁর হস্তে নিহত হইয়াছিলেন ।

চারিদিকে, নিরখিলে আতঙ্কে হৃদয়  
কঁপে উঠে, এই স্থানে কত সাহাজাদা  
সাহাজাদি চিরতরে গভীর নিদ্রিত।  
ফিরোকশিয়ার, রাফি, ১ হতভাগা দারা, ২  
জেন্দাহার, ৩ আলমগীর, ৪ আরো কতজন  
এই স্থানে—হায় এই নিবিড় নির্জনে  
অনন্ত নিজার কোলে লভিছে বিজ্ঞান।

অই হায় অর্ধভগ্ন আবিদ-সমাধি ৫  
বেষ্টিত লভিকাজালে, কত বন-ফুল  
ফুটিছে ঝরিছে এই সমাধির পরে।  
হায় এই শ্মশানের দক্ষিণ পশ্চিমে  
অনুরে গিয়াসপুরে অসংখ্য সমাধি  
আতঙ্কে শিহরে হৃদি হেরিলে নয়নে।  
এই স্থানে নিজামদ্দি ৬ সমাধি-মন্দির  
আজিও কালের সনে বুকিয়া সতত  
অকৃত শরীরে আশা কাদিছে নীরবে  
ধরি বন্ধে সে পবিত্র তাপসের দেহ।  
মন্দিরের মধ্যভাগ কোরানের শ্লোকে  
সুচিহ্নিত, সে পবিত্র সমাধি মন্দির  
শীর্ষদেশে, এক থানা কোরান স্থাপিত।  
আজিও সহস্র লোক প্রতি বর্ষে বর্ষে  
হয় সমবেত এই সমাধি মন্দিরে।  
অই যে বেয়লী কূপ সমাধির কাছে,  
প্রতি বর্ষে বর্ষে হায় উৎসব সময়ে  
কত যাত্রী স্নান করি অতীতের স্মৃতি  
জাগাইয়া অক্ষরাশি করে বরিষণ।

জন্মত খাঁ মসজিদ অর্ধভগ্ন-বেশে  
দাঁড়াইয়া কাদিতেছে গভীর নীরবে  
স্মরি হৃদে মোসেমের অতীত গৌরব।  
অনুরে কোবিল ঐচ্ছিক খজুর সমাধি,  
যাহার কবিষে মুক্ত মোসেম-জগত।  
দিল্লীর সম্রাট যারে করিত সন্মান  
তুনি যার প্রেমপূর্ণ কবিতা-বন্ধার  
অতুলিত, সুধারামি ঝরিত যাহার  
কণ্ঠ স্বরে, আত্মা তার লভিছে বিজ্ঞান  
এই স্থানে মারা-মোহ করিয়া ছেদন।  
অই মির্জা জাহাঙ্গির-সমাধি মন্দির  
কারুকার্য বিখচিত সুরমা প্রস্তরে;  
হায় এ অভাগা বুঝা কালের কবলে  
নিপতিত অসময়ে নিজ বুদ্ধি দোষে  
আত্মা তার দক্ষীভূত অনুতাপানলে।  
মুক্ত গগনের তলে অই যে সমাধি  
তৃণ আচ্ছাদিত, হায় হেরিলে নয়নে  
কি যে এক ভক্তি রসে ডুবে যায় হৃদি,  
কেমনে বর্ণিবে কবি, নারীকুল-মণি  
সাহাজাদি জাহানারা নিদ্রিত এখানে।  
হায় এ সমাধি পরে নাহি চন্দ্রাতপ,  
নাহি শ্বেত মর্মরের চারু আচ্ছাদন,  
নাহি বেশ কুশা, হায় শ্রাম তৃণ দলে  
আচ্ছাদিত এ সমাধি দীন হীন বেশে।  
প্রকৃতির দীন হীন সন্তান যেমন  
লুকায়ে র'য়েছে অই প্রকৃতির কোলে  
নিজা মগ্ন, হায় যেন প্রকৃতি আপনি

১. রাফিউদ্দৌলা। ২. সাহাজাহানের পুর দারার মুওহীন দেহ সমাধির হইরাছিল বলিয়া এই সমাধি সৈরী। কিছু ছোট। ৩. জাহানার সাহা। ৪. দিল্লীর আলমগীর। ৫. সৈয়দ আবিদ।

৬. নেজামদ্দিন আওসিয়া। \* ১৩১৩ খৃষ্টাব্দে ফিরোজ সাহা কর্তৃক এই মসজিদ নির্মিত হইরাছিল।

লুকা'য়ে রে'খেছে তারে শ্রাম তুণদলে ।  
 নিকটেই মহানন্দ সাহার সমাধি,  
 হায় এই হতভাগ্য ভারত সম্রাট  
 নাদিরের আক্রমণে জনমের মত  
 হারাইয়া ধনরত্ন, কোহিনুর মণি,  
 হারাইয়া অমূল্যমৌল্যের ধনি  
 মণি মুক্তা সুশোভিত ময়ূর আসন,  
 আশ্রা তার এই স্থানে নিদ্রিত এখন ।  
 লাল কোট \* মধ্যভাগে অই লৌহস্তম্ভ  
 অতীতের কত স্মৃতি মাখিয়া ছন্দয়ে  
 কত বজ্র কত বজ্র সহিছে নীরবে ।  
 তরু প্রায় অতি দৃঢ় পিথোরার দুর্গ †  
 যেটিয়া এ লালকোট ঘোষিছে নীরবে ।  
 হিন্দুর বিগত বীৰ্য্য ঐশ্বর্য্য গৌরব ।  
 কুতুবুল ইশলাম ‡ হায় তরু প্রায় আজি  
 পাঠান রাজত্ব-স্মৃতি লইয়া ছন্দয়ে  
 নীরবে কেলিছে অক্ষ, হেরিলে বারেক  
 পাঠান গৌরব-গাথা জেগে উঠে মনে ।  
 দিল্লীর শ্রাণান বুকে দুর্গ অগণিত  
 কাল-অজ্রঘাতে আজি চূর্ণীকৃত হায় । +  
 ছিল যাহা এক দিন বিজয়-গৌরবে  
 সম্মানিত, আজি তাহা ভীষণ শ্রাণানে  
 পরিনত, তরু স্তূপ র'য়েছে পড়িয়া

ইতস্ততঃ মরু প্রায় নির্জন প্রান্তরে ?  
 তরু সে জেহান পারা, তরু সেই সিরি,  
 তরু সেই সম্রাটের চারু অট্টালিকা  
 অমূল্যমৌল্যের হাজার সেতন  
 সহস্র স্তম্ভের পরে যে মহা প্রাসাদ  
 হ'য়েছিল বিনিম্বিত অতুল ভগ্নভেদে ।  
 যেই স্থানে আলাউদ্দীন মনের আনন্দে  
 গুজরাটের প্রেমময়ী কমলার সনে  
 নিবসিত, যেই স্থানে পারিজাত প্রায়  
 'দেবলা' 'খেজুর' দুটি পুষ্প মনোহর  
 কুটেছিল এক দিন নয়ন-রঞ্জন ।  
 যাহাদের প্রেম-স্মৃতি র'য়েছে মিশিয়া  
 চিরতরে, হায় এই তরু স্তূপ সনে ।  
 তরু সেই মনোহর রোশন চিরগে ×  
 মহাশ্রা নাসির যাহে লভিছে বিজ্রাম  
 চিরতরে, আরো কত সমাধি-মন্দির  
 রহিয়াছে তরুবোশে হায় এই স্থানে ।  
 তরু প্রায় কির্কি, ○ আহা ইটকের স্তূপে  
 পরিণত, তরু প্রায় একটি মসজিদ  
 এই স্থানে জাহানের স্মৃতি সঙ্কল্প  
 ধরি ছন্দে অবিরত করিছে রোদন ।  
 অই যে ভোগলকাবাদ কুজ শৈল পরে  
 বিনিম্বিত মহাদুর্গ মোসেম-গৌরব ;

\* লালকোট দুর্গ ১০৬০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় অনঙ্গ পাল কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল।

† দিল্লীর শেষ হিন্দু সম্রাট পৃথ্বীরাজের দুর্গ। দিল্লীকে অধিকতর সুদৃঢ় করিবার জন্য পৃথ্বীরাজ কর্তৃক এই দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল। ইহাতে নরসিং ভোরণ ছিল। এই দুর্গের পশ্চিম ভোরণ দিল্লী মসজিদমানসপ দিল্লীতে প্রবেশ করিয়া দিল্লী-সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন।

‡ পাঠান রাজত্ব সময়ে ইহা একটি মনোহর স্থল ছিল। + দিল্লী বড়ই প্রাচীন ও বৃহৎ সহর, ইহার কোন অংশের নাম কিল্লাজাবাদ, কোন অংশের নাম টোপজাবাদ, কোন অংশের নাম ইজগর। দিল্লীর মত পুরাতন ও বৃহৎ সহর পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। পৃথিবীর কোন সহরেই দিল্লীর মত নানা আভির্ষ এত উচ্চান পতন সংঘটিত হয় নাই।

○ একটি দরগাহ। ○ কির্কি একটি প্রাচীরবেষ্টিত দুর্গ। ১৩৮৩ খৃষ্টাব্দে খাঁ জাহান ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন।



পশ্চিম উত্তর পূর্ব পরিখা বেষ্টিত ;  
দক্ষিণে প্রকাণ্ড বাগী, হায় এই স্থানে  
কত অট্টালিকা কত সুরমা মসজিদ  
ক্সাস মুখে নিপতিত, শুকপ্রায় আজি  
অসংখ্য সরসীগুলি কাল আক্রমণে ।  
দুর্গের দক্ষিণে এক সরোবর মাঝে  
অই হায় ভোগলক সাহার সমাধি ।  
মরি কি সুন্দর দৃশ্য নয়ন-রঞ্জন,  
চারিদিকে জলরাশি মধ্যস্থলে হায়  
সমাধি মন্দির উচ্চ, হায় এই স্থানে  
ভোগলক সাহা আজি নিদ্রিত গভীর ।

আরব সরাই \* অই পল্লী মনোহর  
কালের কঠোর অস্ত্রে শ্মশান ভীষণ ।  
যেই স্থানে শত শত আরব নিচয়  
নিবসিত সদা, আজি অদৃষ্টের দোষে  
সেই স্থানে সুগভীর নিবিড় নিষ্ফর্ন,  
আজিও সেখানে ছুটি ফাটক সুন্দর  
হৃদ্যস্ত কালের সনে যুঝি বহু দিন  
জীর্ণ দেহে করিতেছে অশ্রু বরিষণ  
শিশিরের ছলে, শত পথিকের প্রাণে  
জাগাইয়া অতীতের গৌরব-স্বপন ।  
এই স্থানে টোঙ্গা খাঁর সমাধি মন্দির  
অর্ধ ভগ্ন, উঠিয়াছে কত বন লতা ।

মন্দিরের চারি দিক করিয়া বেটন ।  
মনোহর “নীল ভূজ” অর্ধ ভগ্ন প্রায়  
আজিও র’য়েছে পড়ে, অত্যন্তরে তার  
এক জন সৈয়দের সমাধি সুন্দর  
পথিকের প্রাণে করে উদাস সঞ্চার ।  
“মোকুবরা খাঁ খান্না” † অই সমাধি মন্দির  
বিনির্মিত মনোহর সুশুভ্র মন্দিরে  
রক্তিম প্রস্তরে, আহা হেরিলে নয়নে  
কি এক ভাবের স্রোতে ডু’বে যায় মন ।  
ভগ্ন সেই “কিলকিনা” মসজিদ সুন্দর  
হুমায়ুন অতি যত্নে গড়েছিল। যারে  
দিল্লীর হৃদয়ে, আজি কালের কবলে  
নিপতিত, ভগ্ন প্রায় সে “শের মজিল” ‡  
বিনির্মিত বহুমূল্য লোহিত প্রস্তরে  
এ ত্রিতল অট্টালিকা, হেরিলে যাহারে  
অতীতের কত স্মৃতি ঝটিকার মত  
উঠে হৃদে, করে অশ্রু যুগল নয়নে ।

ভগ্ন সেই “কিলকেরী” ○ আজিও কাঁদিছে  
অতীতের কত কথা করিয়া স্মরণ ।  
আর সে যমুনা †—হায় আজিও বহিছে  
হে’রেছে যে মোস্তফার উত্থান পতন ।  
মোস্তফা বীরত্ব-গাথা যমুনার বুকে  
এক দিন ডু’লেছিল কি বড় ভীষণ ।

\* আরব সরাই একটি সুন্দর স্থান, হুমায়ুনের পত্নী হামিদা বানু ওরফে হাজি বেগম কয়েকজন আরব সন্ন্যাসীর  
ধর্মপরাশ্রয় লোক আনিয়া এই স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন ।

† বৈরাগ খাঁর পুত্র আব্দুল রহিম খাঁর দ্বারা সমাধির উপরে নির্মিত ।

‡ ইহা একটি রক্ত প্রস্তরের ত্রিতল অট্টালিকা । হুমায়ুন এই পুণ্ডে নিজের পুত্রকানার স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং  
এই পুণ্ডেই এক দিবস আহম্মদের নামাজ পড়িবার জন্য নামিবার সময় পদস্ফলিত হইয়া নিচে পড়িয়া মৃত্যুবরণ  
করেন ।

○ কিলকেরী যমুনা নদীর তীরে সম্রাট কালিকোবাদের রাজ-প্রাসাদ ।



আজি তা মীরব, সব নাহি কারো মুখে,  
 সে শৌর্য ঐশ্বর্য বীৰ্য্য বিলুপ্ত এখন।  
 আছে শুধু ঋংসরূপী কালের কুকুটী  
 ইতস্ততঃ রাশি রাশি ভয়ভূপ সনে।  
 অতীতের সাক্ষী সেই “কুতুব মিনার”  
 দাঁড়াইয়া যুগে যুগে প্রহরীর মত  
 হেরিয়াছে মোস্তেমের পাঁচটি সাম্রাজ্য  
 এই স্থানে, তাহাদের বিজয় হুঙ্কার,  
 আনন্দের কোলাহল, ঐশ্বর্য্য বৈভব  
 সকলি দেখেছে বৃদ্ধ, সে বীরব গাথা  
 কুতুবের কক্ষে কক্ষে হইত ধনিত  
 নিশি দিন, আজি হায় স্বপনের মত  
 সকলি বিলুপ্ত, নাহি চিহ্ন মাত্র তার।  
 আছে শুধু অতীতের স্মৃতিগুলি হায়  
 ঋংস শেষ রাশি রাশি ভয়ভূপ সনে।  
 আর সেই বৃদ্ধ ?—সেই “কুতুব মিনার”  
 নিরখিয়া মোস্তেমের শ্মশান ভীষণ,  
 নিরখিয়া মোস্তেমের উত্থান পতন,  
 কেঁদে কেঁদে হায় যেন গিয়াছে কাটিয়া  
 মোস্তেম গৌরব-গাথা করিয়া স্মরণ।  
 কুতুবের পাশে এক মিনারের ভিত্তি  
 অসম্পূর্ণ অবস্থায় র’য়েছে পড়িয়া  
 আজো হায়, নিরখিলে করে ছনয়ন।  
 দিল্লী-ই যে মোস্তেমের গৌরব-শ্মশান  
 মোস্তেম-গৌরব-লক্ষ্মী হায় চির তরে  
 কাঁদাইয়া ভারতীয় সমগ্র মোস্তেমে  
 দিল্লীর সমাধি নিয়ে অই ভয় সনে  
 এ কালের মত হায় র’য়েছে শয়ান।  
 দিল্লীর শ্মশান-বুকে সমাধি বিহনে

কি দেখিবে ?—শৌর্য্য বীৰ্য্য বিলুপ্ত সকল।  
 নাহি আর সে গৌরব, দিল্লীর অদৃষ্টে  
 সমাধির পরে হায় সমাধি কেবল।  
 ঋংসরূপী কাল যে মূর্ত্তিমান হ’য়ে  
 ঋংসিয়া গৌরব পূর্ণ সে মহাসাম্রাজ্য,  
 ঋংসিয়া কঠোর অস্ত্রে সে ঐশ্বর্য্য বীৰ্য্য  
 বিরাজিছে আজি হায় এ মহাশ্মশানে ;  
 দিল্লীর শ্মশান দৃষ্ট কি আর বর্ণিবে  
 অভাগা মোস্তেম কবি, সে করুণ চিত্র  
 ভাষায় শব্দ নাই আঁকিব কেমনে ?  
 একবার নিরখিলে এ মহাশ্মশান,  
 আপন। আপনি হায় হৃদয়ের মাঝে  
 উঠিবে যে মহাবড়, কেমনে সে বেগ  
 ভাষার গভীর মাঝে রাখিব রোধিয়া ?  
 অসম্ভব, ইচ্ছা হয় জনমের মত  
 ত্যজিয়া সংসার গৃহ অই ধূলা বালি  
 মাখি ছদে, দিল্লী প্রায় সেজে উদাসীন  
 অনাহারে অনিদ্রায় থাকি পড়ে হায়  
 যথা তথা, জাগাইয়া প্রাণের ভিতরে  
 সে বিগত স্মৃতি—সেই অতীত স্বপন।

ভোরণ-পশ্চিমে মহা কানন হর্গম  
 হিংস্র জন্তু বাসস্থল ; বেটি এ প্রাসাদ  
 দীর্ঘ এক রাজপথ প্রশস্ত সুন্দর  
 গেছে সাজাহানাবাদে, \* হুই পাশে তার  
 জেপীবদ্ধ বৃক্ষগুলি প্রহরীর মত,  
 দাঁড়াইয়া অচঞ্চল রাজ-প্রতীকায়  
 রাজপথে সারি সারি, নয়ন-রঞ্জন।  
 পথ-পাশে সফদরের † সমাধি মন্দির

\* নূতন দিল্লী। † সফদর জঙ্গ, ইংল্যান্ডের প্রকৃত নাম মনসর জঙ্গী খাঁ, ইনি অসোধ্যার নবাব এবং দিল্লীর বাদশাহের  
 উদ্ধির হিংস্র। ইংল্যান্ডই পুর নবাব সাজাহানাবাদ।

শোকে হুঃখে দীর্ঘশ্বাস কেলিছে নীরবে  
অবিরত, আরো কত ভগ্ন পুরাতন  
অসংখ্য সমাধি শোকে কাঁদিছে সতত  
শিশিরের ছলে, আহা পথিকের প্রাণে।—  
হুটাইয়া কি করণ শোক-প্রস্রবণ।

অই যে বৃহৎ এক ত্রিভল প্রাসাদ।—  
—কে জানে এ প্রাসাদের কেবা অধীশ্বর ?  
কোথা আজি সে হুঁতগা ? মৃত কি জীবিত ?  
নিয়তির ঘূর্ণ চক্র সতত মানবে  
নিপেষিয়া এই ভাবে বিনাশে চরমে ;  
এ মহাপ্রাসাদ ভগ্ন আকবর সাহার  
রক্ত ভূমি, ভারতীয় রক্ত সিংহাসনে  
ছিল। সে বীরেন্দ্র বেশে সমাসীন যবে  
তাহারি বিহার ক্ষেত্র ছিল এ ভবন ।  
আজি হায় চিরতরে হারা'য়ে সম্পদ  
এহ দোষে পরিণত নির্জন কাননে ।  
এ বাড়ীর পশ্চিমাংশে বহু সহকার  
ঘন ঘনাকারে, কত সেপাটা পেয়ারা  
নানাবিধ ফল-তরু, পশ্চাতে তাহার  
একটি ত্রিভল কক্ষ ভগ্ন স্থানে স্থানে ।  
সম্মুখে উন্মুক্ত এক অলিন্দ উপরে  
একটি তাপস বৃদ্ধ বসি কুশাসনে,  
নিমিলিত নেত্রদ্বয়, শুভ্র কেশগুলি  
জটা প্রায়, পৃষ্ট দেশে প'ড়েছে হুলিয়া  
শুভ্র শ্মশ্রু অতি দীর্ঘ; গৈরিক বসন  
পড়িয়াছে যোগী শ্রেষ্ঠ, নাহি বাহ্য জ্ঞান  
উন্মত্ত তাপস, মত্ত পরাংপর-প্রেমে  
গাইছে গভীর স্বরে মুদিত নয়নে  
তুহি আশা, তুহি ভরসা, তুহি হৃদি-বাণী ।  
তুহি ভিন জ্ঞানহীন কিছুই না জানি ।

আগে বসুধা তোহারি গানে,  
বিহগ ডাকে তোহারি ডানে,  
গায় ডাটিনী, দিন বাবিনী তোহারি গুণ-বাণী ।  
তুহি প্রিয়, তুহি প্রিয়া,  
তু গরল তু অমিয়া  
সুখ দুঃখ সবহি তুহি, তু বিরহ প্রেম-ধনি ।  
তুহি ভক্ত, তুহি পত্র  
তুহি শত্রু, তুহি মিত্র  
তুহি জ্যোতি, তু তমিস্র তু হিঅগ্নি তুহি পানি ।  
তুহি ধর্ম, তুহি কর্ম,  
এ বিশ্ব তোহারি মর্ম  
তোহারি অগৎ অগতের তুহি, তুহি চন্দ্র দিনমণি  
তুহি আদি, তুহি অন্ত,  
তু অনাদি, তু অনন্ত,  
তুহি মৃত, তু জীবন্ত, তুহি বৃষ্টি, তু অশনি ।  
তুহি হর্ভা, তুহি কর্তা  
তু বিজিত তু বিজেতা,  
তোহারি শ্বাস প্রশ্বাস অগতেরি যত প্রাণী ।  
তুহি জলে, তুহি স্থলে,  
তুহি শূন্যে নভোমণ্ডলে,  
তুহি বিশ্ব, বিশ্ব তুহি, আমি তুহি, তুহি আমি ।

একটি সৈনিক ধীরে কম্পিত চরণে  
উঠিয়া ত্রিভল কক্ষে অলিন্দের পরে  
তাপসের পদ প্রান্তে দাঁড়াইলা আসি  
ভয়ে ভয়ে; স্পন্দহীন প্রস্তরের প্রায়  
বহুক্ষণ যুক্তকরে রহিল। দাঁড়িয়ে  
নীরব, উন্মত্ত যোগী বহুক্ষণ পরে  
মেলিল। যুগল আঁখি, কহিল—“কে তুমি  
কি উদ্দেশে আসিয়াছ পাগলের কাছে ?”  
সমস্রমে প্রশ্নিয়া কহিল। সৈনিক  
“তুমি ত সকলি জান, কেন তবে বাবা  
জিজ্ঞাসিছ অভাগারে ? যোগী শ্রেষ্ঠ তুমি  
তব অগোচর বাবা কি আছে অগতে ?  
সজ্ঞাটের ভৃত্য আমি কিঙ্কর তোমার,  
নজিব আমার নাম, মহারাষ্ট্র সনে

বৈধেছে ভীষণ যুদ্ধ, দুর্বল মোস্তেম  
 বুঝিবা এ যুদ্ধে বাবা যার রসাতলে ।  
 তোমার চরণ প্রান্তে লভিতে আশ্রয়  
 আসিয়াছি, রক্ষা কর এ ঘোর বিপদে  
 নিরীহ মোস্তেমদলে, কর আশীর্বাদ  
 খাসিয়া কাফের যুদ্ধে বিজয়ীর বেশে  
 ইল্লাহের জয় যেন পারি বিবোধিতে ।”  
 নীরবে নয়নদয় মুদ্রিতা তাপস,  
 বহুক্ষণ পরে পুনঃ মেলিল নয়ন,  
 কহিল “নজিব” বাবা জয়ী হবি তোরা  
 এ যুদ্ধে, মোস্তেমরাজ্য রহিবে না আর  
 বেশী দিন, ভারতের ভাগ্য বিপর্যয়  
 হবে শীঘ্র, আধ্যাত্মিক জগতে এখন  
 ছালেকের \* আধিপত্য, কিছু দিন পরে  
 মজুবের † হস্তে বাবা যাবে রাজ্য ভার ।  
 সে সময়ে জগতের সমস্ত কার্যের  
 হবে না শৃঙ্খলা কিছু, সবিশৃঙ্খল  
 অনাবৃষ্টি, অতি বৃষ্টি অসময়ে বাবা  
 হবে সব, মহামারী ছড়িবে ভীষণ  
 ভারতের অস্থি মজা করিবে পেষণ ।  
 শীতে গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মে শীত, বর্ষায় হেমন্ত

শরতে বসন্ত, বাবা সৃষ্টি-রঙ্গ-ভূমে  
 হবে এই অভিনয়, মজুবের কার্য  
 ঘোর বিশৃঙ্খল, নহে নিয়মের বশ ।  
 কেমনে বিশ্বের কার্য শৃঙ্খল ভাবে  
 সম্পাদিবে ? সে যে বাবা আপনি পাগল ।  
 তখনি ভারত রাজ্য মোস্তেমের করে  
 পড়িবে খসিয়া, কোন বিদেশী পুরুষ  
 লভিবে এ রাজ্য ভার । কি করিবে বাছা  
 বিধির বিধান তুমি খণ্ডাবে কেমনে ?  
 স্মরণ করগে সেই পতিত পাবনে,  
 ইচ্ছাময় তিনি, ইচ্ছা তার এ জগতে  
 অবশ্য পুরিবে ; তারে স্মরিলে বিপদে  
 শোক তাপ দূরে যাবে, আত্মার তিতরে  
 লভিবে নূতন বল, হবে বলীয়ান  
 ধর্ম বলে, কেন বাছা দুঃখ অকারণ ?  
 যাও বাছা, স্মর সেই বিপদ ভঞ্জে,  
 অবশ্য মজল তিনি করিবে সাধন ।”  
 তপস্বীর পদ ধূলি করিয়া গ্রহণ  
 বিদায় হইলা বীর ; মুহূর্তে সন্ন্যাসী  
 নয়ন মুজ্রিত করি গাইতে লাগিল  
 বর্ষিয়া শাস্তির ধারা দিল্লীর শ্মশানে ।

\* মুসলমানদের পাশে আছে যে, পৃথিবীর যাবতীয় কার্যই ঈশ্বরের আদেশ ক্রমে আওলিয়া ও কতুবের দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে । এই জন্য চারি জন আওলিয়া ও কতুব (সাধক) প্রত্যেক সহরেই সোপান ভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকেন । ইহারা দুই শ্রেণীর, ১ম ছালেক, Liberal ২য় মজুব Conservative, পর্যায়ক্রমে এই ভার কখন ছালেকের হস্তে, কখন মজুবের হস্তে ন্যস্ত হইয়া থাকে ।

† সংসারে থাকিয়া লোকের সহিত মিলিয়া মিশিয়া যাঁহারা ঈশ্বরকে পাইয়াছেন তাঁহারা ছালেক । আর যাঁহারা উন্মাদ, বোনে লোকাজন হইতে দূরে ও নিজস্ব থাকিয়া ঈশ্বরকে পাইয়াছেন তাঁহারা মজুব । ছালেকগণ অনেক সময়েই পরোপকার করিয়া থাকেন, মজুবগণ কেবল নিজকে জইয়াই ব্যস্ত ।

## দ্বাদশ সর্গ

[ কতেপুর সিক্রি—একটি ভগ্নবাড়ী ]

দিল্লী আগ্রা লখনউ ঘুরা'য়ে কিরা'য়ে  
কোথায় আনিলি মোরে ও কল্পনে দেবি,  
এ যে দেখি সেই রম্য কতেপুর সিক্রি ?  
আহা কি সুন্দর দেবি এ মহানগরী,—  
—মহামতি আকবর সাজা'য়েছে যারে  
কত স্ত্রী মনোহর মসজিদে প্রাসাদে।—  
—তুলনা নাহিক যার সমগ্র ভুবনে।  
কত শত মনোহর রাজ অট্টালিকা  
শোভিছে এখানে দেবি নয়ন রঞ্জন।  
মহারানী যোধাবান্ধ ও বীরবলের  
সুরমা প্রাসাদগুলি মুহূর্তের তরে,  
নিরখিলে কি আনন্দে ডুবে যায় মন  
সে পঞ্চ মহল আর কিরণ মিনার  
এই নগরীর শোভা করিছে বর্জন।  
এখানে সে যোগীশ্রেষ্ঠ সেলিম সমাধি।  
দেখিলে এ হৃদয় সব মোহনম সন্তান,  
বুঝিবে তখন হয় কি সৌভাগ্য-সূচ্য  
তাহাদের, ডুবে গেছে কালের সাগরে।  
যাহারা দেখেনি হয় জীবনে কখন  
দিল্লী-আগ্রা-লখনউ কতেপুর সিক্রি,  
তাদের জীবন বৃথা,—অভিশপ্ত তারা।  
এই স্থানে ভগ্ন প্রায় একটি বাড়ীর  
নীরব নিষ্কর্ন কক্ষে বসিয়া নীরবে  
একটি যুবক, পাশে' যুবতী একটি  
সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি কাপট্যের খনি।  
যুবতী সদর্পে চারু বাড় বাকাইয়া  
কহিল 'দিলীপ তুমি কাপুরুষ ঘোর,

হিরণকে বাধ্য করা কাজ নহে তব ?  
দেখ বে'য়ে তোমারি এ চক্ষের সম্মুখে  
হিরণকে সঙ্গে লয়ে মহারাষ্ট্র গুরু  
আগ্রা ও অয়াগ দিল্লী বিক্রা কানী ঘুরি  
গিয়াছে চলিয়া শেষে পঞ্চবটী বনে।  
ইতিপূর্বে একদিন বলেছিছু তোমা  
হিরণে লইয়া যবে মহারাষ্ট্র গুরু  
বেড়াইবে তীর্থে তীর্থে, সে সময়ে তুমি  
আক্রমিয়া সিংহ বলে বজরা তাহার,  
হিরণকে হরে নিও, কেহও তখন  
পারিবেনা বাধা দিতে তোমার সে কাজে।'  
কি করেছ তুমি তার ? ভেবেছ কি মনে  
তব উপকার তরে এসেছি এখানে  
সপ্ত সিদ্ধ তের নদী পার হ'য়ে আমি ?  
না—তা' নহে, আজি আমি বলিব তোমারে  
সব কথা স্পষ্ট ভাবে, লুকাব না কিছু।  
অমরকে প্রাণাধিক ভালবাসি আমি,  
তারে ছেড়ে এক পল নারিব থাকিতে  
ধরাধামে, এ জীবন আধার সে বিনে।  
তারে লভিবার আশে কত যে ছলনা  
করিয়াছি যোগাধ্যমে, কত যে সাহায্য  
করেছি তোমার আমি, গিয়াছিল যবে  
শত্রে' সে'ছে হিরণমতী দেবীর মন্দিরে  
হিরণের সর্বনাশ করিতে সাধন।  
বতদিন এ জগতে থাকিবে বাঁচিয়া  
পাণিষ্ঠা হিরণ বালা, ততদিন আমি  
কিছুতেই পারিবনা লভিতে অমরে ;

কেন না সে প্রাণ সম ভালবাসে তারে,  
কোন চক্রে তারে আমি কলঙ্ক-সাগরে  
না পারিলে ডুবাইতে মিছে মোর আসা।  
অমর বড়পি পারে জানিতে মুহূর্ত  
তুমি তারে ডুলাইয়া পাপ প্রলোভনে  
হরেছ সতীষ তার, তবে সে নিশ্চয়  
হিরণ লান্তের আশা পারে বিসর্জিতে।  
সেই আশে আশা আমি এসেছি এখানে,  
যদি তব বন্ধে তারে করিয়া স্থাপন  
বিনষ্ট করিতে পারি সতীষ তাহার,  
তবেই সে আশা মম হইবে পূরণ,  
অন্তথা ভাসিব আমি নয়নের জলে।  
দিলীপ। মানবী আমি,—দেবতা ত নহি?—  
—কাম ক্রোধ লোভ লয়ে জনম আমার  
ধরাতলে; স্বার্থ আশে আমি আজি ভাই  
হেন পৈশাচিক ব্রত ক'রেছি গ্রহণ।  
মন্দ কবে লোকে? বলুক যা ইচ্ছে যার,  
কি ক্ষতি আমার তাতে? জগৎ আমায়  
স্থপিত?—করুক যুগা, ক্রন্দন তাহাতে  
করিব না, আমি চাহি শুধু স্বার্থ মম।  
দিলীপ। তোমায় এক সংবাদ নূতন  
দিতেছি এখন আমি, অমরেন্দ্র রাও  
হিন্দু নহে, জাতিতে সে রোহিলা পাঠান।  
যোগাযোগে আমাদের বহুদিন হ'তে  
ছিল সে যে ছদ্মবেশে গুরুদেব-কাছে  
শিখা ভরে; এখন সে মোস্লেম সেনানী,  
আতা খাঁ তাহার নাম, শুনিয়া এ কথা  
দিলীপ বিস্ময় ভরে উঠিল চমকি;  
কহিল সে “তবে তুমি হিন্দুবালা হ'রে  
কেমনে তাহার প্রেম চাও লভিবারে?”

জ্যোৎস্না কহিল। পুনঃ “কি আছে প্রভেদ  
হিন্দু মুসলমানে বল প্রেমের নিকটে?  
জাতি ভেদ মিথ্যা কথা, সমস্ত মানব  
একই স্রষ্টার সৃষ্টি, অনর্থক লোকে  
হিংসা বশে ভেদনীতি করেছে সৃজন।  
আতা খাঁ সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ হিন্দু হ'তে,  
কোন্ রমণীর বল আকাঙ্ক্ষিত নহে  
প্রেম তার? পুরুষের যে সকল গুণে  
মুগ্ধা নারী, সে সকলি আছে তার মাঝে;  
স্নেহ বল, দয়া বল, সৌন্দর্য্য বীরত্ব,  
নিঃস্বার্থপরতা, প্রেম, কোন্ গুণে বল  
আতা খাঁ এ নর কুলে নহে অলঙ্কৃত?  
কে আছে রমণী হেন এ বিশ্ব-মাঝারে  
আতা খাঁর প্রেম লভি' সৌভাগ্য না মানে?  
আতা খাঁরে পাই যদি জনমে জনমে  
স্বামী রূপে, ভাগ্যবতী কে আমার সম  
ধরাতলে? তুমি যেয়ে লভ হিরণেরে  
হলে বলে স্নেহকোশলে; যাও তুমি এবি  
ছদ্মবেশে লোক লয়ে পঞ্চবটী বনে।  
আমিও যাইব তথা ভুলায়ে হিরণে  
কোন মতে নিয়ে যাব কানন ভিতরে  
আগামী পূর্ণিমা দিন, তোমরা তখন  
সবলে ধরিয়া তারে তুলি শিবিকায়  
নিয়ে যে'ও দূরদেশে, তৈরবীর কাছে  
বলিব যাইয়া আমি নিয়া গেছে তারে  
দম্ভাদল হস্তপদ করিয়া বন্ধন;  
হেরি আমি প্রাণ ভয়ে এসেছি পলায়ে।”  
দিলীপ কহিল। তারে “ভেবনা সেজন্য  
জ্যোৎস্না, তোমার আশা পূর্ণ হয় যাতে  
অবশ্য করিব তাহা, কিন্তু এ সময়

একটি প্রার্থনা মোর তোমার নিকটে,  
 হিরণকে কবে পা'ব, ঠিক নাই তার,  
 আজি এ নির্জন স্থানে কেহ নাই আর,  
 তুমি আর আমি মাত্র, দেখিবে না কেহ,  
 জানিবে না কেহ, এ'স হৃদয়ে আমার  
 একবার, দয়া করে কর স্মৃতিভল  
 এ তাপিত প্রাণ মোর।" মুহূর্তে পাষণ্ড  
 ছুই হস্ত প্রসারিয়া ধরিল তাহারে।  
 জ্যোৎস্না সজোরে তার বাহুর বন্ধনী  
 ছাড়াইয়া, গেল চলি চক্কর বাহিরে।  
 দাঁড়াইয়া দূর হতে কহিল সে ক্রোধে  
 "কাপুরুষ" তোর সম পাষণ্ড বর্ষর  
 নাই বিশ্বে, কেন তোর এ ঘোর হৃৎস্পতি  
 হল আজি? অসহায় রমণীর প্রতি  
 অত্যাচার? ধর্ম তোর সহিবে কেমনে?  
 কহিল দিলীপ তারে হাসিয়া আবার  
 "ধর্ম কথা তব কাছে চাহি না শুনিতে  
 রমণী পুষ্পের সম, জন্ম তার ভবে

বিলাইতে প্রেম-সুখা মত্ত মধুকরে।  
 সুগন্ধি কুসুম গুলি কেন কুটে ভবে?—  
 —তুখু বিলাইতে গছ, ভোগান্তে তাহারে  
 কেলো দেয় সকলেই,—তেমতি রমণী।"  
 "দূর হ' পাষণ্ড" পুনঃ কহিলা জ্যোৎস্না  
 "মা তরী কি নাই তোর কামুক কুকুর?  
 লভিতে আমার প্রেম উপযুক্ত পাত্র  
 নহিস, পাষণ্ড তুই? বামন হইয়া  
 চন্দ্রমা ধরিতে সাধ? যা'চলে এখনি  
 গুরুর আশ্রমে সেই পঞ্চবটী বনে,  
 আগামী পূর্ণিমা দিন পাইবি হিরণে;  
 সেই তোর উপযুক্ত, আমি নহি মূঢ়?  
 মুহূর্ত ছুইলে মোরে হবি ভয়ানকৃত।"  
 এতেক বলিয়া জ্যোৎস্না চক্কর নিমিষে  
 তথা হতে ঝড়বেগে করিল প্রস্থান,  
 দিলীপ বিহ্বল চিত্তে রহিল চাহিয়া  
 তার পানে, হৃদে তার ঝটিকা তুকান।



## ত্রয়োদশ সর্গ

[দিল্লী ; কুনা-ভীর, নদীবন্দোলায় আবাস ভবন]

“ছুট ঘাওঁ গম্কে হাঠোঁছে  
জো নেক্লে দম্ কাহিঁ ।”

গাইছে রমণী এক বিষন্ন বদনে  
বসি কক্ক-বাতায়নে, সে করুণ স্বর  
প্লাবিতা গগন তল তরঙ্গে তরঙ্গে  
উঠিছে সপ্তমে কড়ু নামিছে পঞ্চমে ।  
রমণী অনন্তমনে গাইছে বিবাদে ।

“ছুট ঘাওঁ গম্কে হাঠোঁছে  
জো নেক্লে দম্ কাহিঁ ।”  
খাক্ এছি জেনেগী পর  
তোম্ কাহিঁ আওর হাম্ কাহিঁ ।”

রমণীর সুধাধরে বিমুগ্ধ প্রকৃতি,  
নাহি শব্দ, স্পন্দহীন নীরব ধরণী ।  
রমণীর পাশ্বে দৈশে বসি অস্ত্র বামা  
নীরবে শুনিতেছিল। সে সুধা-সঙ্গীত  
মুগ্ধ প্রাণে, সায়াহ্নের স্নিগ্ধ সমীরণ  
সকরিছে বুরু বুরু চুড়িয়া মধুরে  
উত্তরের তরঙ্গিত অলকা কুন্তল  
মনোহর ; সমাপিয়া সে সুধা-সঙ্গীত  
সেই বামা, গারিকারে কহিলা হাসিয়া  
“জোহরা সাবাসি তোরে, তোর মত বামা  
বুঝি এ দিল্লীতে আর নাহি এক জন ।”  
“কেন লো মাহেক, তুই বলিস এ কথা”  
কহিলা জোহরা সতী “হঃখিনী এ তবে

কে আছে আমার সম ? জীবনে কখন  
জানিনে সুখের লেশ, ধূলিকণা সম  
প’ড়ে আছি সকলের চরণের ডলে ।”  
“ছি ছি ছি ও কথা কেন বলিস্ জোহরা ?”  
কহিলা মাহেক হে’সে মধুর বচনে,  
“তোর মত পুণ্যশীলা ধর্মপ্রাণা বামা  
কে আছে মোস্লেম কুলে ? কর্তব্য সাধনে  
হেন বীর্যাময়ী বামা মোস্লেম-সমাজে  
দেখিনি কোথাও আমি, শত ধন্য তারে ।”  
লজ্জায় জোহরা সতী কহিতে লাগিলা  
“ছি দিদি অমন কথা আনিস নে মুখে,  
জগতের অতি হেয় আমি অভাগিনী,  
সুখের কামনা কি নাহি মম মনে  
কণতরে ইস্লামের উন্নতি সাধন  
জীবনের ত্রুত মম স্বজাতির হিতে  
দিতে পারি এ জীবন মুহূর্তের মাঝে ।”  
মাহেক সস্থিত মুখে সুধাইল। পুনঃ  
“আচ্ছা দিদি, সত্য কথা বল্ দেখি মোরে  
ভাল কি বাসিস্, তুই এতাহিম শূরে ?  
পতির মঙ্গল আশা মুহূর্তের তরে  
দেখিনি করিতে তোরে, ধর্মের লাগিয়া  
সদা তুই উম্মাদিনী, বুঝিতে নারিলু  
পতি ছাড়া ধর্ম দিদি কেমন জগতে ?”  
তুনি এই তীব্র প্রেব, বিবাদের ছায়া  
উঠিল ভাসিয়া আহা জোহরার মুখে  
আবরিয়া বর্ণকান্তি আবরে যেমতি  
সুধাংকুর বর্ণহটা কাল কাদম্বিনী,

অথবা মলিন বধা কুম্ভ কমলিনী  
শোকে হুঃখে যবে ভার যান অস্তাচলে ।  
রান মুখে শুক হাসি হাসিরা জোহরা  
কহিলা, “মাহেক দিদি, পারনি চিনিতে  
জোহরার ছদি তুমি তিলাঙ্কের তরে,  
চিনিলে এ কথা কত বলিতে না মোরে  
অমেও কখনো তুমি; এ ছদি-মন্দিরে  
পতি মোর একমাত্র আরাধ্য দেবতা  
নিশি দিন, হায় দিদি পূজি আমি তারে  
শয়নে স্বপনে সদা নয়নের জলে ।  
এ জগতে যাহা কিছু করি আমি দিদি  
সকলেরি মাঝে তিনি সদা বিরাজিত  
গোপনে প্রচ্ছন্ন ভাবে সত্ৰাটের বেশে ;  
দাসী আমি, তারি প্রেমে সদা আত্মহারা,  
প্রত্যেক ধমনী মোর, প্রতি রক্ত-কণা  
তাহারি প্রেমের স্মৃতি গাইয়া নীরবে  
তাহারি মঙ্গল আশে বিশ্বের মঙ্গল  
সাধিছে সতত দিদি ; জড় ও অজড়  
সকলেই স্ব স্ব কার্য্য করিছে সাধন ।  
কর্ম্মহীন নহে কেহ, এ সৌর জগতে  
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা দানব মানব  
যাহা কিছু আছে, সবি আপনার কার্য্য  
সাধিতেছে, সে সাধনা নহে কুরাবার,  
যুগে যুগে এ সাধনা করিয়ে সাধন  
অনন্ত বিরাট বেশে যে মহাপুরুষ  
আছেন ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপি, তারি দিকে সব  
হতেছে খাতি, দিদি আমি কোন্ হার ?  
এ জগৎ কর্ম্ম-ক্ষেত্র, আমিও তেমনি  
করিতেছি কর্ম্ম, কিন্তু আমি অত্যাগিনী ।  
অপূর্ণ, পূর্ণতা লাভ করিতে এখনো

পারিনি, সহজসাধ্য নহে তো জীবন,  
সে পূর্ণ পতি ভিন্ন হইবে না কত ;  
বিশ্বের মঙ্গল হেতু কর্ম্ম করি আমি,  
কর্ম্মের দৈব মম একমাত্র পতি ;  
সাধনা হইলে শেষ, কর্ম্ম অস্তে দিদি  
পতি সনে হ'ব লীন, ভেদাভেদ জ্ঞান  
না রহিবে, আত্মপর ভুলে যাব সব,  
তখনি পূর্ণ লাভ হইবে মোদের,  
আমরাও তারি সনে হইব মিলিত ।”  
কিছুক্ষণ পরে বামা বলিলা আবার  
“সতী আমি, পতি ভিন্ন নাহি জানি কিছু  
জীবনের সব কার্য্যে সেই মোর গুরু,  
সতীই পরম ধন, এ ধনের মত  
রমণীর কোন্ ধন আছে এ জগতে ?  
শত সত্ৰাটের ধন তুচ্ছ তার কাছে  
তাহাও পতির পদে অর্পে সতী নারী,  
সেই পতি মহাপাণী, মোস্মেম হইয়া  
বিদ্রোহী মারাঠা সনে হ'য়েছে মিলিত  
নাশিতে ইস্তাম ধর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত তার  
কবির শোণিতে মম ; সমর প্রাঙ্গণে  
যুঝিয়া কাকের সনে রক্ষিব ইস্তামে ।”  
আবার মাহেক সতী ভিজ্জাসিলা তারে  
“আচ্ছা দিদি, তুই যবে বাউলি প্রান্তরে  
পুরুষের বেশে যুঝি দস্তজীর সনে  
এনেছিলি মৃত তার, কেহ কি তখন  
পারিল না তব সনে যুঝিতে সমরে  
বীর দর্পে ? এত সৈন্য এত সেনাপতি  
বিশ্বস্ত হইল সবি তোমর অদ্রাঘাতে ?”  
বলিলা জোহরা “দিদি কি বলিব তোরে  
কার্য্য বার সাধু, তার সহায় দৈব ।

এ চির সত্যটি বুঝি জানিলনে তুই  
 'যথা ধর্ম' তথা জয়' অধর্ম' কি কতু  
 বিজয়ী ধর্মের সনে যুকিয়া সমরে ?  
 পুরুষ রমণী হু-ই মানব-সন্তান,  
 কি প্রভেদ এ উভয়ে ঈশ্বর সমীপে ?  
 যে কার্যে পুরুষ দক্ষ, সে কার্যে কি কতু  
 রমণী জাতির দ্বারা হয় না সাধিত ?  
 রমণী কি কোন অংশে পুরুষ অপেক্ষা  
 হীনবীৰ্য্য ?—তাহা নহে, অসংখ্য ললনা  
 পুরুষ অপেক্ষা দিদি মহাবীৰ্য্যবতী,  
 যাহাদের অজ্ঞাধাতে কত শত বীর  
 গত প্রাণ, নারী জাতি নহে বন-কুল  
 ঝরিয়া পড়িবে ঝড়ে, গলিয়া যাইবে  
 সূর্য্য করে, কিংবা নহে কামের পুতুল  
 ভোগ বিলাসের বস্তু, দেবী তারা ভবে।  
 পুরুষের মত তারা এ বিশ্ব জগতে  
 সাধিতে আপন কার্য্য নহে হীনবল।"  
 "অবশ্য সে কথা সত্য" কহিল। মাহেক  
 "মোস্সেম রমণী কতু নহে হীনবল।  
 কিন্তু এক কথা দিদি ছিল না স্বরন  
 জিজ্ঞাসিতে তোরে, সত্য বল দেখি মোরে  
 বীরশ্রেষ্ঠ পিসা মোর, জনক তোমার,  
 বধিল কেমনে তারে আদিনা পামর,  
 কেন তার প্রতিশোধ লইলে না তুমি ?"  
 "সে বড় ছুখের কথা" কহিল। জোহরা  
 "বিশ্বজয়ী পিতা মোর, দেব-দৈত্য-ত্রাস  
 পাক্ষাবে তৈমুরাধীনে ছিল। সেনাপতি,  
 কাপিত তাঁহার করে যুগিত পেশবা,  
 সে যদি ধরিত অসি, তুচ্ছ লদানিব

দেবতা তাহার কাছে আসিত না ভরে !  
 আদিনার পরামর্শে একদা নিশিতে  
 সসৈন্তে রাঘব রাও ছরাণী নন্দনে \*  
 করেছিল। আক্রমণ মহা পরাক্রমে।  
 ছিলনা তখন কেহ তৈমুরের কাছে,  
 একাই জনক মম সে ঘোর নিশিতে  
 উন্মুক্ত কপাণ হস্তে "দীন দীন" বলি,  
 পড়েছিল। লক্ষ দিয়া সে রণ-মাগরে।  
 অসংখ্য কাকের সৈন্ত বধেছিল। বীর  
 মহাবলে, কিন্তু হায় আদিনা ছর্ষতি  
 অলক্ষ্যে বন্দুক দিয়া জনকে আমার  
 করি হত্যা, অভাগীকে করিতে হরণ  
 করেছিল। বহু চেষ্টা, ননীর পুতুল  
 নহি আমি, নহি আমি কাননের কুল  
 ছিড়িয়া লইবে মোরে, "আল্লা আল্লা" বলি  
 আক্রমিষু পাষণ্ডের তীক্ষ্ণ অসি নিয়া  
 ভীম বলে, নরাধম যুঝি মম সনে  
 কিছুক্ষণ, পলাইল ভয় দিয়া রণে  
 তীর বেগে, আমি সেই নিশীথ সময়ে  
 যুঝিলাম বহুক্ষণ, সেই কোলাহলে  
 অসংখ্য মোস্সেম সৈন্ত আসিল ছুটিয়া  
 রণ স্থলে, আমি সেই নিশার আধারে  
 আসিলাম রণ স্থল ত্যজিয়া নীরবে  
 ভ্রাতার উদ্দেশে ; কিন্তু দেশ দেশান্তরে  
 কত খুঁজিলাম, নাহি পাইলু তাহারে।  
 গুনিয়াছি ভ্রাতা মম তাপসের বেশে  
 যথা তথা অবিরত করিয়া ভ্রমণ  
 মোস্সেম সেনানী বুলে, সৈনিক সকলে  
 করিতেছে উত্তেজিত বধিতে কাকেরে।

\* তৈমুর আহমদ সাহ, দুরাণীর পুত্র।

অথবা সমরাজনে ভোপের সম্মুখে  
জীবন করিব দান,—ভরি কাহারে ?”  
মাহেক কহিল। হেসে সুমধুর স্বরে  
“দুস্ত তোরে, শত ধনু এতাহিম বীরে,  
হেন বীর্যময়ী বামা গৃহিনী বাহার।”  
নীরব হইলা সতী, জোহরার মুখে  
কি এক রক্তিম-রাগ উঠিল ভাসিয়া  
সেই দণ্ডে, মুক্তা প্রায় দুই বিন্দু অশ্রু  
শোভিল সে দুঃখিনীর নেত্র-নীলোৎপলে।  
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি কহিল। মাহেক  
“এতাহিম মহা মূর্থ, কেমনে চিনিবে  
এ রত্ন ? ত্রিদিবে নাহি তুলনা বাহার ?  
তাই সে অভাগা আহা করিল না ভ্রমে  
এ রত্নের সমাদর, বুঝিল না পাপী  
হেলায় কি মহামণি ডুবাল সাগরে।  
কিন্তু দিদি দুঃখ মোর, পারিলি নে তুই  
মোস্লেম কুলের গ্রানি আদিন। পামরে  
বিনাশিতে, ইচ্ছা করে সুতীক্ষ্ণ কপালে  
চিড়িয়া হৃদয় তার রক্ত করি পান।  
নাহি জানি কোন্ পাপে বহিছে ধরিত্রী  
পাপিষ্ঠের দেহ-ভার, বধিতে পাবণ্ডে  
নাহি কি মোস্লেম হেন সমগ্র ভারতে ?”  
“কেন দিদি, নরাধম কি করেছে তোর ?”  
জিজ্ঞাসিল। সুধা কণ্ঠে জোহরা বেগম।  
উত্তরিল। ক্রুদ্ধভাবে মাহেক বেগম,  
“নরাধম বহু চেষ্টা করিয়াছে দিদি  
ভুলাইতে মোরে, ছিছি পাপ প্রলোভনে,  
কত পত্র লিখিয়াছে পাবণ্ড আমারে,  
সে কথা আনিতে মুখে ঘৃণা হয় মনে।  
ইচ্ছা হয় মম, তারে বধিয়া এখনি

চিবাইতে মুণ্ড তার, কলেকা চিড়িয়া  
উত্তপ্ত শোণিতে তার করিতে নিৰ্ব্বাণ  
প্রতিহিংসা-বহ্নি মম, এ নারী জনমে  
যদি আমি পারি তার প্রতিশোধ নিতে,  
নিতিবে সে অগ্নি মম, শাস্ত হ'বে প্রাণ।  
অন্তথা নরক ভোগ সতত আমার।”

কক্ষান্তরে স্নান মুখে বসিয়া নীরবে  
জেরিণা বেগম, পাশে মোস্লেম গৌরব  
বীরেন্দ্র নজিবদৌল। বিষণ্ণ বদন।  
যমুনার স্নিগ্ধ বায়ু গবাক্ষের পথে  
প্রবেশিয়া কক্ষ মাঝে ধীরে ধীরে ধীরে  
চুসিছে এ দম্পতীর চারু চন্দ্রাসন।  
জেরিণা ব্যাকুল চিন্তে কহিতে লাগিল।  
“বীর তুমি কেন তবে এত চিন্তাকুল ?  
জোহরা বেগম তব পিসাত ভগিনী  
কি-ভীষণ বীর্যময়ী সিংহীসম বামা—  
—দেব দৈত্য যক্ষ রক্ষ বীরছে বাহার  
সম্মানিত, নাহি ভরে দানবে মানবে।  
যে রমণী অসি হস্তে পুরুষের বেশে  
কাঁপাইয়া স্বর্গ মর্ত্য “দীন দীন” রবে  
যুঝেছিল অগণিত কাকেরের সনে  
বাউলি প্রান্তর মাঝে ভীষণ বিক্রমে।  
দস্তজীর ছিন্ন মুণ্ড এনেছিল। যেই  
শূলাগ্রে, সমগ্র বিশ্ব নিরখি যে দৃশ্য  
শব্দিত কম্পিত ভীত ; জাতা তুমি তার  
সৌর্য বীর্য তার মত কোথায় তোমার ?  
হি তুমি পুরুষ বংশে লভিয়া জনম  
কেন এত আতঙ্কিত তাহাদের ভয়ে ?  
নারী আমি, কিন্তু মম হৃদয়ে যে বল

ইচ্ছা হয় এই দণ্ডে ধ্বংসিত কাকেরে ।  
 আজিও নিশ্চল ভাবে রয়েছে বসিয়া  
 কি সাহসে ? দেখ না মহারাষ্ট্রীগণ  
 মোস্লেমের রাজশক্তি করি উন্মূলিত  
 আপন প্রভু ক্রমে করিছে স্থাপন ।  
 কত দেশ কত রাজ্য করি ভস্মীভূত  
 অনলে, মোস্লেম গণে করিছে বিধ্বস্ত  
 সতত, বারেক তাহা হয় না স্মরণ ?  
 দস্যুদের বিষ-দস্ত না ভাজিলে এবে  
 নিশ্চর অচিরে নাথ হবে চূর্ণীকৃত  
 মোস্লেমের রাজ শক্তি, হবে চূর্ণীকৃত  
 মোস্লেমের রত্নময় স্বর্ণ সিংহাসন ।”  
 “জেরিণে,” গভীর ভাবে কহিল। নজিব  
 “নীরব নিশ্চল নহি - নহি কাপুরুষ,  
 ধীরে ধীরে শক্তি রাশি করিয়া সঞ্চয়  
 ধ্বংসিব সে রাজজোহী দস্যু সদাশিব,  
 ধ্বংসিব সে অর্থ গৃহ পেশবা তরুরে ।  
 কাবুলের অধীশ্বর আমেন আকালী,—  
 —তারি প্রতিনিধি আমি ছিনু এ ভারতে ;  
 পাষণ্ড গাজির ভীম কবল হইতে  
 রক্ষিতে সতত সেই দিল্লী সিংহাসন  
 ছিনু আমি নিয়োজিত, মম অস্ত্ররোধে  
 এসেছে ভারতে পুনঃ সেই বীরবর,  
 আমি যদি ক্ষণতরে নীরব নিশ্চল  
 থাকি এবে, অকৃতজ্ঞ আমার মতন  
 কে তবে ?—মানব কুলে পণ্ড আমি তবে ।  
 গাজি গেছে, নরাধম আদিনা পামর  
 হইয়াছে রাজজোহী, মহারাষ্ট্রী সনে  
 করি লঙ্ঘি, বড়বস্ত্র করিছে সতত  
 বিনাশিত মোস্লেমের রাজ-সিংহাসন ?

নজিব এ দৃষ্ট কহু নারিবে দেখিতে  
 জীবন থাকিতে তার, রক্ষিব নিশ্চর  
 দিল্লীর সে সিংহাসন প্রাণের শোণিতে,  
 অথবা সময় ক্ষেত্রে দিব এ জীবন ।”  
 উত্তরিল। দর্প ভরে নজিব-সজিনী  
 “অবশ্য কর্তব্য ইহা, অস্ত্রধা প্রাণেশ  
 শুধু অপযশ তব ঘোষিবে সকলে ।  
 কাকেরে বিধ্বস্ত কর, কিংবা এ আহবে  
 দেও প্রাণ, আশীসিবে দেবতা তোমারে ।  
 মনে কি পড়ে না নাথ অতীতের কথা ?  
 মোস্লেম কুলের সেই জীবন্ত গৌরব  
 শুলতান্ মামুদ যবে ভীষণ বিক্রমে  
 দাঁড়াইল। অসি হস্তে ধানের ধারে,  
 প্রমাদ গণিল। সবে বহু হিন্দু রাজা,  
 সসৈন্তে পশুন-পতি আসিল। ছুটিয়া  
 রক্ষিতে সে সোমনাথে ভীষণ আহবে ।  
 হেরি সেই সমবেত হিন্দু রাজগণ,  
 হেরি সেই সিদ্ধ প্রায় সৈন্ত অগণন,  
 অটুট বিক্রমে শূর নগ্ন অসি করে  
 দাঁড়াইয়া সিংহ সম উঠিল। গর্জিয়া  
 ‘দীন দীন’ চন্দ্র পূর্বা কাপিল সতয়ে  
 তার সে গগনভেদী ভীষণ হুকারে  
 আসমুদ্র হিমাচল উঠিল কাণিয়া ।  
 উঠিল কাণিয়া তার সমগ্র পৃথিবী ।  
 হিমাজির শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিদ্যা-গিরি-চূড়ে  
 সে ভীষণ প্রতিধ্বনি উঠিল জাগিয়া ।  
 দেব দৈত্য যক রাক্ষ হইল কম্পিত  
 সে ভীষণ হুকারে—মানব কি হার ।  
 যুহুর্থে সে মহাবীর ‘আল্লা আল্লা’ বলি  
 লক্ষ দিরা পড়িল। সে সৈন্তের সাগরে,



তার সে ভীষণ খড়্গ লক্ষ লক্ষ সৈন্য  
পড়িতে লাগিল ভূমে, শোণিত সাগরে  
ভাসিল সে রণ ক্ষেত্র, হেরিলে সে দৃষ্ট  
আতঙ্কে শিহরি উঠে দেবতা কিম্বদন্তি।  
বহুক্ষণ হিন্দু-সৈন্য সুখি প্রাণ পণে  
সে মহা বীরেন্দ্র সনে ভক্ত দিল রণে।  
পরাজিত সৈন্য বৃন্দ ছুটিল সবগে  
ভেয়াগিয়া রণস্থল, সে ঘোর সঙ্কটে  
পাণ্ডাগণ বহু রক্ত প্রদানিয়া তারে  
সমস্ত্রমে, যুক্ত করে করিলা প্রার্থনা।  
রক্ষিতে তাদের সেই দেব সোমনাথে।  
উপেক্ষি সে ধন রক্ত সে বিশ্ব বিজয়ী  
মহাবীর, বজ্রধরে কহিলা গর্জিয়া  
“দূর হ’ পাষণ্ড তোরা বিধর্মী কাকের,  
তোদের প্রেতায় দিয়া অর্থ বিনিময়ে  
পৌত্তলিক ধর্ম আমি করিব স্থাপন?  
মোস্লেম হইয়া আমি ইসলাম বিরুদ্ধে  
যাইব অর্থের লাগি? ভাবিলেও ইহা  
সহস্র বৃক্ষিক দংশে হৃদয়ে আমার;  
দূর হ’—দূর হ’ পাপি সম্মুখ হইতে,  
প্রতিমা বিক্রেতা আমি নহি এ জগতে,  
প্রতিমা নাশক আমি, কেন তোরা বৃথা  
প্রলুব্ধ করিস মোরে অর্থ প্রলোভনে?  
অর্থ কেন?—জগতের কোন প্রলোভনে  
টলিবে না এ হৃদয় যুহুস্তের তরে।”  
আল্লা আল্লা বলি বীর স্মৃতীকু কুঠারে  
চূর্ণিয়া ফেলিলা সেই দেব সোমনাথে;  
অগণিত ধন রক্ত পড়িল ছিটিয়া  
চারি দিকে, ভূপাকারে ভূতল উপরে।  
তার সে অক্ষয় কীর্তি আজিও ধ্বনিত

মোস্লেমের ঘরে ঘরে, ধর্মের সমরে  
মরিলে অক্ষয় কীর্তি—কেন চিন্তা তবে?  
হও অগ্রসর—অসি কর নিকোষিত,  
পেশবার যুগ এনে দেও এ দাসীরে।  
অবলা রমণী আমি, ডরি না শমনে,  
এই দণ্ডে—এ যুহুস্তে দিতে পারি প্রাণ  
রক্ষিতে ইসলাম ধর্ম—জাতীয় গৌরব।  
তোমরা বীরের জাতি,—ভয় কি মরণে?  
বিজ্রোহী মারাঠাগণ মোস্লেমের বৃকে  
করিয়াছে যে আঘাত, স্মরিলে সে কথা  
হৃদয় শিহরি উঠে, প্রতিহিংসা-বহি  
তখনি অলিয়া উঠে প্রাণের তিতরে!  
মোস্লেম রমণী বৃন্দে, চন্দ্র সূর্য্য হায়  
যাহাদের মুখ কভু দেখিতে না পায়  
মহারাষ্ট্র দস্যুগণ নৃশংস হৃদয়ে  
করিয়াছে বেত্রাঘাত, ক্রত অত্যাচারে  
পীড়িয়াছে দিবা নিশি রোহিলা পাঠানে;  
‘মোস্লেম রমণী হ’য়ে কেমনে ভুলিব  
সেই কথা? খোল অসি, পেশবা-শোণিতে  
সে কলঙ্ক-কালী আজি কর প্রক্ষালিত!’  
যুহুস্তে নজিবদৌলা আরক্ত লোচনে  
নিকোষিয়া তরবার কহিলা গর্জিয়া  
“কেন প্রিয়তমে, তুমি ছবিছ আমারে?  
কাপুরুষ নহি আমি, এই তরবারে  
দস্যুদের হৃদপিণ্ড করি বিদারণ  
লইব সে প্রতিশোধ, সে সন্ত শোণিতে  
প্রতিহিংসা-বহি মম করিব নির্বাণ।  
যতক্ষণ একবিন্দু শোণিতের কণা  
বহিবে এ ধমনীতে, ইসলামের তরে  
দিব প্রাণ অকাতরে, হৃদয় পাতিয়া



লহব ইন্ডের বজ্র-অশনি ভীষণ ।  
 এ অগ্নি সহায় মোর বিপদে সম্পদে  
 আমি কেন ডরিব সে কাকের কুহুরে ?  
 মরিব,—অথবা যুদ্ধে মারিব কাফেরে,  
 ইহা যদি নাহি পারি, কাপুরুষ আমি  
 দেখাব না কহু আর এ মুখ তোমারে ।  
 চূর্ণিব মারাঠা শক্তি স্তম্ভীক কুঠারে,  
 চূর্ণিব আদিনা-মুণ্ড, দম্ভ্য সদাশিবে,  
 চূর্ণিব সে রাজজোহী পেশবা তব্বরে,

মহারাষ্ট্র হুর্গগুলি চূর্ণ চূর্ণ করি  
 ডুবাইব একে একে অতল সাগরে ।  
 চূর্ণিব সে গিরি-শৃঙ্গ দেবতা-মন্দির ;  
 বহাইব রক্ত-গঙ্গা বিধর্মী-রুধিরে  
 দাক্ষিণাত্যে—ভারতের নগরে নগরে ।  
 নীরবিলা বীর, কক উঠিল কাঁপিয়া  
 সে ভীষণ হৃদ্বকারে,—উঠিল কাঁপিয়া  
 দেব দৈত্য যক্ষ রক্ষ সমগ্র পৃথিবী ।

-----

## চতুর্দশ সর্গ

[ আগ্রা ; যমুনা-তীর ; বাহেজ বেগমের গৃহ ]

তারকা মণ্ডিত চারু সুনীল গগনে  
বিমল চন্দ্রমা ; নিম্নে যমুনা স্নানরী  
মধুর জ্যোৎস্না রাশি মাখিয়া হৃদয়ে  
তর তর তর রবে ঘাইছে বহিয়া  
কি মধুরে বিমোহিয়া সে নৈশ প্রকৃতি ;  
সচন্দ্র তারকা গুলি শোভিছে সুন্দর  
যমুনার নীল বক্ষে ; তরলী-হৃদয়ে  
অলিছে প্রদীপ রাজি, স্বর্ণ-রেখা প্রায়  
আভা তার বলিতেছে যমুনা-সলিলে ।  
যমুনার শ্যাম তীরে একটি প্রাসাদ  
মনোহর, পার্শ্বে তার নিকুঞ্জ কানন  
কুল কুল সুশোভিত নয়ন রঞ্জন ।  
নিকুঞ্জের অভ্যন্তরে সরসী-সম্মুখে  
একটি মসজিদ গৃহ, তিনটি গম্বুজ  
শোভিতেছে শীর্ষদেশে কেমন সুন্দর !  
দক্ষিণে সমাধি এক মন্দির নিশ্চিত  
বকুল বৃক্ষের তলে, চারিদিকে তার  
অসংখ্য ফলের বৃক্ষ,—দিবসে আঁধার ;  
শীতল সমীর স্পর্শে রাশি রাশি ফুল  
অবিরত বুর বুর পড়িছে ঝরিয়া  
সমাধির বক্ষে সেই নিকুঞ্জ কাননে ।

প্রাসাদ সংলগ্ন এক কুজ কক্ষ মাঝে  
একটি যুবতী, যেন কনক-প্রতিমা,  
সজ্জিত সর্বদা তার কুটুম্ব কুশুমে ।  
মস্তকে কুশুম গুচ্ছ মুকুটের মত,  
চারিদিক আমোদিত কুশুম-সৌরভে ।

যুবতী পরীর মত মন্দির আসনে  
বসিয়া মনের হুঃখে গাইলা বিষাদে

“খাবারাহ্ রসিন্ এশ্শাব্ বহ্ এয়ারে খাহি আমন্  
সারে মন্ ফেদারে রাহে কে সওয়ারে খাহি আমন্ ।  
“বাবারাহ্ রসিন্ জানন্ তু বিয়া কে জেন্ন বাসন্  
পাগ্ আঁজো কে মন্ নামানন্ বাচেকার খাহি আমন্”

হুই বিন্দু অশ্রু হায় পড়িল ঝরিয়া  
ধীরে ধীরে তার সেই উদাস নয়নে ।  
যুবতী আকুল প্রাণে গাইলা আবার

“কাশেণে কে একে দারন্ না গোজারাদত্ বাড়িগাঁ  
ব জানাজা গাব্ নে আই ব মাজারে খাহি আমন্”

• নীরবে একটি দাসী দাঁড়াইল আসি  
যুবতী-পশ্চাতে, বামা যুহুর্শের পরে  
সঙ্গীতাস্তে সুধা স্বরে জিজ্ঞাসিলা তারে  
“কিরোজ, কোথায় তুমি ছিলে এতক্ষণ ?  
কি ক’রেছ আমার সে সমাধি সজ্জার ?  
শুক্রবার আজি, নিশি অতি পুণ্যময়ী  
সমস্ত শব্দরী আমি জাগিয়া জাগিয়া  
কোরান পড়িব সেই সমাধির পরে ।”  
উত্তরিল সসঙ্গমে কিরোজা স্নানরী  
“সকলি সে’রেছি, কিছু বাকী নাই আর,  
নানাবিধ সুবাসিত কুশুম স্তবকে  
লতা পত্র, গুচ্ছে গুচ্ছে নীল শতদলে  
সাজায়েছি সে সমাধি ; শব্দা মনোহর

রেখেছি বিছায়ে সেই সমাধির পরে  
 ভব ভরে, মোম্বাতি রেখেছি আলায়ে।”  
 “একটুক পরে আমি যাইব সেখানে”  
 কহিলা মধুর স্বরে সেই ফুল-রাণী।  
 ফিরোজা আবার তারে করিল জিজ্ঞাসা  
 “কেন দেবি, ফুল-বেশে হইয়া সজ্জিত  
 যাও তুমি নিশাকালে প্রতি শুক্রবারে  
 আমার সমাধি পরে?” উত্তরিল। বামা  
 “তুমি, মূর্খ, কি বুঝিবে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব?  
 প্রতি শুক্রবারে রাতে প্রাণেশ আমার  
 আসে সেখা ফুল সাজে ভেটিতে আমারে,  
 তাই এ সংসার ফুলি উন্মাদিনী প্রায়  
 যাই তথা তার সনে হইতে মিলিত।  
 সেই রাত্রি অতি শুভ, বসে আমি সেখা  
 উপাসনা করি সেই সমাধির পরে।  
 ভক্তনাস্তে যবে আমি বসি যোগাসনে  
 সেই স্থানে আত্মা তার হয় আবিভূত  
 প্রাণের ভিতরে মম, কি যে এক মোহে  
 হই আমি আত্মহারা, অন্তরে বাহিরে  
 শুধু তার রূপ হেরি এ সৌর জগতে।  
 তারপর সারানিশি জাগিয়া জাগিয়া  
 আনন্দে কোরান পাঠ করি সেই স্থানে  
 প্রাণেশেরে পারত্রিক মঙ্গলের ভরে;  
 জীবনের ত্রুট মম এই শুভ কার্য,  
 ইহা তির পুণ্য-কার্য মোসুলেম-বামার  
 কি আছে ধরনীতলে? জীবনে মরণে  
 পতিপদ সেবা বিনে, মোসুলেম বামার  
 নাহি আর কোন কার্য এ পাপ সংসারে।  
 যতদিন এ জগতে রহিব জীবিত  
 এ নারী জনম আমি করিব সার্থক

এই ভাবে সেবা তার করিয়া নিয়ত  
 পতিই পরম গুরু, পতি ভিন্ন তবে  
 কি আছে সতীর গতি? সতী রমণীর  
 মুখ শাস্তি সমাহিত পতির চরণে।  
 পতির চরণ তলে স্বর্গ রমণীর,  
 ইহাই শাস্ত্রের বিধি, যে নারী না বুঝে  
 অবহেলা করে এই পতির চরণ,  
 বিফল জীবন তার, বিফল জনম,  
 পানিষ্ঠা তাহার সম নাই এ ভুবনে।  
 সেই মোর একমাত্র আরাধ্য দেবতা,  
 ইহকাল পরকাল সকলি আমার  
 তাহারি চরণে আমি ক’রেছি অর্পণ;  
 হৃদয়-মন্দিরে আমি অতি সযতনে  
 স্থাপিয়া মূর্তি তার, পূজিব সতত  
 পরম ভকতি ভরে সতীত্ব-কুশ্রমে।  
 ইহা তির মাহেকর নাহি অন্য আশা  
 তারি সংমিলন আশে নববধু প্রায়  
 সাজিয়াছি আমি আজি এ ফুল ভূষণে।”

উঠিলা মাহেকর সতী, লইয়া যতনে  
 পবিত্র কোদ্রাণ এক আলমারী হইতে  
 চলিল। সে পুষ্প-কুঞ্জে সমাধি যেখানে।  
 ফিরোজাও সঙ্গে সঙ্গে চলিল পশ্চাতে  
 ক্ষণপরে উভয়েই উত্তরিল। আসি  
 সরসী সন্মুখে সেই মসজিদের পাশে!  
 দেখিলা দক্ষিণে তার মর্ম্মর নির্মিত  
 বকুল বৃক্ষের তলে একটি সমাধি  
 সুসজ্জিত লতা পত্রে ফুলে ও পঙ্কজে  
 দীপাধারে, ভক্তি ভরে মাহেকর বেগম  
 প্রণমিলা সে সমাধি পতির উদ্দেশে।

হুই বিন্দু অশ্রুজল পড়িল গ'ড়ায়ে  
 সুবর্ণ-কপোল বাহি, নিশির নিশির  
 পড়ে যথা অর্ককুট কমল-কোরকে ।  
 বিদাইয়া ফিরোজারে মাহেক তখন  
 চাহিলা সমাধি পানে, দেখিলা ছুঃখিনী  
 বকুলের পুষ্প গুলি বুর বুর বুর  
 ঝরিছে সতত সেই সমাধির পরে ।  
 বিষাদে আকুল চিত্তে ভাবিলা ছুঃখিনী  
 এইত মিলন মোর, এ মরু জীবনে  
 এইত বাসর শর্যা, সুখ শাস্তি মোর ;  
 এই সুখ আশে আমি এ ধরণী ধামে  
 এখনো বাঁচিয়া আছি, অশ্রুধা মাহেক  
 অতীতের গর্ভে কবে যাইত মিশিয়া ।”  
 নীরব নিরুন্ম নিশি, শুধু ঝিল্লিগুলি  
 কি এক বিষাদ গীতি গাহিয়া গাহিয়া  
 কাঁদাইছে প্রকৃতিরে, কাঁদিছে মাহেক ।  
 চারিদিকে ঘনাকারে অসংখ্য বিটপী  
 দাঁড়াইয়া শোকভরে নীরব নিশ্চল  
 মুহূর্তেক পরে বামা সরসীর জলে  
 ওজু করি, উপাসনা করিতে বসিলা  
 প্রস্তর-নির্মিত সেই সমাধি বেদীতে ।  
 নামাজাস্ত্রে অভাগিনী আত্মহারা প্রাণে  
 ধ্যানমগ্ন যোগী প্রায় বসি যোগাসনে  
 সাধিতে লাগিলা যোগ, বুর বুর বুর  
 ঝরিতে লাগিল সেই বকুলের ফুল  
 মাহেকর শির' পরে সমাধি-ছদয়ে ।  
 যোগশেষে বসি বামা সমাধি-শিরে  
 দীপালোকে সুধাশ্বরে পঠিতে লাগিলা  
 পবিত্র কোরাণ গ্রন্থ, সে মধুর স্বর  
 ভেসে ভেসে বায়ু ভরে দূর দূরান্তরে  
 বহিল কি সুধাধারা প্রকৃতির প্রাণে ।

আত্মহারা বসুন্ধরা, নীরব প্রকৃতি  
 কি এক নেশায় যেন হুইল বিভোর  
 শুনি সেই পুণ্য শ্লোক ঈশ্বরের বাণী ।  
 সমাপি' কোরাণ পাঠ, মাহেক বেগম  
 সমাধির বাম পার্শ্বে করিলা শয়ন,  
 নিদ্রা দেবী ধীরে ধীরে নেত্র-নীলোৎপলে  
 পাতিলা অজ্ঞাতে তার সুবর্ণ-আসন ।  
 অভাগিনী ঘুমঘোরে দেখিতে লাগিলা  
 স্বপ্ন এক, ধীরে ধীরে ছড়াইয়া জ্যোতিঃ,  
 ত্রিদিব হুইতে এক সুবর্ণ আসন  
 নামিয়া আসিল সেই সমাধির পরে ;  
 অভাগিনী মুগ্ধ প্রাণে দেখিলা চাহিয়া  
 স্বামী তার, হাসি মুখে বসিলা আসিয়া  
 পাশে তার, স্নেহভরে কত যে আলাপ  
 করিতে লাগিলা দোহে, ছুঃখিনী মাহেক  
 অভিমানে ক্ষুণ্ণ প্রাণে উঠিল কাঁদিয়া ;  
 সাদরে চুম্বিয়া তার সুধেন্দু বদন  
 কহিলা প্রাণেশ তার “উঠ প্রিয়তমে  
 এ আসনে, নিয়ে যাব ত্রিদিবে তোমারে ;  
 আজি হ'তে বিচ্ছেদের আলা তীব্রতর  
 সহিতে হবেনা আর এ মরু জীবনে ;  
 চল যাই স্বর্গ ধামে, উভয়ে আনন্দে  
 থাকিব সে মনোহর স্বর্গের উচ্চানে ।  
 সংসারের শোক ছুঃখ বাদ বিসম্বাদ  
 জরা মৃত্যু পারিবে না মুহূর্তের তরে  
 পরশিতে আমাদের, চল যাই সেখা ।”  
 মাহেকর হস্তধরি তুলিলা তাহারে  
 স্বর্ণাসনে, ধীরে ধীরে আকাশের দিকে  
 উঠিতে লাগিল সেই সুবর্ণ আসন  
 বায়ু ভরে, হেনকালে সঙ্গীতের স্বরে  
 ভেঙ্গে গেল নিদ্রা তার, শুনিলা ছুঃখিনী

কে জানি গাইছে দূরে যমুনার তীরে —

রাগ করে সে চ'লে গেছে  
আর ত সই এলনা ফিরে ।  
আমি—মনের দুঃখে ব'সে ব'সে  
কাঁদি এ যমুনা-তীরে ।

তরঙ্গে তরঙ্গে সেট সুধামাখা স্বর  
প্রাবিয়া আকাশ তল, প্রাবিয়া ধরণী  
দূর হ'তে দূরাস্তরে ভাসিয়া ভাসিয়া  
মিশে গেল যমুনার কল কল তানে ;  
প্রকৃতি আকুল প্রাণে শুনি সে সঙ্গীত  
ছাড়িল নিশ্বাস দীর্ঘ সমীর-স্বননে ।  
আবার—আবার স্বর ভাসিল গগনে—

সাধলেম তারে কত মত  
হ'লনা তার দয়া হৃদে,  
আমি—নয়ন জলে ভেবে গেছে  
দিনু কত মাথার ফিরে ।

সঙ্গীতের সুধাস্বরে মুগ্ধ বিভাবরী,  
কি যে এক মাদকতা পড়িল ছাইয়া  
চারিদিকে, আত্মহারা যমুনা সুন্দরী ;  
বকুলের ফুলগুলি বুর বুর বুর  
পড়িল ঝরিয়া সেই সঙ্গীতের স্বরে  
মাহেকর হৈম দেহে, সমাধির পরে ।  
অতীতের কত স্মৃতি উঠিল ভাসিয়া  
হৃঃখিনীর ভগ্ন প্রাণে, ভাবিলা হৃঃখিনী  
কত নিশি এই ভাবে প্রাণেশের সনে  
বসিয়া সোপান 'পরি যেপেহিছু আমি,  
শেকালী বকুলগুলি বুর বুর বুর  
ঝরিত মোদের শিরে সমস্ত বামিনী ।

শোকে হৃঃখে হৃঃখিনীর হৃদয় ফাটিয়া  
বাহিরিল অশ্রুজল, বিহ্বল হৃদয়ে  
কাঁদিল মাহেকর ; স্বর ভাসিল আবার

আবার—কুল গিয়াছে, মান গিয়াছে !  
কি আছে আর ধরা পরে ।  
আবার—মনের আশা প্রেম পিপাসা,  
সব গিয়াছে ভে'সে সখি  
কালিন্দীর ঐ কাল নীরে ।

সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি হৃঃখিনী মাহেকর  
ভাবিতে লাগিলা হৃদে সজল নয়নে  
বিচ্ছেদের তীব্র জ্বালা সহিয়া সতত  
না জানি কোন্ উপেক্ষিত নিরাশ প্রাণের  
হৃদয় ভেদিয়া এই সুদীর্ঘ নিশ্বাস  
হ'য়েছিল বহির্গত কাঁদাতে তাহার  
চিরারাধ্যা প্রেমময়ী প্রাণের সঙ্গিনী,  
কি গভীর বাথা হায় পরতে পরতে  
এ গানের, নিরাশায় কলিজা ফাটিয়া  
প্রাণের শোণিত যেন হ'য়েছে বাহির  
শতধারে, কাঁদাইতে সমগ্র ধরণী ;  
ধন্য সে প্রেমিক, যার হৃদয় ফাটিয়া  
বহির্গত এ করুণ জীবন্ত রাগিনী !  
গায়ক মুহূর্ত মাঝে চ'লে গেলা দূরে  
গে'য়ে গেয়ে, সুর তার ভাসিতে লাগিল  
উঠে প'ড়ে দূরে দূরে তরঙ্গিনী-নীরে ।

বহুক্ষণ ক্লান্ত প্রাণে রহিলা বসিয়া  
অভাগিনী, হেনকালে দেখিলা অদূরে  
ছায়া প্রায়, মানবের অস্পষ্ট মূর্তি ;  
শিহরি উঠিলা বামা, অনিমেষ নেত্রে  
ভয়ে ভয়ে সেই দিকে রহিলা চাহিয়া ।

দেখিতে দেখিতে মরি বিকট দর্শন  
 তিনটি মানব-মূর্তি আইল সেখানে।  
 “কে তোরা?” বিস্মিত হৃদে জিজ্ঞাসিল বামা।  
 হাসি মুখে একজন করিল উত্তর  
 “চিন না আমারে তুমি মাহেক বেগম?  
 আমি সে আদিনা বেগ, তোমারি সৌন্দর্যে  
 সতত উন্মত্ত আমি, যে দিন তোমারে  
 হেরেছি শিবিক্য পরে, সেই দিন হ’তে  
 এ প্রাণ সঁপেছি আমি তোমার চরণে;  
 কত দিন তোমার এ বাটীর পশ্চাতে  
 অশ্বখের গাছে উঠি হেরেছি তোমারে  
 গোপনে, যখন তুমি এসেছ উদ্যানে।  
 তার পর কত দিন গোপনে গোপনে  
 কত পত্র লিখিয়াছি ভিখারীর মত  
 প্রেম-ভিক্ষা কতবার চে’য়েছি কাতরে  
 তব কাছে, কিন্তু তুমি পাষাণীর প্রায়  
 উপেক্ষা ক’রেছ মোরে সারাটি জীবন,  
 আজি আমি বহু কষ্টে এসেছি এখানে  
 প্রাণময়ি, একবার এস এ হৃদয়ে  
 কত কাল তুমি আর কঁদাবে আমারে  
 এই ভাবে?” রোষে ক্রোড়ে লাজে ও ঘৃণায়  
 মাহেকর মুখ খানি হইল রঞ্জিত  
 রক্ত রাগে, ক্রোধোন্মত্তা ভুজঙ্গিনী প্রায়  
 কহিল গর্জিয়া বামা “দূর হ” পাষণ্ড,  
 নর কূলে তোর মত কামুক কুকুর  
 নাহি আর ধরাতলে, ইচ্ছা হয় মোর  
 জিহ্বা তোর কেটে ফেলি স্মৃতিহীন কপালে।  
 ঘৃণিত চোরের মত এসেছিস্ তুই  
 এই স্থানে, বিনা বাক্যে চ’লে যা পাষণ্ড,  
 অকথা জীবন তোর যাইবে এখনি।”

“এত শোঁধা বীঁধা কেন দেখাস্ আমারে”  
 কহিল আদিনা বেগ, আমি যে সতত  
 প’ড়ে আছি সদা তোর চরণের তলে;  
 প্রাণের অধিক ভাল বাসি আমি তোরে  
 তুই ভিন্ন কিছু আমি জানিনে সংসারে  
 তোরি আশে—তোরি প্রেমে হইয়া উন্মত্ত  
 যাপি এ জীবন আমি সদা কেঁদে কেঁদে,  
 তুই মোর একমাত্র হৃদয় রাণী।  
 আজি হ’ক কালি হ’ক ভারত সাম্রাজ্য  
 লুপ্তিবে নিশ্চয় মোর চরণের তলে,  
 রাজ-বাণী হবি তুই, দিল্লী সিংহাসনে  
 বসাইব তোরে আমি সম্রাজ্ঞীর বেশে,  
 কত সুখে রবি তুই, চল্ মম সাথে  
 দহিস্ নে মোরে আর বিচ্ছেদ-অনলে।”  
 ঘৃণায় ব্যথিত চিন্তে কহিল মাহেক  
 “ছি ছি ছি, আবার মূর্থ সেই পাপ-কথা  
 মুখে তোর? দেহ হ’তে করিব বিচ্ছিন্ন  
 মুণ্ড তোরে রে পাষণ্ড বলিয়া নজীবে,  
 তবে মোর নিবিবে এ প্রতিহিংসা-বহ্নি;  
 সতী আমি, অসহায় পাইয়া আমারে  
 হেন অপমান তুই করিলি পাষণ্ড,  
 এর প্রতিশোধ তুই পাইবি নিশ্চয়  
 কালি প্রাতে, যা ত্যজিয়া মম এ উদ্যান  
 মুখ তোর দেখিলেও ঘৃণা হয় মনে।”  
 “কত সতী সাধ্বী তুই” কহিল আদিনা  
 উপহাস করি তারে, “চল্ মম গৃহে  
 ভাল যদি চা’স্ তুই অকথা নিশ্চয়,  
 মাহেক, এ প্রাণ তোর যাইবে এখনি।  
 জীবনের সম নহে তোর এ সতীত্ব,  
 ছিছি তুই, কেন তুচ্ছ সতীত্বের লাগি



অকালে হারাবি এই অমূল্য জীবন।”  
 “কি বলিলি নরাদম কামুক কুকুর?”  
 কহিল গর্জিয়া বামা, আরক্ত নয়নে  
 অনলের উৎস যেন উঠিল ফুটিয়া  
 সেই দণ্ডে, ক্রুদ্ধ ভাবে কহিল আবার  
 “জীবন ত অতি তুচ্ছ সত্যীত্বের কাছে।  
 সে তবু দেখাস কেন? সত্যী নারী কিরে  
 ডরিবে কুকুর, তোর ক্রকুটি দর্শনে?  
 সত্যীত্ব পরম ধন,—অর্গ্য রতন,  
 —তুচ্ছ শত কোটিম্বর সে ধনের কাছে;  
 তার সম মূল্যবান কি আছে জগতে  
 সত্যী রমণীর কাছে? কোন্ মুখে তুই  
 আনিলি এ পাপ-কথা? ভারতের মত  
 সহস্র সাম্রাজ্য নহে সত্যীত্ব সমান।  
 সত্যীত্ব অর্গ্য ধন, একবার কেন,  
 শতবার মৃত্যু জেয়, তবু এ সত্যীত্ব  
 করিব না কসঙ্কিত রে মুখ-অধম।”  
 মুহূর্তে আদিনা বেগ করিল ইঞ্জিত  
 সঙ্গী হয়ে ধরিতে সে মাহেক বেগমে।  
 লক্ষ দিয়া দশ্যায় ধরিল তাহারে  
 দৃঢ় ভাবে, ক্রোধান্বিতা ফণিনীর প্রায়  
 মাহেক ভীষণ রোষ উঠিল গর্জিয়া,  
 কিন্তু হস্তে অভাগিনী চক্ষের নিমেষে  
 তীক্ষ্ণ ধার ছুরি এক করিয়া বাহির

বক্ষ হ’তে, আঘাতিল দশ্য এক জনে,  
 মুহূর্তে সে নরাদম পড়িল ভূতলে।  
 আবার সক্রোধে বামা আঘাতিল পুনঃ  
 অন্ত জনে, রক্ত-স্রোতে ভেসে গেল ধরা,  
 পড়িল তখনি পাপী ধরনী-হৃদয়ে।  
 সক্রোধে আদিনা বেগ প্রভঞ্ বেগে  
 ছুটিল ধরিতে সেই মাহেক বেগমে;  
 বিহ্বত গতিতে বামা মারিল ছুরিকা  
 হস্তে তার, নরাদম হটিয়া পশ্চাতে  
 প্রহারিল তীক্ষ্ণ অসি মাহেকর শিরে,  
 বিহ্বাতের মত অসি বলমল করি  
 চক্ষের আলোকে মরি নামিল যখন;  
 অভাগিনী ছিন্ন দেহে পড়িল ছুটিয়া  
 স্বামীর সমাধি পরে; শোণিতে তাহার  
 হইল রঞ্জিত সেই পবিত্র সমাধি।  
 বকুলের ফুল গুলি বুর বুর বুর  
 পড়িল ঝড়িয়া সেই শবের উপরে।  
 পানিয়া বুল বুল শ্রামা গাইতে লাগিল  
 বিদায়ের শোক-গীতি, বিটপী পল্লব  
 কাঁদিতে লাগিল শোকে মাথা লুটাইয়া  
 ধে’কে ধে’কে তরু শিরে, উষার পবন  
 সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি বহিতে লাগিল  
 শোকে হঃখে কেঁদে কেঁদে বুর বুর বুর  
 ছড়াইয়া পুষ্প রেণু শবের উপরে।

## পঞ্চদশ সর্গ

[ পুরাতন দিল্লী—কুতুব মিনার ]

দিবা অবসান প্রায়, সায়াহ্নের ছায়া  
আসিতেছে ঘনাইয়া কন্দর কাননে ।  
রক্তিম বরণ ভানু ডুবিতেছে ধীরে  
রঞ্জিয়া বিটপী-শির সুবর্ণ কিরণে ।  
পুরাতন দিল্লী ; হেথা মনুষ্য বসতি  
নাহি এবে, স্থানে স্থানে ইষ্টকের ভূপ,  
ভগ্নকূপ, ভগ্ন দুর্গ, ভগ্ন অট্টালিকা  
রাশি রাশি, কোথাও বা ভগ্ন পাঠাগার  
মসজিদ মিনার ভগ্ন, ভগ্ন দেব গৃহ  
ভগ্ন স্নানাগার, ভগ্ন চিকিৎসা আশ্রয়,  
কোথাও বা অর্দ্ধ ভগ্ন প্রাচীর সকল ।  
কোথাও বা ভগ্ন কূপে ভগ্ন গৃহ ছাদে  
পতন উন্মুখ ভগ্ন প্রাচীরে মন্দিরে  
উঠেছে কণ্টক তরু বন-পুষ্প-লতা ।

উন্মাদিনী বেশে হায় এ দিল্লী নগরী  
মুসলমান গৌরবের চিতা ভস্ম রাশি  
মাখি হৃদে, অবিরত কাঁদিছে নীরবে ;  
কত শোক—কত ব্যথা—কত হা হতাশ  
অনলের উৎস প্রায় উঠিছে আলিয়া  
দিবানিশি, দুঃখিনীর মরুৎ-হৃদয়ে ।  
সায়াহ্নের যুহু যুহু উদাস পবন  
অতীতের সেই স্মৃতি লইয়া হৃদয়ে  
প্রাণের গভীর ব্যথা করিছে জ্ঞাপন  
দীর্ঘ শ্বাসে, পাখীগুলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া  
গাইছে অতীত স্মৃতি,—শোক প্রস্রবণ !  
যেখানে সায়াহ্ন প্রাতে কত নহবত

বাজিত আলাপি কত রাগিনী মধুর ।  
কত বামা-কণ্ঠ উঠি তরঙ্গে তরঙ্গে  
উদার। মুদার। তার। সপ্তমে পঞ্চমে  
স্তরে স্তরে সুধারামি করিত বর্ষণ ।  
যেখানে মোলানাগণ পঠিত কোরান  
প্রভাতে, গভীর রাত্রে বর্ষিয়া আনন্দে  
শাস্তির অমিয়-ধারা প্রকৃতির প্রাণে ।  
সেইস্থানে—আজি হায় অদৃষ্টের দোষে  
পেচকের কিচ মিচি পাখীর কুজন ।  
প্রকৃতি বিষাদময়ী, নাহি প্রীতিহাসি,  
মুসলমান গৌরবের শোক-স্মৃতি রাশি  
উঠিছে জাগিয়া তাব হৃদয়-শ্মশানে ।

কুতুব মলিন বেশে দাঁড়ায়ে অদূরে  
স্মরিয়া অতীত কথা কাঁদিছে নীরবে ।  
দিল্লীর শ্মশান দৃশ্য হৃদয়ে তাহার  
যে অগ্নি দিয়াছে ছেঁলে নিবিল না তাহা  
যুগ যুগান্তরে, বন্ধ গিয়াছে ফাটিয়া  
সে অনলে ; স্বপ্ন প্রায় মনে হয় তার  
দিবানিশি মোসলেমের অতীত গৌরব ।  
দিল্লীর এ উদাসিনী মলিনা প্রকৃতি  
প্রভাতে সায়াহ্নে আর নিশীথ সময়ে  
সতত বলিছে তারে নীরবে নীরবে  
মোসলেম-গৌরব-রবি ডুবেছে এখানে ।  
তাই সে তুলিয়া শির উর্দ্ধে—অতি উর্দ্ধে  
হেরিছে মোসলেম-ভাগ্যে কি আছে অদূরে ।

কুতুবের পার্শ্বদেশে এক বৃক্ষ-শাখে  
 ছইটি তুরঙ্গ বাঁধা, অনূরে দাঁড়ায়ে  
 ছইটি যুবক বীর অতি মনোহর  
 সম্মিলিত সমর সাজে তরবারি হাতে ।  
 একটি যুবক হে'সে কহিলা অপরে  
 "সংবাদ দিয়াছি তারে এখন আসিবে  
 সে বীরেন্দ্র, আমি এবে যাই গৃহ মাঝে ।"  
 উত্তরিল সঙ্গী তার "যাও তুমি এবে,  
 দেখি সে কি বলে মোরে, কিছুক্ষণ পরে  
 যাব আমি, যদি পারি সঙ্গে নিয়ে তারে ।"  
 যুহুর্ন্তে একটি অর্ধেক করি আরোহণ  
 বিছাত গতিতে যুবা করিলা প্রস্থান ।  
 অন্তর্যন কিছুক্ষণ হেরিলা দাঁড়ায়ে  
 দিল্লীর শ্মশান দৃশ্য, হৃদয়ে তাহার  
 শোকের তুমুল ঝড় হইল উখিত ;  
 অজ্ঞাতে হৃকোট। অশ্রু ঝরিল নয়নে ।  
 দিল্লীর শ্মশান পানে চাহিয়া চাহিয়া  
 বিষাদে ককণ কণ্ঠে গাইলা যুবক !

১

দেখরে মোল্লের, তুমি  
 একবার দেখ ফিরে ।  
 কি রস ডুবিয়া গেছে  
 অতীতের গিহু নীরে ।

ছিলে তুমি ধর্ম বনে  
 অজ্ঞেয় ধরনীতলে  
 দলিত লাহিত আজি,  
 পর পদ-রজঃনিরে ।

ধর্ম কর্ত্ত তেরাশিয়া  
 পর ধন লুটে নিয়া  
 হুদে মদে পরদারে  
 চ'লেছে ধ্বংসের তীরে ।

২

কি ছিলে কি হ'লে এবে,  
 বারেক দেখনা ভে'বে,  
 আরো বা কি হবে তুমি  
 জানিনে দুদিন পরে ।

পূর্বের গৌরব যত,  
 সকলি হ'য়েছে গত,  
 আজি ভিখারীর মত  
 ফিরিতেছ দ্বারে দ্বারে ?

সে সম্পদ সে গৌরব,  
 মনে কি পড়ে তা' সব,  
 সে আকবর, জাহাঙ্গির  
 সে সাজাহাঁ আলমগীরে ।

সে তাজ, সে সেকন্দরা,  
 সেই দিল্লী সে আগরা  
 উদাসীন বেশে আজি,  
 ভাগিছে নয়ন-নীরে ।

প্রকৃতি বিহ্বল, স্বর বায়ু স্তরে স্তরে  
 উঠিয়া পড়িয়া সেই দিল্লীর শ্মশানে  
 কি এক মদিরাময় ভাবের তুরঙ্গ  
 বহাইল, অতীতের সে গৌরব স্মৃতি,  
 উঠিল জাগিয়া যুদ্ধ প্রকৃতির প্রাণে ;  
 কুতুবের কক্ষে কক্ষে হইল ধ্বনিত

সে তাজ সে সেকন্দরা  
 সেই দিল্লী সে আগরা  
 উদাসীন বেশে আজি  
 ভাগিছে নয়ন-নীরে ।

প্রতিধ্বনি ছলে দূরে উঠিল কাঁদিয়া  
 দিল্লীর শ্মশান দেবী, সমীরের ছলে  
 প্রকৃতি আপনি যেন গাইল বিষাদে

আজি ভিখারীর মত

ফিরিতেছ ঘারে ঘারে ।

সে করুণ সুধাস্বর তরঙ্গে তরঙ্গে  
কি এক অতীত স্মৃতি দিল জাগাইয়া ;  
সমাপি' সঙ্গীত যুবা বসিলা যাইয়া  
চিন্তাকুল প্রাণে ; হৃদে কত যে ঝটিকা  
বহিতে লাগিল বেগে ; কিছুক্ষণ পরে  
একটি বীরেন্দ্র মূর্তি দাঁড়াইল আসি  
যুবার সম্মুখে । যুবা প্রভঞ্জন বেগে  
দাঁড়াইয়া দর্প ভরে কহিলা তাহারে  
“বহুক্ষণ তব তরে আছি এই স্থানে ;  
শুনিয়াছি লোক-মুখে মহাবীর তুমি  
মহারাত্রি সৈন্যদলে, তাই ইচ্ছা মম  
দেখিতে বীরত্ব তব এ রণ প্রাঙ্গণে,  
এ'স তবে হে বীরেন্দ্র দেহ যুদ্ধ মোরে ।”  
হাসিয়া কহিলা বীর “নির্বোধ বালক  
কি যুদ্ধ করিবে তুমি ? কেন স্বইচ্ছায়  
মৃত্যু সনে আলিঙ্গন করিতে বাসনা ?  
এব্রাহিম কার্দি আমি, শোন নি কি কভু  
নাম মোর ? মহারাত্রি সৈন্যের সাগরে  
কর্ণধার আমি, তুমি নারিবে যুঝিতে  
মম সনে, কেন যথা হারাবে জীবন ?  
ফিরে যাও, তব সনে যুঝিবে না কভু  
মহারাত্রি-সেনাপতি ।” হাসিলা যুবক,  
বাক্য করি পুনর্ব্বার কহিলা তাহারে  
“বহুদিন তব নাম করেছি শ্রবণ  
হে বীরেন্দ্র, আসিয়াছি তাই তব কাছে  
মিছি ভয় কেন দেখাও আমারে ?  
শৃগাল কুকুর নহি তোমার গর্জনে  
ডরিব, তোমার মত পরাক্রান্ত বীর

দস্তদ্বী তাহার মুণ্ড সম্মুখ সমরে,

ছিন্ন করি, উপহার দিয়াছিহু আমি

দোরানী সাহারে, তুমি শুনেছ কি তাহা ?

সেই মারু বেগ আমি ; মোস্লেম হইয়া

মোস্লেম বিপক্ষে তুমি ধরিয়াছ অসি,

সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব নিশ্চয়

তোমার শোনিতে আমি । মোস্লেম-শোণিত

এ-প্রাণের স্তরে স্তরে শিরায় শিরায়

প্রবাহিত—মৃত্যু ভয় নাহি এ হৃদয়ে ;

তবে আর কারে ভয় ? এ প্রাণ থাকিতে

ইসলামের অবনতি নারিব দেখিতে ।

এ'স তবে বীরবর দেহ যুদ্ধ মোরে ।”

বিনাবাক্যে এব্রাহিম রহিলা দাঁড়ায়ে

কিছুক্ষণ, ধীরে ধীরে কহিলা আবার

“নির্বোধ বালক, কেন এসেছ মরিতে

এই স্থানে ? যে মুহূর্ত্ত হেরেছি তোমারে

কেন জানি এ হৃদয়ে মমতার উৎস

কুটিয়াছে কণ্ঠস্বর কেন জানি হায়

বহু পরিচিত ব'লে বোধ হয় মনে ।

আবার—আবার বলি ফিরে যাও গৃহে,

এব্রাহিম যুঝিবেনা বালকের সনে ;

কি বীরত্ব কেশরীর বধিলে শৃগালে ?”

আবার হাসিলা যুবা, কহিলা “বীরেন্দ্র

যুঝিয়াছি, মৃত্যু ভয়ে তুমি এত ভীত,

নহিলে যুঝিতে কেন অনিচ্ছা তোমার ?

বিনা যুদ্ধে পরাজয় করিলে স্বীকার

হে বীরেন্দ্র, দেও অসি, আত্ম সমর্পণ

কর তুমি, কিংবা আজি দেহ যুদ্ধ মোরে ।”

এব্রাহিম পুনর্ব্বার কহিলা সস্বরে

“হেন সুকুমার দেহে অস্ত্রের আঘাত

কেমনে করিব আমি ? শোণিতে তোমার  
করিব না কলঙ্কিত এ অসি আমার ।  
কর তুমি অজ্ঞাঘাত যত ইচ্ছা তব,  
সাক্ষী জগদীশ, আমি করিহু প্রতিজ্ঞা  
যুঝিবনা ; আশ্রয় রক্ষা করিব কেবল ।”  
হাসিলা যুবক, গর্বে কহিলা তখন  
ব্যঙ্গকরি এতাহিমে “হে বীর কেশরি,  
রমণীও তোমাপেক্ষা বেশী শক্তি ধরে ;  
মনে করে দেখ দেখি শৈশবের কথা ?  
আছে মনে—পেরেছিলে তুমি কি কখন  
জোহরারে পরাজিতে শৈশব সময়ে  
আনার কলির সেই উত্তান ভিতরে ?  
তুমি ত তাহার সনে শক্তির পরীক্ষা  
করেছিলে বহুদিন, আছে কি তা মনে ?  
যে জন নারীর সনে না পারে সমরে,  
সে কেমনে জয়ী হবে মায়ু-বেগ সনে ?”  
জোহরার নাম শুনি উঠিলা চমকি  
বীরেন্দ্র, অনল-কণা উঠিল অলিয়া  
নেত্রে তার ক্রোধভরে জিজ্ঞাসিলা তারে  
“জোহরা পরের পত্নী, চিনিলে কেমনে  
তুমি তারে ? তব সনে কোথায় সাক্ষাৎ  
জোহরার ? সে কি কভু ব’লেছে তোমারে  
শৈশবের কথা তার ? ভাবিতেও তাহা  
ক্রোধে মোর অঙ্গ অলে, পর নারী সনে  
অবৈধ আলাপ তুমি করিলে কেমনে ?”  
“সে আমার প্রণয়িনী” কহিলা যুবক  
হেঁসে হেঁসে বীরেন্দ্রের মুখ পানে চেয়ে  
“সেও মোরে ভালবাসে প্রাণের সমান,  
সে কভু আমার হেঁড়ে পারেনা থাকিতে  
এক পল, ছায়া প্রায় থাকে মোর সাথে ;

শৈশবের কথা কেন ? সারা জীবনের  
সুখ দুঃখ বিজড়িত সব কথা তার  
বলিয়াছে সে আমারে ।” তারি অনুরোধে  
এসেছি বীরেন্দ্র, হেথা বধিতে তোমারে  
যুঝিয়া সমুখ যুদ্ধে” ভূজঙ্গ দংশনে  
পাখি মাঝে পান্থ যত উঠে চমকিয়া ;  
তেমনি বীরেন্দ্র মরি উঠিলা চমকি ;  
ভাবিলা অসতী তবে জোহরা বেগম ।  
পাণিষ্ঠা ভেবেছে মনে আমারে বধিয়া  
এ নব প্রণয়ী সনে, সূখের সাগরে  
ভাসিবে আনন্দে, তাই পরামর্শ দিয়া  
মায়ু বেগে পাঠায়েছে বধিতে আমারে ।”  
ভাবিতেও ইহা তার মস্তক উপরে  
শত বজ্রাঘাত যেন হ’ল একেবারে  
সহস্র বৃষ্টিক তার হৃদয় মাঝারে  
দংশিতে লাগিল, মুখ হইল রঞ্জিত  
রক্ত রাগে, নেত্রদ্বয়ে উঠিল অলিয়া  
“প্রাণের মহা অগ্নি, মহাক্রোধে বীর  
বাধা দিয়া মেঘমল্লের কহিলা গর্জিয়া  
“চাইনে শুনিতে আর, মৃত্যুর লাগিয়া  
এখনি প্রস্তুত হও, কার সাধ্য আজ  
রক্তিতে তোমারে এই কুপাণের মুখে ।  
ভূতলে পাতালে কিংবা গগনে সাগরে  
যেখানে ঘাইবে, আজি বধিব তোমারে  
এ প্রতিজ্ঞা,—স্বর্গ হ’তে দেবতাও এ’লে  
নাহি রক্ষা, রে পান্থও দেহ যুদ্ধ মোরে,”  
যুহুর্ভে নিকোষি অসি কহিলা বীরেন্দ্র  
“লও অস্ত্র, বধিব না নিরস্ত্র অরিরে;  
যে অগ্নি জ্বলেছে তুমি হৃদয়ে আমার  
নিবাইব সে অনল তোমারি শোণিতে

এ অসি তোমারি রক্তে করিয়া রঞ্জিত  
প্রাণের যজ্ঞণা মোর করিব বারণ,  
দেহ যুদ্ধ রে পাপিষ্ট।” হাসি মনে মনে  
কহিলা যুবক “কেন উঠিলে চমকি  
জোহরার নাম শুনি হে বীর কেশরী ?  
—বিবর্ণ হইল কেন বদন তোমার ?  
আরো এক কথা আছে বলিব তোমারে  
সংগোপনে।” মুহূর্ত্তেকে কহিলা যুবক  
বীরেন্দ্রর কাছে যেয়ে কি জানি কি কথা  
কাণে কাণে, চমকিয়া উঠিলা বীরেন্দ্র  
সে মুহূর্ত্তে, এক দৃষ্টে বিহ্বল হৃদয়ে  
যুবকের মুখপানে রহিলা চাহিয়া।  
গভীর বিষ্ময়ে বীর কহিতে লাগিলা  
“কি আশ্চর্য্য, তুমি সেই জোহরা বেগম ?”  
যুবক কহিলা হেসে ধিক্ সে পুরুষে  
যে জন আপন ভার্যা না পারে চিনিতে ?  
কে বলে তোমারে বীর ? রমণীর সনে  
পারিলে না যুদ্ধে, ছিছি কাপুরুষ তুমি,  
নহিলে আমার কাছে হারিলে কেমনে ?  
এখনো ত তুমি মোরে পারনি চিনিতে ?  
“চিনেছি” বলিয়া শূর লজ্জায় তখনি  
যুবকের শিরদ্বাণ লৌহের কবচ  
শ্রুত শুষ্ক উন্মোচিয়া কে’লে দিলা দূরে।  
যদি কি মোহিনী মূর্ত্তি,—নিরুপমা ভরে।  
সৌন্দর্য্যের মহাসিদ্ধ করিয়া মগ্ন  
অমৃত তুলিয়া যেন বিধাতা চতুর  
গ’ড়েছে ইহায়ে, জ্বলে করিয়া স্থাপন  
বীরব্রতের মহা ধনি—প্রেমের ভাণ্ডার।  
যুদ্ধ প্রাণে এরাহিম জিজ্ঞাসিলা তারে  
“কে সে যুবা তব সনে এসেছিল। হেথা ?

যে আমারে বহু কষ্টে এনেছিল ডাকি  
এই স্থানে তব সনে করিতে সাক্ষাৎ ?”  
কহিলা জোহরা “সে যে কুলসুম বানী  
এসেছিল মম সাথে পুরুষের বেশে।”  
যুদ্ধবীর যদি মাঝে লইলা টানিয়া  
সে স্বর্ণ কুসুম, স্নেহে করিয়া চুষন  
বিষাধরে, অভাগিনী লজ্জাবতী প্রার  
রহিলা সন্মিত মুখে নয়ন মুদ্রিয়া  
বক্ষে তার—অকুটন্ত সোনার নলিনী।  
এরাহিম যুদ্ধ প্রাণে রহিলা চাহিয়া  
সে স্বর্ণ-লতিকা পানে, স্ননীল আকাশে  
সুধাকর সুধা-রশ্মি বর্ষিতে লাগিল  
শির’ পরে, স্নিক বায়ু রহিয়া রহিয়া  
ব্যজনিতে ছিল সেই ক্লান্ত কলেবরে।  
বীরেন্দ্র আকুল চিন্তে ভাবিতে লাগিলা  
সুখের শৈশব কাল কত সুধাময়,  
জোহরার সনে যবে খেলেছি লাহোরে  
আনার কলির সেই নিকুঞ্জ বিতানে।  
পিতৃদেব কত হর্ষে বাঁধিলেন দৌহে  
বিবাহ বন্ধনে, কিন্তু হৃদয়ে বিদরে  
সন্ন্যাসীর অভিধাপে বিধাতার কোপে  
সেই সুখ এ অদৃষ্টে ঘটিল না আর।  
পিতৃমাতৃহীন আমি হুঁ অসময়ে,  
দিল্লীর সেনানী পদ বহু চেষ্টা ক’রে  
পেয়েছিহু, ভাগ্য দোষে পড়িহু মন্ত্রী  
বিষ নেত্রে, বিনা দোষে পদচ্যুত আমি  
হইহু, অন্নের লাগি দেশ দেশান্তরে  
কত ভ্রমিলাম, ব্যর্থ হইল সকল,  
কোন স্থানে হইল না অন্নের সংস্থান  
অভাগার, অনাহারে দিল্লী-আব্দা পথে



কেটেছিল কত দিন তিক্কুর মত ।  
অগত্যা আশ্রয় হীন শুক শুক প্রায়  
অবস্থার মোটে পড়ে গিয়াছিল ভেসে  
দক্ষিণাত্যে, মুষ্টিমের অন্নের লাগিয়া  
মহারাত্রি সৈন্তদলে করিছু প্রবেশ  
অনিচ্ছায়, সেই হাতে অদৃষ্ট আমার  
হইল সহায়, ক্রমে সেনাপতি পদে  
হইল উন্নীত, আত্মা বিধির মহিমা  
অনন্ত, কে পারে লীলা বুঝিতে তাহার ?

কিছুক্ষণ পরে বামা মেলিল নয়ন,  
বীরেন্দ্র আবার তারে কহিল সাদরে  
জোহরা পড়ে কি মনে শৈশবের কথা ?  
সে মধুর সন্তাষণ, সে সুখ-মিলন,  
সেই প্রেম, সেই আশা, সেই ভালবাসা  
বল দেখি প্রাণময়ি, তুলিলে কেমনে ?  
শৈশবের কথা আমি, যৌবনের স্বামী  
বল দেখি কোন্ প্রাণে তুলিয়া আমারে  
একাকিনী, প্রাণময়ি, যাপিছ জীবন  
প্রাণের সমান ভাল বাসিতে যাহারে  
কোন্ দোষে তুমি আজি ত্যজিলে তাহারে ?  
হায় সে শৈশব কালে কত যে কি দ্রব্য  
নিজে না খাইয়া তুমি দিয়াছিলে মোরে ;  
সে সুখের কথা আজি পড়িছে কি মনে  
জোহরা ? বুঝিছ তব হৃদয় পাষাণ,  
নাহি প্রেম নাহি প্রীতি, নাহি ভালবাসা ;  
পাষাণ হইত তব হৃদয় পাষাণ,  
পাষাণী তোমার সম নাহি ধরাপরে ?  
তোমারে বা হবি কেন ? দোষী এ অদৃষ্ট  
সত্যাসীর অভিশাপে বুঝিছ লাগরে ।

প্রভাতের পল্ল সম তুলি আঁধার ধীরে  
কহিল জোহরা “নাথ জানিবা জীবনে  
তোমা ভিন্ন অন্য কিছু শরনে বপনে  
তুমি মোর একমাত্র আরাধা দেবতা  
এ জগতে, তব স্মৃতি দিবস রজনী  
বরিষে অমিয়-ধারা আমার হৃদয়ে ।  
স্বামী তুমি, প্রভু তুমি, কেমনে তুলিব  
তোমার সে ভালবাসা আমি অভাগিনী ?  
চিরদাসী আমি তব ও পদ-রাজীবে ।  
দেখ নাথ মনে ক’রে লাহোর-কুটীরে  
আমার সমস্ত ধন, অলঙ্কার যত  
দিয়াছিলাম সব, আমি তোমার চরণে ;  
কিন্তু নাথ, তুমি ত তা নেওনি তখন ?  
আমার সে ধন রত্নে—আমারেও শেষে  
দলিয়া চরণে তুমি গিয়াছিলে চলে  
হিন্দুর দাসত্ব ব্রত করিয়া গ্রহণ  
মহারাত্রি, সে কথা কি সবি গেছ ভুলে ?  
সত্য বটে বহুদিন সে’খিছ আমারে  
যাইতে তোমার কাছে, মোসলিম হইয়া  
হব কি প্রতিজ্ঞাত, তুচ্ছ সুখ আশে ?  
স্বামী তুমি—এ প্রাণের অধীশ্বর তুমি,  
তোমার চরণ সেবা কর্তব্য আমার,  
—এ নখর জীবনের সার ব্রত তাহা  
মানি আমি, কিন্তু নাথ কাকেরের অন্ন,  
হারাম আমার কাছে—জীবিকা তোমার ;  
কেমনে যাইব আমি তোমার সকাশে ?  
ধরিয়া চরম তব অনুরোধ আমি  
করেছিলাম বহুদিন, ত্যজিতে দাসত্ব  
মারাঠার,—উপেক্ষিতা হইয়াছি সদা ।  
বারেক জাবিয়া দেখ মোসলিম হইয়া

ইসলাম বিরুদ্ধে তুমি ধরেছ কপাল,  
তব অজ্ঞাঘাতে আজি ইসলামের জ্বলি  
জ্বলিত, মোস্লেমের রক্ত-সিংহাসন  
বহি আজি ভেঙ্গে যায় তব অজ্ঞাঘাতে,  
এ কলঙ্ক চিরতরে রহিবে অগতে ।  
হিন্দুর সাম্রাজ্য ভিত্তি হইবে স্থাপিত  
ভগ্নপ্রায় ইসলামের পঙ্কজ উপরে,  
এ কলঙ্ক প্রিয়তম, লুকাবে কেমনে ?  
পেশবার ভৃত্য তুমি, মোস্লেমের বৃকে  
করিতেছ অজ্ঞাঘাত নিশ্চয় হৃদয়ে,  
সমগ্র মোস্লেম আজি ঘৃণিছে তোমারে  
মুসলমান নর নারী প্রতি ঘরে ঘরে  
তোমারে দিতেছে গালি, বল প্রিয়তম  
এ হুঃখ তোমার দাসী সহিবে কেমনে ?  
যেই দণ্ডে শুনিয়াছি এ হুঃখ তব  
ছেড়েছি প্রাণের আশা স্পর্শিয়া কোরাণ  
করেছি প্রতিজ্ঞা আমি, কলঙ্ক তোমার  
প্রক্ষালিব প্রাণনাথ শোণিতে আমার ।  
যাইব না গৃহে তব ; পতি গৃহে আর  
করিব না স্মৃতি ভোগ থাকিতে জীবন ।  
মোস্লেমের পক্ষে থাকি ধ্বংসিব সমরে  
বিজোহী মারাঠা বৃন্দে, পেশবা তঙ্করে ;  
অথবা সমর-ক্ষেত্রে করিব শয়ন ।  
স্বধর্মের তরে যদি মরি আমি রণে  
ভিল মাত্র হুঃখ মম নাহি হবে মনে ।  
মরণে নির্ভয় আমি, জন্মিলে মরণ  
সুনিশ্চিত, তবে কেন পাপ আচরণে  
কলঙ্কিত করিব এ নব্বয় জীবন ?  
আমী তুমি, প্রভু তুমি, কলঙ্ক তোমার ,  
যদি না ধুইতে পারি কি কাজ জীবনে ।

প্রাণের অধিক ভাল বাসি আমি তোমা,  
তব প্রেমময় মূর্তি স্থাপিয়া হৃদয়ে  
অশনে বসনে ধ্যানে পূজি আমি তারে  
অক্ষুণ্ণে, তারে নাথ ছলিব কেমনে ?  
নীরবিলা ইন্দুমুখী কহিলা বীরেন্দ্র  
“জোহরা, পাণিষ্ঠ আমি, দেবী তুমি ভবে,  
কি করিব, অভাগার কি আছে উপায়,  
উদরায় তরে আমি নানা স্থান আমি  
না পেয়ে আশ্রয় কোথা, মর্মহত প্রাণে  
হিন্দু দাসত্ব শেষে করেছি গ্রহণ ।  
জোহরা, বলিতে পার তোমার সাহায্য  
কেন নাহি নিয়াছি—কি দিব উত্তর ?  
নারীর সাহায্য মোর নহে বাঞ্ছনীয়,  
তাহাপেক্ষা শতগুণে মৃত্যু অগ্নিকর ।  
পেশবার ভৃত্য আমি, মিথ্যা নহে তাহা,  
এ মোর প্রাক্তন লিপি-নিষ্ঠুর নিয়তি ?  
অদৃষ্টের গতি আমি ফিরাব কেমনে ;  
মারাঠা আশ্রয়ে থেকে উন্নতি আমার,  
এ কথা স্বীকার্য্য, ইথে দ্বিধা নাহি কিছু,  
হ'ক তারা রাজজোহী কাকের অধম,  
কি ক্ষতি তাহাতে ? তারা অন্নদাতা মোর,  
তাহাদেরি অন্ন খেয়ে এ দেহ বর্জিত,  
কেমনে ধরিব অসি বিপক্ষে তাদের ?  
এর চেয়ে মহাপাপ কি আছে অগতে ?”  
জোহরা সজল নেত্রে কহিলা তাহারে  
“ছেড়ে দেও প্রিয়তম দাসত্ব তাদের ;  
দাসী আমি, আজীবন সেবিব তোমার  
পবিত্র চরণে ছুটি, পৈতৃক সম্পত্তি  
করি বিক্রী, পাইয়াছি স্বর্ণের মুদ্রা  
দ্বিসহস্র, তাহা ভিন্ন বহু অলঙ্কার

আছে মম, চল সঙ্গে দিব তা তোমারে ;  
 এতেন কি বুচিবেনা অস্তাব তোমার ?  
 আমি যবে দাসী তব, সম্পত্তিতে মোর  
 কেন নাহি অধিকার থাকিবে তোমার ?”  
 “না জোহরা” এতাহিম কহিল। তাহারে  
 “করা কর বহবার বলেছি তোমারে  
 নারীর সাহায্য আমি লইব না কতু ;  
 পেশবার কৃত্য আমি, লবণ তাহার  
 খেঁয়ে এতদিন, শেষে যাইব ছাড়িয়া  
 বিপদ সময়ে তারে কোন্ ধর্ম মতে ?

এর চেঁয়ে যত্ন মোর শতগুণে ভাল,  
 কর্তব্য আমার কাছে সব চেয়ে বড়,  
 যে দেহ তাদের অয়ে হয়েছে বর্জিত  
 কি কাজ সে দেহে আর ? নাহি কোন আশা  
 নাহি জীবনের কোন উদ্দেশ্য মহান  
 আশীর্বাদ কর তুমি যেন এ জীবন,  
 তাদের সেবায় হায় হয় সমাপন।”  
 “তথাক্ত” বলিয়া ধীরে নৈশ সমীরণ  
 বহিল, প্রকৃতি যেন উদাস হৃদয়ে  
 কেলিল নিশ্বাস দীর্ঘ সে মহানন্দশানে ।

— — —

## ষোড়শ সর্গ

[আগ্রা নগরী ; আদিনা বেগের বৈমাত্রেয় ভাতার গৃহ]

গাভীরা ঘামিনী ; শুক প্রকৃতির কোলে  
জে'গে আছে নীরবতা ; নীরব অবনী ।  
বুড়ি হ'য়ে গেছে, এবি শীতল বাতাস  
বহিতেছে ধীরে ধীরে ; হু একটি তারা  
কু'টে আছে রজনীর আঁধার ললাটে ।  
শ্রামল জলদ পাশে স্নান শশধর  
অর্ধ নিমিলিত নেত্র চুলু চুলু করি  
প্রকৃতির স্বন্ধে শির রাখিয়া কাতরে  
চে'য়ে আছে বিশ্বপানে—আকাক্ষা বিদায় ।  
নাহি আলো প্রভাহীন মলিনা কৌমুদী  
ঈষৎ আধারে ঘেরা রঞ্জিয়াছে ধরা ।

মলিন চন্দ্রমালোকে কি দৃশ্য মহান্ ।  
—শোভিছে ঘুমন্ত আগ্রা, মর্ত-মরুভূমে  
প্রকৃতির মনোহর নন্দন উজ্জান ।  
স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ পবিত্র প্রেমের  
কত স্মৃতি অঙ্কে অঙ্কে জড়িত এখানে ।  
ভূতলে নন্দন শোভা, শান্তি-নিকেতন ।  
অনন্ত গৌরব পূর্ণ সৌন্দর্য্য মহান্  
কুটিরা প'ড়েছে যেন তরঙ্গে তরঙ্গে  
আগ্রার সুচারু বক্ষে, তরঙ্গে তরঙ্গে  
চালিছে অমৃত ধারা যাতনা-ভাঙিত  
হতাশ মানব-হৃদে, প্রেম-প্রসবণ  
কুটাইয়া, লঙ্কারিয়া সেই দক্ষ প্রাণে  
অনন্ত বৈরাগ্যময় শান্তির আসব ।  
বসুনার ছুই পাশে অমল ধবল  
সৌধশ্রেণী স্নশোভিত প্রমোদ উজ্জান ।

প্রত্যেক হৃদয়ের সনে যে স্মৃতি জড়িত  
উঠিবে না চিহ্ন তার শত যুগান্তরে  
অনন্ত কালের মহাঅনন্ত প্রাবনে ।  
আগ্রার অনতিদূরে শোকাঙ্ক জড়িত  
অই সেকন্দরা, অই মন্দির সুন্দর  
গাইছে কি শোক-গাথা, স্তরে স্তরে স্তরে  
কত চূড়া, কত কক্ষ, রঞ্জিত সুন্দর  
কত বর্ণে, হায় অই ত্রিতলে তাহার  
শ্বেত মর্ম্মরের এক কক্ষ মনোহর ।  
অভ্যন্তরে অতি শুভ্র নয়ন-রঞ্জন  
একটি কবরাকৃতি গঠিত মর্ম্মরে ।  
নিম্নতলে মৃত্তিকার সমাধি গহ্বরে  
নিদ্রিত জন্মের মত বীর কুলধ্বজ  
আকবর ভারতের গৌরব ভাস্কর ।  
হায় এ সমাধি গৃহ মানবের প্রাণে  
কি এক অতীত স্মৃতি দেয় জাগাইয়া ।  
হিন্দু মুসলমানে হায় করিয়া আবদ্ধ  
এক সূত্রে, আকবর যে মহা সাম্রাজ্য  
ক'রেছিল সংস্থাপিত ভারতের বুকে,  
ভেবেছিল মনে তাহা হইবে অক্ষর,—  
—হইবে না ধ্বংস কভু ভূগর্ভে সে রাজ্য  
উত্তরাধিকারী তার যুগ যুগান্তরে ;  
সেকেন্দ্রার কক্ষে কক্ষে হইবে সমাধি  
তাহাদের, কিন্তু হায় কালের কুঠারে  
তাহার সে আশা-লতা চির উন্মূলিত ।  
চারিদিকে মনোহর কুসুম উজ্জান,  
কত জাতি পুষ্পগুলি র'য়েছে কুটিয়া

বুকে বুকে, কতজাতি শূকঠ বিহগ  
 চালিছে অমৃত ধার। মোস্লেম-জদরে  
 জাগাইয়া শোক স্মৃতি অতীত গৌরব।  
 প্রাঙ্গণের বহির্ভাগে একটি বিতল  
 অট্টালিকা, আকবরের বিধবা মহিষী  
 বোকাবাই কত কটে বিচ্ছেদে তাহার  
 যাপিত এখানে সেই বৈধব্য জীবন।  
 অই যে আরামবাগ, প্রমোদ উদ্যান  
 যমুনার তীরে, মরি কি শোভা সুন্দর  
 বিকালিছে, স্তরে স্তরে কত কুল কুল  
 গোলাপ মতিয়া যুই চামেলী চম্পক  
 গন্ধরাজ, আরো কত কুসুম সুন্দর  
 শোভিতেছে বুকে বুকে, মোহিয়া সৌরভে  
 কুজবন, নৈশ বায়ু রহিয়া রহিয়া  
 চুপি এ কুসুম পুজ যাইছে বহিয়া  
 ধীরে ধীরে, জুড়াইয়া জগত জীবন।  
 কল্পনে লো, প্রিয়সখি, এ কুজ কানন  
 গড়িল যে জন এই যমুনার তীরে,  
 কোথা সে ? এ ধরাধামে আছে কি সে জন ?  
 অণু পরমাণু তার অনন্তের সনে  
 গিয়াছে মিশিয়া, কিন্তু চিরন্তন তার  
 আজিও তাহারি নাম করিছে কীৰ্ত্তন।  
 জগতেরি এ দশা, অমাক মানব  
 বোঝে না তা',—অমর ত কেহ নহে তবে ?

অইবে এসতদৌলা, মর্শ্বের নির্মিত  
 অট্টালিকা, অভ্যন্তরে লভিছে বিজ্ঞান  
 হুজুহান বেগমের জনক জননী।  
 চারিধারে কুজবন মরি কি সুন্দর,

মধ্যে এ সমাধি গৃহ, হেরিলে নয়নে  
 কত পুরাতন স্মৃতি জে'গে উঠে মনে।  
 অই দেবি এ জগতে শাস্তি-নিকেতন,—  
 —কবির উৎস, ছুটি প্রেমিক দম্পতী,  
 ধরি বন্ধে, মাখি হৃদে তাম্ররাশি তার  
 তাজ \* আজি কি পবিত্র কি শোভা-সদন ?  
 ভূতলে দ্বিতীয় স্বর্গ, পবিত্র প্রেমের  
 কি স্মৃতি জড়িত দেবি অঙ্গে অঙ্গে তার  
 অণু পরমাণু সনে ; বসিলে এখানে  
 মুহূর্ত, মনের গতি থাকে না সংসারে।  
 ইচ্ছা হয় সেই দণ্ডে তাজি এ সংসার  
 সাজিতে সন্ন্যাসী, দেবি, পরিয়া বকল  
 'তাজের চরণ প্রান্তে, স্নিগ্ধ ছায়াতলে  
 অই ধূলা বালি তাম্র মাখিয়া হৃদয়ে  
 লুটাইতে এ তাপিত নখর জীবন।  
 এমন শাস্তির স্থান কে দে'খছে কবে ?  
 এমন অতুল শোভা আছে কি জগতে ?  
 এমন পবিত্র তীর্থ, প্রেমাত্মক জড়িত  
 এমন শোকের স্মৃতি কোথা আছে তবে ?  
 অভ্যন্তরে মনোহর মর্শ্বের প্রাচীরে  
 লতা পাতা পুষ্প কলি মুকুল মঞ্জরী  
 বিনির্মিত বহুমূল্য উজ্জল রতনে  
 নানাবর্ণ, সে সৌন্দর্য্য কবি-তুলিকার  
 কুটাইতে এ জগতে কে আছে সক্ষম ?—  
 —স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য তাহা, নহে তা' ধরার,  
 ধরার এ মর কবি আঁকিবে কেমনে ?  
 অই স্থানে সাজাহান হৃদয়ের পাশে  
 রাখিয়া সে প্রেমময়ী প্রাণের মোমতাজে  
 চিরতরে, লভিয়াছে অনন্ত বিজ্ঞান।

নিরখিলে এ মন্দির প্রাণের ভিতরে  
 জে'গে উঠে অতীতের বিস্মৃত স্বপন,  
 করে দেবি, কেন জানি যুগলনয়ন।  
 চারি কোনে মর্ম্মরের ভোরণ নিচর;  
 কি সুন্দর, লতা পাতা ফুল ও মুকুল  
 চিত্রিত উজ্জল বর্ণে বিবিধ রতনে।  
 প্রভাতে মধ্যাহ্নে সন্ধ্যা নিশীথ সময়ে  
 বাজিত নহবত কত মধুর সুস্বরে  
 এই ভোরণের পরে, হয় সে সময়ে  
 ললিত ভৈরবী পিলু পুরবী মূলতান  
 পরজ কালোড়া বহু মধুর রাগিনী  
 তরঙ্গে তরঙ্গে কেঁদে সাজাহান-জুদে  
 মোম-তাজ-প্রেমের স্মৃতি রাখিত জাগা'য়ে  
 অবিরত, প্রেম তীর্থ হয় এইস্থান।  
 তাই সরোবরে দেবি অসংখ্য ফোয়ারা  
 ঝরিত বিবিধ পুষ্প করিয়া নির্মাণ।  
 নাই সেই সাজাহান, নাই সে মোম-তাজ,  
 নাই সেই নহবত, আর সে রাগিনী  
 কাঁদে না, ধরে না কত মুহূর্ত্তের তরে  
 মোম-তাজ প্রেমের সেই সঙ্কল্প তান।  
 সে সঙ্গীত চির তরে নীরব এখন;  
 আজি শুধু নৈশ বায়ু রহিয়া রহিয়া  
 প্রাণের গভীর শোকে নীরবে কেলিছে  
 দীর্ঘ শ্বাস, পাখীগুলি থাকিয়া থাকিয়া  
 অতীতের কথা স্মরি করিছে রোদন।  
 যমুনা আজিও হয় গভীর বিবাদে  
 মোম-তাজের শোক স্মৃতি লইয়া হৃদয়ে  
 কাঁদিয়া কাঁদিয়া হয় বাইছে বহিরা।  
 তাজের অতীত স্মৃতি সাজাহান-কীর্ত্তি  
 আজিও সে কণ তরে পারেনি ভুলিতে ;

আজিও সে শোকাবেশে আত্মহারা প্রাণে  
 তাজের চরণ তলে লুটিয়া লুটিয়া  
 কুলু কুলু তানে সদা করিছে রোদন।  
 এমন প্রেমের তীর্থ আছে কি জগতে ?  
 এমন প্রেমের স্মৃতি মাখিয়া হৃদয়ে,  
 এমন যুগল রত্ন লইয়া হৃদয়ে  
 এমন পবিত্র তীর্থ আছে কি এ ভবে ?  
 —কল্পনে, ভারতে এ যে নন্দন উদ্যান।  
 চারি ধারে কুঞ্জবন, পার্শ্বে সরোবর,  
 সরোবরে শতদল ; নব পল্লবিত  
 সুশ্রামল তরু শাখে বিহগের গান  
 কি মধুর, মুহুমন্দ, নৈশ সমীরণে  
 রাশি রাশি পুষ্পবৃন্দ তাজের চরণে  
 পড়িছে ঝরিয়া, দেবি, কি শোভা মহান্।

অই যে যমুনাতীরে উচ্চ—উচ্চতর  
 আশ্রা-ভূর্গ, বিনির্ম্মিত লোহিত প্রস্তরে  
 মনোহর, মোম-প্রেমের কীর্ত্তি নিদর্শন।  
 অভ্যস্তরে সত্রাটের অসংখ্য প্রাসাদ  
 মুনিজন-মনোহর নয়ন-রঞ্জন।  
 অই রাজ অস্তঃপুর—যেন ইন্দ্রপুরী।  
 কত কক্ষ, কত সৌধ সুশুভ্র মর্ম্মরে  
 সুগঠিত, এক পার্শ্বে রক্ত প্রস্তরের  
 হর্ম্মা এক, বেত পুন্নে রক্ত জবা যেন, —  
 —যোধাবাদী সজ্জাজীর প্রাসাদ সুন্দর।  
 সুরমা দেওয়ান আম, মতি মসজিদ,  
 আরো কত মনোহর রাজ অট্টালিকা  
 আশ্রার সুচারু বকে শোভিছে সুন্দর।  
 সুশুভ্র দেওয়ানখাস হানিছে গৌরবে  
 চন্দ্রালোকে, আকাশের চারু শুভতার



মিশাইয়া শুভ্র দেহ ; দুর্গের বাহিরে  
 জুয়া মসজিদ যেন সৌন্দর্যের খনি !  
 স্থানে স্থানে মনোহর কত হস্ত্যমালা  
 হুই ধারে, মধ্যস্থলে যমুনা স্তম্ভরী  
 প্রবাহিতা, বিমোহিতা কল কল তানে  
 মন্ডের অমরাবতী নন্দন কানন ।  
 সূচক বেলনগঞ্জে আগ্রার নিকটে  
 একটি বৃহৎ বাড়ী, অতি পুরাতন,  
 বেষ্টিত বিটপীবৃন্দে তৃণ গুল্ম দলে !  
 মধ্যস্থলে জীর্ণতম একটি প্রাসাদ  
 ভগ্ন স্থানে স্থানে, ভগ্ন প্রাচীর উপরে  
 ক্ষুদ্র বটবৃক্ষ, কোথা কণ্টকিত তরু  
 উঠিয়াছে, সে নির্জন বৃহৎ প্রাঙ্গণে  
 দীর্ঘ মহীকূহ গুলি শাখা প্রশাখায়  
 আলিঙ্গিয়া পরম্পরে ঘন আবরণে  
 ঢাকিয়াছে এ প্রাসাদ, তপনের কর  
 প্রবেশিতে নাহি স্থান—দিবসে আধার !  
 এ ভগ্ন প্রাসাদ রম্য হেরিলে নয়নে  
 বোধ হয় কোন কালে অধীশ্বর তার  
 ছিল অর্ধশালী, আজি অদৃষ্টের দোষে  
 পড়িয়াছে দারিদ্র্যের নিভৃত কন্দরে ।  
 প্রাসাদের পূর্বদিকে জীর্ণ সরোবর  
 বেষ্টিত জলজ তৃণে, তিন দিকে তার  
 অসংখ্য পনস বৃক্ষ দৃঢ় আলিঙ্গনে  
 চির বক্স, অস্ত্র ভীরে একটি প্রাসাদ  
 পুরাতন, ভগ্ন প্রায় ; ক্ষুদ্র কক্ষে তার  
 একটি মানব মূর্তি পর্য্যটকের পরে  
 সমাসীন, পাশ্বে একে একটি বোতল  
 সুরাপূর্ণ ; কিছু দূরে একটি বালিকা  
 পাড়াইয়া, রূপে তার কক আনোড়িত

যুহুভে' সে নরায়ণ ঢালিল মদিরা  
 এক পাত্রে, হির নেত্রে হেরি কিছুক্ষণ  
 সেই পাত্র, নরায়ণ পিইল নীরবে ।  
 আবার ঢালিল সুরা, আবার পিইল ।  
 পাপিষ্ঠের পাপ হৃদে থাকিয়া থাকিয়া  
 প্রেমের তরঙ্গ কত উঠিল পড়িল ।  
 পাষণ্ড কামাক্ষ প্রাণে কহিতে লাগিল  
 “হিরণ, দাঁড়িয়ে কেন ? এস এ হৃদয়ে,  
 প্রাণের আরাধ্য তুমি, সংসার মরুতে  
 তুমি মোর একমাত্র সুখ-নিব' রিণী ।  
 এস প্রাণময়ি, তুমি এস হৃদি মাঝে  
 আমি ত তোমারি প্রিয়ে, কেন তুমি দূরে ?  
 তোমার বিরহে আমি কত যে যন্ত্রণা  
 ভুগিতেছি, কেন তুমি কাঁদাইছ মোরে ?  
 এস প্রিয়ে, এ হৃদয়ে এস একবার,  
 তাপিত জীবন মোর কর হৃদয়তল  
 হাসিমুখে, এই দেখ হৃদয়ে আমার  
 প্রাণের চিতা প্রায় কামের অনল  
 জ্বলিতেছে অবিরত নিভাও এখনি  
 এ অনল, অস্ত্রধা এ হৃদয় আমার  
 হবে দহীভূত প্রিয়ে জনমের মত !”  
 পাষণ্ড আবার সেই মদিরা ঢালিয়া  
 নিরখিল কিছুক্ষণ, হৃদয়ের মাঝে  
 কত কথা, কত ভাব উদিল তাহার ।  
 মদিরা জড়িত কণ্ঠে কহিতে লাগিল  
 নরায়ণ “সুরাদেবি, প্রাণমি তোমায়ে  
 প্রেমের তরঙ্গী তুমি, তোমারি সাহসে  
 করিব প্রেমের পূজা, লইব হৃদয়ে  
 হিরণ-প্রেমের গুল্মে, জাগিব আনন্দে  
 তোমারি সাহায্যে আমি প্রেমের সাগরে ।

পিইল সে সুরা মূর্খ, ঢালিল আবার  
মুহূর্ত্তে কে ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল  
“আসিলে না ?—প্রাণময়ি আসিলে না হৃদে  
একবার ? কেন তুমি নিষ্ঠুর এমন ?  
এ’স প্রাণ, একবার এ’স এ হৃদয়ে।”  
মুহূর্ত্তে পাষণ্ড চাহি হিরণের পানে  
মদিরা জড়িতকণ্ঠে ঢুলিয়া ঢুলিয়া  
ধরিল প্রেমের গান কামাক্স হৃদয়ে।  
পাষণ্ডের হস্ত হ’তে মদিরার পাত্র  
প’ড়ে গেল শয়া। পরে, তখনি আবার  
ঢালিয়া মদিরা পাপী, সেবিল আনন্দে  
সেই পাত্র, হাসিমুখে ডাকিল আবার  
হিরণেরে ; অভাগিনী ঘৃণার নয়নে  
চাহিলা পাষণ্ড পানে, সে দৃষ্টির অর্থ  
কেমনে বুঝিবে পাপী ? সে দৃষ্টির অর্থ  
“রে কামাক্স নরাদম যাও রসাতলে।”  
ক্রমেই কামের নেশা বাড়িতে লাগিল  
পাষণ্ডের ; নরাদম উঠিয়া তখন  
ধরিল সে ছুঃখিনীরে, মুহূর্ত্তে বালিকা  
দাঁড়াইলা দূরে সরি, অরিল হৃদয়ে  
বিপদ ভঞ্জে, হায় রক্ষিতে তাহারে  
এ বিপদে নরাকৃতি শার্দূলের আসে।  
আবার পাষণ্ড যে’য়ে ধরিল তাহারে,  
আবার সরিলা বালা, মহা ক্রোধ ভরে  
কহিল পাষণ্ড “তুই চিনিস্ আমারে ?  
আমি সেই আদিনা বেগ, তুই কোন্ ছার  
দিল্লীর সজাট যার কপার তিথারী  
তার গ্রাস হ’তে তুই বাঁচিবি কেমনে ?  
পিতা তোর বালানাথ কি সাধ্য তাহার  
উদ্ধারিবে তোরে আজি আমার কবলে ?”

আবার পাষণ্ড যে’য়ে ধরিল সজোরে  
ছুঃখিনীরে, এইবার লইল টানিয়া  
হৃদয়ে, মুহূর্ত্তে পাপী পড়িল ভূতলে  
চীৎকারিয়া, রক্ত স্রোতে ডালিল ধরনী ;  
হিরণ ক্রোধাক্স হৃদে স্তম্ভীক্স ছুরিকা  
আঘাতিল। কিন্তু বেগে হৃদয়ে তাহার  
পুনর্ব্বার ; নরাদম গৌগাতে লাগিল  
ভূ-পৃষ্ঠে, শোণিত-স্রোত চলিল বহিয়া  
ভীর বেগে ; হিরণের যুগল নয়নে  
অরিতে লাগিল যেন অগ্নি রাশি রাশি।  
অদূরে কপাণ হস্তে দাঁড়ায়ে ছুঃখিনী  
বক্রগ্রীবা কেশগুচ্ছ নিতম্বের পরে  
পড়িয়াছে এলাইয়া, বিছাভের মত  
তেজোদীপ্ত মুখখানি নীরদ কুন্তলে।  
ক্রোধ বিকম্পিত স্বরে বসিতে লাগিলা  
হিরণ “প্রেমের তুষা মি’টেছে পাষণ্ড ?  
হরিতে সতীক্স মম যে ঘোর যন্ত্রণা  
দিয়াছিস্ ? ভগবান সহিবে কেমনে  
রে দুঃখতি, ধিক্ তোর এ পাপ জীবনে,  
সতী আমি, হায় তুই কত যে লাঞ্ছনা  
দিয়াছিস, প্রতিশোধ পাইলি তাহার  
নরাদম, জানিস্ নে আর্ন্তের নিশ্বাসে  
বিধাতার সিংহাসন কাঁপে টলমল।”  
কীণস্বরে গৌগাইয়া কহিল আদিনা  
“পাপীয়সি, কেন তুই আমার সম্মুখে ?  
দূর হ’ দূর হ’” পাশ ফিরিয়া পাষণ্ড  
মুহূর্ত্তে সুরার পাত্র মারিলা নিক্ষেপি  
বালিকারে, প্রাসাদের প্রাচীরে লাগিয়া  
ধগ ধগ হ’য়ে ভূমে পড়িল তাজিয়া  
সেই পাত্র, অভাগিনী কহিলা গর্জিয়া

“যথা ধর্ম তথা জয়,” এ সত্য সহজ  
জানিস নে নরোধম ? কেন এ’নেছিলি  
কাল সর্প ? আজি যার কঠোর দংশনে  
মরিলি বর্ষর— বাক্য না হইতে শেষ  
পার্বস্থিত কক্ষ হ’তে একটি রমণী  
বাহিরিয়া, বাস্ত ভাবে কহিল। গর্জিয়া  
“কি দেখিস ? ছি ছি তুমি এখনো রে’খেছ  
নরোধমে ?” ক্রিষ্ট বেগে কাড়িয়া ছুরিকা  
বসাইলা আদিনার কঁকের উপরে।  
গৌ গৌ রবে হতভাগা লুটিতে লাগিল  
ধরাপৃষ্ঠে, রক্ত স্রোত চলিল বহিয়া  
কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিলা অভাগী  
সেই দৃষ্ট, কি ভাবিয়া হাসিলা তখনি ।  
মুহূর্ত্তেকে গেলা বামা ঘরের বাহিরে,  
দেখিলা গভীরা নিশি, নীরব প্রকৃতি ;  
নীরব নগরবাসী, শুধু মাঝে মাঝে  
ভাসিছে গগনে দূরে সারমেয়-রব ।  
অমনি আবার বামা চক্ষুর নিমিষে  
প্রবেশিয়া গৃহমাঝে কহিতে লাগিল।  
“এস দিদি হু’ও জন ধরাধরি ক’রে  
কেলি গে পাষণ্ডে এই অন্ধ কূপ মাঝে  
বাটীর পশ্চাতে আত্ম কানন ভিতরে ;  
অন্তথা দিবসে কেহ দেখিলে ইহারে  
বিষম বিপদ দিদি ঘটিবে নিশ্চয়।”  
হু’ও জন অভাগারে ধরাধরি করে  
নিকেপিয়া সেই অন্ধ কূপের মাঝারে ;  
উভয়ে রক্তাক্ত কর করি প্রকালিত  
মুহূর্ত্তেকে, প্রবেশিলা কঁকের ভিতরে।  
অন্ত গেলা নিশানাথ, গগনমণ্ডল

আবরিল মেঘজালে, শপ্ শপ্ করি  
বহিল ভীষণ বাত্যা। আলোড়ি ভুবন ।  
রুধিরাক্ত শব্দা দৌছে ধুইলা যতনে  
সেই দণ্ডে, প্রকালিয়া বসন আসন  
শুইলা হৃদয়ে এক পর্য্যাক্ষের পরে ।  
জিজ্ঞাসিলা আত্মমনে হিরণ হুঃখিনী  
“আত্ম দিদি, ব’লেছিলি বধিলে পাষণ্ডে,  
বলিবি কি জন্ত এত করিলি সাহায্য  
অভাগীর, যেই কষ্টে রক্ষিলি আমারে  
পাষণ্ডের গ্রাস হ’তে, মরিলে সে কথা  
পদধূলি নিতে তোর, ইচ্ছা হয় মনে,  
তোরি করুণার বলে আজিও হুঃখিনী  
রক্ষিতে সক্ষমা দিদি ধর্ম আপনার ।  
কও দিদি, কেন এই দেবরে তোমার  
বধিলে, রক্ষিতে এই হুঃখিনী রমণী ?”  
হিরণ।” কহিলা হাসি বিবি আত্মমন  
“কে বলে তোমার জন্ত ব’ধেছি পাষণ্ডে ?  
যে ভীষণ চিতা দিদি হৃদয়ে আমার  
জলিতেছে দিবা নিশি, এ জনমে আর  
হবে না নির্বাণ তাহা, হৃদয় বিদরে  
বলিতে সে কথা পাপী সম্পত্তির লোভে  
বধিল \* স্বামীরে মোর তীব্র হলাহলে ।  
মৃত্যুকালে স্বামী মোর হস্ত ধরে দিদি  
বলেছিল। ম্লানমুখে “চলিলাম প্রিয়ে,  
যে পাপিষ্ঠ অর্থলোভে বধিল আমারে  
অবশ্যই জগদীশ প্রদানিবে তারে  
প্রতিফল, অব্যাহতি পাবেনা নিশ্চয়।”  
তার সে কাতর দৃষ্টি অক্ষ পূর্ণ আঁখি  
আজিও ভাসিছে চক্ষ, কথাগুলি তার

\* আদিনা বেলেগ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

বজ্রধ্বনি প্রায় মোর বাজিছে অবশে।  
সেই দিন এ প্রতিজ্ঞা করেছিলাম মনে  
স্বামীহত্যা আদিনার তরল শোণিতে  
নিবাইব সে অনল, পূর্ণ সে বাসনা,  
স্বামী হত্যা প্রতিশোধ নিম্ন এত দিনে।  
জীবনের মায়া আর নাহি দিদি মোর,  
বিধবার এ জগতে বাঁচিয়া কি কল ?  
ইচ্ছা মোর একবার মক্কা মদিনার  
তীর্থে যে'য়ে জুড়াইতে প্রাণের অনল।  
আর এক কথা দিদি জিজ্ঞাসি তোমারে  
লুকাবে না, সত্য সত্য বল মোর কাছে,  
কেমনে আদিনাবেগ মহারাষ্ট্র হ'তে  
আনিল তোমারে হেথা ? দিল নাকি বাধা  
জনক জননী তব মুহূর্তের তরে  
হরিল তোমারে যবে কামুক ছন্দতি ?”  
“সে অনেক কথা দিদি” কহিল হিরণ  
“কি হবে শুনিলে তাহা ? আমি অভাগিনী  
শৈশবেই মাতৃহীনা ; মাতৃ অনুরোধে  
পিতা মোর দিয়াছিল যোগাশ্রমে মোরে  
শৈশবেই মহারাষ্ট্র গুরুর নিকটে।  
সেই স্থানে মা তৈরবী ব্রহ্মচর্য্য ব্রত  
শিক্ষা দিত মোরে, আমি পূজার কুসুম  
তুলিয়া দিতাম তারে পালা মত দিদি।  
আমরা চারটি শিশু ছিলাম সে আশ্রমে।  
কিছুদিন হল দিদি সবে মিলি মোরা  
মহারাষ্ট্র গুরু আর মা তৈরবী সনে  
দিল্লী আশ্রা বিক্যাচল নানা তীর্থ আমি  
এসেছিলাম রায়ের সে পঞ্চবটী বনে।  
এমন সুন্দর স্থান জীবনে আমার  
দেখিনি কখনো দিদি, গোদাবরী তীরে

মুনিজন-মনোলোভা এ বন নির্জন  
দণ্ডক অরণ্য নামে—শান্তি-নিকেতন।  
পর পারে মনোহর নাসিক নগরী,  
কত অট্টালিকা কত দেবতা মন্দির  
শ্রেণীমত শোভে এই নাসিক নগরে,  
কোথা বা কৃষ্ণের মূর্তি, কোথা রাম সীতা  
স্থাপিত সুন্দর সেই মন্দির ভিতরে।  
এ পারে নাসিক, আর ও পারে পবিত্র  
পঞ্চবটী, মাক খানে গোদাবরী দিদি  
কি সুন্দর কল তানে যাইছে বহিয়া  
অবিরাম ; এই স্থানে রঘুকুল রবি  
রামচন্দ্র নির্মাইয়া কুজ পর্ণগৃহ  
বাসিতেন শ্রীতিময়ী সীতা দেবী সনে।  
আজিও সে মনোহর যুগল মূর্তি  
স্থাপিত এখানে এক মন্দিরের মাঝে।  
নিরখি এ শোভাময় নয়ন-রঞ্জন  
পরম পবিত্র তীর্থ ; গিয়াছিলাম দিদি  
নিরখিতে তপোবন, কি শোভা সেখানে,  
পাঁচটি বৃহৎ বট বিস্তারিয়া বাহ  
শোভিতেছে ছত্রাকারে, নিরে ছায়া তলে  
এখনো সন্ন্যাসী কত রচিয়া কুটির  
নিবসিছে, বন-বৃক্ষ বেষ্টিয়া সে ভূমি  
শোভিতেছে, চারিদিকে প্রাচীরের মত।  
এই স্থানে, এ নির্জন তাপস আশ্রমে  
কাটাইলাম কতদিন ; তার পরে দিদি  
একদিন, অনুরোধে জ্যোৎস্নার আমি  
গিয়াছিলাম কিছুদূরে কুটির ত্যাগিয়া  
সন্ধ্যে তার, কি যে শোভা দেখিলাম তখন  
তুলিব না আমি তাহা মানব জীবনে।  
অদূরে চিত্রের মত আকাশের পটে

শোভিতেছে আরাবলী নয়নরঞ্জন।  
 অন্ত দিকে গোদাবরী কি মধুর রবে  
 শিলা হ'তে শিলাস্তরে বাইছে ছুটিয়া।  
 স্থানে স্থানে মনোহর ক্ষুদ্র প্রস্রবণ  
 করিতেছে পুষ্পযুটি, জ্যোৎস্না তখন  
 গেলা চলি স্নান আশে একটি নিরঞ্জে।  
 আমি অজাগিনী দিদি নিরখি' নয়নে  
 প্রকৃতির এ সৌন্দর্য্য, বিমুগ্ধ হৃদয়ে  
 অগ্রসরি, বন-পথে, তুলিতে লাগিছু  
 বন ফুল, হায় দিদি স্মৃতিতে সে কথা  
 এখনো শিহরে যদি, মৃত্যুস্তের মাঝে  
 বাধি হস্তপদ মম, তুলি শিবিকায়  
 হরিল আমারে এই পাবণ শঙ্কর।  
 তারপর ? -- তারপর অদৃষ্টে আমার  
 যে লাঞ্ছনা সকলি তা' জান তুমি দিদি,  
 হেনকালে কাঁপাউয়া সে গৃহ প্রাঙ্গণ  
 ভীমনাদে, প্রবেশিল দম্ভা একদল  
 গৃহ মাঝে, ভীরবেগে ধরিল যাইয়া  
 হিরণে, হুঃখিনী হায় সজ্জাসিত হৃদে  
 মূচ্ছিয়া পড়িল। ভূমে, বিবি আছোমন  
 একদৃষ্টে দম্ভাগণে করি নিরীকণ  
 কহিলা, "শঙ্কর ছি ছি তব এই কাজ ?  
 দম্ভাবেশে প্রবেশিয়া আমারি ভবনে  
 আজি এই অসহায়া হুঃখিনী বালারে  
 করিতেছ উৎপীড়িত, নিশ্চয় জানিও  
 এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'বে কালি প্রাতে।  
 নরকের কীট তুমি, সন্ধ্যা পালে রক্ত,  
 ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পুণ্য বুঝিবে কেমনে ?  
 যদি চাও, তবে ছোঁড়ে দেও ও'রে  
 দণ্ডিত হ'বে কালি রাজদ্বারে ;"

উপেক্ষার হাসি হে'লে কহিল পাবণ  
 "সে ভয় দেখাও কেন ? থাকে যদি সাধা  
 দিও দণ্ড ; ভেবে দেখ আপনার মনে  
 এ বালিকা কে তোমার ? কেন বৃথা তুমি  
 আপনার অমঙ্গল আনিছ ডাকিয়া ?  
 তোমাদের বড়বড় সব জানি আমি,  
 তোমরা কি দোষী নহ ? শুধু দোষী আমি ?  
 নারী হ'য়ে কি সাহসে বধিলে তোমরা  
 আদিনারে ? রাজদ্বারে হবে না দণ্ডিত ?  
 পরের লাগিয়া তুমি কেন দেও বাঁপ  
 অগ্নিকুণ্ডে ? বিশেষতঃ স্বজাতি তোমার  
 নহে এ বালিকা, কেন অযথা বিবাদ  
 বাঁধাইছ ? পরিণামে তব অমঙ্গল,  
 আদিনার প্রিয়বন্ধু দিলীপের জন্ত  
 এনেছি হরণ ক'রে এই বালিকাবে।  
 কেননা সৌন্দর্য্য এর নিরখি দিলীপ  
 হয়েছিল আত্মহারা লভিতে ইহারে।  
 গোপনে আদিনা বেগ বলেছিল মোরে  
 একদিন উপভোগ করিয়া ইহারে  
 দিলীপের হস্তে এরে দিবে সে সঁপিয়া।  
 তাই আমি এনে এরে পঞ্চবটী হতে  
 রেখেছি তব কাছে, সে ত গেছে ম'রে  
 তোমাদের বড়বড় আজি আমি এরে  
 দিলীপের হস্তে নিয়া দিব সমর্পিয়া।"  
 কোথাক কণিনী প্রায় উঠিল। পড়িয়া  
 আছোমন "কি বলিলি পাবণ বকর  
 কুহর অধম ? মোদের মমতী আমি  
 আমার এ গৃহ হ'তে নিয়ে বাধি কুই  
 এ দোষী নারীকে সেই লম্পটের হস্তে  
 সমর্পিত, পারবি মে রে বৃথ অধম।"

যতক্ষণ আশ্রয়ন থাকিবে জীবিত ।  
 হ'ক না সে অশ্রুজাতি কি কতি ডাহাতে ?  
 আমি নারী, সেও নারী, নারী হ'য়ে মৃত  
 নারীর এ অপমান কে পারে সহিতে ?  
 “না পার গোলায় যাও” বলিয়া পাখও  
 আঘাতিল তীক্ষ্ণ অসি হুঃখিনীর শিরে ।  
 মুহূর্ত্তেকে ছিন্ন মূণ পড়িল তাহার  
 ধরাভলে, রক্ত স্রোতে ভে'সে গেল গেহ ;

নিরখি এ শোচনীয় দৃশ্য হুঃখিনীর  
 “দিদি দিদি” বলে বেগে ধরিল। যাইয়া  
 হিরণ সে মৃত দেহ, কাঁদিতে লাগিল।  
 উচ্চৈঃস্বরে হুঃখিনীর বক্ষদেশে পড়ি ।  
 মুহূর্ত্তে শব্দ পুনঃ ধরিয়া হিরণে  
 দৃঢ় করে' ক্রতপদে করিল। প্রস্থান  
 নীরব নিশীথে সেই আগ্রার বাহিরে ।

— — —



## সপ্তম সর্গ

[ আশ্রয় নিকট বন ভূমি ; একটি পুরাতন বাড়ী ]

গভীর নির্জন বন ; নাহি লোকালয়,  
অমেঘ এখানে কেহ আসেনা কখন ।  
মানাবিধ বৃক্ষগুলি শাখা প্রশাখায়  
আলিঙ্গিয়া পরস্পর এ নির্জন বনে  
পলে পলে ভীষণতা করিছে বর্জন ।  
নাহি শব্দ, পশু পাখী গভীর নীরব,  
নাহি মানবের চিহ্ন এ ঘোর কাননে ।  
একটি সরল পথ ভেদি এ কানন  
চলিয়া গিয়াছে দূরে আগরার দিকে,  
হুই ধারে অতি ঘন নিবিড় কানন ।

সন্ধ্যা সমাগত ; সূর্য তিল তিল করি  
ভুবিতেছে, অন্ধকার আসিছে ঘনায়ে  
ক্রমে ক্রমে এ নিবিড় নির্জন কাননে ।  
একজন অনারোহী বীরেন্দ্র যুবক  
মুসজ্জিত যোদ্ধাবেশে ছুটিয়াছে বেগে  
বিছাতের মত এই নিবিড় কাননে ।  
সহসা অদূরে এক বামা কণ্ঠ ধ্বনি  
তুলিলা যুবক, যেন উৎপীড়িত হ'য়ে  
কঁাদিতেছে কেহ এই নির্জন কাননে ।  
যুবক বিম্বিত হৃদে থামাইয়া অশ্রু  
নীরবে পাতিলা কর্ণ, দেখিলা চাহিয়া  
পশি পাশে' ভয় প্রায় একটি মন্দির  
পুরাতন, কিছু দূরে পশ্চাতে তাহার  
অতি জীর্ণ পুরাতন ভয় বাড়ী এক  
বেষ্টিত বনজ বৃক্ষে ; পূর্বের গৌরব  
অস্তহিত চিরতরে অদৃষ্টের দোষে ।

যুবক একাএ চিন্তে তুলিলা নীরবে  
বামার রোদন ধ্বনি সেই দিক হ'তে  
আসিতেছে, এক লক্ষ্যে নামিয়া ভূতলে  
উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে পশিলা তখনি,  
বাটীর ভিতরে, বুঝা দেখিলা চাহিয়া  
একজন আততায়ী দম্ভ নরাধম  
অকুটন্ত পুষ্প প্রায় এক বালিকারে  
ধরিয়া সজোরে, তার সতীত্ব-রতন  
হুষ্টিতে উদ্ধত, ভয়ে কম্পিত হৃদয়ে  
অসহায় মৃতপ্রায় হুঃখিনী বালিকা  
ভীষণ দম্ভার হস্তে পড়িয়া আতঙ্কে  
করিতেছে ছটফট কঁাদিছে চিৎকারি  
শ্রিয়। সে দীনবন্ধু বিপদভঞ্জে ।  
আপনার শক্তিরশি করি একত্রিত  
অভাগিনী, বহু চেষ্টা করিছে সজোরে  
ছুটিতে দম্ভার হস্তে, কিন্তু নরাধম  
পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিছে তাহারে ।  
যুবারে সম্মুখে হেরি সহসা পাষণ্ড  
এক লক্ষ্যে আঘাতিলা মস্তকে তাহার  
ভীক্ৰ অসি, অপ্রস্তুত বীরেন্দ্র যুবক  
মুহূর্তে পশ্চাতে হটি অদ্ভুত কোশলে  
নিবারিলা সে আঘাত, চক্কর নিমিষে  
ক্রোধাক্ত হৃদয়ে তারে কহিলা গর্জিয়া  
“দিলীপ চি'নেছি তোরে, আজি তোর শেষ ;  
অসহায় হিরণ্যেরে পে'য়ে একাকিনী,  
যে ভীষণ অত্যাচার করিসি পামর  
তার প্রতিফল তুই পাইবি এখন ।”

দিলীপ তেমনি ভাবে কহিল গঞ্জিয়া  
 “তুই কেন এসেছিস আমার এ গৃহে  
 নরাদম ? হিন্দুবেশে ছিলি যোগাশ্রমে  
 নিজ নাম লুকাইয়া অমরেন্দ্র নামে ।  
 আতীর্থী যে নাম তোর, তাও ত’ জেনেছি,  
 মুসলমান হ’য়ে তুই হিন্দু বালিকারে  
 ভুলাইয়া প্রেমপ্রার্থী হয়েছিলি কেন ?  
 কে তোর হিরণ বালা ? সে যে হিন্দু কস্তা  
 তার জন্ত কেন তুই এমন পাগল ?”  
 “চুপ থাক্ নরাকৃতি কামুক কুকুর”  
 কহিল আতীর্থী। “আমি ব্যভিচারী নহি  
 তোর মত পাপি, তুই শঙ্করের বেশে  
 অমৃত সাগরে যে’য়ে কি ঘোর কুকাণ্ড  
 করেছিলি, সে কথা কি মনে আছে তোর ?”  
 এতেক বলিয়া বীর স্মৃতিশ্রু কৃপাণ  
 মারিল। দিলীপ শিরে, চক্ষের নিমিষে  
 নরাদম এক লক্ষ্যে সরিয়া দাঁড়া’ল  
 কিছু দূরে, কিন্তু অসি বিছাত গতিতে  
 বিঁধিল মস্তকে তার,—পলাইল পাণী ।

বালিকার পানে চে’য়ে কহিল আতীর্থী।  
 বহুদিন পরে আজি দেখা তব সনে  
 “হিরণ, আমার কথা পড়ে কিছু মনে ?”  
 যোগাশ্রমে যবে মোরা সন্ন্যাসীর কাছে  
 শিষ্য-শিষ্যাদের সনে ছিলাম আনন্দে  
 কুল তুলে মালা গাঁথে যাপিতাম দিন ;  
 কভু বনে—কভু সেই সমুদ্র-সৈকতে  
 বেড়াতেম ; কভু উঠি’ মলয় পর্বতে  
 প্রকৃতির চারু শোভা হেরিতাম প্রিয়ে ?  
 তুমিও আমার সনে ভ্রমিয়া সতত ।

যাপিয়াছ কত দিন, কত আলাপনে।  
 মধুর সায়াহ্ন কালে সমুদ্রের তীরে  
 দাঁড়াইয়া দেখিতাম রক্তিম তপন  
 ডুবিত সে সিন্ধু গর্ভে কত মনোহর  
 ছড়াইয়া স্বর্ণ কর,—সাগরের জল  
 উঠিত বলিয়া সেই সোনালী কিরণে ।  
 সন্ন্যাসীর কাছে সদা শাস্ত্র অধ্যয়ন  
 করিতাম, শিখিতাম সমর কৌশল  
 রণ-নীতি, নানারূপ অস্ত্র সঞ্চালন ।  
 এক ছই করি হায় অতীতের গর্ভে  
 কত মাস, কত বর্ষ গিয়াছিল চলি  
 এই ভাবে, তার পর ক্রমে ক্রমে মোরা  
 যৌবন-সীমায় যবে উত্তরিষু আসি,  
 অজ্ঞাতে বাসিলে ভাল, আমিও বাসিষু ;  
 সেই হ’তে ছ’ও জন বিপদে সম্পদে  
 প্রাণে প্রাণে মিশে গেলু, দৌড়েই দৌড়ারে  
 না দেখিলে এক পল-দিবসে আধার  
 দেখিতাম, কি যে কষ্ট হইত এ প্রাণে  
 ভাবিলে তা’ স্বপ্ন ব’লে বোধ হয় মনে ।”

“বড়ই চিন্তিত আমি ছিষু এত দিন  
 তব লাগি, একটুকু শান্তি লাভিবারে  
 পারিনি কখনো আমি অশনে বসনে ।  
 বহু পুণ্য ফলে আজি জ্যোৎস্নার সনে  
 হয়েছিল দেখা মোর প্রত্যাত সময়ে  
 যমুনা তটিনী-তীরে, সে মোরে তখন  
 ভালবাসা দেখাইয়া কত প্রেমালাপ  
 করেছিল, বলেছিল “দিলীপের সনে  
 হিরণ মজেছে প্রেমে, কেন তার লাগি  
 আপন অনিষ্ট তুমি করিছ সাধন ?

ভুলে যাও তারে, সেত ভুলেছে তোমারে,  
 কেন আর তার আশা করিছ এখন ?  
 এ'স মোর। ধর্ম মতে বিবাহ-বন্ধনে  
 বদ্ধ হ'য়ে, বিধাতার এ বিশ্ব সংসারে  
 বাপিগে মোদের এই মুখের জীবন ।”  
 কিন্তু আমি তার বাক্যে হলে অসম্মত  
 সে আমারে মহাক্রোধে গর্জিয়া তখন  
 বলেছিল “প্রত্যাখ্যান করিলে আমারে  
 যার লাগি, দেখ যোঁয়ে আগ্রার বাহিরে  
 বন মাঝে পুরাতন একটি মন্দিরে  
 তব সে হিরণ সতী শোভিছে কেমন  
 পদ প্রায় দিলীপের বন্ধের উপরে ।  
 সার্থক করগে দেখে নয়ন তোমার  
 তব সে প্রাণের ধনে দিলীপের বৃকে ।  
 ঘৃণা লাজে এ হৃদয় উঠেছিল জ্বলি,  
 পুরুষ হইলে আমি তখনি তাহারে  
 বধিয়া প্রাণের জ্বালা নিভাতেম প্রিয়ে ।  
 জ্যোৎস্না রমণী বলে কমেছিল তারে ।  
 অগত্যা রাগের বশে তুরঙ্গ লইয়া  
 ছুটিবু বিছাৎ বেগে সমস্ত দিবস  
 তর তর ক'রে আমি এ বন প্রদেশে  
 খুঁজিয়াছি, এই মাত্র তব আর্তনাদে  
 প্রবেশিয়া এ মন্দিরে পেয়েছি তোমারে ।”  
 হুঃখিনী হিরণবালা আতর্ধীর পানে  
 চাহিয়া জড়িত কণ্ঠে কহিলা তখন  
 “অমর” মুখের কথা মুখেই রহিল  
 নীরবে হুঃখিনী হায় পড়িলা চলিয়া  
 যুবকের পদপ্রান্তে, সাবরে যুবক  
 তুলিয়া লইলা বন্ধ, সজল নয়নে  
 রহিলা চাহিয়া বালা যুবকের পানে ।

উভয়েই আশ্চর্য, মাতোয়ারা প্রেমে  
 উভয়ের প্রাণ যেন সংসার ছাড়িয়া  
 চলিয়া গিয়াছে কোথা—প্রসূর মুরতি !  
 লভি সংজ্ঞা, ক্ষণ পরে কহিলা হিরণ  
 “তুমি না আসিলে মোর কোন্ দশা হ'ত ?  
 পাষণ্ড দিলীপ মোর ধর্ম নাশ করি  
 ডুবাইত চিরতরে কলঙ্ক-সাগরে ?  
 বিধাতা সহায়, তাই পাইয়াছি রক্ষা  
 পাষণ্ডের হস্ত হতে বহু পুণ্য ফলে ।”  
 কিছুকন পরে বালা কহিলা আবার  
 “অমর, জেনেছি আজ হিন্দু নও তুমি  
 আতর্ধী তোমার নাম,—তুমি মুসলমান ।  
 কেন তবে জানাওনি এ কথা আমারে ?”  
 হিরণের হস্ত ধরি কহিলা আতর্ধী  
 “সত্য কথা বলিতে কি ? তোমার নিকটে  
 লুকাবনা কোন কথা—মুসলমান আমি ।  
 নৈশবে মাতুল সনে আজমীর নগরে  
 গিয়াছিলাম, সপ্তবর্ষ বয়স্কুম যবে ।  
 এক দিন অপরাহ্নে খেলিতে খেলিতে  
 গিয়াছিলাম গিরিঘূলে সঙ্গীদের সনে  
 ধরিতে পাখীর ছানা, অদৃষ্টের দোষে  
 সিংহ এক আক্রমণ করেছিল মোরে  
 বন মাঝে, সঙ্গী সব হেরি এ বিপদ  
 গিয়াছিল পলাইয়া, চীৎকারে আমার  
 মহারাষ্ট্র-গুরু এসে বিছাতের বেগে  
 বধিয়া সে পশুরাজে রকেছিল মোরে ।  
 অচেতন দেখ মোর, বধিয়া গুরুজী  
 নিয়াছিল বহুকষ্টে আশ্রমে তাহার ।  
 সেই স্থানে দীর্ঘকাল করিয়া চিকিৎসা,  
 আরোগ্যের পর মোরে গিয়াছিল নিরে

যোগাশ্রমে, সেই স্থানে তোমাদের সনে  
 থাকি বহুবর্ষ আমি করেছিহু শিক্ষা  
 অত্র বিজ্ঞা, মন্ত্র যুদ্ধ, স্মৃতি ও বিজ্ঞান।  
 মনে করে দেখ তুমি, যোগীদের পাকে  
 খাইনি কখনো আমি ছিহু যোগাশ্রমে  
 যতদিন, নিজ হস্তে করিয়া রন্ধন  
 করেছি আহাৰ আমি, শুধু ফল মূল  
 লুচি পুরী খাইয়াছি তাহাদের হাতে।  
 তা ছাড়া গুহার মাঝে নিভূতে নির্জনে  
 নমাজ পড়েছি আমি, তুমি দেখে তাহা  
 বুঝিতে পারনি কিছু, অবাক হইয়া  
 দাঁড়ায়ে দেখেছ শুধু; একদিন মোরে  
 জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, বলেছিহু আমি  
 সে সময় বুঝিবে না, করিতেছি পূজা  
 নূতন পদ্ধতি মত—বল'না কাহারে।  
 সে কথা কি মনে আছে? আমি মুসলমান  
 তাই নিজ ধর্ম আমি করেছি পালন  
 আমার গুহার মাঝে গোপনে গোপনে।  
 আজি আমি সব কথা বলিহু তোমারে  
 ইচ্ছা হয় ভালবাস কিংবা নাহি বাস  
 যা ইচ্ছে তোমার, তুমি পার তা করিতে।”  
 হিরণ সজল নেত্রে কহিলা তাহারে  
 “যে জাতি হওন। তুমি ক্ষতি কি তাহাতে,  
 আমার এ ভালবাসা অটুট থাকিবে।  
 কেননা জাতিকে আমি ভালত বাসিনি?  
 আমি যে বেসেছি ভাল অমর তোমারে।  
 যতদিন এ জগতে থাকিব বাঁচিয়া  
 ‘অমর’ বলি আমি থাকিব তোমারে।  
 ‘আতর্থা’ ‘অবরে’ বল কি আছে প্রভেদ?  
 ইহাত লৌকিক নাম নবর জগতে।

মোদের উভয় আশ্রা হ'য়েছে মিলিত  
 পরস্পর, প্রেম বশে উভয়ের সনে,  
 ক্ষতি বৃদ্ধি কিছু নেই জাতি কিংবা নামে।”

আবার মুহূর্ত পরে কহিলা হিরণ  
 “অমর, আমার কথা ছিল কি স্মরণ?  
 যোগাশ্রম হতে তুমি আনিয়া আমারে  
 গিয়াছিলে রেখে সেই সুরাট নগরে।  
 তার পর এতদিন সংবাদ আমার  
 নেওনি কখনো তুমি মুহূর্তের তরে।  
 অভাগীর এ অদৃষ্টে কত বিড়ম্বনা  
 ঘটিয়াছে পদে পদে, কত যে লাঞ্ছনা  
 ভুগিয়াছি কত স্থানে বুঝিবে কি তুমি?”  
 “সবি সত্য” স্নেহ স্বরে কহিলা আতর্থা  
 “কি করিব? হতভাগ্য আমি অল্পপায়,  
 কত ঋণ কত বাত্যা গিয়াছে বহিয়া  
 আমার উপর দিয়া অদৃষ্টের দোষে।  
 অবস্থার স্রোতে পড়ি চলেছি ভাসিয়া  
 নানা স্থানে, পেশবার ঘোর অত্যাচারে  
 ব্যতিব্যস্ত; শাস্তি আমি নারিহু লভিতে।  
 আততায়ী দিলীপের পাশব আচারে  
 বিপ্র গৃহে এসেছিহু রাখিয়া তোমারে  
 সন্ন্যাসীর আশ্রামত; কিন্তু সে পাবণ  
 নানারূপ কুংসা মোর করিয়া রটনা  
 বলেছিল সদাশিবে, সন্ন্যাসী প্রবরে;  
 মোল্লের পক্ষে যেয়ে কৃত্যের প্রায়।  
 মারাঠা বিপকে আমি ধরিয়াছি অসি,  
 পেশবা সে কথা শুনে মহাক্রুদ্ধ হ'য়ে  
 বলেছিল। তাহাদের সমস্ত গৈরিন্দক  
 যে জন ধরিয়া দিতে পারিবে আমারে

বহু পুরস্কার তিনি দিবেন তাহারে ।  
সেই ভয়ে আমি আর সুরাট নগরে,  
যোগাঙ্গমে, অথবা সে পঞ্চবটী বনে  
বাইনি করিতে দেখা তব সনে প্রিয়ে ।”

“আর এক কথা আমি নারিহু বুঝিতে  
দিলীপ তোমারে হেথা আনিল কেমনে ?”  
হিরণ সমস্ত কথা জানাইল তারে  
যে ভাবে তাহারে দম্ভ্য সুরাট নগরে  
করেছিল আক্রমণ, যে ভাবে তাহারে  
রেখে এসেছিল বিগ্রহ সন্ন্যাসীর কাছে ।  
আবার শঙ্কর সেই পঞ্চবটী হতে  
যে ভাবে হরিয়া এনে রেখেছিল তারে  
কতেপুরে, তার পর গভীর নিশীতে  
যে ভাবে সে করেছিল হত্যা আদিনারে  
শুভীক্স ছুরিকাঘাতে, যে ভাবে শঙ্কর  
আবার আনিয়া তারে দিয়াছিল হেথা,  
দিলীপের হস্তে সঁপি, পাষণ্ড দিলীপ  
প্রত্যহ আসিয়া হেথা ক’রেছিল চেষ্টা  
হরিতে সতীত তার কত প্রলোভনে  
ভুলাইয়া কত ভাবে, হুঃখিনী হিরণ  
জানাইল সবি তারে একে একে একে ।

হেন কালে সাথে নিয়া পাষণ্ড শঙ্করে  
দিলীপ বিহ্যত বেগে পলিয়া সেখানে  
আক্রমিল আতর্ধারে, গঞ্জিয়া তৈরবে  
আতর্ধাও আক্রমিল। সেই দুই জনে ।  
যুঝিতে লাগিল তারা সিংহ পরাক্রমে  
কছু উঠি কছু বসি, যাত্ত প্রতিঘাতে  
অমল-সুনিদ গুলি পড়িল বরিয়া

মুহূর্হ, আতর্ধার তীক্ষ্ণ তরবার  
বিহ্যতের মত বলি চুছিল মুহূর্হে  
শঙ্কর দম্ভ্যর কন্ডে—পড়িল সে ভূমে ।  
দিলীপ তখনি ক্রোধে ‘হর হর’ বলি  
মারিল শুভীক্স অসি আতর্ধার শিরে ;  
আতর্ধাও লক্ষ দিয়া দাঁড়াইল। সরি,  
কিন্তু সেই লোলজিহ্বা অসি খরধার  
আতর্ধার বাহুয়ুগে করিল দংশন ।  
ঝলকে ঝগকে রক্ত ঝরিতে লাগিল  
সেই স্থানে—বীরবর ভীষণ বিক্রমে  
মারিল। শুভীক্স অসি দিলীপের শিরে ।  
ফলকে ঠেকিয়া অসি মুহূর্হের মাঝে  
চুছিল বাইয়া তার অবগের মূলে ;  
ছুটিল শোণিত স্রোতঃ—পড়িল ভূপৃষ্ঠে  
ছিন্ন কর্ণ, নরাধম পলাইল দ্রুত  
উর্দ্ধ্বাসে, মুহূর্হেকে সে কক্ষ ত্যজিয়া ।

অজস্র শোণিত পাতে শক্তিহীন হ’য়ে  
আতর্ধা পড়িল। ঢলি ধরণীর পরে  
সংজ্ঞাশূন্য ; দ্রুতবেগে হিরণ তখন  
বাহিরিয়া, বহু যত্নে আনিল তুলিয়া  
কতগুলি লতা গুল্ম, পেঁয়ি সে সকল  
আপনা অঞ্চল ছিঁড়ি বাঁধিলা যুবার  
কত স্থান, গৃহ কর্তী বৃদ্ধা এক এসে  
প্রদীপ আলিয়া দিল, শর্যা পে’তে দিতে  
কহিলা হিরণ তারে, মুহূর্হে সে বৃদ্ধা  
বিহান। পাতিয়া দিল, হুঃখিনী হিরণ  
আতর্ধারে বন্ধে করি রহিলা বঁসিয়া  
সেই স্থানে, বহুক্ষণ হইল অতীত  
এইভাবে, ধীরে ধীরে আহত যুবক



লভি সংজ্ঞা, অতি কষ্টে মেলিলা নয়ন ?  
 হিরণ অনেক কষ্টে ধরিয়া তাহাকে  
 নিয়ে গেল। ধীরে ধীরে শয্যার উপরে ।  
 আবার তখনি যুবা হইল। মুচ্ছিত।  
 হিরণ বৃদ্ধারে ডাকি কহিলা কাতরে  
 “মা আমার, তুমি ভিন্ন নাহি কেহ হেথা  
 হুঃখিনীর, স্বামী মোর সংজ্ঞাহীন এবে,  
 ভাল কোন বৈজ্ঞ মাগে। থাকিলে এখানে  
 ডেকে দেও, —পায়ে পড়ি আমি অভাগিনী ।”  
 স্নেহস্বরে বৃদ্ধা তারে কহিল তখন  
 “হেথা কোন বৈজ্ঞ নাই, মাত্র তিন ঘর  
 হুঃখী মোরা আছি হেথা, চিন্তা কি জননী  
 আমিও ঔষধ জানি, আজি রাত্রে তুমি  
 এ ঔষধ খেতে দেও, বিপদভঞ্জন  
 অবশ্যই রক্ষিবেন স্বামীরে তোমার ।”  
 যুহুর্ন্তে সে বৃদ্ধা এক ঔষধ আনিয়া  
 দিল হিরণের হস্তে, বিষাদে হুঃখিনী  
 সেবন করাল তাহা মুচ্ছিত যুবকে ।

যুবকের পদপ্রান্তে বসিয়া হিরণ  
 করিতে লাগিল বহু শুশ্রূষা তাহার ।  
 অভাগিনী ক্ষুণ্ণপ্রাণে ভাবিতে লাগিল।  
 “আজি এ বিপত্তিকালে না এলে অমর  
 কে হার রক্ষিত মোরে ? কত ভালবাসে  
 সে আমারে, কত স্থান খুঁজে খুঁজে আজি  
 আসিয়াছে এই স্থানে, না এলে নিশ্চয়  
 প্রাণ মোর—ততোধিক সতীত্ব-রতন  
 হইতে বিনষ্ট আজি পাষণ্ডের করে ।  
 আমারি কারণে হার অমর আমার  
 বিপন্ন, জীবন তার সঙ্কট-সাগরে ।

কি দিয়াছি আমি তারে ?—এ হৃদি সাআজ্ঞা  
 সে আমার প্রাণেশ্বর, আমি দাসী তার,  
 সেবিব চরণ তার জন্ম-জন্মান্তরে ।”  
 কে জানি হৃদয় মাঝে কহিল ডাকিয়া  
 “হা হুঃখিনী মহা ভুল করেছিস্ তুই  
 ভালবেসে, না ভাবিয়া দূর ভবিষ্যত  
 আপনার অমঙ্গল আনিলি ডাকিয়া ।  
 জানিসনে অভাগিনী এ বীর যুবক  
 বাঁচিবে না, নিকটেই মরণ তাহার ।”  
 বালিকার প্রাণখানি উঠিল কাঁপিয়া  
 ছরু ছরু, অভাগিনী সজল নয়নে  
 ভাবিতে লাগিল। “প্রভো, কি ক্ষতি তাহাতে ?  
 সুখের কামনা হার নাহি মম হৃদে,  
 এ জগতে সকলেই মৃত্যুর অধীন  
 আজি হ’ক কালি হ’ক মরিবে ত গবি,  
 তবে আর কোন্ ভয় ? মরিব বলিয়া  
 ভাল কি বাসিতে নাই ? এ কেমন নীতি  
 না বুঝি—আমি মূর্খ চাইনা বুঝিতে ;  
 আমি বুঝি সে আমার আরাধ্য দেবতা,  
 তারে ভালবেসে আমি সুখী মনে মনে,  
 সে ভাল বাসুক, কিংবা না বাসুক মোরে,  
 কি ক্ষতি আমার তাহে ? ভালবাসা মোর  
 কামনা কলুষ ছাড়া, জন্ম জন্মান্তরে  
 আমার এ ভালবাসা নহে যাইবার ।”  
 নীরবে নয়ন দুটি মুদিল। বালিকা,  
 দেখিলা হৃদয় তার গিয়াছে ভরিয়া  
 অমরের স্নিগ্ধরূপে, অন্তরে বাহিরে  
 তারি রূপ ভিন্ন আর নাহি কিছু তবে ।  
 অঙ্কিত সে মুখখানি আকাশে পাড়ালে  
 মর্ত্যভূমে—হৃদয়ের পরতে পরতে ।



নীরবে বসিয়া বাল্য আত্মার পাশে  
 সেবিতে লাগিল। তার চরণ হৃদয়  
 মুক্তপ্রাণে, নিশীথিনী চলিল বহিয়া  
 ধীরে ধীরে ধীরে মহাকালের সাগরে।  
 আত্মা। ঘুমের ঘোরে দেখিতে লাগিল।  
 ত্রিদিব হইতে এক দেবকন্ঠা আসি'  
 সেবিছে চরণ তার, সৌরভে সৌন্দর্য্যে  
 গৃহখানি আলোকিত, তাহারি লাগিয়া  
 একটি স্তব্ধ রথ রয়েছে সজ্জিত  
 দ্বারদেশে, দেবকন্ঠা বসি শয্যাপাশে  
 শুশ্রূষা করিছে তার কত না যতনে।  
 আত্মা। বিমুক্ত প্রাণে প্রসারি হৃ-কর

লইল হৃদয়ে তারে, সুধাইলা স্নেহে  
 “কে তুমি ?” “তোমার দাসী” উত্তরিল। বাল্য  
 ভেঙ্গে গেল স্বপ্ন তার, মেলিয়া নয়ন  
 দেখিল। হিরণ তার বকের উপরে।  
 অভাগা স্বপ্নের ঘোরে হিরণ বালারে  
 আপনার বক্ষদেশে নিয়েছে টানিয়া।  
 হিরণ মলিন মুখে ঈষৎ হেলিয়া  
 সপন্য যুগল হস্ত প্রসারিত করি  
 পুরীকন্ঠা প্রায় তার সেবিছে চরণ।  
 অদূরে অরণ্য-মাঝে বৃক্ষ চূড়ে বসি  
 কানন কুঁকুটগুলি গাইছে আনন্দে  
 বিধাতার গুণ-গাথা—প্রভাত-কীর্তন।

— — —

## অষ্টাদশ সর্গ

[ পানিপথের নিকটস্থ বনভূমি ]

সরস্বতী নদী-তীরে ; কালিকা মন্দির ।

নিবিড় নিষ্কর্ন বন ; সরস্বতী তীরে  
স্পন্দহীন, প্রস্তুতের তরুরাজি প্রায়  
অসংখ্য পিয়াল শাল তমাল বকুল  
শিরিষ চম্পক বক কদম্ব কেতকী  
দাড়িয়ে, অদূরে এক অশ্বখের মূলে  
অর্দ্ধভগ্ন, অতি জীর্ণ কালিকা-মন্দির  
পুরাতন, অভ্যস্তরে অতি ক্ষীণালোকে  
শোভিছে চামুণ্ড মূর্তি ভীষণ দর্শন ;  
পদতলে বিরূপাক্ষ, ডাকিনী যোগিনী  
তুই পার্শ্বে, পিয়িতেছে শোণিতের ধারা  
অজস্র, শোভিছে কণ্ঠে নরমুণ্ডমালা  
কদম্বের মালা যেন রঞ্জিত রুধিরে ।  
এক পার্শ্বে যোগীন্দ্রের পদযুগ পাশে  
দীর্ঘ জটাধারী এক তপস্বী প্রবর  
চিন্তা মগ্ন, উর্দ্ধ মুখ, অর্দ্ধ নিমিলিত  
নেত্র যুগ, শ্বেত শ্মশ্রু চূষিছে ধরণী ।  
সম্মুখে একটি খড়্গ বলিছে স্তম্ভর  
ক্ষীণালোকে, কাষ্ঠখণ্ড শোভিছে অদূরে  
সিন্দূর মণ্ডিত, সেই ভীম অস্ত্র পাশে ।  
অস্ত্র পার্শ্বে যুবা এক কন্দর্পের মত  
মনোহর, বামে তার দেবতা বাহিত  
একটি যুবতী মূর্তি অমৃতের খনি ।  
“বম্ বম্ হর হর” বলিয়া গম্ভীরে  
সন্ন্যাসী মেলিয়া আঁখি, মুহূর্তে অমনি  
“বম্ বম্ হর হর” বলিয়া গম্ভীরে

যুবক যুবতী, মরি উঠিল জাগিয়া  
প্রতিধ্বনি “হর হর” মুহূর্তের মাঝে  
কাননকালীর সেই নিষ্কর্ন মন্দিরে  
কাঁপাইয়া কাননের সে নৈশ প্রকৃতি ।  
“কি ইচ্ছা ?” গম্ভীর স্বরে কহিলা সন্ন্যাসী,  
কি ইচ্ছা রক্তজী তব ? উত্তরিলো যুবা,  
কি ইচ্ছা আমার দেব ? মায়ের আদেশ  
শিরোধার্য্য, মানবের ইচ্ছা কি আবার ?  
কুদ্রাদপি কুদ্র নর, তার ইচ্ছা ? দেব  
এ কেমন কথা ? নর কলের পুতুল  
যে দিকে চালাবে তারে, যাইবে সে দিকে ;  
ইচ্ছা বা অনিচ্ছা তার মিথ্যা কথা ভবে,  
নিয়তির তন্ত্রে সে যে বঁধা সর্ব্বক্ষণ ।  
বিলম্বে কি কাজ প্রভু ? এই নিম্ন অসি  
কাট্টন এ হস্ত মম, হাসিয়া আনন্দে  
দিবু উপহার মার চরণ-কমলে ।  
যখন ছিলাম শিশু আমরা উভয়  
জননীর অন্ত্রগ্রাহে জন্মভূমি কোড়ে  
হ’য়েছিমু সংবর্দ্ধিত, অদৃষ্ট-গগনে  
দিন দিন কাল মেঘ প্রসারিয়া কায়া  
তুলেছিল মহাঝড় ; সেই বড় বেগে  
যৌবনের প্রারম্ভেই গেলাম ভাসিয়া  
তুই দিকে তুইজন সংসার-সাগরে ।  
সেই দিন এ হৃদয় শত বজ্রাঘাতে  
কেটেছিল, ভেঙ্গেছিল জনমের তরে ।  
কত কষ্টে অনিচ্ছায় করিমু বিবাহ  
জান তুমি, নিশাকালে দেখিমু স্বপনে

জননী তৈরবী বেশে আদেশিলা মোরে  
 'যাও বাহা বিছ্যাচলে পুরিবে বাসনা।'  
 অমনি আগিহু দেব, হৃদয়ের মাঝে  
 কি এক ভীষণ বড় বহিল তখন,  
 হইলাম আত্মহারা, তুলিহু সংসার,  
 উন্নতের মত দেব কত স্থান ঘুরি  
 আসিহু এ বিছ্যাচলে, লভিহু আশ্রয়  
 আপনার চরণের স্নিগ্ধ ছায়াতলে।  
 কলিল মায়ের কথা,—অপন আমার ;  
 পাইলাম সেই রক্ত, অদৃষ্টের দোষে  
 হারিয়ে ছিলাম যাহা সংসার-সাগরে।  
 আবার লাগিল যোড়া এ ভগ্ন হৃদয়,  
 ভেঙ্গে ছিল যাহা দেব বজ্র-প্রহরণে।  
 এই স্থানে কত সুখে কাটিতাম দিন,  
 জান দেব, এই স্থানে লবঙ্গের সনে  
 মিশিল জীবন মম,—ছুট প্রেম-ধারা  
 মিশি এক সঙ্গে সদা চলিল বহিয়া।  
 একই উদ্দেশ্য, দেব, অনন্তের পানে।  
 তুলিহু বিগত চিত্র, হেরি বর্তমান  
 হইলাম আত্মহারা, আনন্দ সাগরে  
 ডুবিলাম, মজিলাম মায়ার কুহকে।  
 সচল যামিনী যবে হাসিত মধুরে  
 প্রেম-হাসি, বসি দোহে সরসীর তীরে  
 হেরিতাম কত শোভা, উর্দ্ধে নিরুপম  
 চন্দ্র তারা সুশোভিত অনন্ত গগন,  
 নিরে ধরাডলে শুক রজনীর বুকে  
 নিশ্চর বনের সেই উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যে  
 গভীর নীরব দৃশ্যে—কি এক মধুর  
 শান্তিপূর্ণ শ্রীতিপূর্ণ অনন্ত মহান  
 পাণ্ডুর্য্যে ভরিয়া যেত এ ক্ষুদ্র হৃদয়।

অমনি বিমূঢ় ভাবে উন্নতের মত  
 চাহিতাম আশ্র পানে—দেখিতাম তথা  
 সেই দৃশ্য, এ হৃদয় সেই ধরাডল,  
 এখানেও সেই মত লোভ-ক্রোধ-মোহ  
 কতশত মহাতরু ঘন ঘনাকারে  
 সজিয়াছে মহারণ্য, রঞ্জিত সুন্দর  
 সুধাংশুর অংশুদামে সুস্নিগ্ধ কিরণে।  
 কে এ চন্দ্র ? ফিরায়ে নেত্র দেখিতাম আমি  
 এ চন্দ্র লবঙ্গ-শ্রীতি, হৃদয় তাহার  
 এ চন্দ্র তারা সুশোভিত অনন্ত গগন।  
 মরি কি স্বর্গীয় দৃশ্য, অনন্তে অনন্তে  
 কি অনন্ত শ্রীতি পূর্ণ মহা সম্মিলন।  
 এ হৃদয় ধরাডল, ও হৃদি গগন,  
 এ হৃদয় মর্ত্য, আর ও হৃদি নন্দন ;  
 হেরি এ অদ্ভুতপূর্ব সৌন্দর্য্য মহান  
 হইলাম আত্মহারা, স্নিগ্ধ সমীরণ  
 ধীরে ধীরে কি সুন্দর আনিত বহিয়া  
 শেফালির সুধাপূর্ণ গন্ধ মনোহর  
 তুষিতে এ ক্রান্ত হৃদি, ধীরে ধীরে ধীরে  
 উভয়ে অবশ প্রাণে সেই সরঃতীরে।  
 পড়িতাম ঘুমাইয়া, দেখিতাম দেব  
 কত শত শাস্তিপূর্ণ সুখদ স্বপন।  
 দেখিতাম মহারাষ্ট্র বিজয় কেতন  
 উড়িছে সগর্বে উচ্চে হিমালয়ের শিরে  
 ধ্বংসিয়া মোঙ্গোল-শক্তি, সমগ্র ভারতে  
 “হর হর মহাদেও” শব্দ মধুময়  
 উঠেছে গগন পাশে মোহিয়া ধরণী।  
 প্রভাতে বিহগবন্দ মধুর সঙ্গীতে  
 জাগাইত, উঠি দেব সে ললিত রবে  
 মুকুটতে প্রাতঃক্রিয়া করি সমাপন

যাইতাম বেড়াইতে বিছোর কাননে ।  
 প্রভাতে নবীন বেশে প্রকৃতি সুন্দরী  
 সাজিত কি মনোহর আলোক-আধারে ।  
 কোথা বা শোভিত ফুল খেত নীল পীত  
 বন পুষ্প, স্তরে স্তরে পল্লবের তলে  
 শ্রামল লতিকা বৃন্তে বিটপীর শিরে ।  
 কোথা বা কুকুর বৃন্দ শাবকের সনে  
 খেলিত, নাচিত কোথা মধুর ময়ূরী ;  
 কোথা বা রিশাল গুলি এ গাছে ও গাছে  
 বেড়াইত, কোথা পিক, কোথা বা ধনেশ  
 শোভিত বিটপী-শাখে নয়ন-রঞ্জন ।  
 প্রকৃতির এ উন্মুক্ত শোভা অল্পম  
 দেখিতাম, শুনিতাম বিমুগ্ধ হৃদয়ে  
 নিৰ্ঝরিণী কলকণ্ঠে কি সুধা সঙ্গীত  
 গাইত, মোহিয়া সেই নিৰ্জ্বল প্রকৃতি ।  
 দেখিতাম ছৰ্ব্বাক্ষেত্রে-অধিত্যকা পরে  
 কত যুগ শিশু, কত শশক নকুল  
 নাচিত খেলিত ; উর্দ্ধে বিটপীর শিরে  
 কত পাখী সুধা স্বরে গাইত সুন্দর ।  
 কানন-কপোত কত উচ্চ তরু শাখে  
 বিরাজিত মন সুখে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপে  
 গুঞ্জনিত কত ঘুঘু বন-তপস্বিনী  
 কত শুক সারী, কত পাপিয়া যোগিনী  
 নিবসিত সুখে সেই নিৰ্জ্বল কাননে ।  
 মধ্যাহ্নে সে বন প্রান্তে অশ্বখের মূলে  
 ভীলদের পুত্রগুলি চরা'য়ে গো-দল  
 হান্ত দেহে, বিজ্ঞামিত কত সুখে আসি,  
 দলে দলে কাননের দ্বিধ সমীরণে ।  
 সে সময় বিটপীর পল্লবের তলে  
 লুকাইয়া কত জাতি বন-বিহগিনী

গাইত মধ্যাহ্ন-স্তুতি, উচ্চ বৃক্ষশাখে  
 কত শাখায়ুগ মরি খেলিত উল্লাসে ।  
 কুবো পাখী লুকাইয়া বেতসের ঝোপে  
 জাগাইত প্রতিধ্বনি “কুব্, কুব্” রবে ।  
 চঞ্চল মণিয়াগুলি ঝাকে ঝাকে মিলি  
 বৃক্ষ হ'তে বৃক্ষান্তরে যাইত উড়িয়া ।  
 বন-মোহাগিনী শ্রামা মধুর সপ্তমে  
 তুলি স্বর, মাঝে মাঝে গাইত সঙ্গীত  
 দূর প্রান্তে বিমোহিয়া নিৰ্জ্বল কানন ।  
 কোথা উচ্চ পর্কটের আধার কোটরে  
 পেচক বিহগ-খাষি উঠিত ডাকিয়া  
 উচ্চৈশ্বরে, বনস্থলী পুরি সেই রবে ।  
 কোথা বা নিষাদবৃন্দ বিস্তারি বাগুরা  
 ধরিত কুরঙ্গ শিশু, কোথা কাঠুরিয়া  
 কাটিত অসংখ্য বৃক্ষ স্তম্ভীকৃত কুঠারে ।  
 ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বোঝা বাঁধি কাঠুরিয়া, বামা  
 সেই কাঠে, শিরে বহি যাইত লইয়া  
 সুদূর গ্রামের দিকে গিরিপদ-মূলে ।  
 কোথা বা কানন প্রান্তে স্বভাব-সরসী—  
 — নহে মানবের সৃষ্টি—সৃষ্টি বিধাতার,  
 ভূধরে এমন শোভা, প্রসূরের গায়  
 কি কোশলে গড়িয়াছে সেই শিল্পকর  
 অচিন্ত্য কল্পনাভীত এ সরঃ সুন্দর ।  
 চারিপাশে কত বৃক্ষ সেগুন চন্দন ।  
 ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড র'য়েছে পড়িয়া  
 সেই সরসীর তীরে, তৃণ গুল্ম কত  
 উঠিয়াছে স্থানে স্থানে, শব্দক বিবৃক  
 র'য়েছে মিশিয়া সেই শিলারানি সনে ।  
 সুগভীর কাল জলে কুমুদ কঙ্কার  
 শোভিত, কুটিল কত জলজ কুমুম

বিবিধ, সুগন্ধ নীল রক্ত শতদল ।  
 কত ভীলবালা, ভীল যুবক যুবতী  
 রক্ত পীত বেশধারী, স্নান আশে সবে  
 আসিয়া কুটিত দেব, কুশুমের মত  
 স্বভাব গঠিত এই নির্জন সরসে ।  
 তাহাদের সে চর্যাবাস্য আরণ্য-সঙ্গীতে  
 মুহূর্তে সে বন ভূমি যাইত ডুবিয়া  
 কি এক অতৃপ্তিময় সুধার সাগরে ।  
 স্থানে স্থানে তাহাদের ক্ষুদ্র পর্ণ গৃহ  
 শোভিত কি মনোহর চিত্রিতের মত  
 কাননের শ্রামদেহে বিটপীর শাখে  
 উর্ধ্ব দেশে, নিম্নে কত পালিত কুরঙ্গ  
 বেড়াইত, গৃহগুলি ভগ্ন, পুরাতন  
 অতি জীর্ণ, অন্ধ ভগ্ন, দরিদ্রতা যেন  
 মূর্ত্তিমতী হ'য়ে দেব নিবসে এখানে ।”  
 “আবার সায়াহ্ন কালে কি শোভা সুন্দর,  
 রক্তিম বরণ তাম্র ডুবিত যখন  
 ধীরে ধীরে, বৃক্ষ-শিরে সূর্যের ছটা  
 ভাসিত কি মনোহর ; হিল্লোলে হিল্লোলে  
 সায়াহ্নের স্নিগ্ধ বায়ু সঞ্চরিত ধীরে  
 কাঁপাইয়া বন লতা মঞ্জরিত তরু  
 মনোহর, —চুষ্টি নব কুটুম্ব কুশুম  
 কাননের, কত ঘরে আনিত বহিয়া  
 সুস্নিগ্ধ সৌরভরাশি, ধীবে ধীরে ধীরে  
 মধুর হিল্লোল খেলি বুড়াইত দেব,  
 বিদ্যাবাসিনদের সেই অতৃপ্ত জীবন ।  
 এ সময়ে নানা জাতি বন-বিহগিনী  
 লুকাইয়া মঞ্জরিত নিকুঞ্জ আধারে  
 খ খ রবে সকলেই করি কোলাহল  
 গাইত সায়াহ্ন ভাতি, স্নান কালেবরে

ভীল, কোল, পার্বত্যীয় কত নর-নারী  
 কাষ্ঠ-বোকা শিরে বহি ফিরিত আলয়ে ।  
 দলে দলে অবিকল্পা সাজি বন ফুলে  
 বনদেবী প্রায়, দেব, বেড়াত আসিয়া  
 সেই বনে, সেই অচ্ছ নিবারণী তীরে  
 কত অবিপুল সেই সরসী তীরে  
 লতা কুঞ্জে ছায়াময় কত বৃক্ষ তলে  
 বেড়াইত, নিরখিয়া স্বভাবের শোভা  
 মনোহর, সুশ্রামল নির্জন কাননে  
 মুনিদের পুত্র কন্যা যুবক যুবতী  
 বন-কুশুমের মত র'য়েছে কুটিয়া  
 বিদ্যাচলে, মুখরিত করি বেদগানে  
 এ অনন্ত শোভাময় বিদ্যার কানন ।  
 প্রকৃতির বহুরূপ, —রহস্য গভীর,  
 সায়াহ্নে মধ্যাহ্নে রাত্রে ভিন্ন ভিন্ন কালে  
 ভিন্ন মূর্ত্তি —কভু শাস্ত, কভু উন্মাদিনী  
 সৃষ্টি সংহারিণী ভীমা, কভু সুহাসিনী ।  
 বহুরূপী প্রকৃতির মহাকাব্য ধানি  
 পঠিলে যে শিক্ষা দেব, মানব জীবনে  
 লভে নর, কোটিগ্রাহ্য হয় না তেমন ।  
 এ শিক্ষারি তরে দেব উচ্ছ্বসিত প্রাণে  
 সায়াহ্নে মধ্যাহ্নে প্রাতে যেখানে সেখানে  
 জমিয়াছি, লভিয়াছি যে শিক্ষা মহৎ  
 আপনারি অমুগ্রাহ্য, কোটি জন্মে আর  
 হবে না তেমন দেব, বুঝিয়াছি সার  
 অবস্থার দাস নর, অনূর্ঠের স্রোতে  
 যাইছে ভাসিয়া সদা তব তৃণ প্রায় ।  
 মূৰ্খ নর না বুঝিয়া এ তব গভীর,  
 বুঝা বুঝ করে এই অনূর্ঠের সনে ।  
 সে দিন নিশীথ কালে আশ্রয়-কুণ্ডারে

শুণ্ড যবে, বসুন্ধরা ঘোর অচেতন,  
মা আমার জ্যোতির্শ্রয়ী ভৈরবীর বেশে  
আদেশিলা, সে আদেশ এখনো বাজিছে  
বীণা প্রায় হৃদয়ের প্রতি তারে তারে ।  
“সংসার ত্যজিয়া বাছা এ’সেহিস তুই  
বিদ্যাচলে, যোগ ধর্ম করিতে সাধন,  
বিদ্যাবাসিনীর পদে—শিবের চরণে ।  
কিন্তু বাছা প্রণয়ের কুহকে মজিয়া  
ভুলেহিস্ সেই ধর্ম, লবঙ্গের প্রেমে  
সতত বিমুগ্ধ তুই, প্রায়শ্চিত্ত তার,  
সরস্বতী-তীরে সেই চামুণ্ডা চরণে  
দেগা বলি, উভয়ের ছইখানি কর  
ছষ্ট চিন্তে, স্বদেশের মঙ্গলের তরে ;  
অশ্রুধা জননী সম জগদুমি তোর  
ভুবিলে জন্মের মত ধ্বংসের সাগরে ।”  
“ঠিক বাছা” উত্তরিলে সন্ন্যাসী তখন  
“আমিও নিশীথ কালে দেখেছি স্বপন  
জননী ভৈরবী বেশে আদেশিলা মোরে  
‘অদূরে বিপ্লব ঘোর, শোণিত-তরণে  
ভুবিলে এ মহারাষ্ট্র, রক্ত-লবঙ্গের  
ছখানি পবিত্রকর উৎসর্গি যতনে  
সরস্বতী-চণ্ডী-পদে \* ত্রিশূল আকারে  
বাঁধি সেই কর ছয় পতাকার শিরে,  
শিখ সন্ন্যাসীর সনে সমর প্রাঙ্গণে  
বাইবে, ত্রিশূল হস্তে কৃতান্তের বেশে  
কাঁপাইবে রণস্থল গর্জিয়া ভৈরবে  
“হর হর মহাদেও’ ।” সে ঘোর হুকারে  
উঠিবে ভীষণ বড়, হাসিবে তখন  
রণক্ষেত্র বিধর্মীর শোণিত-সাগরে ;

\* সরস্বতী নদীতীরস্থ চণ্ডী ।

সে শোণিতে রঞ্জিবে এ পবিত্র ত্রিশূল  
নির্মিত মানব করে ; কুরাশা যেমন  
রবি করে, রক্ততেজে বিধর্মী মোল্লের  
হইবে বিধ্বস্ত, চিহ্ন রহিবে না আর ।  
যুদ্ধান্তে সন্ন্যাসী দল মহাসমারোহে  
পূজিয়া এ রুধিরাক্ত ত্রিশূল ভীষণ  
রণক্ষেত্রে, বিসর্জিবে শ্মশান-অনলে ।  
সেই দিন এ ভারতে হইবে পশ্চন  
হিন্দু রাজত্বের ভিত্তি হিন্দু রাজধানী  
হইবে স্থাপিত সেই ভ্রমের উপরে ।”  
“তথাস্তু” বলিয়া যুবা হাসিলা মধুরে,  
হাসিলা লবঙ্গ ; কর দিলা বাড়াইয়া  
উভয়ে সানন্দ মনে ; সহাস্ত বদনে  
কহিলা আবার “দেব, তুচ্ছ এই কর,  
দিতে পারি এ জীবন স্বদেশের তরে ।  
কিন্তু দেব, ছিন্ন কর রাখিবে কেমনে  
এত দিন ? কে জানে সে যুদ্ধ কবে হবে ?”  
হাসিলা সন্ন্যাসী, স্নেহে কহিলা আবার  
“সে চিন্তা তোমার কেন ? সমস্ত জীবন  
রাখিতে সক্ষম আমি ঐষধের বলে” ।  
“এই নিন্ গুরু দেব” বলিয়া নির্ভয়ে  
উভয়ে স্থাপিলা হস্ত কাঠের উপরে ;  
মুদিল নয়ন, মুখে ধ্বনিলা আনন্দে  
“বম বম হর হর” ; ধ্বনিলা আনন্দে  
“বম বম হর হর” তপস্বী প্রবর ।  
অমনি উজ্জল অসি উঠিল বলিয়া  
সে ক্ষীণ প্রদীপালোকে, মরি কি ভীষণ,  
মুহূর্তে কঙ্কিত হস্ত পড়িল ছুটিয়া  
চামুণ্ডার পদ তলে চতুর্ভুজ বৃকে ।



ছুটিল-শোণিত স্রোত রঞ্জিয়া মন্দির  
 দেবী পদ, ধূসরীর খেত বক্ষস্থল।  
 চলিয়া পড়িল দোহে রক্তের সাগরে  
 দেবী-পদে ; কিন্তু করে সন্ন্যাসী তখন  
 উভয়ের ছিন্ন কর বাঁধিলা যতনে  
 নিষ্পেষিয়া কতটুকু বিশল্যকরণী।  
 কটিস্থিত চূর্ণ কিছু করিয়া বাহির  
 যোগী শ্রেষ্ঠ, উভয়ের মূখের ভিতরে  
 দিলা গুজি, অবিলম্বে উঠিয়া বসিলা  
 হুঁও জন সেবি সেই মৃত-সজীবনী।  
 উভয়ে মেলিল আঁখি, আবার কাতরে  
 “বম বম হর হর” ধ্বনিলা উভয়ে ;  
 “বম বম হর হর” ধ্বনিলা সন্ন্যাসী।  
 ভক্তি-উল্কাসিত প্রাণে মুদ্রিলা নয়ন  
 সন্ন্যাসী, ডুবিল। মহাধ্যানের সাগরে।  
 কিছুক্ষণ পরে পুনঃ উন্মোলি নয়ন  
 কহিলা “সার্থক বাছা জন্ম তোমাদের,  
 স্থাপিলা যে কীৰ্ত্তিস্তম্ভ, শত বজ্রাঘাতে  
 ভাঙিবে না—ভাঙিবে না কালের কুঠারে ;”  
 লবঙ্গ সজল নেত্রে কহিলা কাতরে  
 “গুরুদেব” পিপাসায় কণ্ঠাগত প্রাণ  
 একটুকু জল দিন্ নতুবা এখন  
 জীবন সংশয় মোর, মস্তিষ্কের পরে  
 না চালিলে জল, দেব মরিব এখনি।”  
 “আমারো পিপাসা বড়” কহিলা রক্তজী  
 কাতরে ; উঠিলা যোগী, কহিলা সাদরে  
 “এ’ল বাছা যাই অই সরস্বতী তীরে ;  
 অমৃত সলিল তার, সে জল পরশে  
 এখনি লভিবে বাছা নূতন জীবন।”

অতি কষ্টে সন্ন্যাসীয়ে করিয়া ধারণ  
 গেলা দোহে ধীরে ধীরে তটিনীর তীরে।  
 উভয়ে শীতল জল হৃদয় ভরিয়া  
 আনন্দে করিলা পান, মস্তিষ্কের পরে  
 দিলা দোহে ধীরে ধীরে সে স্নিক জীবন।  
 কিছুক্ষণ পরে দোহে উঠিবে যখন  
 নদী হ’তে, অকস্মাত হায় সে সময়ে  
 “ক্রম” শব্দে নদীবক্ষ করিয়া কম্পিত  
 গজ্জিল বন্দুক এক সেই সঙ্গে হায়  
 রক্তজী ডুবিয়া গেল তটিনীর জলে।  
 “এ কি হ’ল গুরুদেব ?” বলিয়া লবঙ্গ  
 ঝপ্প দিলা নদীবক্ষে, মুহূর্তের তরে  
 ছিটিয়া উঠিল বারি ; হইলা অদৃশ্য  
 হুঁও জন, হায় সেই তটিনী হৃদয়ে।  
 মহাত্ম্যে যোগীবর চাহিলা অমনি  
 সেইদিকে, উচ্চ তীরে দেখিলা তখন  
 একটি মসজিদ ভগ্ন, অর্ধেক তাহার  
 পড়েছে ভাঙিয়া, তাহে তৃণ গুল্ম লতা  
 উঠিয়াছে রাশি রাশি, পতন উন্মূখ  
 ভগ্নাঙ্ক প্রাচীর পরে দীর্ঘ বটবৃক্ষ  
 উদ্ভবাহ, নিয়ে তার আধারের পটে  
 অল্পষ্ট মানব ছায়া, দেখিতে দেখিতে  
 সহসা মিশিয়া গেল সে নৈশ আধারে।  
 অমনি বিহ্বল বেগে সেই বৃক্ষ তলে  
 যাইলা সন্ন্যাসী, কিন্তু মানবের চিহ্ন  
 নাহি তথা,—তথু ভ্রম। উর্ধ্বে তর পরে  
 নানাজাতি বিহঙ্গম উঠিল কুজিয়া  
 মধুর প্রতীতি সুরে উবা-সস্তাষণ।  
 চুম্বিত প্রকৃতি বেন উঠিল জাগিয়া  
 নিরখিয়া এ অদ্ভুত ভীষণ স্বপন।

## উনবিংশ সর্গ

[আগ্রার নিকটস্থ বনভূমি ; একটি পুরাতন বাড়ী]

লোহিত বরণ ভাঙ্গু ডুবিল গগনে ;  
বিষাদে মলিন মুখী প্রকৃতি সুন্দরী  
ঈষদ্ আধারে মরি আবরিয়া দেহ  
হেরিছে সে শোক-দৃশ্য কাতর নয়নে ।  
নিবিড় নির্জন বন, নাহি জন প্রাণী,  
নাহি নর-কোলাহল, বহু দূরে দূরে  
হু একটি ভীল কোল গ্রাম্য নীচ জাতি  
নিবসিছে এই স্থানে ; আসিছে ঘনায়ে  
অন্ধকার ক্রমে ক্রমে এ নির্জন বনে ।  
বহিতেছে সাক্ষানিল, ধীরে ধীরে ধীরে ।  
তারাদল একে একে ফুটিছে গগনে ।

কাননের মধ্যস্থলে দীর্ঘ পথ ধারে  
একটি নির্জন বাড়ী বহু পুরাতন,  
নাহি আজি সৌভাগ্যের চিহ্ন ক্ষীণতর,  
স্থানে স্থানে ভগ্ন প্রায়, বহু বস্ত্র তরু  
উঠিয়াছে স্থানে স্থানে প্রাচীর ভেদিয়া ।  
সায়াক্ষের অন্ধকারে ছাদের উপরে  
একটি বালিকা মূর্তি—রূপের ছটায়  
আলোকিত চারিদিক, কৃষ্ণ কেশ রাশি  
কুজঙ্গিনী প্রায় পৃষ্ঠে পড়েছে হুলিয়া ।  
কুটম্ব গোলাপ প্রায় চারু মুখ খানি  
সদা হাসি মাখা, কিংবা কনক-নলিনী ;  
অল্পপম রূপরাশি, মদ-মস্ত আখি,  
সুবর্ণে গঠিত দেহ, বন্ধে পুষ্প-কলি,  
ভূজঙ্গ-বর্ণলতা সহ মৃণালিনী ;  
পার্শ্বদেশে যুবা এক অতি মনোহর

যোদ্ধা বেশে, চেয়ে আছে বালিকার পানে ।  
উভয়েই আশ্রহারা, উভয়ের প্রাণ  
এ মর জগৎ ছাড়ি চলি গেলা উর্দ্ধে  
এক স্বপনের রাজ্যে, প্রাণয়ে যেথায়  
কলঙ্ক-কালিমা নাই, নাই দলা দলি  
জাতি ভেদ, হিংসা ছেয় পাপ তাপ রাশি ।  
বালিকা বিহ্বল প্রাণে যুবকের বন্ধে  
রাখি শির, যদি চক্ষু জাগিয়া জাগিয়া  
দেখিতে লাগিল। কত প্রেমের স্বপন !  
কিছুক্ষণ পরে বালা জিজ্ঞাসিল। তারে  
“অমর, কোথায় তুমি ছিলে এত দিন ?  
আরোগ্য লভিয়া তুমি সেই গেছ চ’লে  
বহু দিন, কোথা হতে এত দিন পরে  
এলে আজি ? একাকিনী এ নিহৃত স্থানে  
কেমনে থাকি যে আমি ভেবেছ কি তুমি  
কণ ভরে ?” স্নেহ ভরে কহিল। আতর্কী  
“ইচ্ছা ক’রে একাকিনী রাখিয়া তোমারে  
যাইনি কোথাও আমি ? ছিল আশা মনে,  
আগ্রা হ’তে ফিরে আমি আসিব এখানে  
এইরী সৈনিক নিয়ে ; কিন্তু প্রাণময়ি  
আগ্রার সে রাজ পথে হয়েছিল দেখা  
নজীবের ভৃত্য সনে, দিয়াছিল প্রিয়ে  
সে আমারে পত্র তার, ছিল লেখা তাহে  
“নবাবের লইয়া আমি গেছ সাহডেরা  
ছুরাণী সাহার কাছে, শুনিব এখানে  
বহু মহারাষ্ট্র সৈন্য দিল্লী বিনাশিয়া  
গেছে কুঞ্জপুর হর্গে, তুমি অবিলম্বে

যে'ও সেখা আপনার সৈন্তদল নিয়ে  
 ক্ষতবেগে, আমরাও যাইব সেখানে  
 সসৈন্তে করিতে যুদ্ধ মহারাত্রি সনে ।  
 আমাদের সনে তুমি হইও মিলিত  
 সেই স্থানে, ইথে যেন অশ্রুধা না ঘটে ।  
 বিলম্বিলে সর্বনাশ জানিও নিশ্চয় ।  
 মোসেমের চিহ্ন আর রবেনা ভারতে,  
 সমগ্র মোসেম জাতি হইবে বিধ্বস্ত  
 এ যুদ্ধে, কলঙ্ক শুধু রহিবে জগতে ।”  
 তাই আমি কুঞ্জপুরে গিয়াছিলাম প্রিয়ে  
 হৃদবেশে, গতি বিধি করিয়া নির্ভয়  
 শত্রুদের, আসিয়াছি আজি এই স্থানে ।  
 সসৈন্তে এখনি মোর যাইতে হইবে  
 কুঞ্জপুরে, তুমি হেথা থেক সাবধানে ।  
 “না অমর, তুমি মোরে নিয়ে যাও গৃহে”  
 কহিল হিরণবালা ভার করি মুখ,  
 “এখানে যুগুষ্ঠ আর নারিব থাকিতে ।”  
 হিরণের হস্ত ধরি আতর্থা সাদরে  
 কহিল “হিরণ, আমি ঘোব ব্যতিব্যস্ত  
 এ সংগ্রামে, গৃহে আজ যাইব কেমনে ?  
 গৃহে গেলে নানা কার্যে হইবে বিলম্ব,  
 অনিষ্ট হইবে শেষে এ মহা সংগ্রামে ।  
 অতএব কিছুকাল থাক এই স্থানে  
 যুদ্ধান্তে তোমারে আমি নিয়ে যাব গৃহে ।”  
 এইভাবে বহুকণ হইল অতীত ;  
 উভয়েই কিছুকণ রহিল বসিয়া  
 নীরবে ছাদের পরে, উভয়ের প্রাণ  
 প্রেম-মদে মাতোয়ারা, অদূর কাননে  
 একটি অরণ্য পাখী উঠিল চিংকারি,  
 সেই রবে ভেঙ্গে গেল উভয়ের মোহ,

আতর্থা'র স্বপ্নে শির রাখিয়া হিরণ  
 কহিল “অমর, আর কত দিন তুমি  
 রাখিবে কেলিয়া মোরে যেখানে সেখানে  
 হেন ভাবে ?” উত্তরিল আতর্থা তাহারে  
 “কি আর বলিব প্রিয়ে । অতীতের স্মৃতি  
 যবে মোর মনে উঠে, সহস্র বৃষ্টিক  
 দংশে মোরে হৃদি মূলে ; যবে যোগাশ্রমে  
 ছিন্ন মোরা, কোন চিন্তা ছিল না হৃদয়ে  
 কত সুখে ছিন্ন মোরা কাননে কাননে ।  
 আজি আমি ভাগ্য দোষে হায় প্রিয়তমে  
 ভীষণ সমরাজ্ঞে অস্ত্রের বননে  
 কামানের মুহুমূহ গোলা বরিষণে  
 ভ্রমিতেছি চারি দিকে উদ্ভ্রান্ত হৃদয়ে ।  
 এ ঘোর সঙ্কটে কোথা রাখিব তোমারে ?  
 সুখ নাই—শান্তি নাই হৃদয়ে আমার ;  
 আজি আমি সব ছেঁড়ে উৎকল হৃদয়ে  
 মৃত্যুকে বরণ করে লইয়াছি প্রিয়ে  
 স্বধর্ম ও জন্মভূমি জননীর লাগি ।  
 কিন্তু আমি তোমার সে সরল প্রাণের  
 শৈশবের ভালবাসা পারিনি ভুলিতে ।  
 —পারিনি ভুলিতে সেই মলয় গিরির  
 অধিত্যকা যোগাশ্রম, সমুদ্র-সৈকতে  
 ধূলা খেলা, মধুময়ী চাঁদনী নিশিতে  
 সাগরে সূবর্ণ-শোভা, নিভৃত নির্জনে  
 কুল তোলা, মালা গাঁথা, প্রেম-সম্ভাষণ ;  
 প্রদোষ প্রভাতে সেই কানন-ভ্রমণ ।  
 সে কথা কি মনে আছে আজি প্রিয়তমে ?”  
 হিরণ সজল নেত্রে কহিল তাহারে  
 “সব কথা মনে আছে, ভুলিলে তোমারে  
 কি ল'রে বাঁচিব আমি ?—হায় প্রাণনাথ,

তুমি ভিন্ন শাস্তি-ভর কে মোর অগতে ?  
 স্বামী তুমি, পতি তুমি, এগাপ-সংসারে  
 আরাধ্য দেবতা তুমি, তব প্রেম-মাশে  
 আজিও জীবিত দাসী, নতুবা হুঃখিনী  
 ডুবিয়া যাইত কবে অতীত-সাগরে ।  
 অবলা রমণী আমি, কি সাধ্য আমার ?  
 এ দিকে ভীষণ বেগে হিন্দু মুসলমানে  
 লেগে গেছে মহাযুদ্ধ স্থানে স্থানে কত ।  
 মোসলেমের সৈন্যবল করিয়া নির্ণয়  
 ভারতীয় হিন্দুযুদ্ধে করিতে গোপনে  
 উদ্ভেজিত, গুরুদেব বজরা লইয়া  
 এসেছিল দিল্লী আগ্রা আরো বহু স্থানে,  
 আমিও তাহার সনে তোমার সন্ধান  
 এসেছিলাম নাথ, কিন্তু কোথাও না পে'য়ে  
 গিয়াছিলাম ফিরে শেষে পঞ্চবটী বনে ।  
 তার পর সকলিত বলেছি তোমারে  
 সেই দিন একে একে ।” নীরবিলা বালা ।

ভিল ভিল করি নিশি চলিল বহিয়া,  
 ধীরে ধীরে পূর্বাকাশে উদিল চন্দ্রমা,  
 উজ্জল আলোকপুঞ্জ পড়িল ছড়া'য়ে  
 চারিদিকে জলে স্থলে রঞ্জিয়া ধরণী ।  
 আতর্ষা! আদর করি কহিল মধুরে  
 চুপিয়া তাহার সেই চার মুখ খানি  
 “হিরণ, বিদায় দেও, যাই আমি তবে ।”  
 হিরণ ব্যথিত চিত্তে কহিল তখন  
 “একাকী কেমনে আমি থাকিব এখানে ?”  
 “একাকী ?—একাকী কেন থাকিব এখানে ?”  
 কহিল আতর্ষা! ধরি হাতখানি তার  
 শেকালী বকুল ছটি বয়স্তা তোমার

সতত সেবিবে তব চরণ ছুখানি ।  
 হুইজন ভৃত্য আরো রহিল এখানে ;  
 ইহা ভিন্ন পঞ্চজন বিশ্বাসী সৈনিক  
 যাহারা আমার সঙ্গে এসেছিল আজি  
 তারাও রহিল ঘায়ে সশস্ত্র প্রহরী ।  
 দ্বিসপ্তাহ পর আমি আসিব আবার  
 এই স্থানে, তুমি হেথা থেক সাবধানে ।”  
 তার পর মিষ্টি বাক্যে চুপিয়া হিরণে  
 বিদায় লইলা বীর, চলি গেলা দ্রুত  
 একটি তুরঙ্গ পরে করি আরোহণ ।

বহুক্ষণ একাকিনী রহিল বসিয়া  
 হিরণ সে ছাদ' পরে বিষণ্ণ হৃদয়ে,  
 কত যে ভাবনা-স্রোত বহিতে লাগিল  
 হৃদয়ে তার, যদি এই ভীষণ সময়ে  
 অমর নিহত হয়, কেমনে বাঁচিবে  
 অভাগিনী ; জীবনের সব সাধ আশা  
 জনমের মত হায় যাইবে ডুবিয়া ।  
 মহারাষ্ট্র পক্ষ যদি হয় পরাজিত,  
 আত্মীয় স্বজন কেহ না রহিবে তবে ।  
 নানারূপ হুশিঙ্কায় হুঃখিনীর প্রাণ  
 শতধা কাটিয়া গেল, সজল নয়নে  
 আকাশের দিকে চেয়ে রহিল কাতরে ।  
 সুশীতল নৈশ বায়ু রহিয়া রহিয়া  
 বহিতেছে কি মধুরে, হাসিছে চন্দ্রমা,  
 নীলাকাশে ছড়াইয়া কিরণ-মাধুরী ।  
 শেকালী নীরবে আসি রহিল দাঁড়া'য়ে  
 পশ্চাতে, স্তম্ভিত প্রাণে নিরখি এ দৃশ্য  
 ভাবিল দিদি কি আজ হল উন্মাদিনী ?  
 ক্ষণ পরে স্নেহভরে কহিল শেকালী

“রজনী অধিক হ’ল চল ঘাই গৃহে  
অনুধ হইবে তব থাকিলে এখানে।”  
“চল ঘাই” বলে ধীরে উঠিলা হিরণ,  
উভয়ে সোপান বহি আসিলা নীরবে  
নিরতলে, ক্ষুদ্র কক্ষ সম্বিত সুন্দর  
নানাবিধ জব্য ভারে, একটি পর্য্যঙ্কে  
তুইলা ঘাইয়া বালা বিষম হৃদয়ে।  
শেফালী মধুর স্বরে জিজ্ঞাসিলা তারে  
“তুইলে যে অসময়ে? উঠ করা করি  
দিদি মোর, আহা রাত্রে করিও শয়ন।”  
কহিলা হিরণ “বড় অনুচ্ছ শরীর,  
খাইব না আমি আজ, তোরা যে’য়ে সবে  
খে’য়ে দে’য়ে নিজ কক্ষে কর্গে শয়ন;  
ডাকিস্নে মোরে আর।” শেফালী নীরবে  
গেলা চলি, উপাধানে ঢাকিয়া বদন  
কাঁদিতে লাগিলা বালা নীরবে বিষাদে।  
ভাবনার শত ঝঙ্কা ভাজিতে লাগিল  
হৃদি তার, অজ্ঞানারে শয্যা উপাধান  
ভিজে গেল চুঃখিনীর, কেঁদে কেঁদে বালা  
বহুকণ, ক্রান্ত হ’য়ে পড়িলা ঘুমা’য়ে।  
অকস্মাৎ দারদেশে মহা কোলাহল  
হইল উখিত, আসে শেফালী বকুল  
উঠিলা আগিয়া করা, দেখিলা গোপনে  
সপ্তজন পরাক্রান্ত দৌবারিক সনে  
অষ্টাদশ ভীমকার সৈনিক ভীষণ  
যুঝিতেছে সিংহনাদে প্রচণ্ড বিক্রমে।  
সেই রবে হিরণের ভেঙ্গে গেল ঘুম,  
অত্নের ঝঞ্ঝনি, আর নর-কোলাহলে  
উঠিলা চমকি বালা, শয্যার উপরে  
বসিলা নীরবে উঠি ভয়াকুল প্রাণে।

শেফালী শব্দিত চিত্তে কাঁপিতে কাঁপিতে  
আসিলা ছুটিয়া ক্রত হিরণের গৃহে।  
বকুল ভয়ার্ত প্রাণে প্রবেশিয়া তথা  
কহিলা “কি সর্বনাশ, দম্ভ অগণিত  
ভয় করি সিংহদার প্রবেশি ভিতরে  
হয় জন দৌবারিকে করেছে হনন।  
এক জন প্রাণ ভয়ে করেছে প্রস্থান।  
• “কি হবে উপায় এবে”, বলিয়া বকুল  
কাঁদিতে লাগিলা, পুনঃ কহিলা সত্বরে  
“অই শোন কি ভীষণ হকার তাদের,  
বোধ হয় পাষণ্ডেরা এখনি আসিয়া  
এই স্থানে, আমাদের করিবে হনন।  
রাক্য না হইতে শেষ, মুহূর্ত্তে তখনি  
দম্ভাবল প্রবেশিল কক্ষের ভিতরে;  
তারি মাঝে এক জনে দেখিয়া হিরণ  
উঠিলা চমকি, ক্রোধে কহিলা তাহারে  
“দিলীপ, পাষণ্ড তুই? তোরি এই কাজ?  
দম্ভাবেশে তুই আজ এসেছিস্ হেথা?”  
উত্তরিলা শ্লেষ ভাবে পাষণ্ড দিলীপ  
“কেন সতি, দম্ভাবেশে কি দোষ আসিতে  
তোমার এ গুণ্ড প্রেম ধরিতে এখানে?  
হিন্দু তুমি, মুসলমান আতর্ষার প্রেমে  
ম’জেছ, আপন ধর্ম্ম দিয়া জলাঞ্জলি;  
সতী ব’লে তবু তুমি করিতেছ গর্ব্ব,  
তোমার সতীত্ব আজি দেখা যাবে সতি,  
চল ঘাই সদাশিব ও গুরুজীর কাছে।”  
“সতী নহি?” মহাক্রোধে কহিলা হিরণ  
“তোমার মত নরাকৃতি কামুক কুঁকুর  
কে আছে জগতে মূঢ়? সতীর উপরে  
কে করে রে তোমার মত এত অত্যাচার?”

কি ভয় দেখাস্ তুই ? গুরুজী স্বয়ং  
দিয়াছে বিবাহ মোর অমরের সনে  
শিবের সম্মুখে, তুই সুধাগে' তাহারে  
নরাধম ?" উচ্চৈশ্বরে হাসিয়া দিলীপ  
কহিল "অমর নহে, আতর্থা সে সতি ।"  
"হোক সে আতর্থা, তাতে কি ক্ষতি আমার ?  
ধর্মমতে সে আমার আরাধ্য দেবতা  
এ জগতে স্বামী রূপে ।" "চল্ তবে সতি

স্বামীর নিকটে তোর" বলিয়া দিলীপ  
করিল ইজিত সেই আততায়ী সবে,  
তখনি সে দম্ভা বৃন্দ আনন্দে-উৎসাহে  
তুলিয়া হিরণে এক শিবিকার মাঝে  
ক্রতপদে বন পথে করিল প্রস্থান ।  
শেকালী বকুল সেই কঙ্কের ছ্যারে  
• নীরবে স্তম্ভিত ভাবে রহিল দাঁড়ায়ে  
সে বন প্রদেশে, ভয়ে আকুলিত প্রাণ ।

— — —



## বিংশ সর্গ

[সাহডেরা ; যুগলমান শিবির]

সাহডেরা ; মোস্তেমের অসংখ্য শিবির  
শোভিছে ; হাসিছে উর্ধ্বে সুনীল অধরে  
“অর্দ্ধচন্দ্র” সুশোভিত পতাকা সুন্দর  
আগাইয়া সুগুণায় মোস্তেম হৃদয়ে  
কি এক বিস্মৃতি স্মৃতি অতীত গৌরব !  
স্থানে স্থানে মদমস্ত মাতঙ্গের মত  
সজ্জিত প্রহরীবৃন্দ ভ্রমিছে উল্লাসে  
বীরদর্পে, কটিস্থিত উলঙ্গ কুপাণ  
অস্ত্রোন্মুখ ভাস্করের উজ্জল কিরণে  
ঝলিছে ; ঝলিছে শিরে লোহিত উকীষে  
“অর্দ্ধচন্দ্র” প্রতিবিম্ব করি প্রদর্শন  
ব্যঙ্গ ছলে, উপহাসি ভেজস্বী ভাস্করে  
মহা গর্বে, বিজ্ঞাপিয়া শত সূর্য্য হ’তে  
মোস্তেমের শৌর্য্য বীর্য্য অনন্ত মহান্ ।

অনুরে যমুনা অই কত রক্ত তলে  
যাইছে বহিয়া সদা কুলু কুলু রবে  
মোহিয়া সৈকত ভূমি, সে সুখা সজীতে  
বর্ষিছে কি শাস্তি ধারা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে  
দরিদ্র সৈকতবাসী কুবকের প্রাণে ।  
অগণিত ঝাউতরু তটিনী সৈকতে  
শোভিছে কি মনোহর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখী  
উড়িছে বসিছে এই ক্ষুদ্র তরু শাখে ।  
দলে দলে অগণিত কুবক রমণী  
আসিতেছে লুকাইয়া সৈনিকের ভয়ে  
যমুনার গুপ্ত ঘাটে, যাইছে কেহ বা  
হুগে হুগে জল নিয়া প্রায় অতিমুখে ।

কিছু দূরে পল্লী প্রান্তে যমুনা-সৈকতে  
একটি আশ্রম বাড়ী, বেষ্টিত কাননে  
সুস্তামল, মধ্যস্থলে প্রাঙ্গণের মাঝে  
একটি সুরম্য মঠ ভূধরের মত  
তুলি শির মহাপুণ্ড্রে স্পর্শিতে গগন  
উর্দ্ধমুখ, চারিদিকে অসংখ্য বিটপী  
শ্রেণীবদ্ধ, কোথা যাম সেগুন চন্দন  
সহকার, কোথা নিম্ব অশোক বকুল  
কোথা দেবদারু, তাল বন-সেনাপতি ।  
বহির্ভাগে শ্রেণীবদ্ধ গুবাক প্রহরী  
দাঁড়াইয়া, রণস্থলে পদাতিক যেন ।  
প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে মন্দিরের পাশে  
অসংখ্য সুরভি পুষ্প র’য়েছে কুটিয়া  
বৃন্তে বৃন্তে, বামপাশে একটি গো-গৃহ  
সুশোভিত ধেনুবৃন্দে চির ছদ্মবতী ।  
দক্ষিণে অত্যুচ্চ মঠ বিবিধ বরণে  
সুচিত্রিত, সুরঞ্জিত প্রাচীরের গায়  
কত শত দেব মূর্তি, অভ্যস্তরে তার  
রক্তত নির্মিত এক পুষ্প-সিংহাসনে  
রাধা কৃষ্ণ, রত্নময় যুগল মূর্তি  
বৈকবের অনুগ্রহে, ততোধিক স্নেহে  
এ মূর্তির পদপ্রান্তে স্নিগ্ধ ছায়া তলে  
বন-কুমুমের মত আশ্রমবাসিনী  
কত স্নেহময়ী চারু বালিকা-কুমুম  
কুটিয়া র’য়েছে এই কানন আধারে ।  
নিরখিতে শাস্তি পূর্ণ এ চারু মন্দির  
দলে দলে সৈন্ত বৃন্দ আসিছে এখানে

দলে দলে কত সৈন্ত যমুনার তীরে  
অনিতেছে শীতলিয়া ক্রান্ত কলেবর  
সুমধুর সাঙ্খ্যানিলে ; পলে পলে পলে  
হেলিয়া পড়িছে ভানু পশ্চিম গগনে ।  
হাউনির প্রান্ত দেশে একটা শিবিরে  
নবাব সুজাউদ্দৌলা চিন্তার সাগরে  
নিমগ্ন, সম্মুখে দূত ভবানীশঙ্কর, \*  
বাম পার্শ্বে ইয়াকুব খোজা অনুচর  
দাঁড়াইয়া সকলেই গভীর নীরব ।  
কিছুক্ষণ পরে সুজা কহিলা শঙ্করে  
ভবানী, তোমার বাক্যে কি দিব উত্তর ?  
পেশবার মনোবাঞ্ছা পূরাইতে আমি  
অসমর্থ ; কি করিব, সাধ্যাতীত কার্য  
কেমনে সাধিব আমি ? যে দিন প্রথম  
এ'সেছিলে, সেই দিন বলেছি তোমারে  
সব কথা, কেন পুনঃ লজ্জা দেও মোরে ?  
পেশবা যে চির মিত্র জনকের মম  
জানি তাহা, কিন্তু আমি কৃত্যের প্রায়  
পেশবার শত্রু সনে হইনি মিলিত ?  
অনর্থক অনুযোগ দেও যদি মোরে,  
তহুত্তরে মুক্ত কণ্ঠে অগতের কাছে  
অবশ্য বলিব আমি, আজি এ সমরে  
যে স্বার্থ আকালী শা'র সেই স্বার্থ আজ  
সকলের, সেই স্বার্থ আমি অভাগার ;  
একই স্বার্থের তরে সমগ্র মোসলম  
একতার ভোরে আজি বাঁধা দৃঢ়তর ;  
একি মন্ত্রে ভারতীয় সমগ্র মোসলম  
দীক্ষিত, চালিত আজি একই উদ্দেশ্যে ।

ভবানি । কেমনে আমি বিপক্ষে তাহার  
ধরিমু কপাণ ?—এ যে কর্তব্য আমার ।  
ভাওয়ের † অনুরোধে ছরানী শিবিরে  
পাঠাইমু দেবীদত্তে, ‡ কি কলিল তায় ?  
—হইল কি সন্ধি ? শুধু বৃথা পরিশ্রম ;  
মলহর সূর্য্যমল্ল সন্ধিহীন হৃদয়ে  
পাঠাইল কত দূত, দিমু উপদেশ  
সাধ্যমত ; নজীবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে  
কেমনে হইবে সন্ধি ? সেই যে নায়ক  
এ যুদ্ধে, তাহারি যুদ্ধে সমগ্র মোসলম  
একত্র মিলিত, বদ্ধ একতার পাশে ।  
কেমনে হইবে সন্ধি তাহার অমতে ?  
তথাপি ও তাও দূত পাঠাইলা পুনঃ  
অনর্থক, কি করিব ? শিবিরে তাহার  
পাঠাইমু ইয়াকুবে, বলিলাম তারে  
তাজিতে সমর ক্ষেত্র, মোসলমের সনে  
না যুদ্ধিতে, তেয়োগিতে চির অভ্যাসিত  
লুণ্ঠন গোপন যুদ্ধ, কিন্তু সদাশিব  
না তনে সে কথা মম, ধ্বংসিলা আবার  
কুঞ্জপুর—মোসলমের হৃগ্ন মনোহর ।”  
“সত্য তাহা” উত্তরিলা ভবানীশঙ্কর  
“নজীবের গর্ব চূর্ণ হউক সমরে,  
আপনি চলিয়া যান আপনার দেশে  
সৈন্ত সহ, অযোধ্যার বিধাতা আপনি  
ভারতের বীর পুত্র, মিত্র পেশবার ।  
বিদেশী আকালী সবে সমর প্রাপ্ত  
ভারতের বীর পুত্র কেন সংমিলিত  
বিদারিতে তীক্ষ্ণ অস্ত্রে বদ্ধ ভারতের ?

\* আওরঙ্গজেব নিবাসী ভবানীশঙ্কর পণ্ডিত, ইনি সঙ্গাশিবের দূত ।

† সঙ্গাশিব ভাও । ‡ দিল্লী নিবাসী রাজা দেবদত্ত, ইনি সুজাউদ্দৌলার অনুচর ।

এ কি কথা ? অরণেও শিহরে হৃদয়,  
পুত্র হ'য়ে জননীর জীবন সংহার ?  
এ কি নীতি জাহাপানা ? শত অনুরোধে  
তাজি এ বিপক্ষ দল, দেশে আপনার  
যান চলি, কিংবা সন্ধি করুন স্থাপন  
এ সমরে ; মহারাষ্ট্র আপনার সনে  
বুঝিতে ইচ্ছুক নহে মুহূর্তের তরে ।”  
কিছুক্ষণ নত শিরে গম্ভীর বদনে  
কি ভাবিলা বীর সূজা, কহিলা আবার  
“তিষ্ঠ কণকাল, আমি দেখি পুনরায়  
পারি কি না পারি সন্ধি করিতে স্থাপন ।”

হাউনির মধ্যস্থলে একাণ্ড শিবিরে  
সুবর্ণ আসনে বসি বীর চূড়ামণি  
আমেদ আকালী সাহা, সম্মুখে নজিব  
যোদ্ধা বংশে, আর কত বীর সেনাপতি  
সমাসীন স্ব স্ব স্থানে ; কুঁতাস্তের প্রায়,  
অগণিত ভীম বাহু সেনা নিমকোটি  
দাঁড়াইয়া অসি হস্তে ভীষণ দর্শন ।  
সমস্ত্রমে যুগ্ম স্বরে কহিলা উজির ।  
মহারাষ্ট্রী সন্ধি আশে ধরেছে সূজায়  
বহু ভাবে, নিজ স্বার্থ রাখিয়া বজায়  
ক্ষতি কি করিতে সন্ধি ? আমি ভাল বুঝি  
শত্রু যদি কোন ভাবে বশুতা স্বীকার  
করে আসি, অগ্নাঘাত তাহার উপরে  
নহে ধর্ম ; নিজ স্বার্থে না হ'লে ব্যাধাত  
সন্ধিতে কি দোষ ? তাহে এ হেন সন্ধিতে  
মোসেমের জয় ভিন্ন নহে পরাজয় ।”  
সরোবে নজীবদৌল কহিলা আকালি  
“সপনেও ভাবি নাই উজিরের মুখে

তুনিব এ কথা আমি ; সমগ্র ভারত  
দস্যুদের উৎপীড়নে যে ভাবে জীবন  
যাপিতেছে, অরিলেও করে হৃদয়ন ।  
আজি কি না সেই শত্রু, যোর অত্যাচারী  
মোসেমের সেই শত্রু, — শত্রু ভারতের  
পড়িয়া ভীষণ কাঁদে উদ্ধারের আশে  
খেলিতেছে এ চাতুরী, উদ্ধারের পরে  
এ ভুজঙ্গ ধরিবে যে মুরতি ভীষণ,  
উজিরের সাধ্য কি তা নিবারে তখন ?  
মধ্যস্থ নবাব সূজা, হাসি পায় হুঃখে,  
সংসারের অনভিজ্ঞ সরল যুবক  
কি বুঝিবে রাজ নীতি ? — বুঝিবে কেমনে  
‘কালস্ত্র কুটিল গতি’ কুটিল সংসারে ?  
শত্রু যবে দৈবচক্রে বিপদের ক্রোড়ে  
পড়ে, আমি কি প্রতিজ্ঞা আছে এ জগতে  
যাহা সে করিতে নারে ? ভেবে দেখ মনে  
সে প্রতিজ্ঞা বাক্য মাত্র, নহে তা শৃঙ্খল  
— বাধিয়া রাখিবে যাহে সমগ্র জীবন ।  
সে আজি বিপদে মগ্ন, যদি আজি তারে  
ছেড়ে দেও, কালি কি সে শক্তি আপনার  
করিয়া সক্ষম, সেই বিগত গৌরব  
লভিবে না ? প্রাণপণে যুঝিয়া আবার  
শত্রু সনে প্রতিশোধ দিবে না কি তার ?  
এ কথা যে মিথ্যা বলে জামান্ন সে জন,  
জানে না সংসার নীতি, জীব চরিত্রের  
মহাকাব্য কণতরে পঠে নি সে জন  
এ জীবনে ; বিশ্ব-কাব্য দেখিলে বারেক  
বুঝিবে এ কথা মম, প্রকৃতি আপনি  
অভিনেত্রী, একদিকে তাজিলে আবার  
গড়ে না কি অস্ত্র দিক ? এক জীব তবে

মরিলে, অপর জীব লাভনা জনম ?  
 প্রকৃতির কোন অংশ অপূর্ণ কি থাকে  
 চিরদিন, সে কি তাহা করে না পূরণ ?  
 সর্বগ্রাসী কাল সনে শত যুগ ব্যাপি  
 এইরূপে মহাযুদ্ধ করিছে প্রকৃতি  
 পলে পলে,—একদিকে প্রলয় ভীষণ,  
 অন্য দিকে মহাশান্তি ; অমৃতের সনে  
 গরলের সংমিশ্রণ, মরি কি অদ্ভুত ।—  
 জ্ঞানের অগম্য নীতি, সিদ্ধ মরুভূমি,  
 মরু সিদ্ধ, এ রহস্য বুঝিবে কেমনে ?  
 মোস্তেম সাম্রাজ্য ভিত্তি অক্ষ ভয় প্রায়,  
 আজি কিংবা কালি তাহা হইবে পতিত  
 দস্যদের অত্যাধাতে, তাই ইচ্ছা মম  
 মারাঠার উষ্ণ রক্তে সেই ভিত্তি-মূল  
 স্ফূট করিতে পুনঃ, দক্ষিণ ভারতে  
 সে কার্যের একমাত্র পেশবা কণ্টক ।  
 তাহারেই ধ্বংস করা কর্তব্য মোদের,  
 অন্তথা অচিরে হয় এ জন্মের মত  
 ইসলাম-গৌরব-রবি ডুবিবে অতলে ।  
 মারাঠার মত হেন পিষাচ বর্ষার  
 বোধ হয় কেহ আর নাই ধরাতে ।  
 পাপীদের অত্যাচারে মরিলে মুহূর্তে  
 হৃদয়ের রক্তে রক্তে শিরায় শিরায়  
 প্রতি রক্ত বিন্দু সনে কি যে এক বহি  
 উঠে জলি, মুখে তাহা বলিব কেমনে ?  
 আমার বিধবা ভগ্নী মাহের বেগম  
 ধর্ম কর্মে অনিরত যাপিত জীবন ।  
 পাপ হ'তে সে ছঃখিনী থাকিত সুদূরে  
 দিবা নিশি, বীতশুভ বিলাস বাসনে ;  
 হজ ও নমাজ রোজা ভিন্ন কিছু আর

জানিত না সে ছঃখিনী, পবিত্র হৃদয়ে  
 যাপিত জীবন সদা ভজন পূজনে ।  
 মহারাষ্ট্র দস্যগণ ব'বেছে তাহারে  
 গুপ্ত ভাবে নিশাকালে পশি তার গৃহে ।  
 মোস্তেম রমণী বন্দে পথে ঘাটে ধরি  
 করিয়াছে বেআখাত এই দস্যদল ।  
 আরো যে কত কি তারা পাপ অজ্ঞান  
 করিতেছে প্রতিদিন, হেরিলে নয়নে  
 কে আছে মোস্তেম হেন পারে সহিবারে ?  
 প্রতিহিংসা-বহি মম হৃদয়-কন্দরে  
 জলিতেছে অশ্রুক্ষণ, প্রতিজ্ঞা আমার  
 যেখানে যে ভাবে পারি ধ্বংসিব তাদেরে ।”

হেন কালে মহা দর্পে একটি যুবক  
 স্ফূট কবচাবৃত পশিলা শিবিরে ;  
 হস্তে তার তীক্ষ্ণ ধার বর্শা ভয়ঙ্কর,  
 অগ্র ভাগে মহারাষ্ট্র সৈনিকের মুণ্ড  
 কুধিরাক্ত, নিরখিলে ভয় হয় মনে ।  
 স্তম্ভিত বীরেন্দ্র বন্দ নিরখি সে দৃশ্য  
 বিস্ময়ে আকালী সাহা জিজ্ঞাসিলা তারে  
 “মারু বেগ, কোথা হ'তে আইলে এখন ?  
 কাহার এ মুণ্ড তুমি এনেছ গাঁথিয়া  
 বরশার অগ্রভাগে ?” উত্তরিল বীর  
 “গিয়াছিল কুঞ্জপুরে, দেখিলু যে দৃশ্য  
 সেই স্থানে, মরি তাহা বিদরে পরাণ ।  
 বিধ্বস্ত সে ছর্গ হার অনলে অসিতে  
 চিহ্ন মাত্র নাহি তার—ভীষণ শ্মশান ।  
 স্থানে স্থানে ভূপাকারে রয়েছে পড়িয়া  
 মোস্তেমের শবদেহ, বিজোহী মারাঠা  
 প্রতিদিন নানাক্রমে ঘোর উৎসাহে

অর্ধরিত্ত করিতেছে যোগেশ্বর সকলে ।  
 পথি মাঝে এক দিন কিরিবার কালে  
 দেখিল পাঁচটি ভীম মারাঠা সৈনিক  
 একটি যোগেশ্বর বাড়ী করি আক্রমণ  
 বধিয়াছে গৃহ স্বামী, পায়ণ্ড সকল  
 তিনটি সহায়হীন। শূন্য বালিকারে  
 ধরি বলে অত্যাচার করিতে উত্তত ;  
 হেরি তাহা প্রাণ মোর উঠিল আলিয়া  
 ক্রোধানলে, চারিদিকে করেছি নিহত  
 এই অস্ত্রে, এ পাণিষ্ঠ সেনানী তাদের ;  
 অনেক যুদ্ধের পর ব'ধেছি ইহারে ।  
 এইরূপ নানা স্থানে ঘোর উৎপীড়ন  
 করিতেছে মহারাষ্ট্রী দিল্লী আক্রমিয়া  
 তাজিয়া কেলেছে কত মর্ম্মর প্রাসাদ  
 মনোহর, কামানের গোলা বরিষণে ।  
 বহু যোগেশ্বরে বধি নিয়াছে লুটিয়া  
 অগণিত ধন রত্ন ; কত যুবতীর  
 স্বামীয়ে বধিয়া তার সতীত্ব রতন  
 হরিয়াছে দম্ভাদল, কত জননীর  
 কোলের সন্তান হরি জনমের মত  
 ডুবাইয়াছে হুঃখিনীয়ে শোকের সাগরে ।  
 পায়ণ্ড বিজোহীগণ অনল অগ্নিতে  
 যোগেশ্বরের ঘরে ঘরে করেছে শ্মশান,  
 কেমনে সে দৃষ্ট হার দেখিব নয়নে ?  
 কখনো একবার করিলে দর্শন  
 সেই দৃষ্ট, যোবে কোড়ে অলে উঠে প্রাণ ।  
 কি আর বলিব আমি সে হুঃখের কথা,  
 দিল্লী কুতূবুর আভি ভীষণ শ্মশান ।  
 লক্ষ লক্ষ মূল্যমান থাকিতে জীবিত  
 মূল্যমান মৃত্যুর মেনে অপমান

কেমনে সহিছ বল, —লজ্জা নাই মনে ?  
 খোল আমি—রণ ক্ষেত্রে হও অগ্রসর,  
 রমণীর মত কেন করিতেছ ভয়  
 তুচ্ছ ক্ষীণজীবী সেই মারাঠা তব্বরে ?  
 সচ্চি ?—তাহা মিথ্যা কথা, হলনা কেবল  
 বিশেষতঃ কার সনে সচ্চির নিগড়ে  
 হবে বদ্ধ ?—নহে তারা রাজ্যের ঈশ্বর ?  
 বিজোহীর সনে সচ্চি ? প্রজা হ'য়ে যারা  
 রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্র করিয়া ধারণ  
 আলিয়াছে চারিদিকে অশান্তি-অনল ;  
 তাহাদের সনে সচ্চি ? এ লজ্জার কথা  
 কেমনে আনিলে মুখে বীরেন্দ্র সমাজে ?  
 হেঁড়ে দেও সেই কথা, এ'স রণ-ক্ষেত্রে,  
 রাজদ্রোহী পশুদের অস্পৃশ্য শোণিতে  
 ডুবাইব রণস্থল, ভেবে দেখ মনে  
 রাজদ্রোহিতার মত গুরুতর পাপ  
 নাহি আর ধরা তলে, যে পায়ণ্ডগণ  
 এহেন কুকার্য্যে লিপ্ত বধিয়া তাদের  
 এই তীক্ষ্ণ তরবারে, রক্তিব যতনে  
 ইস্লামের অতুলিত পবিত্র গৌরব ।  
 কাপুরুষ যারা, তারা যা'ক জাহান্নমে,  
 যা'ক তারা চির তরে নরকের পথে,  
 কি লাভ তাদের এই স্থণিত জীবনে ?  
 বীর যারা, এস তারা ইস্লামের তরে  
 দিব প্রাণ অকাতরে সমুখ সমরে !”  
 বিহ্যত গতিতে বীর ত্যজিয়া শিবির  
 গেলা চলি, পরস্পর রহিলা চাহিয়া  
 বীর বৃন্দ—যেন সবে প্রস্তর মূর্তি ।  
 কিছুকণ পরে পুনঃ কহিলা আত্মাঙ্গী  
 “কি ভীষণ ভেদখীতা, বস্ত্র মারুবেন ।







মহাশয়ের দীর্ঘ বার্তা ও সমান  
মোস্তুকের সেই রবি জ্যোতিমান,  
সেই মহা ঐশ্বর্য্য সৌন্দর্য্য মহান,  
দস্যু সদাশিব ফেলিল গ্রাসি।  
সে মহা মহিমা অনন্ত গৌরব,  
বীরব বীরব পাণ্ডিত্য বৈভব,  
কোটি কঠে সেই “দীন দীন” রব  
কোন্ পাপে হায় বুচিয়ে গেল।  
হা বিধি দারুণ। এ কি লীলা তব  
এ দুঃখের কথা কার কাছে ক’ব  
এ বর্ষ বেদনা কত আর স’ব  
গেল যা’ তা’ আর ফিরে না এ’ল।

ভারত-আকাশে আকবর যখন  
ছিল সবুদিত, হায়রে তখন  
কি শোভা সম্পদ, কি ধন রতন  
ছিল পরিপূর্ণ ভারত বুকে।  
আজকের যবে যোর পরাক্রম  
শাসিত ভারত ভে’বে দে’ শুষ্টিয়া  
ইস্লাম সৌভাগ্য মধ্যাহ্নে  
ছিলরে তখন কতই সুখে।

ভারতের সেই সম্রাট প্রধান,  
বার্ত্তগের সব বীর সাজাহান,  
শিবী-সিংহাসন করিয়া নির্দ্বাপ,  
যসিলা যখন দেবেদ্র প্রায়।  
কোটি কোটি কঠে হ’ল জয়স্বনি,  
নিরে তার দীর্ঘ কোহিনুর মনি,  
ভারত তখন ঐশ্বর্য্যের বনি,  
সে দিন আজিরে কোথায় হায়।

নিবাতীর বংশ তব্বর প্রধান,  
মোবার সাম্রাজ্য ক’রেছে শূণ্যান,  
জমিনী ভগিনী ভরে গ্রিসমান  
কি বটে কাহার ভাগ্য কে জানে ?  
যবে যবে আজি হোলেন্দর-স্বনি,  
হংসিরাছে বেন যোর কাল কবী,  
হৃদয়ে ভীষণ অনলের বনি,  
এ যাতনা আর সহেনা প্রাণে।

কি কঠোর প্রাণে সেই দস্যাদল  
সে মোবার দিল্লী দিল রসাতল,  
না মুছিতে সেই নয়নের জল,  
কুশপুর বুকে হানিল ছোরা।  
গেল স্বাধীনতা, গেল ধন মান,  
পদে পদে আজি যোর অপমান,  
কে ক’বে ইহারা মোস্তুম-সন্তান,  
কেশবীর যের শৃগাল মোরা।

কামানের কত গোলা ভয়ঙ্কর,  
গভীর বর্ষরে কাঁপা’য়ে ভূধর,  
ভাঙ্গিল অসংখ্য প্রাণদ স্তম্বর  
যোর আর্ন্তনাদ দিল্লীর মুখে।  
ছিনু নেজামদ্দী-সমাধি মন্দিরে,  
দস্যু সদাশিব ভাঙ্গিল তাহারে  
পড়িনু বিপদে অদৃষ্টের ফেরে,  
পাষণেব চাপ পড়িল বুকে।  
আজি বর্ষদুঃখে ভাসি অশ্রু জলে,  
থাকি অনাহারে বিটপীর মূলে,  
গাই বন খুলে তটিনীর কূলে,  
সে দুঃখ যাতনা বলিব কত।  
মোস্তুমের আর নাই সেই দিন,  
‘মোস্তুম-সন্তান বিঘাদে মলিন,  
নাহি সে ঐশ্বর্য্য দেহ শক্তিহীন,  
আজিরে তাহারা জীবনে মৃত ?

গিয়াছে সে দিল্লী গেছে ধনমান,  
গিয়াছে সাহিত্য, গিয়াছে বিজ্ঞান,  
মোস্তুম-সন্তান আজি হীনমান,

ভাসিছে কেবলি নয়ন জলে।  
সকলি গিয়াছে বাকী কি র’য়েছে,  
শূণ্যানের ভয়া উড়িছে পড়িছে,  
শকুনি গৃধিনী ভাকিছে হাকিছে

ভ’বেছে সকলি বারিধি-তলে।

হা বিধি। এ দুঃখ সহিব কেমনে,  
সকলি যে গেল অদৃষ্টের সনে,  
যা ছিল সকলি পুড়িল আগুনে,

দেখিয়াও বেন দেখনা তুমি।  
পেটে নাই অন্ন, হৃদে নাই বল,  
দেহে নাই বস, ধবনী অচল,

মোয়েসের ভাগ্য অনন্ত পরল  
সোনার সাম্রাজ্য শ্মশান তুলি

কে আছে জগতে মোয়েস এমন,  
এ ঘোর দুর্ভাগ্য করি দরশন,  
কণ্ডারে বার নাহি কাঁদে মন,

নাহি ভাগে বৃক্ষ নয়ন-জলে ?  
প্রতিশোধ-আশে না-বাঁধে হৃদয়,  
নাহি ধরে অস্ত্র অগ্নি কণাময়,  
বস্ত্র প্রহরণ নাহি হৃদে লয়,  
না রাখে মস্তক কৃপাণ-তলে ?

জাগোরে মোয়েস, জাগো একবার  
ধর দৃঢ় করি অগ্নি ধরধার,  
মারাত্মক বক্ষ করিয়া বিদার,

লও প্রতিশোধ ভীষণ বলে ।  
কি ভয় কি ভয় কি ভয় তোমার,  
জন্মিলে মরণ বিধি বিধাতার,  
অই যে উন্মুক্ত স্বর্গের দুয়ার,  
এখনি যাইবে সমরে ম'লে ।

তবে কার ভয়ে ভাবিছ নীরবে,  
কাপুরুষ প্রায় ব'লে আছ স'বে  
কাঁপাও বহুলা "দীন দীন"রবে  
পেশবা তরুরে ক'রনা ভয় ।  
ধর বস্ত্রমুঠে ভীষণ কৃপাণ,  
এ ধর্ম-সমরে দেও বলি প্রাণ,  
শত বহুনাগে গজ্জুক কামান,  
গাও ভীম স্বরে "ইসলাম জয় ।"

সঙ্গীতের প্রতি তানে প্রত্যেক উচ্ছ্বাসে  
বহিল অনল-কণা মোয়েস হৃদয়ে ।  
সমস্ত সেনানী, নৈস্ত চিত্রাচিত্র প্রায়  
স্পন্দহীন, শুনি সেই দীপক সঙ্গীত ।  
অমনি দোরাদী সাহা করিলা আদেশ  
দৌবারিকে "যাও শীঘ্র আনিতে গায়কে  
যম কাছে," তখনি সে গেল চলি দ্রুত

ছাউনির বহির্ভাগে ; কিছুক্ষণ পরে  
একটি ককির সহ করিল প্রবেশ  
সভাস্থলে, সকলেই রহিল চাহিয়া  
নীরবে সে ক্ষীণকায় ককিরের পানে ।  
সন্মুখে তুলিয়া আঁখি দোরাদী তখন  
সুধাইল। সুধাকণ্ঠে তাপস প্রবরে  
"কোথায় আশ্রম তব ? এ বৃদ্ধ বয়সে  
কেন বাবা, দেশে দেশে উন্মত্তের মত  
বেড়াও কাঁদিয়া ? কোন আত্মীয় স্বজন  
নাহি কি সংসারে তব ? বল কি উদ্দেশে  
ভ্রমিয়া সংসার, বাবা সেজেছ সন্ন্যাসী ?"  
নীরবে তাপস-নেত্রে শোক অক্ষ-ধারা  
ঝরিতে লাগিল, ধীরে কহিলা সন্ন্যাসী  
"বাড়ী ঘর সঙ্গে মোর, কেহ নাই ভবে,  
লাহোরের মহাবীর মেহেদি বেগের  
পুত্র আমি, এ সংসার ভ্রমি মন-হুঃখে  
ছিলাম সুখে নেত্রামদী-সমাধি মন্দিরে ;  
মহারাত্রি দম্ভ্য তাহা ভ্রমিল সমরে,  
ভ্রমিল সমরে বাবা কত অট্টালিকা  
মণিময়, ভাবিতেও হৃদয় বিদরে ।  
দরিদ্র ভিক্ষুক আমি অতি দীন হীন  
তাড়াইল মোরে দম্ভ্য দিল্লীর বাহিরে,  
গৃহস্থ তাড়ায় যথা অস্পৃশ্য কুকুরে ।  
সেই দিন যে আঘাত পাইল হৃদয়ে,  
গেল না জীবনে তাহা, ভিক্ষকের বেশে  
তাই আজি পথে ঘাটে যেখানে সেখানে  
পাইব এ মহা গীত, মোয়েস হৃদয়ে  
করিব আবার বাবা জীবন সঞ্চার ।"  
চলি গেল। দ্রুতবেগে তেজস্বী ককির  
ভ্রমিয়া সে সভাস্থল, বীরেন্দ্র নিচর

পাষাণের বৃষ্টি প্রায় নীরব নিঃশব্দ।  
 কহিল। দোরানি সাহা জীবুত নিঃশব্দে  
 “জানিতে বাসনা মম এ ধর্ম সমরে  
 ভারতীর মোস্লেমের কি ইচ্ছা এখন ?”  
 “কি ইচ্ছা ?” গভীর স্বরে কহিল। নজীব  
 “রণস্থলে অগ্নিবর্ষা কামানের মুখে  
 পাতি বক ল’ব ক্ষুদ্রে অশনি ভীষণ।  
 অস্ত্রাঘাত ভীষণ যুদ্ধে রঞ্জিব ভারত  
 মারাত্মক সত্ত রক্তে মোদের মনন।”  
 পশ্চাত্ত হইতে কোণে করি আফালন  
 কহিল। আশির বেগ “ইচ্ছা আমাদের  
 ডুবাইতে মহারাষ্ট্র শোণিত-সাগরে ;  
 ডুবাইতে অর্ধ গুরু প্রবঞ্চক দলে  
 বঙ্গ সাগরের গর্ভে, চূর্ণ চূর্ণ করি  
 দেব গৃহ, ডুবাইতে কৃষ্ণার সলিলে।”  
 “ইচ্ছা কি এ ধর্ম যুদ্ধে ?” কহিল। গর্জিয়া  
 সেনাপতি জেহান<sup>\*</sup> খাঁ “কর্তব্য মোদের  
 মারাত্মক সত্ত রক্তে রঞ্জিয়া এ অসি  
 লইতে সে প্রতিশোধ ; পাষাণ সকল  
 অনলে অসিতে হায় দিবস শরীরী  
 দিতেছে যে মর্মব্যথা, যন্ত্রণা ভীষণ,  
 কেমনে তুলিব তাহা ? যোর অত্যাচারে  
 মোস্লেমের অস্থি মজা করেছে পেষণ।  
 আজি তার প্রতিশোধ সময় প্রাপ্ত  
 প্রদানিব, দেখাইব মোস্লেম-বিক্রম।”  
 কহিল। বঙ্গ • বীর জলদ-নিঃশব্দে  
 “আমারো ইহাই মত ; কাসিয়া কাকেরে  
 মোস্লেম-সাজ্জাদ্য-ভিত্তি করিব স্থাপন  
 দূর করি পুনর্বাস, সমগ্র ভারত

হইবে কাসিয়ায় “আজা আজা” রবে ;  
 সেই দিন আশা মম হইবে পূরণ।”  
 “সকলেরি ইচ্ছা তাহা” কহিল। উজির  
 সাহাবুরি “এ অগতে কে আছে এমন  
 মোস্লেম কুলের প্রানি, মোস্লেম উখানে  
 যে নহে প্রকৃত চিত্ত’ মোস্লেম পতনে  
 নাহি করে ক্ষণ তরে বাহার নয়ন।  
 “থাকিবে না কেন ?” ধীরে কহিল। নজীব  
 “এ অগত মহাক্ষত্র, পুণ্যস্থান সনে  
 মোস্লেম কুলের কত নরাকৃতি পশু  
 নিবসিছে এই স্থানে, পাপিষ্ঠ আদিনা  
 প্রত্যক্ষ প্রমাণ তার, মোস্লেম বিপক্ষে  
 কেমনে ধরেছে অসি পেশবার সনে।  
 পাষাণের গুপ্তচর গভীর নিশিতে  
 পশিয়া শিবিরে মম প্রহরীর বেশে  
 কেমন ভীষণ অস্ত্রে আঘাতিল মোরে।  
 বিধাতার অমুগ্ধে বাঁচিছু সেবার ;  
 বধিলাম সেই দণ্ডে পাষাণ বক্ষরে  
 ভীক অস্ত্রে ; মৃত্যু কালে বলিল পাষাণ  
 মঙ্গল তাহার নাম দস্যু দলপতি  
 আদিনার আজামত এসেছিল পানী  
 বধিতে আমারে, আর দোরানী সাহায়।  
 কত স্থানে আদিনার করিছু সন্ধান  
 কত দিন, কোন স্থানে না পাইছু তারে।  
 নরাদম সেই তরে পলাতক এবে।”  
 বাধা দিয়া ভীত স্বরে কহিল। দোরানী  
 “কথা বাক্য কালক্রম কেন কর সব ?  
 আপন কর্তব্য এবে কর নির্ধারণ,  
 কি তাহে করিবে যুদ্ধ, দলিবে কেমনে

\* জাহাঙ্গীর খাঁ বঙ্গ।

মহারাজী দম্ভাঙ্গলে, না ভাবিরা তাহ।  
 কি সত্তিবে তর্কযুদ্ধে ? বক্তৃতা-সমরে  
 ভারতের বক্ষ হ'তে যাবে কি উঠিরা  
 দম্ভাঙ্গের পদ-চিহ্ন ? মোস্তফা-সাম্রাজ্য  
 হইবে কি নিরাপদ ? তবে অনর্থক  
 বাক্য বুদ্ধ নাহি চাহি, হও অগ্রসর  
 সম্মুখ সমরে, ধ্বংস করিতে কাকেরে  
 বাহু বলে, বাক্যবীর হেয় সর্ব্বস্থলে,  
 রণ বীর পূজনীয় বীরেন্দ্র সমাজে ।  
 অতএব তর্ক ছাড়ি সাজ রণ সাজে,  
 অতাই করিব যাত্রা নিশীথ সময়ে ;  
 এত দম্ভ, এত স্পর্ধা, এত অপমান  
 কেমনে সহিবে বল ? পাষাণ সকল  
 ধ্বংসিয়া দিল্লীর দুর্গ ধ্বংসি কুজপুর  
 অহঙ্কারে ক্ষীণ বক্ষ, ছলনা কেবল  
 মুখে সন্ধি, করে অসি ঘোর প্রবঞ্চক ।”  
 হেন কালে সুজাউদ্দৌলা প্রবেশি শিবিরে  
 বসিলা নির্দিষ্ট স্থানে, অযোধ্যা-সৈনিক  
 “জয় সুজাউদ্দৌলা” বলি উঠিলা গর্জিয়া ।  
 সহাস্ত্রে অযোধ্যাপতি কহিতে লাগিলা  
 দোরানীর পানে চাহি বিনম্র বচনে  
 “সদাশিব সন্ধি প্রার্থী, মহারাষ্ট্র-দূত  
 সন্ধি আশে এ'সেছিল শিবিরে আমার ।  
 ক্ষতি কি করিতে সন্ধি আর্থ আমাদের  
 করি রক্ষা ? বিনা যুদ্ধে বিনা লোক কয়ে  
 স্বকার্য সাধিত হ'লে কি ক্ষতি সন্ধিতে ?  
 বিশেষতঃ সন্ধি হ'লে লক্ষ লক্ষ প্রাণী  
 বেঁচে যাবে, যুদ্ধ হ'লে সমর প্রাঙ্গণে  
 লক্ষাধিক মুসলমান হ'বে না কি হত ?  
 এত গুলি জীব হত্যা ? ভাবিতে হৃদয়

উঠে না শিহরি, পাপ হ'বে না কি ইথে ?  
 আমি বলি বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্ত নাতে  
 স্বকার্য সাধিত হ'লে প্রভূত মঙ্গল ।”  
 নীরবিল। সুজাউদ্দৌলা, কহিল আকাশী  
 “নির্বোধ বালক তুমি, কি বুঝিবে বাবা  
 যুদ্ধ নীতি ? মহারাষ্ট্রী দম্ভার অধম  
 নহে তারা বীর জাতি, দম্ভার নিকটে  
 কোন্ লাভ বীর ধর্ম্ম ? কর্তব্য মোদের  
 ধ্বংসিতে সে দম্ভাবৃন্দে, যেন ভবিষ্যতে  
 হেন স্পর্ধা কভু আর না করে কখন ?  
 নজীবের অস্ত্ররোধে এসেছি ভারতে  
 রক্ষিতে মোস্তফা বৃন্দে, তাহার অমতে  
 কেমনে করিব সন্ধি ? আমি চ'লে গেলে  
 পাষাণেরা পুনর্ব্বার ধরি নিজ মূর্ত্তি  
 ঘোরতর নির্যাতিত করিবে মোস্তফা ।  
 বুধা এ সন্ধির কথা আনিওনা মুখে,  
 নিশ্চয় হ'বে না সন্ধি, সমর প্রান্তরে  
 দম্ভাদের উচ্চ রক্তে এ জন্মের মত  
 লিখিব যে সন্ধি পত্র উলঙ্গ কপাণে  
 সেই সন্ধি আমাদের বাহনীয় এবে ।  
 অস্ত্র কোন সন্ধি সত্তে নাহি প্রয়োজন ।  
 যত দিন এ বাসনা অপূর্ণ রহিবে,  
 নারিব রক্তিতে অসি, তত দিন আমি  
 করিব না সুখ ভোগ,—প্রতিজ্ঞা আমার ।  
 ইহা যদি নাহি করি, কিংবা নাহি পারি  
 কাপুরুষ আমি, আমি নহি মুসলমান ।  
 এ বিশ্ব হইলে ধ্বংস ভাজিলে গগন,  
 চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, এ সৌর জগৎ  
 হইলে বিধ্বস্ত, আমি রহিব অটল ;  
 আমার প্রতিজ্ঞা নাহি টলিবে কখন ।

কি কাজ বিলম্বে আর, সাজ সবে শীঘ্র,  
 অতাই নিশীথ কালে উঠাও ছাউনি।  
 রসদ অথবা অর্থ যেখানে দেখিবে  
 দস্যুদের, যুহুর্ভেকে করিবে লুণ্ঠন।  
 সাবধান এ আদেশ পালিও সতত,  
 করিওনা অবহেলা থাকিতে জীবন;  
 ভারতীয় নিরাশ্রয় মোস্তামের তরে,  
 ততোধিক ইস্তামের রক্ষিতে গৌরব  
 তেরাগিরা। অশুভুমি, জননী ভগিনী,  
 তেরাগিরা পুত্র কন্যা আশীর স্বজন  
 অর্দ্ধাঙ্গিনী, ত্যজি হার রত্ন-সিংহাসন  
 তুচ্ছ গণি এ জীবন, প্রাণের আনন্দে  
 দিল্লু স্বপ্ন এ ভীষণ সংগ্রাম-সাগরে।  
 মরি বাঁচি হুঃখ নাই, অমর কে তবে ?  
 কি কাজ বিলম্বে আর ?—সাজ রণ-সাজে  
 ন্মপশিয়া একাএ চিত্তে পবিত্র কোরান  
 হও রণে অগ্রসর, কর এ প্রতিজ্ঞা  
 ফিরিবে না গৃহে আর থাকিতে জীবন  
 না ধ্বংসিয়া দস্যুবৃন্দে সমুখ সমরে।  
 পারিবে না এ প্রতিজ্ঞা করিতে পূরণ ?  
 পারিবে না বীর বেশে নর অসি করে  
 কাফেরের সত্ত রক্তে রঞ্জিয়া ভারত  
 ইস্তামের অরুণনি করিতে ঘোষণা ?  
 —না পার, জলধি গর্ভে অতল সলিলে  
 এ অস্ত্রের মত সবে হও নিমগন।”  
 “পারিব না ?” বজ্রনাদে গঞ্জিলা নজীব  
 পারিব না ? এ ভূজ কি এতই দুর্বল ?  
 এ ভূজ কি তুচ্ছ হার সৌন্দর্যের তরে ?  
 অথবা কি তুচ্ছ হি হি কামাঙ্কের মত  
 রমণীর কণ্ঠ বেগ করিতে ধারণ।

না না.—তাহা নহে, এ যে ভীষ্ম লৌহ-দণ্ড,  
 এ নহে রমণী-কণ্ঠে সুবর্ণের হার,  
 এ ভূজ কৃপাণধারী, বিশ্ব-ধ্বংসকারী  
 এ ভূজ বিশ্বশ্রীকুলে করিতে সংহার।”  
 নীরবিলা বীর শ্রেষ্ঠ, যুহুর্ভের মাঝে  
 সৈন্তদের হুহুকারে, অস্ত্রের বন্ধারে  
 হাহডেরা মহাতঙ্কে উঠিল কাঁপিয়া।  
 সাধিতে প্রলয় ঘোর কালান্তক বেশে  
 ভীষণ বারিষি যেন উঠিল গঞ্জিয়া।  
 আবার ভীষণ স্বরে গঞ্জিলা নজীব  
 “ভয় কারে ? এ জীবন নহে চিরস্থায়ী,  
 তবে কেন, বীর হ’রে কাপুরুষ প্রায়  
 বীর ধর্ম, ততোধিক ইস্তামের নামে  
 কলঙ্ক-কালিমা হায় করিব লেপন ?  
 ডরি না দেবতাবৃন্দে,—মানব কি ছার ?  
 এই অসি রণক্ষেত্রে বিছাতের বেগে  
 পেশবার বক্ষস্থল করিবে বিদার।  
 এ’স সবে রণক্ষেত্রে সমুখ সমরে  
 দিব প্রাণ বীর বেশে স্বধর্মের তরে।  
 আমরা বীরের পুত্র, ডরি না শমনে  
 আনন্দে হৃদয় পে’তে লইব অশনি।  
 সাজ তবে বীরবৃন্দ, বিলম্ব না সহে  
 হও অগ্রসর, অসি খোল ধরধার  
 মারাঠার সত্ত রক্তে লও প্রতিশোধ  
 ভাসায়ে ভারত বক্ষ, ভয় কারে আর ?  
 উঠ উঠ, কেন, হিহি রহিলে বসিয়া ?  
 কেমনে দেখাবে মুখ বীরেন্দ্র সমাজে ?  
 মোসুলেমের রক্ত বিন্দু বহে না কি স্রমে ?  
 ইস্তামের পূর্ণ তেজ নাইকি শোণিতে ?  
 কেন তবে চিন্তাকুল ?—হও অগ্রসর,

ধর অসি বজ্র মুঠে, “দীন দীন” রবে  
 “উড়াও সে অর্ধচন্দ্র”—কাঁপাও অধর।  
 উঠিল ভীষণ রোল সে মহাশিবিরে ;  
 নিত্ৰোখিত সিংহ প্রায় সমগ্র মোক্ষম  
 দাড়াইলা অসি হস্তে, উঠিলা গর্জিয়া  
 “দীন দীন” ; ভারতের ভবিষ্য ললাটে  
 কি এক ভীষণ রেখা করিয়া অঙ্কিত

মুহুর্তে উলঙ্গ অসি উঠিল বলিয়া  
 শির’ পরে লক্ষ লক্ষ মোক্ষমের করে।  
 হেরি সে ভীষণ দৃশ্য কাঁপিল ভুবন,  
 কাঁপিল দেবতা দৈত্য গন্ধর্ব্ব কিয়র,  
 কাঁপিল সে স্বর্গ মর্ত্য কাঁপিল প্রকৃতি,  
 সঙ্কয়ে রক্তিম ভাঙ্গু মুদিল নয়ন।

— — —



## একবিংশ সর্গ

[কুঞ্জপুর — মহারাষ্ট্র-শিবির ; সদাশিবের ভীষণ আদেশ]

কুঞ্জপুর ; সদাশিব বসিয়া নীরবে  
বিষন্ন মলিন মুখ ; দক্ষিণে তাহার  
প্রবীণ সন্ন্যাসী এক দীর্ঘ অটোধারী ।  
অস্ত্রাস্ত্র বীরেন্দ্রকুল বামে ও দক্ষিণে  
বসি স্ব স্ব স্থানে স্নান গম্ভীর বদন ।  
অনুরে বালিকা এক সজল নয়নে  
দাঁড়ায়ে নীরব, যেন গোলাপের কলি  
অর্ধফুট প্রত্যন্তের শিশির মণ্ডিত ।  
সদাশিব ক্রোধ ভরে কহিতে লাগিল।  
“হিরণ, ছি ছি ছি, তব উচ্ছ্বল মতি,  
মহারাষ্ট্র বালিকার হেন খেচ্ছাচার  
নহে মার্জনীয়, তব শিরায় শিরায়  
এখনো মারাঠা রক্ত আছে প্রবাহিত,  
কোন্ মুখে তুমি আজি বলিলে এখানে  
আতর্থা তোমার স্বামী, ঘৃণা কি হ'লনা  
আনিতে একথা মুখে ? স্নেহ হ'তে আজি  
এত সাধ ? প্রদানিয়া বালানাথ-মুখে  
কলঙ্ক-কালিমা ছি ছি জনমের মত ?”  
ভাণ্ডারের কথা শুনি ভাবিল। হিরণ  
মনে মনে, এষে দেখি বড় দুঃসময় ।  
যদি আমি লজ্জা করে চেপে থাকি তবে  
কোন কথা নাহি বলি, তা হলে ইহারা  
অপদস্থ পদে পদে করিবে আমারে ।  
লজ্জার এ মুখ মোর ছেট্ হয়ে যাবে  
বিনা দোষে চিরন্তরে অগভের কাছে ।  
সকলেই কলঙ্কিনী বলিবে আমারে  
ইহাদের কথা শুনি, ধর্মের নিকটে

আমি কিন্তু নিহলঙ্ক, লোকে না বুঝিবে  
অতএব এই বেলা দিব ইহাদের  
উপযুক্ত প্রত্যুত্তর, যা থাকে কপালে ।  
তার পর ক্রোধভরে ঐবা বঁকাইয়া  
কহিল। বালিকা “ঘৃণা ?—কেন হবে ঘৃণা ?  
পেশবার বংশে তুমি মহাবীর ব'লে  
খ্যাতি এ ভারত ভূমে, কোন্ মুখে আজি  
বলিলে আমারে তুমি ‘স্নেহ হ'তে ছি ছি  
এত সাধ ?’ শত ধিক তোমারে বীরেন্দ্র  
ভ্রাতার মস্তকে ছি ছি হেন পদাঘাত  
বীর হ'য়ে বুঝি কেহ পারেনা করিতে ;  
তোমরা বলিলে তারা হইবেন। স্নেহ,  
আপনার ঘরে ব'সে যা' ইচ্ছে তা' বল  
তোমাদের গালি রবে তোমাদেরি মুখে  
হে বীরেন্দ্র, তাহাদের কোন্ ক্ষতি হ'বে ?  
মুসলমান স্নেহ নহে, নহে নীচ জাতি,  
অনর্থক গালি কেন দেও তাহাদেরে ?  
একই পিতার পুত্র হিন্দু-মুসলমান—  
—পরস্পর ভাই ভাই, নহে তারা পর,  
ভ্রাতার অনিষ্ট ভ্রাতা করিতে কি পারে ?  
কাজ নেই ভ্রাতৃ মনে করিয়া বিরোধ ;  
জাতি ভেদ ভুলে যাও, হিন্দু-মুসলমান  
ভারতের প্রিয় পুত্র—সবি এক জাতি ।  
ভাষিয়া কলহ স্বার্থ বগড়া বিবাদ  
হিংসা ঘেঁষ, পরস্পর বিবাহ-বন্ধনে  
হও বদ্ধ, অচিরেই কলিবে অমৃত,  
ভারত দ্বিতীয় বর্গে হবে পরিণত ।

হু' জাতি হয়ে বহু সে পুত বহুনে  
পুতুলের পূজা ছাড়ি, পুজ' তক্তি তরে  
নিরাকার নির্বিকার সর্বশক্তিমান  
সর্ব'ধর্মী সর্ব'ব্যাপী পতিত পাবনে।  
পুতুলের পূজা করি কেন অনর্থক  
বাড়াও পাপের বোকা নিব্বোধের প্রার ?  
যদিও বালিকা আমি, সব কথা জানি,  
বহু হিন্দু মহারাজা ভারত-গৌরব  
আপনার কস্তা-ভগ্নী মোস্তেসের সনে  
পুত পরিণয়-পাশে করিয়া বহু  
আপনারে সম্মানিত ভেঁবে গেছে মনে।  
হিন্দুদের পূজনীয়া কত রাজ-বালা  
পদ্মাবতী-স্বর্ণময়ী যোধ যোধ বাদী  
হ'য়েছিল মোস্তেসের জীবন সঙ্গিনী।—  
—তার। কি ঘণার পাত্রী ? অশেষ সম্মান  
লভেছিল। তার। এই উত্তর সমাজে।  
সে কথা কি একবারে ভুলে গেছ তবে ?  
আজি সে মোস্তেসগণ রোচ্ছ নীচজাতি,  
নারী আমি, হেন নীতি জানিনে কেমন ;  
মুসলমান রোচ্ছ নহে ; কি গুণে তোমরা  
মোস্লেম হইতে শ্রেষ্ঠ ? প্রতিমা পূজক  
মহারাত্রী, মুসলমান একেশ্বর বাদী,  
ইসলাম তাদের ধর্ম পবিত্র নির্মল  
পাপের আবিল্য তাহে নাহি কণা মাত্র,  
তোমাদের মত তারা নহে বেচ্ছাচারী।  
তাহাদের ব্যবহার আচার বিচার  
ধর্ম-নীতি সকলি যে পবিত্র নির্মল।  
নহি বেচ্ছাচারী আমি, মিথ্যা অপবাদ  
দিওনা আমারে তুমি এ বীর সমাজে ;  
বেচ্ছাচার কিসে তুমি দেখিলে আমার ?

আতর্থা' আমার বামী, আমি দাসী তার,  
ধর্ম'মত সে আমার আরাধ্য দেবতা,  
একবার কেন ?—আমি বলি শতবার  
আতর্থা' আমার বামী, জন্ম-জন্মান্তরে  
আতর্থা'রে বামী রূপে পাই যেন আমি।  
আজিও সে গুরুদেব তোমারি সম্মুখে  
সমাসীন, যিনি মোরে আতর্থা'র করে  
ক'রেছিল। সম্প্রদান শিবের সম্মুখে  
যোগাঙ্গমে,—একবার শ্রুধাও তাঁহারে,  
তোমাদের বংশধর পাবও দিলীপ  
একদিন হিরমস্তা মন্দিরের কাছে  
করেছিল কত চেষ্টা করিতে আমার  
ধর্ম'নাশ, অসহায় আমি একাকিনী  
কত কেঁদেছি, কিন্তু পণবণ্ডের মনে  
হইল না তিল মাত্র দয়ার সঞ্চার।  
আমার চীৎকারে শেষে আতর্থা'। বাইয়া  
করেছিল রক্ষা মোরে পাবও-কবলে।  
গুরুদেব তুনে তাকা সমপিয়া মোরে  
তার করে পরীক্ষণে করেছিল। তারে  
পুরকৃত সে সময়, শ্রুধাও তাহারে  
সত্য মিথ্যা, বেচ্ছাচারী বলনা আমারে।"  
উপেকার হাসি হে'লে সন্ন্যাসী তখন  
কহিতে লাগিল। "আমি সপেছিলাম তোমা  
যার করে, সেত নহে মোস্লেম যুবক,  
নাম তার অমরেন্দ্র শিষ্য সে আমারি।  
বহু দিন তাদের আমি কত দেশ পরী  
খুঁজিয়াছি কিন্তু কোথা না পাইলাম তারে,  
তুনেছি মোস্লেম দলে মিশেছে এখন  
নরাধম।" বাধা দিয়া কহিল। হিরণ  
"আতর্থা'ই নাম তার, নহে অমরেন্দ্র,

সে তাহার নিজ নাম করিয়া গোপন  
 শিখ্য হ'য়ে তব কাছে ছিল যোশাফমে  
 একটি কল্পিত নাম করিয়া ধারণ।”  
 কহিল। সন্ন্যাসী পুনঃ “হক সে আত্মার্থ।  
 আমাদের ধর্ম মতে মোসেসের সনে  
 বিবাহ ত সিদ্ধ নহে হিন্দু বালিকার ?  
 আত্মার্থ। লুকায়ে তার জাতি ধর্ম নাম  
 হিন্দু বলে পরিচয় দিয়াছিল মোরে,  
 তাই আমি করে তার সপেক্ষিত্ব তোমা ;  
 কিন্তু তুমি যে সময় পারিলে জানিতে  
 হিন্দু নহে মোসেস সে, সংগ্রহ তাহার  
 কেন নাহি তেয়াগিলে ? মোসেস যুবকে  
 স্বামী বলে কেন তুমি করিলে গ্রহণ  
 জে'নে শুনে ? এ কি তব খেচ্ছাচার নহে ?  
 এ কলঙ্ক হিহি তুমি রাখিবে কোথায় ?”  
 কহিল। হিরণ “এ যে স্বার্থপর কথা ;  
 হিন্দু হ'ক বৌদ্ধ হ'ক মোসেস খুটান .  
 যেই জাতি হ'ক, বল বিবাহ হইলে  
 ধর্ম মতে, সে বিবাহ কিরার কেমনে ?  
 বিবাহ ত খেলা নহে,—আত্মার বন্ধন ;  
 পরম্পর ছুটি আত্মা হইলে মিলিত  
 ধর্ম মতে বিবাহের কুসুম বন্ধনে,  
 লৌহ অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন হয় না তা' কত ?  
 এ জীবনে দূরে থাক, মরণের পরে  
 সে বন্ধন কত নহে ছিন্ন হইবার ।  
 অচ্ছেদ্য বন্ধন সে যে জনমে জনমে  
 আমি নারী মূর্খ জাতি, পারিনে বুঝিতে  
 তোমাদের ধর্ম-নীতি—হুসনা কেবল,  
 তোমাদের ধর্ম কর্ম রীতি নীতি সব  
 কে পারে বুঝিতে দেব ? যেই খানে স্বার্থ

সেখানে তোমরা অন্ধ, অর্ধের লাগিয়া  
 কোন্ পাপ আছে তবে না পার করিতে ?  
 তোমাদের শাস্ত্রগুলি বিষয় জটিল,  
 হিংসা ঘেমে পরিপূর্ণ অশান্তি-আকর, . .  
 নহে তাহা প্রহরীর ; নহে তা' অস্ত্রাস্ত্র !  
 ভিন্ন ভিন্ন মূনিদের ভিন্ন ভিন্ন মত ;  
 এমন জটিল শাস্ত্র কে বিশ্বাস করে ?”  
 সদাশিব ক্রুদ্ধ ভাবে কহিল। গঞ্জিয়া  
 “চুপ, থাক, বেশী বাক্য নাহি প্রয়োজন,  
 বক্তৃতার স্থান নহে আমার এ গৃহ ?”  
 প্রহরীর দিকে চেয়ে কহিল। তখন  
 “কোথা হ'তে পাণিষ্ঠারে আনিলে এখানে ?”  
 সসঙ্কমে উত্তরিল। প্রহরী তখন  
 “আগ্রার বাহিরে এক কাননের মাঝে  
 ছিল সে, দিলীপ রাও সন্ধান পাইয়া  
 বলেছিল আমাদের ধরিয়া আনিতে।  
 তাই তারে সঙ্গে ল'য়ে একদা নিশিতে  
 আক্রমিয়া আত্মার্থার দৌবারিক দল  
 এনেছি আমরা এরে আপনার কাছে।”  
 সন্ন্যাসীর দিকে চে'য়ে কহিল। তখন  
 সদাশিব “গুরুদেব দিন পাঠাইয়া  
 পাণিষ্ঠারে সেতারার, যুদ্ধান্তে আমরা  
 শাস্ত্রমত প্রায়শ্চিত্ত করিব ইহার।”  
 হিরণ এ কথা শুনে কহিল। সরোবে  
 “সেতারার কেবল যাব তোমাদের কাছে  
 স্বামী ছে'ড়ে ? প্রায়শ্চিত্ত হইবে সেখানে  
 কি পাপের ? কোন পাপ করিনি ত আমি ?”  
 সন্ন্যাসী স্নেহের স্বরে কহিল। তাহারে  
 “হিরণ, হি হি হি তুমি হেন পাপ কথা  
 আনিও না যুখে আর, যাও সেতারার,

বালানাথ কেঁদে কেঁদে তোমার লাগিয়া  
অন্ধ প্রায়, অচিরেই শূণ্যত্রে তোমারে  
করিব অর্পণ আমি সেতারা নগরে ।  
তুমি কেন আপনার মর্যাদা ভুলিয়া  
য়েচ্ছ হ'তে চাও আজি ? কলঙ্ক-সাগরে  
ডুবাইয়া কুল-মান বংশের গৌরব ।”  
হিরণ বাঘিনী প্রায় কহিলা গজিয়া  
“সন্ন্যাসী হইয়া ছিছি কোন্ মুখে তুমি  
আনিলে এ পাপ কথা ?—বিবাহ আমার  
দিয়াছ ত বহু পূর্বে, কোন্ ধর্ম্মমতে  
আবার বিবাহ দিবে ? তব অনুরোধে  
হইব কি ধর্ম্ম-ভ্রষ্টা ?—থাকিতে এ প্রাণ  
হিরণ হ'বেনা কভু বিচারিণী ভবে ।  
থাক্ বিবাহের কথা, ভ্রমেও কখন  
অপর পুরুষ যদি পরশে আমারে  
ক্ষণ মাত্র, এ পরাণ তাজিব সে দিন  
বধিয়া সে নরাকৃতি কামুক-কুকুরে ।  
আতর্থা আমার স্বামী, তার নিন্দা তুমি  
ক'রনা আমার কাছে, কোন্ সতী নারী  
নীরবে পতির নিন্দা পারে সহিবারে ?  
শত ছিন্ন বস্ত্র পরি, তরুতলে থাকি  
অনশনে তার সনে করিলে বসতি  
ভাগ্যবতী মম সম কে আছে জগতে ?  
স্বামী সে—পতি সে, মম হৃদয়-মন্দিরে  
চিরারাধা দেবতা সে, জনমে জনমে  
দাসী আমি তার সেই পবিত্র চরণে !  
এমন জঘন্ত কথা বল না আমারে  
শুন হ'য়ে, হৃদ পিণ্ড খণ্ড খণ্ড করি  
কেল যদি নদী-গর্ভে, তাও বাহনীর  
তবু আতর্থায়ে ছেঁড়ে যাইব না আমি

কভু আর এ জীবনে সেতারা নগরে ।”  
“খেক আতর্থা'র কাছে” কহিলা গজিয়া  
সদাশিব, উত্তরিলা হিরণ তখনি  
“সে তরে হিরণ বালা ভীত নহে শূর ;  
প্রাণের মমতা তার নাহি ক্ষণ তরে,  
তোমাদের মত সে যে স্বার্থের লাগিয়া  
পরের অনিষ্ট চিন্তা নাহি করে কভু,  
সেতারা ছাড়িয়া আজি কেন কুজপুরে  
আসিয়াছ ? মুসলমান কোন্ দোষে দোষী ?  
তাহাদের রাজ্যে আসি ঘোর অত্যাচারে  
পীড়িতেছ বিনা দোষে মোসলেম সকলে ?  
রাজা তারা, তাহাদের সোনার সাম্রাজ্য  
করিতেছ ভস্মীভূত বিজ্রোহের বহি  
আলাইয়া,—একি ধর্ম্ম ? রাজার বিক্রমে  
বড়যন্ত্র ? তাহারা কি মূহুর্তের তরে  
গিয়াছিল তোমাদের সেতারা নগরে ?  
রাজারে পিতার সম মানে না যে মূঢ়  
ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট সে অভাগা, তার মত পাণী  
কে জগতে ? শত দিক জীবনে তাহার  
স্বজাতি হইলে রাজা মানিবে তাহারে  
এ কেমন নীতি শূর ? ভিন্ন জাতি হ'লে  
রাজারে মানিতে নাই কোন্ শাস্ত্রে বলে ?  
যে জাতি হউক রাজা, পিতার সমান  
অবশ্য মানিবে তারে, কোন্ শাস্ত্রে বলে ?  
যুক্তিতে রাজার সনে রাজজ্যোহী হ'য়ে ?  
রাজজ্যোহী সম পাপ নাহি ধরাতলে ।  
আজি হ'ক কালি হ'ক ভুগিবে তোমরা  
সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত, মহারাষ্ট্র শক্তি  
ধ্বংস হ'বে অচিরেই তোমাদের দোষে ।”  
সদাশিব মহাক্রোধে কহিলা গজিয়া

“পানীয়সি, যুগা লক্ষ্য নাহি তোর মনে,  
 মহারাষ্ট্র বামা হ’য়ে এত হীন মতি ?  
 এখনি পাইবি তুই প্রতিকূল তার”  
 সদাশিব মহাক্রোধে কহিল। ডাকিয়া  
 একজন সৈন্তাধাকে আরক্ত নয়নে  
 “সপ্তদশ সৈন্ত সহ যাও অবিলম্বে  
 পাণিষ্ঠারে সঙ্গে লয়ে নগর বাহিরে  
 শ্মশানকালীর ঘাটে যমুনা পুলিনে  
 জীবন্ত করিতে দহ, তুণ্ডক ঘাইয়া  
 আপনার কন্ম-কল শমন-সদনে  
 পানীয়সী।” পুনর্বার কিরায়ে নয়ন  
 হিরণের পানে শূর কহিতে লাগিল।  
 “যাও ভাগ্যবতি, তুমি যাও স্বর্গধামে  
 ধরাতল নহে তব উপযুক্ত স্থান।”  
 রোষে কোঙে রক্ত ভাবে কহিল। হিরণ  
 “মৃত্যুরে না ডরি আমি, সে তব আয়ারে  
 কেন দেখাইছ ? বিশ্ব দেখিবে বিষয়ে  
 হাসিয়া হিরণবালা আলিজিবে যমে ;  
 সেই সঙ্গে শত মুখে ঘোষিবে জগৎ  
 তোমার কলঙ্ক রাশি মানব-সমাজে ;  
 কিন্তু শূর, তব সম কাপুরুষ তবে  
 নাহি আর, পাপ কার্যে সদা তব মতি,  
 ভায়ের মস্তকে করি তীব্র পদাঘাত  
 সকলি করিতে পার, মৃত্যু আছে পাছে

এ কথা মুহূর্ত্ত তুমি ভাবনি স্বপ্নে ।  
 চলিলাম—জন্ম মৃত্যু বিধির বিধান,  
 হুঃখ কি তাহাতে ? কিন্তু প্রতিকূল তার  
 পাইবে অচিরে তুমি বিধাতার কোপে ;  
 যদি সত্যী সাক্ষী হই, দিগু অভিলাপ  
 যে নারীরে তুমি আজি বিনা অপরাধে  
 করিলে এ অপমান সবার সম্মুখে,  
 সেই নারী জাতি হস্তে মৃত্যু হবে তব  
 শৃগাল শকুনি তব মাংস পিণ্ড খাবে  
 পথে ঘাটে, মৃত্র ভাগ করিবে সকলে  
 দিবা নিশি তব সেই অস্থির উপরে ।  
 মৃত্ত তব হবে পদ দলিত লাহিত  
 মোস্তেমের।” সদাশিব উঠিল গর্জিয়া  
 “চূপ থাক পানীয়সি, উঠ শিবিকায় ;  
 নারী বধে মহাপাপ, নহিলে এখনি  
 শমন সদনে তোরে প্রেরিতাম আমি  
 এই অস্ত্রে, বাক্য তোর চাহিনা শুনিতে ।”  
 রোষে কোঙে অভিমানে আত্মহারা হ’য়ে  
 হিরণ উঠিল। যো’য়ে শিবিকার পরে  
 নীরবে, বাহ্যকগুলি শিবিকা লইয়া  
 ছুটিল সবগে সেই শ্মশানের ঘাটে ;  
 উলঙ্গ কপাণ হস্তে কৃতান্তের মত  
 সপ্তদশ ভীম সৈন্ত ছুটিল পশ্চাতে ।

## দ্বাবিংশ সর্গ

[কুন্তপুর, শ্মশান-কালীর ঘাট; যমুনা তীর]

তমিস্রা রজনী ; বিশ্ব ঘোর অন্ধকারে  
সমাজ্জর ; চারি দিকে নাহি জন প্রাণী,  
নাহি নর-কোলাহল, শকুনী-গৃধিনী  
কোথাও বা বৃক্ষ চূড়ে রয়েছে বসিয়া  
ধ্যানমগ্ন যোগী প্রায় ; কোথাও বা শিবা  
রজনীর শাস্তি ভাসি উঠিছে চীৎকারি ।  
কোথাও বা অন্ধ দন্ধ মানব কঙ্কাল ।  
রয়েছে পড়িয়া, কোথা নিৰ্বাপিত প্রায়  
চিতা-বহি, কোথা ধূম উঠিতেছে ধীরে  
চিতা ভস্ম, দন্ধ প্রায় মানব কঙ্কালে ।  
অন্ধ দন্ধ চিতা কাষ্ঠ বিক্লিষ্ট চৌদিকে,  
কোথা ভগ্ন হুকা বর্কা, কোথা ভগ্ন ছাতা,  
কোথা বা মাতুর ছিন্ন, কোথা ছিন্ন কাঁথা  
উপাধান, কোথা ভগ্ন মৃন্ময় কলসী  
ইতস্ততঃ চারিদিকে রয়েছে পড়িয়া  
এ শ্মশানে, হেরিলে তা' কেঁপে উঠে প্রাণ ।  
অদূরে শ্মশান ঘাটে শ্মশানকালীর  
অন্ধ ভগ্ন জরাজীর্ণ সমুচ্চ মন্দির  
দৈত্য প্রায়, সমাবৃত আরণ্য পাদপে  
গুল্ম দলে, প্রদর্শিছে অকুটি ভীষণ ।  
অদূরে মন্দির পাশে ভীষণ আকৃতি  
একটি শাল্মলী তরু দানবের প্রায়  
দীর্ঘবাহু প্রসারিয়া মানবের প্রাণে  
প্রদর্শিছে এ শ্মশানে বিভীষিকা কত ।  
কতগুলি নরাকৃতি মহারাষ্ট্র পত  
অসম্ভব মশাল হস্তে কৃতান্তের প্রায়  
দাঁড়ারে শ্মশান ঘাটে মন্দিরের কাছে ;

সম্মুখে সম্ভিত চিতা, একটি বালিকা  
অফুটন্ত পুষ্প সম রূপের প্রভায়  
উজ্জলি শ্মশান ভূমি চিতার সম্মুখে  
দাঁড়াইয়া যুক্ত করে অঙ্গারার প্রায়  
অন্ধ নিমিলিত নেত্রে চাহি উর্দ্ধ পানে  
কহিল। ভকতি ভরে অরি জগদীশে

হে বিভূ কঙ্কণাসিদ্ধ পতিত পাশন  
বিপদ ভঞ্জন তুমি সর্ব শঙ্কিতান  
পাপী আমি, তব পদে লইনু শরণ,  
অস্ত্রিমে তোমার কোড়ে দিও মোরে স্থান

তার পর ? — তার পর সে স্বর্ণ-প্রতিমা  
বসিল। যাইয়া সেই চিতার উপরে ।  
হৃদি মানে আত্মার স্নিগ্ধ রূপরাশি  
উঠিল ভাসিয়া, বালা সজল নয়নে  
একটি নিঃশ্বাস ছাড়ি ভাবিলা হৃদয়ে  
“অমর ! কোথায় তুমি আজি এ অস্ত্রিমে ?  
— হ'লনা সাক্ষাৎ আর এ নারী জনমে ।”

মহারাষ্ট্র সৈন্তগণ চিতার উপরে  
সাজাইলা স্তরে স্তরে কাষ্ঠ অগ্নিত,  
একজন ঘান মুখে কহিল। অপরে  
“বহু সৈন্ত বধিয়াছি সম্মুখ সমরে,  
এমন পাপের কার্য করিনি কখন,  
নারী বধে মহাপাপ, তাও করিলাম  
পাপিষ্ঠের আজ্ঞা মত, শিহরে হৃদয়  
সে কথা ভাবিতে আজি ।” “কি সংশয় ইথে”



কহিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি “মুখ সদাশিব  
পাপে মত্ত, পাপ পুণ্য ভাবেনা জীবনে  
ক্ষণতরে, স্মরিলেও ঘৃণা হয় মনে।”  
হেনকালে দিলা বহি চিতার ইন্ধনে  
একটি মারাঠা সৈন্ত, ধক্ ধক্ করি  
উঠিল অলিয়া বহি চিতার উপরে।  
আবার প্রথম ব্যক্তি কহিল। বিষাদে  
“আজি এ সোনার পুষ্প এ নব যৌবনে  
কত সাধ কত আশা লইয়া হৃদয়ে  
তব্ব হ'বে চিরতরে চিতার অনলে।  
হক না সে মহাপাণী, রমণীর প্রতি  
হেন পশু আচরণ বর্জিত। ঘোর।”  
কহিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি “ও কিসের শব্দ ?—  
—অথ পদধ্বনি নহে ?” উচ্চ কর্ণে থাকি  
মুহূর্ত, প্রথম ব্যক্তি কহিল। “নিশ্চয়  
তুরঙ্গের পদ শব্দ, কে জানি আবার  
আসিছে এদিকে তার কোন্ আজ্ঞা লয়ে ?”  
চক্ষের নিমিষে সেখা বিহ্ব্যতের বেগে  
পদধ্বনি অঝোরোহী উতরিল। আসি।  
একজন বড়বেগে উদ্ভাসের মত  
“হিরণ হিরণ” বলে চিৎকারিয়া জোরে  
লক্ষ দিয়া পড়িল। সে চিতার উপরে ;  
মুহূর্তের মাঝে সেই চিতার ইন্ধন  
সরাইয়া, কিপ্র হস্তে করিলা বাহির  
সুবর্ণ নলিনী প্রায় এক বালিকারে।  
চক্ষের নিমিষে বীর মন্দিরের পাছে  
রাখি এই বালিকারে অমিত বিক্রমে  
সিংহ প্রায় আক্রমিল। বিপক্ষ সৈনিকে।  
মহারাত্রি সৈন্তদল প্রথম ভাদরে

না পারি চিনিতে, ছিল। দূরে দাঁড়াইয়া  
ভক্তিতের মত, ভ্রম বুঝিতে পারিয়া  
পরক্ষণে আক্রমিল। আগন্তক দলে।  
মুহূর্তে উভয় দলে তুমুল সংগ্রাম  
বাধিল, অশান ভূমি উঠিল কাঁপিয়া  
সৈন্তদের হুহুকারে অসির বজারে।  
আগন্তক সৈন্তবৃন্দ “আল্লা আল্লা” বলি  
গজিল। তৈরব রবে, মারাঠা সৈনিক  
“হর হর মহাদেও” উঠিল গজিয়া।  
বহুক্ষণ হুঁও দল কৃপাণে কৃপাণে  
বুঝিলা ভীষণ বলে, মহারাষ্ট্র সেনা  
একে একে রণ ক্ষেত্রে গুড়িতে লাগিল।  
যুদ্ধান্তে মোসেম বীর দেখিলা মারাঠা  
নাহি আর রণক্ষেত্রে, তখনি সে ক্রত  
হিরণের অধেষণে ছুটিলা চৌদিকে।  
দেখিলা অদূরে সেই সোনার নলিনী  
শ্মশান কালির ভগ্ন মন্দিরের পাছে  
দাঁড়াইয়া স্পন্দহীন নীরব নিশ্চল।  
তখনি সে যে'য়ে ক্রত হিরণের কাছে  
সুধাইলা “কোন অঙ্গ হয়নি ত দহ  
চিতানলে ?” নিবেধিয়া হিরণ ডাহারে,  
কহিল। “অমর তুমি জানিলে কেমনে  
ভাণ্ডের আজ্ঞামত মারাঠা সৈনিক  
এনেছিল মোরে দহ করিতে এখানে ?”  
হিরণের হস্ত ধরি সন্তোহ বচনে  
কহিল। আত্মা। “আমি শেকালীর মুখে  
তুলিয়া সমস্ত কথা বিহ্ব্যৎ গতিতে  
গিয়াছিল হৃদবেশে মারাঠা শিবিরে  
কুজপুরে সেইস্থানে দেখিলাম ভাও \*

আদেশিল সপ্তদশ মারাঠা সৈনিকে  
জীবন্ত করিতে বন্ধ তোমারে শ্রাণনে।  
যে মুহূর্তে পাষাণেরা লইয়া তোমারে  
ছুটিল তড়িৎ বেগে শ্রাণনের দিকে,  
আমরাও সে মুহূর্তে ছুটিমু সবেগে  
হৃদবেশে তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে।  
তার পর ঘোর রণে করিয়া নিহত  
মারাঠা পিশাচ বৃন্দে যে ভাবে তোমারে  
রক্ষিয়াছি, সকলি তা দেখিয়াছ তুমি।”  
হেনকালে হুন্দিখাঁ ও সৈন্ত দশজন  
আতাতাঁর অধেষণে আসিলা সেখানে  
ক্রতবেগে, তিনজন হত রণস্থলে।  
মৃত সৈনিকের এক তুরঙ্গ আতাতাঁ  
প্রদানিয়া হিরণেরে, স্ব স্ব অশ্ব পরে  
আরোহিয়া সকলেই ছুটিল সবেগে।  
বহুদূর অতিক্রমি নিশি অবসানে  
উতরিল। সবে আসি আতাতাঁর গৃহে  
শোনপথে ; মহাহর্ষে আতাতাঁ তখন  
কহিলা হুন্দিখাঁ বীরে “রাখিয়া হিরণে  
গৃহ মাঝে, যাব আমি মোসেম-শিবিরে  
কিছু পরে, যাও আজি তোমরা সকলে  
সেই স্থানে,” বীর বৃন্দ ছুটিল সবেগে।  
উভয়ে তুরঙ্গ হ’তে নামিলা তখন,—  
—নিরখিলা অগণিত খজুর \* গুবাক  
শ্রেণীমত দাঁড়াইয়া রয়েছে অদূরে  
কি সুন্দর বায়ু ভরে হেলিয়া ছলিয়া  
প্রহরীর প্রায়, মুগ্ধ করিয়া পখিকে।  
নিকটেই আশ্রয়ন, পার্শ্বে সরোবর  
প্রস্তরে সোপান বীধা, বসিলা যাইয়া

উভয়ে সোপান পরি, প্রভাত-পবন  
মৃদু মৃদু সফরিয়া হিলোলে হিলোলে।  
জুড়াইল উভয়ের ক্রান্ত কলেবর ;  
গাহে গাহে পাখীগুলি প্রভাত সঙ্গীত  
গাইতেছে কি মধুরে, তনি সে সঙ্গীত  
উভয়েই আশ্রহার। আকুল অন্তর।  
আতাতাঁর পানে চে’য়ে কহিলা হিরণ  
“অমর, আমার তুমি যাবে কি ছাড়িয়া  
পুনর্ব্বার ? দম্ভাগণ যে ভাবে লেগেছে  
মম পাছে, না থাকিলে তুমি মোর কাছে  
নাহি জানি এ অদৃষ্টে আরো কত আছে।”  
হিরণের হস্ত ধরি কহিলা আতাতাঁ  
“হৃদান্ত মারাঠাগণ ঘোর অত্যাচারে  
করিতেছে প্রপীড়িত নিরীহ মোসেমে ;  
সেই হুঃখে যদি মোর সদা জর্জরিত,  
সংসারের কোন কার্য ভাল নাহি লাগে।  
যতদিন সে হৃদান্ত পাষাণ সকলে  
শাস্তি দিয়া না পারিব রক্ষিতে মোসেমে ;  
ততদিন সুখ ভোগ করিব না আমি,  
ইহাই প্রতিজ্ঞা মোর—জীবনের ত্রুট।  
যে পর্য্যন্ত আমাদের না হবে বিবাহ  
নিবন। তোমারে আমি গৃহে আমাদের ;  
প্রতীক্ষা করিয়া তুমি থাক কিছুকাল,  
কি করিব ? বিধাতার ইচ্ছা অনুরূপ,  
তাই এ পরীক্ষা আজি আমাদের পরে।  
আমি তব হিতাকাঙ্ক্ষী জীবনে মরণে ;  
আমার এ ভালবাসা পবিত্র নির্মল,  
করিব না কলঙ্কিত আমি তা’ জীবনে।  
অই যে বনানী এই বাটীর পশ্চাতে,

তাহারি উত্তরে এক ক্ষুদ্র স্রোতঃবতী  
 বহিতেছে বার মাস বেড়ি এ কানন ;  
 তীরে তার বহ লোক ধনী ও নির্ধন  
 নিবসিছে ; সেই ক্ষুদ্র তটিনীর তীরে  
 গভীর নির্জন স্থানে থাকিতে তোমারে  
 একটি কুটির দিব করিয়া নির্মাণ ;  
 এখানে মারাঠা তব পাবে না সন্ধান ।  
 শেকালী বকুল সহ নিবসিও তুমি  
 সেই স্থানে—সে নিচ্ছন্ন নির্জন কাননে ।  
 এখনি যাইব আমি তৃত্য নিয়ে তথা  
 করিতে নির্মাণ এক কুটির তোমার ।”  
 হেন কালে গৃহ হ’তে শেকালী বকুল  
 বাহিরিলা, হস্তমুখ প্রকাশিতে আসি  
 সরোবরে উভয়ের দেখিয়া সেখানে  
 ছুটিয়া আসিলা দোহে বিস্মিত হৃদয়ে ।  
 আতর্ক্য। ছুইটি তৃত্য সঙ্গে ক’রে নিয়ে  
 চলিলা সে নদী তীরে করিতে নির্মাণ .  
 একটি পর্ণ-কুটির হিরণের তরে ।  
 নীরবে হিরণ তার চলিলা পশ্চাতে ।  
 হেনকালে অথ খুড়ে উড়াইয়া ধূলি  
 একজন অসারোহী মোসেম সৈনিক  
 আসি সেথা ক্ষুদ্র বেগে কহিলা সম্মুখে  
 আতর্ক্যারে “আকালী সাহু অমিত্ত বিক্রমে  
 সমস্ত সেনানী সহ এ ভরা বমুনা  
 অতিক্রমি কুজপুরে করিলে প্রবেশ  
 সর্বাধিব কি প্রবেগে সব সৈন্ত লয়ে  
 ডাখিরা সে রণস্থল, গিয়াছে চলিয়া

পানিপথে, হুসানীও ছুটেছে তাহার  
 পাছে পাছে তীরবেগে বহ সৈন্ত লয়ে ।  
 এ যুদ্ধের উপযুক্ত পানিপথ ভিন্ন  
 নাহি অন্য স্থান,—সে যে ভীষণ প্রান্তর  
 সীমা শূন্য, চারি দিক ধূধু ধূধু করে,  
 দেখিলে আতঙ্কে ছদ্মি উঠে শিহরিয়া ।  
 এমন ভীষণ স্থান নাই এ ভারতে,  
 এখানে যে ক’টি যুদ্ধ হইয়াছে পূর্বে,  
 সব যুদ্ধে এক পক্ষ হ’য়েছে বিধ্বস্ত  
 চির তরে, চির মাত্র নাই আর ভবে,  
 পৃথিরাজ লোদি-বংশ নিমূল এখানে ।  
 এই সেই কুরুক্ষেত্র—যে মহাশয়ানে  
 কোটি কোটি বীর যোদ্ধা নিহত সমরে ।  
 কুরু পাণ্ডবের সেই ভীষণ সংগ্রাম  
 হ’য়েছিল সংঘটিত এ মহা প্রান্তরে ।  
 এই স্থান ভিন্ন আর যুঝিবে কোথায়  
 ছ’পক্ষের পরাক্রান্ত সৈন্ত লক্ষ লক্ষ  
 প্রাণের শোণিত দিয়া এ মহা আহবে ।  
 বীরেন্দ্র নজীবদৌলা পাঠায়েছে মোরে  
 তব কাছে, অবিলম্বে যাইতে সে মাঠে  
 ক্ষিপ্ত বেগে, আপনার সৈন্তদল নিয়ে ।  
 ভারতীয় রাজা প্রজা ওমরাহ নবাব  
 পাঠান মোগল সেখ, সমগ্র মোসেম  
 একত্রিত রণ-ক্ষেত্রে এ মহা সমরে ।  
 ইসামের ভাগ্য আজি হবে পরীক্ষিত  
 পানিপথে বীরদের তীক্ষ্ণ তরবারে ।

## ত্রয়োবিংশ সর্গ

[ খানেশ্বর ; ইস্লাম শক্তিকে উদ্বোধন ও তপস্বীর প্রতি স্বপ্নাদেশ ]

এই সেই খানেশ্বর ? যেখানে মাহমুদ \*  
খেলেছিল। মহাখেলা তীক্ষ্ণ তরবারে।  
যাহার অবগভেদী “দীন দীন” রব  
প্লাবিত। ধরণী তল, প্লাবিত। ভূধর  
উঠেছিল ভীম রোলে সুনীল অশ্বরে।  
হিন্দুদের সম্মিলিত লক্ষ লক্ষ সৈন্ত  
যে বীরেন্দ্র ঘোর রণে করে পরাজিত  
ভেঙ্গেছিল। “সোমনাথ” স্মৃতিস্তম্ভ কুঠারে।  
এই সেই খানেশ্বর ? — কাঁপে হিয়া ডরে।

খানেশ্বর সন্নিহিত প্রান্তরের মাঝে  
একটি তপস্বী বসি অশ্বখের মূলে  
বিশ্রামিছে ; হৃদে তার অজস্র ভাবনা  
বহিছে সহস্র ধারে। অশ্বখের পাশে  
একটি প্রকাণ্ড দীঘি অদূরে তাহার  
অসংখ্য আত্মের বৃক্ষ ধরি পরস্পর  
ছত্রাকারে শোভিতেছে কেমন সুন্দর।  
হেনকালে যোগীবর হেরিল। সূদূরে  
একজন অস্বারোহী বীরেন্দ্র যুবক  
সজ্জিত সমর সাজে, পশ্চাতে তাহার  
অগণিত অস্বারোহী সৈনিক নিচয়  
আসিছে ছুটিয়া ক্রান্ত প্রভঞ্জন বেগে।  
চক্কের নিমিষে সবে আসি সেই স্থানে  
অবতরি অশ্ব হ’তে সানন্দ হৃদয়ে  
গেল। চপি দলে দলে সহকার-বনে  
বিদূরিতে পথপ্রাপ্তি ; সে বীরেন্দ্র যুবক

ধীরে ধীরে যোগী পাশে দাঁড়াইল। আসি।  
যোগীবর কিছুক্ষণ বীরেন্দ্রর দিকে  
নিরখিয়া, জিজ্ঞাসিল। মধুর বচনে  
“এত সৈন্ত লয়ে তুমি কোথা যাও বাবা  
এ বেগে ? কি নাম তব জন্ম কোন্ কুলে ?  
“আতর্থা! আমার নাম” কহিল। বীরেন্দ্র  
তপস্বীর পানে চে’য়ে “পাঠানের বংশে  
জন্ম মোর, বৃদ্ধ আশে যাব পানিপথে,  
ব্রত মোর একমাত্র মহারাষ্ট্র-ধ্বংস,  
অথবা সমর ক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন।”  
যোগীর বদন প্রান্তে আমনের জ্যোতিঃ  
উঠিল ভাসিয়া ; যোগী সুধাইল। তারে  
সুগভীর স্বরে, “তুমি পারিবে কি তাহা  
হে বীরেন্দ্র ?” উত্তরিল। সে বীর যুবক  
হাসি মুখে “পারিন। মোসলেম হইয়া  
বিধর্মী মারাঠা সনে সম্মুখ সমরে ?  
তব কথা শু’নে মোর চাসি পায় লাজে,  
কাপুরুষ প্রায় কেন বলিলে এ কথা  
যোগী হয়ে, হিছি তব লজ্জা নাই মনে ?  
মোসলেম-শোণিত বৃদ্ধি নাই তব দেহে,  
নহিলে এ কথা তুমি বলিলে কেমনে ?”  
তপস্বী গভীর ভাবে কহিল। আগার  
“নহি আমি কাপুরুষ হে বীর কেশরী  
আতর্থা!, এ বাহু মম সতত প্রস্তুত  
বধিতে কাকের বৃন্দে, এ ভিখারী-বেশ  
তথু কি ভিক্ষার ভণ্ড করেছি এহণ ?

মিথ্যা তাহা, নহি আমি তিক্কা ব্যবসায়ী,  
তৈমুরের সেনাপতি মেহেদি' বেগের  
পুত্র আমি, যার নামে দানব-মানব  
কাপিত, নিহত যিনি লাহোর সমরে  
রাঘবের বড়যন্ত্রে আদিনার করে।

সেই হুঃখে আজি শূর সাজিয়া সন্ন্যাসী  
ইসলামের হিতব্রতে এ তুচ্ছ জীবন  
উৎসর্গ করেছি আমি, সমগ্র মোস্লেমে  
উত্তেজিয়া মহাযুদ্ধে বধিব কাকেরে।  
তুমিও প্রতিজ্ঞা কর থাকিতে জীবন  
ফিরিবে না এক পদ সমর প্রাঙ্গণে ;  
মারিবে কাকের বৃন্দে, অথবা মরিবে  
যুঝিয়া বীরেন্দ্র প্রায় রক্ষিয়া যতনে  
ইসলামের বিশ্বাস্য পবিত্র গৌরব।”  
গভীর বদনে যুবা কহিল তাহারে  
“এ প্রতিজ্ঞা বহু পূর্বে করিয়াছি আমি  
জোহরা বেগম কাছে—সাক্ষী এই অসি।”  
ভক্তিত হইয়া যোগী, দেখিলা কৃপাণে  
অঙ্কিত “জোহরা” নাম, জিজ্ঞাসিলা তারে  
জোহরার সঙ্গে তব দেখা হ'ল কোথা ?  
উত্তরিল বীর যুবা “হ'য়েছিল দেখা  
দিল্লীর প্রাসাদে এক যমুনার তীরে।”  
সানন্দে জ্বলয়ে যোগী কহিলা তাহারে  
“যাও তবে বীরবর, আশীষি তোমারে”  
কংসিয়া মারাঠা বৃন্দে এ'লে জয়ী বেশে  
মহানন্দে আলিজিব সে দিন তোমারে।  
চলি গেল বীর যুবা, কিছুক্ষণ পরে  
উঠি যোগী বীরে বীরে উত্তরিল। অসি  
থানেবরে, ক্রান্ত দেহে বসিলা ঘাইয়া  
তরু তলে, দূর হ'তে দেখিলা তপস্বী

একটি প্রাসাদ হ'তে বাহিরিয়া দ্রুত  
একটি রমণী মরি আসিছে সেদিকে।  
মুহূর্তে সে বামা এ'সে প্রণমি যোগীরে  
নিবেদিল। সবিনয়ে “বেগম মোদের  
আহ্বানিছে যোগীবর, তোমারে এখনি।”

“কোথায় বেগম তব, কেন আহ্বানিছে  
আমারে ? তিখারী আমি, কি কাজ তাহার  
মম কাছে ?” স্নেহ স্বরে জিজ্ঞাসিলা যোগী।  
“অই প্রাসাদের মাঝে, জানিনা কেন যে  
আহ্বানিছে” উত্তরিল। সন্মুখে রমণী।  
নীরবে চলিল। যোগী রমণীর সাথে  
সেই প্রাসাদের দিকে, কিছু ক্ষণ পরে  
উত্তরিল। অসি দৌড়ে বাটির ছয়ারে।  
কক্ষ হ'তে বামা এক করিলা জিজ্ঞাসা  
সন্মুখে “যোগীবর কোন্ হুঃখে তুমি  
উদাসীন বেশে হায় যেখানে সেখানে  
বেড়াইছ দিবা নিশি ?” উত্তরিল। যোগী  
শূন্যস্বরে “সে কথায় কি কাজ তোমার ?  
সংসার বিরাগী আমি, ছিন্ন এতদিন  
নেজামদী তপস্বীর সমাধি-মন্দিরে ;  
বিজোহী মারাঠাগণ ভগ্ন-করি তাহা  
তাড়িয়ে দিয়াছে মোরে সারমেয় প্রায়  
তথা হ'তে, ধর্মসাক্ষী করেছি প্রতিজ্ঞা  
নিজিত মোস্লেম বৃন্দে জাগাইব আমি  
বধিতে সে রাজজোহী মারাঠা কুহুরে,  
বধিতে সে নরাধম পেশবা তনুরে।”  
যোগীর নয়ন হ'তে ঝরিতে লাগিল  
অশ্রুবিন্দু, মুছি তাহা বসন অকলে  
কহিতে লাগিলা পুনঃ “দনু্যগণ মোরে

ক'রেছে যে অপমান সে কথা স্মরিলে  
এখনো ক্ষণে মোর ক্রোধ-বহ্নি জ্বলে !  
পাষাণেরা একদিন নিশীথ সময়ে  
বধেছে জনকে মোর অস্তায় সমরে ।  
স্নেহের ভগিনী মোর জোহরা বেগম,  
ফেলিয়া এসেছি তাঁরে সুদূর লাহোরে  
সেই রাতে, জানিনা সে মৃত কি জীবিত ।  
সেই হৃৎকান্দে প্রাণ—প্রতিশোধ তার  
লইব, এ প্রাণ আমি তৃণ সম গণি !  
মোস্তেম কুলের গ্লানি আদিনা পামর  
যাহার ইজিতে সেই মারাঠা কুকুর  
ঘটায়েছে এ বিভ্রাট, শুনেছি সে পাণী  
হ'য়েছে নিহত সেই আগ্রা নগরে,  
দম্ভ করে ।" বাক্য আর স্মরিল না মুখে ।  
স্বস্তিতের স্মায় যোগী রহিল দাঁড়ায়ে ;  
বেগম আকুল প্রাণে মুহূর্তের মাঝে  
সরাইয়া যবনিকা "আমি সে হৃৎখিনী  
জোহরা" বলিয়া তার পড়িলা চরণে ।  
তপস্বী ধরিয়া ত্রস্তে উঠাইলা তারে ;  
আবার করুণ কণ্ঠে কহিল জোহরা  
"আমারে সে দম্ভাগণ পারেনি বধিতে ;  
আদিনারে রণক্ষেত্রে করি পরাজিত  
গিয়াছি দাদা আমি তব অবেবণে,  
কোথাও না পেয়ে শেষে মর্মান্বিত প্রাণে  
এ অসি সহায় করি জগদীশে স্মরি  
পড়িয়াছি বম্প দিয়া এ রণ-সাগরে ।  
কোরাণ স্পর্শিয়া আমি ক'রেছি প্রতিজ্ঞা  
আজি হ'ক কালি হ'ক ধর্মসিব নিশ্চয়  
সে কৃত্য রাজজোহী মারাঠা বকরে ।  
দৈব সহায় মোর, কোরাণ আমার

মূল মন্ত্র,—রণক্ষেত্রে অক্ষয় কবচ ;  
ডরি না দেবতা দৈত্য, ডরি না কাকেরে ।  
আশীর্বাদ কর দাদা এ মিনতি পদে ;  
তোমার এ ভগ্নী নহে অবলা রমণী  
পুরুষের ভয়ে যে'য়ে থাকিবে অন্দরে ।  
মোস্তেম রমণী আমি, স্বধর্মের তরে  
একা সে বাহাও কেন, থাক সজে তার  
পেশবা রাঘব জাহ্নু বিশ্ব সমসের  
এক পদ না টলিবে ভগিনী তোমার ;  
সাক্ষী ধর্ম, রণক্ষেত্রে একা এ জোহরা  
যুঝিবে বীরের মত সকলের সনে ।  
ইহা যদি নাহি পারি, নহি আমি তবে  
মেহেদি বেগের কস্তা, নহি আমি তবে  
বীর-পত্নী, নহি আমি মোস্তেম রমণী ।"  
নীরবিলা বামা, পুনঃ মুহূর্তের পরে  
কহিল "এ বেশে দাদা, কোথা যাও তুমি ?  
থাক মোর কাছে ।" "না না" উত্তরিল যোগী  
"দেশে দেশে আমি" আমি ভিখারীর বেশে  
ভারতের সুপ্ত প্রায় সমগ্র মোস্তেমে  
জাগাইয়া, রণক্ষেত্রে স্বধর্মের তরে  
যুঝিব জোহরা, আমি মারাঠার সনে ।  
ইসলাম শক্তিকে আমি করি উজ্জীবিত  
মন্ত্র বলে চূর্ণিব সে পাষাণ সকলে,  
চূর্ণিব সে রাজজোহী পেশবা তরুরে ।"  
মুহূর্তে সে যোগীবর ত্যজি সেই স্থান  
গেলা চলি, বহুদূর করি অতিক্রম  
দেখিলা সম্মুখে এক বিস্তৃত প্রান্তর,  
একটি সরল পথ ভেদি এ প্রান্তর  
গিয়াছে অনেক দূর, হুই ধারে তার  
জ্যোতিষক ঝাউ তরু মরি কি সুন্দর ।



পথি পার্শে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র পল্লীগুলি  
অতি সুন্দর, স্থানে স্থানে অখণ্ডের তলে  
হ' একটি পাখশালা বিপণি সুন্দর ;  
মাঝে মাঝে হ' একটি বিদেশী পথিক  
আসিছে যাইছে, কোথা কৃষক নিচয়  
চষিতেছে ক্ষেত্র, কোথা রাখাল বালক  
চরাইছে গেলু এই পথের দুধারে।  
বহুদূর অতিক্রমি তপস্বী প্রবর  
হেরিলা সম্মুখে এক সুদীর্ঘ সরসী  
সুশোভিত অগণিত কুমুদ-কলসারে।  
সরসী পশ্চাতে এক অতি মনোহর  
ফুল ফুল সুশোভিত নিকুঞ্জ কানন ,  
নানা বিধ ফল-বৃক্ষ শাখা প্রশাখায়  
আলিঙ্গিয়া পরস্পর এ মঞ্জু কাননে  
শোভিছে মুকুলে ফলে নয়ন-রঞ্জন।  
নিরে সমতল ভূমি স্নিগ্ধ ছায়ায়  
একটি প্রস্তর-বেদী শোভিছে সেখানে,  
কণ মাত্র সেই দৃশ্য হেরিলে নয়নে  
বিস্ময়-সাগরে ডুবে ভাবুকের মন।  
অদূরে সে কুঞ্জে এক ভয় অট্টালিকা  
যুঝিছে কালের সনে অটুট বিক্রমে  
দাঁড়াইয়া, পার্শে তার একটি মসজিদ  
সম্মুখে বকুল বৃক্ষ মন্দিরের প্রায়  
অতি সুন্দর, নিরে তার একটি সমাধি।  
তপস্বী আকুল চিন্তে বসিল। যাইয়া  
বেদী পরে কুজবনে সরসীর তীরে।  
জন্মে তার কি বে এক চিন্তার লহরী  
বহিতে লাগিল, যোন্নি পাইলা বিবাদে  
আগাইতে স্তম্ভ প্রায় ইল্লাহ-শক্তিকে  
এ মহা সজীবে আহা করি উদ্বোধন।

কেন গো বরাবনে, বগ্ন গভীর ঘুমে,  
ফুল ফুল সুশোভিত  
এ মঞ্জু  
কুঞ্জ কুটারে।  
মলিন বদন-ইন্দু, অধর সুধার সিঁদু  
কম্পিত চকিত ভীত  
কি গুণ  
ভাবনা-ভারে।

কোথা সে স্বর্গীয় ভূষা হেরি যা' লঙ্ঘিত উষা  
কৌমুদী জিনিয়া কান্তি  
কোথা  
আজি হা রে।  
কোথা সে গৌরবা মুক্ত, কোথা কৃষ্ণ কেশ গুচ্ছ  
সুশোভিত অতুলিত  
খচিত  
মুকুতা-হারে  
আজি এ মলিন বেশে, কেন দেবি কি উদ্দেশ্যে  
কাদারে মোদ্রামগনে  
নিমগ্ন  
এ ধুম-ধোরে।  
জাগো জাগো-জাগো,  
হে বীর রমণি  
জাগো,  
ভিখারী দাঁড়িয়ে দ্বারে।

ওগো।  
পাপতাপ হারিনী, কাকের মদিনী  
শত্রু সংহারিনী  
ভীষা!  
কোরান ধারিনী, অধর্ম নাশিনী  
অতুল গৌরবময়ী  
বান।  
কোথায় সে গৌরব, কোথায় সে বৈভব  
কোথায় সে  
ঐশ্বর্য হা রে।  
ওগো।  
হে মাজিনী বরাজিনী  
“অর্দ্ধচন্দ্র” সুশোভিত মুকুট ধারিনী  
শৌর্য বীর্যময়ী ঐশ্বর্য শামিনী  
ওগো।

বীর রমণি,  
আগো-আগো-আগো,  
ভিখারী দাঁড়ারে ধারে।

হে রণ-রজিবি,  
আগো  
ভিখারী দাঁড়ারে ধারে।

ওগো।  
বিশ্ব চরাচর, বন্ধ বন্ধ নর  
কাঁপিত তোমার  
একটি হৃদয়ে।  
রোম ও এফ্রিকা ক্রান্স ও স্পেন  
বিশ্বস্ত তোমারি  
ভীক তরবারে  
কত শত রাজা, কত সিংহাসন  
কত সেনাপতি, সৈন্য অগণন,  
চূর্ণ বিচূর্ণ  
তব—অসি প্রহারে।  
তব রণ-বেশ, হেরিলে বহুত  
কাঁপিত আতঙ্কে দেবকুল দৈত্য,  
আজি  
কেন ঘুম ঘোরে ?  
ওগো।  
মানময়ী, বীর্যময়ী  
অতুল মহিমাময়ী  
আগো—আগো—আগো,  
হে বীর রমণি,  
আগো  
ভিখারী দাঁড়ারে ধারে।

ওগো।—  
“দীন দীন” হবে ভীষণ হৃদয়ে  
এ’স গো জননি, সমর-প্রান্তরে  
কোটি কোটি বিদ্যুৎ  
বরষা তোমারি  
ভীক তরবারে।  
ছুটুক তরঙ্গ, প্লাবি গিরি-শৃঙ্গ,  
নারাঠার  
তপ্ত রবিবে।

ওগো।—  
শক্তিময়ী—প্রাণময়ী  
অতুল প্রতিভাময়ী  
আগো—আগো—আগো

নীরব গগন ডলে নীরব নিকুঞ্জে  
সেই স্বর কি শূন্য করিল বর্ষণ  
সুধা-ধারা, আশ্রয়-ধারা হইল অবনী।  
সমীরণ মৃদু মৃদু বহিল মধুরে  
ফুটিল সরসী-জলে সর-সোহাগিনী।  
বহুক্ষণ এইভাবে হইল অতীত,  
যোগীবর ক্লান্ত হৃদয়ে পড়িল ঘুমায়ে  
বেদী-পরে, ঘুম ঘোরে দেখিতে লাগিল  
অপূর্ব স্বপন এক,—ধীরে ধীরে ধীরে  
সুবর্ণের রথ এক, ত্রিদিব হইতে  
নামিয়া আসিল ভূমে, অভ্যস্তরে তার  
দেবী-মূর্তি, উদ্ভাসিত রূপের কিরণে  
বনভূমি, জ্যোতির্ময়ী কহিল। মধুরে  
“ইসলামের শক্তি আমি, ছিঁছু ঘুম-ঘোরে  
স্বর্গধামে—নন্দনের নিভৃত কুটীরে,  
কেন বাছা অসময়ে জাগালি আমারে ?  
আমি কি করিব বাছা, নিজ কর্ম-দোষে  
ডুবিলি—ডুবিলি তোরা ধ্বংসের সাগরে।  
তাজিয়া আমারে তোরা ঘোর পাপাচারে  
লিপ্ত এবে, গা ঢালিয়া বিলাসিতা-স্রোতে  
চলেছিস্, ভুলেছিস্ নিজ ধর্ম-কর্ম ;  
বিধাতার কথা আর নাহি পড়ে মনে  
কণতরে, রজুলের করজ ছুরত  
ভেয়াগিয়া, ভেয়াগিয়া রোজা ও নমাজ  
হজ্জত, দান ধ্যান কেতরা জাকাত  
সতত করিস তোরা পাপ অমুঠান ;  
হলনা বকনা চুরি—মিথ্যা কথা বলা,

মতপান, হত্যাকাণ্ড, পরদারে লিপা,  
 নিত্য নৈমিত্তিক কার্য হ'য়েছে তোদের ;  
 তুলিয়া একতা ভ্রত, বাম বিলম্বাদে  
 লিপ্ত এবে, কেহ কার নহে আত্মাবহ,  
 পিতা-পুত্রে মারে-ঝিরে আত্মার আত্মার  
 নাহি ঐক্য, হিংসা ঘেবে পরিপূর্ণ সবে,  
 কুশীদ হারাম খেয়ে সদা আশ্রয়রী,  
 জগতে কুকার্য্য হেন নাহি কিছু আর  
 বাহা তোর। না পারিস্ করিতে সাধন।  
 তোদেরি ত কর্দমোবে বিধাতার ক্রোধ  
 বজ্ররূপে নিপতিত হ'য়েছে তোদের  
 শির'পরে, এবে বাহা কি হবে কাঁদিলে ?  
 পাপ কার্য্য তেয়োগিয়া একাএ জন্মরে  
 বিধাতার পুত নাম করিয়া অরণ,  
 রত্নুলের উপদেশ মানিয়া সন্তত  
 অটল বিশ্বাস রাখি ধর্ম্মে আপনার  
 রোজা ও নমাজ দান করক্ হুরত  
 ধর্ম্ম কার্য্য রীতিমত করিলে পালন,  
 হিংসা ঘেবে তেয়োগিয়া সমগ্র মোস্তেম  
 আত্মভাবে সম্মিলিত হয়ে পরস্পর  
 পবিত্র একতা ভ্রত করিলে সাধন,  
 নিশ্চয় তোদের বাহা হইবে মঙ্গল।  
 অস্তথা ছুবিবি তোর। ধ্বংসের সাগরে।”  
 যুহুর্থে সে দেবী মূর্ত্তি হ'ল অন্তর্দান,  
 হুর্থে আধার আসি গ্রাসিল ধরনী ;  
 তরে ও বিশ্বরে যোগী উঠিলা জাগিয়া,  
 তাজিল ঘুমের ঘোর, তাজিল স্বপন,  
 “হুক হুক” হিয়া তার উঠিল কাঁপিয়া।  
 তাবিল জন্মরে যোগী লজ্জাই কি তবে  
 আপনার কর্দমোবে বিধাতার-ক্রোধে

ছুবিবে মোস্লেম জাতি ধ্বংসের সাগরে ?  
 হেনকালে যোগীবর তুলিলা অনুরে  
 মসজিদের পার্শ্বদেশে মিনারের পরে  
 মোয়াজ্জিন দাঁড়াইয়া দিতেছে আত্মান  
 সুধাকণ্ঠে, তার সেই স্বর মধুময়  
 ঘুরিয়া ফিরিয়া মরি বায়ু স্তরে স্তরে  
 তাসিয়া মিষিছে যে'য়ে দূর দূরান্তরে।  
 মোয়াজ্জিন যে যুহুর্থে দাঁড়ায় মিনারে  
 “লায়েলাহা ইন্নেলাহ” উঠিলা বলিয়া,  
 “ক্রম” করি সে যুহুর্থে একটি বন্দুক  
 গরজিল কাঁপাইয়া সে বন প্রদেশ ;  
 “মোহাম্মদ রহুলোজ্জাহ” না হ'তে বাহির  
 মুখে তার, অভাগার কধিরাক্ত দেহ  
 মিনার হইতে ভূমে পড়িল ছুটিয়া।  
 হেরি এই শোচনীয় দৃশ্য শোকাবহ  
 যুহুর্থে যোগীর ছদ্ম উঠিল জলিয়া,  
 দেখিলা মসজিদ পার্শ্বে বৃক্ষ অন্তরালে  
 দশজন মহারাষ্ট্র সৈনিক নির্দয়  
 হাসিছে দাঁড়ায়, ক্রোধে উন্নতের মত  
 কটি হ'তে তীক্ষ্ণ ছুরি করি নিকাষিত  
 যোগীবর, বড় বেগে আক্রমিলা যে'য়ে  
 সে নির্ভুর আততায়ী সৈনিক সকলে।  
 একে একে পকজনে করিয়া মিহত  
 কধিরাক্ত দেহে যোগী পড়িলা ভূতলে ?  
 “হর হর মহাদেব” বলি উঠেবরে  
 মহারাষ্ট্র পতগুলি পখিল তখন  
 অন্তঃপুরে, —প্রাণীদের কন্ধের ভিতরে  
 নিরখিলা একজন বর্ষীয়সী বামা  
 নমাজ পড়িছে বসে এক পুতাসনে  
 একাএ জন্মরে, বামা সাষ্টাঙ্গে যখন

প্রণমিতা অগনীশে ভূমে রাখি শির,  
 নির্ঝর পাবও এক সুভীক কুঠারে  
 ছেদিল মস্তক তার ভীষণ আঘাতে,  
 রক্ত-স্রোতে সেই আসন হইল রঞ্জিত,  
 হইল রঞ্জিত সেই পবিত্র কোরান  
 আসনের পার্শ্বদেশে ছিল যা' রক্ষিত।  
 মহা হর্ষে কক্ষ হ'তে বাহিরিয়া ঐত  
 পশুগণ, নিরখিল। একটী যুবতী  
 দাঁড়ারে প্রাঙ্গণে, কোড়ে অপোপও শিত  
 হাসিছে সে সৈনিকের মুখপানে চে'রে।  
 শোকে হুঃখে যুবতীর বদন-কমলে  
 বিবাদের গাঢ় ছায়া সদা একটিত।  
 একটি সৈনিক তার ধরিয়া কুন্তলে  
 আনিল পথের ধারে, অপর সৈনিক

শিতর কোমল বক্ষে সুভীক বরশা  
 বিঁধাইয়া, খুঁতে তারে উঠাইল কোরে।  
 প্রথম সৈনিক পুনঃ ভীক তরবারে  
 ছেদিল মস্তক তার কেলিলা কুন্তলে,  
 অজস্র শোণিতে তার ভে'সে গেল ধরা।  
 শিতর এ কথা ছেদি অগনী তাহার  
 বিষম শোকের বেগে উঠিল কাঁদিয়া।  
 তখনি ভীষণ এক অসি ধরবার  
 চুখিল যুবতী-কণ্ঠ, ছিন্ন যুগ তার  
 প্রদানিয়া পেশবারে ঘোর অভিশাপ  
 চক্ষের নিমিষে কুমে পড়িল লুটিয়া।  
 সেই রক্তে—হার সেই শোণিতের স্রোতে  
 মহারাষ্ট্র-শক্তি,—তার স্বাধীনতা-আশা  
 এ জন্মের মত হায় গিয়াছে তাসিয়া।

## চতুর্বিংশ সর্গ

[গোনপথ • অকলের বন ভূমি, ক্ষুদ্র নদী-তীর]

হুধারে বনানী ; মধ্যে ক্ষুদ্র স্রোতঃবতী  
কি সুন্দর কল তানে বাইছে বহিরা  
অবিরাম, তীরে তার অসংখ্য বিটপী  
মহাবাহু, মর্ম্মরিয়া গাইছে সতত  
আরণ্য সঙ্গীত কত, কণ্ঠ মিলাইয়া  
তটিনীর মধুমাখা “কলকল” তানে।  
কাশবন—নলবন, ক্ষুদ্র ঝোপ কত  
বেতস বগুনী সনে সংমিলিত ভাবে  
চুপেছে সে স্রোত ধারা ; পানিয়া বুলবুলি  
বন-ঘুঘু নিবসিছে সেই ঝোপে ঝোপে  
নৌড় বাধি, সুধাতানে করি মুখরিত  
বন ভূমি,—সেই ক্ষুদ্র তটিনীর তীরে।  
স্থানে স্থানে নানাবর্ণ আরণ্য কুসুম  
রয়েছে কুটিয়া সেই তরুরাজি শিরে  
বিতরি সৌরভ-সুধা স্নিগ্ধ সমীরণে  
কাননের , ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা ধীবরের  
স্থানে স্থানে নদী গর্ভে শোভিছে সুন্দর  
নে’চে নে’চে ; সেই ক্ষুদ্র তটিনী সৈকতে  
তরুতলে কি সুন্দর কুটীর একটি,  
সম্মুখে প্রাঙ্গণ ক্ষুদ্র রয়েছে কুটিয়া  
সুগন্ধি কুসুম কত বিবিধ বরণ  
সে প্রাঙ্গণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুরাজি শিরে।  
জ্ঞাতগামী অশ্ব এক করি অতিক্রম  
এ বনানী, বড় বেগে দাঁড়াল আসিয়া  
যুবা এক নদী তীরে কুটীর সম্মুখে।  
অশ্ব হতে নামিয়া সে এক্ষুণ্ড প্রাঙ্গণে

দাঁড়াইয়া সুধাধরে ডাকিল। হিরণে  
অমনি কুটীর হতে বালিকা একটি  
বিষাদের প্রতিমূর্তি যোগিনীর বেশে  
বাহিরিয়া “কি অমর” বলিয়া সম্মুখে  
দাঁড়াইলা, বীণা যেন উঠিল বাজিয়া  
তৈরবীর মধুমাখা কড়ি ও কোমলে।  
বালিকার ম্লান মুখে বিষাদের ছায়া  
প্রকটিত, অন্তর্হিত সুধামাখা হাসি  
চিরতরে ; বুঝি সদা ছন্দিতার সনে  
লাবণ্য সৌন্দর্য্য তার হারিয়েছে জ্যোতিঃ  
সমুজ্জল, অতীতের অনন্ত আধারে।  
যুবক স্নেহের স্বরে সুধাইলা তারে  
“শেকালী বকুল কোথা?” উত্তরিল। বাল।  
“কাষ্ঠ কুড়াইতে গেছে বনের ভিতরে।”  
আবার যুবক ধরি হস্ত দুটি তার  
কহিল। কাতর কণ্ঠে সজল নয়নে  
“হিরণ, এ জীবনের অনেক সময়  
যে’পেছি তোমার সাথে মলয় পর্ব্বতে  
যোগাশ্রমে, কত সুখে কত কুল তুলে  
খেলেছি সে বালুবনে সমুদ্রের তীরে।  
কত আশা ভালবাসা ছিল এই মনে  
সে সময়ে, সূর্য্যতাপে কুরাশার মত  
সকলি গিয়াছে আজি অদৃষ্টের দোষে।  
আজি আমি সব ছেঁড়ে এসেছি কুটিয়া  
রণ ক্ষেত্রে,—অনুভূমি জননীর ডাকে।  
আমি যদি নাহি পারি রক্ষিতে তাহারে

এ তুমি প্রাণের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়া,  
 জন্ম ভূমি জননীর কুসন্তান আমি,  
 কি কাজ আমার এ ষ্ণিভ জীবনে ?  
 বিদায় লইতে তাই এসেছি হিরণ  
 তব কাছে, ঐব তারা হৃদয় গগনে  
 তুমি মোর, বোধ হয় তব সনে আর  
 হবে না সাক্ষাৎ মোর এ তব জীবনে ।  
 এ প্রাণের বহু কথা রেখেছিছু চে'পে  
 ছদি মাঝে, আজ সব এসেছি বলিতে ।”  
 বেদনা জড়িত কণ্ঠে কহিলা বালিকা  
 যুবকের পানে চাহি সজল নয়নে  
 “কি কথা বলিতে তুমি এসেছ অমর ?  
 প্রাণ মোর কেন আজি হুক হুক কাঁপে ।  
 তোমারি আদেশে আমি যোগিনীর বেশে  
 সব ছে'ড়ে, এসেছি এ নির্জন কাননে,  
 তবু এ সঙ্কোচ কেন বলিতে আমারে  
 সেই কথা ?” পুনর্ব্বার কহিলা সে যুবা  
 “জানি তাহা, কি করিব ? সুখের লাগিয়া  
 কর্তব্যের প্রতি আমি পারিনে করিতে  
 অবহেলা, দেখ ভে'বে এ ধর্ম্ম জগতে  
 মানব মাত্রই প্রিয়ে কর্তব্য অধীন ।  
 কর্তব্য বিচ্যুত হলে বিধাতৃ সমীপে  
 কি উত্তর দিব আমি বিচারের দিন ?  
 সংসারের কাম ক্রোধ মাৎস্য্য বাসনা  
 লয়ে যদি থাকি তুমি, পণ্ড ও ত প্রিয়ে  
 আমি হতে স্বেচ্ছা তবে ? মানবে পণ্ডতে  
 কি প্রভেদ আছে তবে বিধাতার কাছে ?  
 পণ্ড ও ত খার দায়, মানবেরি মত,  
 কাম ক্রোধ লোভ লয়ে বিচরে সংসারে  
 একি ভাবে নিশি দিন, কি পার্থক্য তবে

এ উত্তরে ?—আছে কিছু, এ বৈব জগতে  
 মানবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, জ্ঞান ও বিবেক  
 দেয় নি পণ্ডতে বিধি,—দিয়াছে মানবে ।  
 তাই তারা এ অজ্ঞেয় আধার জগতে  
 বিবেকের আলো জ্ব'লে জ্ঞানের সাহায্যে  
 সুখ দুঃখ ভাল মন্দ বে'ছে নেয় সব ।  
 আপনার কন্ম' দোষে—নিরুত্তি তাড়নে  
 সকলের ভাগ্যে কত সুখ ও ঐশ্বর্য্য  
 নাহি ঘটে, এ সংসার মায়া-মরীচিকা,  
 আলো দেখাইয়া শেষে ডুবায় আধারে ।  
 কত দুঃখ কত শোক কতযে অশান্তি  
 আপদ বিপদ কত অজানিত ভাবে  
 পড়িয়া বজ্রের মত মানব অনৃষ্টে  
 নিপ্পেষিত করে সব ; আশার প্রাসাদ  
 চূর্ণ করি, কত সুখ কত সাধ হ'তে  
 বঞ্চিত করিয়া দেয় জনমের তরে ।  
 কত যে সাধের ধনে, কত প্রিয়জনে ।  
 বাধ্য করে তেয়াগিতে এ ছদি দলিয়া  
 এ সংসার সুখ দুঃখ হর্ষ বিষাদের  
 রক্তভূমি, নিপ্পেষিত হয় জীবগণ  
 পলে পলে এই স্থানে জীবন সংগ্রামে ।  
 নিয়তির বাধ্য নর, কি সাধা তাহার  
 এক পদ যে'তে কত এদিকে ওদিকে ?  
 সম্মুখে ভীষণ যুদ্ধ মহারাষ্ট্র সনে,  
 বাঁচি মরি ঠিক নাই, কি আছে অনৃষ্টে  
 কে জানে ? সমস্ত সৈন্ত গেছে পানিপথে  
 আমিও এখন যাব সে মহা সমরে ;  
 বোধ হয় আমি আর আনিব না কিরে ।  
 যে কথা বলিতে আজ এসেছি এখানে,  
 বলিতে তা এ হৃদয় যেতেছে কাটিয়া ।



এত বে বে'লেহ ভাল, এত বে বে'লেছি,  
সকলি বিকল তাহা—অপমের মত ।  
কি করিব ? হার এই নবর অগতে  
কত সাধ কত আশা কত ভালবাসা  
অল বুঝুদের মত কুটে ছিদি মাঝে,  
সবি কি তা' পূর্ণ হয় মানব জীবনে ?  
এমত রাবণ সম মানবের মন,  
উচ্ছ্বল গতি তার, জ্ঞানের অঙ্কুর  
না কিরালে তারে, শেষে বিপদ বিষম ।  
মুখ শাস্তি মানবের আয়ত্ত ত নহে ?  
সকলি প্রাক্তন-লিপি, দোষ দিব কার ?  
ধর্ম মতে এ অগতে বিবাহ মোদের  
অসম্ভব, তুমি হিন্দু, আমি মুসলমান,  
কিন্তু আমি পাপ পথে যাবনা কখনি  
লজিতে তোমারে, তব ধর্ম নষ্ট করি ।  
পশু নহি, জীব ঐচ্ছ মানব হইয়া  
ধর্ম ছাড়ি, কেন ছিছি নারী-ধর্ম্যে তব  
করিব কুঠারাঘাত পশু প্রায় আমি ।  
অগতের মাতৃজাতি নারী ধরাধামে,  
সে নারীর অপমানে ক্রুদ্ধ অগদীশ,  
ইহাই ইসলাম নীতি—সে পবিত্র ধর্ম্যে  
অত্যাচছে নারীর স্থান, সে নীতি লজিয়া  
নারীদের অপমান চাহিনা করিতে ।  
আতর্ক ! এ পথাচার ভাল নাহি বাসে ;  
আমি তব শুভাকাঙ্ক্ষী জীবনে মরণে ।  
ইচ্ছির শ্বশুর লাগি কেন আমি তব  
বিনাশিয়া নারী-ধর্ম্যে নারীর নিকটে  
হের করি, কলঙ্কিত করিব তোমারে ?  
বিবাহ ত নহে শুধু মতের বীধন ?  
আমার বীধন তাহা অটুট লগারে ;

হুটি আশা পরম্পর না হলে মিলিত  
ধর্ম মতে, নহে তাহা প্রকৃত বিবাহ ।  
যদি না হইল তাহা, না পাত্ত তোমারে  
বৈধ ভাবে, এ অগতে কি কাজ বহিরা  
বুধা জীবনের ভার—কলঙ্কের ডালি ?  
বাধা দিয়া চাপা কঠে কহিলা হিরণ  
“কেন নাথ ধর্ম্য পত্নী আমিও তোমারি ?  
গুরুদেব যোগাঙ্গমে স্বয়ম্ভু-সম্মুখে  
বাধিয়াছে ধর্ম্য মতে বিবাহ-বন্ধনে  
আমারে, তোমার হস্তে করি সম্প্রদান,  
আমিও ত স্বয়ংবরা হ'য়েছি সেদিন,  
মালা দিয়া কঠে তব, প'ড়ে না তা' মনে ?—  
—পড়ে না তা' মনে সেই মলয় পর্বতে  
সন্ন্যাসীর যোগাঙ্গমে অধিত্যকা পরে  
কৌমুদী রঞ্জিত রাত্রে বন-পুষ্প হার  
দিয়াছি কঠে তব, তুমিও সেদিন  
ব'লেছিলে স্বয়ংবরা হয়েছি আমি,  
আজি কেন বলিতেছ এ কথা আবার ?  
ভুলেছ কি তাহা এবে ? আমি অত্যাগিনী  
অত কথা নাহি বুঝি, সাক্ষী রবি শশী,  
সাক্ষী মহেশ্বর, আমি নহি বিচারিণী ।  
স্বামী বলে তোমারেই পূজা করি আমি  
ভক্তি ভরে—অক্লান্তি—প্রেমের কুসুম ।”  
কহিলা সজল নেত্রে আতর্ক ! হাসিয়া  
“হিন্দু ধর্ম্য মতে তব হ'য়েছে বিবাহ  
মানি তাহা, কিন্তু প্রিয়ে আমি মুসলমান ।  
ইসলাম ধর্ম্যের মতে হয়নি বিবাহ  
আমাদের, স্বদয়ের নিছত প্রদেশে  
উভয়েই উভয়ের প্রতিমা গড়িয়া  
স্বাপিরাছি প্রণয়ের স্বর্ণ-সিংহাসনে।

কিন্তু প্রিয়ে আমাদের হবে না মিলন  
 এ জীবনে, কেন তবে বুঝা যায় মোহে  
 আশার হলনে তুলি দেখিব স্বপন ?  
 ইসলাম ধর্মের মতে সত্য বটে আজি  
 হতে পারি বন্ধ মোরা বিবাহ-বন্ধনে ।  
 কিন্তু সে সময় নাই, ধর্মের আহ্বানে—  
 —স্বজাতি কল্যাণে, আর জননীর ডাকে  
 এসেছি ছুটিয়া আজি সময় প্রাপ্তে ।  
 বিশেষতঃ ধর্ম ভগ্নী মোহরার কাছে  
 প্রতিজ্ঞায় বন্ধ আমি জনমের তরে,  
 যত দিন না পারিব করিতে সংহার  
 হৃদয় মারাঠা বৃন্দে সম্মুখ সংগ্রামে  
 বাহু বলে, করিব না পরিণয় আমি  
 ততদিন,—সে প্রতিজ্ঞা তাজিব কেমনে ?  
 হিরণ তোমার কাছে মহা দোষী আমি ;  
 যদি বেঁচে থাকি, তবে আসিয়া আবার  
 বাধিব তোমারে আমি বিবাহ-বন্ধনে  
 আমাদের ধর্ম মতে এই ইচ্ছা মনে ।  
 অথবা সময় ক্ষেত্রে ম'রে যাই যদি,  
 ক্ষমিও আমারে তুমি,—বিদায় এখন ।  
 আর কি বলিব প্রিয়ে, কেঁটে যায় যদি,  
 তুলে যাও অভাগারে জনমের মত ,  
 তুলে যাও ভালবাসা, তুলে যাও প্রীতি,  
 মুছে কেল অতীতের সুখামাখা স্মৃতি,  
 হিঁড়ে কেল ভগ্নতের সমস্ত বন্ধন ।  
 এ শরীর কণহারা, ইন্দ্রিয়ের সুখ  
 কিছু নহে, সব কঁাকি—মরীচিকা ভ্রম ।  
 আজি হ'ক কালি হ'ক মরিব নিশ্চয়  
 একদিন, কল্পতুমি জননীর তরে  
 প্রাণ দিলে ধর্ম বৃদ্ধে—পবিত্র প্রেমের

পুরস্কার অবশ্যই পাব পরকালে  
 জীবনের পরপারে—বিধাতার কাছে ।  
 আমার প্রাণের শেষ রক্তবিন্দু যবে  
 পড়িবে এ ধরাতলে স্বদেশের তরে,—  
 —সেই রক্তে বিধাতার আগনের নিয়ে  
 স্বর্গীয় সুবর্ণ-পটে হইবে অঙ্কিত  
 এ পুত কামনাশূন্য প্রেমের কাহিনী ।  
 প্রেমের মদিয়া প্রিয়ে পান করি মোরা  
 হইয়াছি আত্মহারা, তোমাতে আমাতে  
 নাহি কোন ভেদাভেদ, প্রাণের ভিতরে  
 চাহিলে, নিরখি শুধু মুরতি তোমার—  
 —আমি তুমি, তুমি আমি ভিন্ন নহে কেহ ।  
 সে পুত কামনা শূন্য প্রেম-আকর্ষণে  
 ত্যজিয়া সংসার-মায়া কামনা বাসনা  
 চ'লেছি ছুটিয়া মোরা বিধাতার কাছে ।  
 সেই প্রেম-বশে মোরা রহিব ফুটিয়া  
 পদ্ম প্রায়, বিধাতার চরণের তলে ।  
 এ দেহ হইলে ধ্বংস আত্মা উত্তরের  
 একত্র মিলিত হবে স্বর্গের উদ্ভানে ;  
 সেই সুখ আমাদের বাঞ্ছনীয় এবে  
 পার্থিব সুখের জন্য নহি লালারিত ;  
 সে সুখে আমার এবে নাহি আকিঞ্চন ।”  
 হিরণ সজল নেত্রে কহিল তাহারে  
 “অমর, তোমার সুখে চিরসুখী আমি ;  
 তোমারি সুখের তরে জীবন আমার  
 উৎসর্গ করেছি আমি, একমাত্র তুমি  
 আরাধ্য দেবতা মোর, তুমি না থাকিলে  
 স্বর্গও আমার কাছে নরক সমান ।  
 দয়া ক'রে তুমি মোর ধর্মের উপরে  
 করিবে না হস্তক্ষেপ, ইহাও তোমারি

মহেশ্বর পরিচয় ; কিন্তু প্রিয়তম  
 আমার এ দেহ-প্রাণ সবি ত তোমারি ?  
 ধর্ম কি এ প্রাণ ছাড়া ? প্রাণের দেহ  
 তুমি হবে, ধর্ম-কর্তা তুমিই ত মম ?  
 বিবাহ ত বহুপূর্বে হয়েছে আমার  
 তব সনে যোগাশ্রমে গুরুর আদেশে ।  
 আজি এ নূতন কথা বলিলে কেমনে  
 প্রাণেশ্বর ? যাহা হ'ক, অনন্ত উদার  
 সিদ্ধ হুমি, আমি নাথ ক্ষুদ্র স্রোতঃস্রোতী,  
 তোমারি উদ্দেশে আমি চ'লেছি ছুটিয়া  
 দিবা নিশি, প্রেম-মদে হ'য়ে আশ্রহারা ;  
 আমি ক্ষুদ্র, তুমি বড়, তব সনে মোর  
 হয়না তুলনা, তুমি স্বর্গের দেবতা  
 নরকের কীট আমি ; তুমি মুসলমান  
 আমি হিন্দু, কি পার্থক্য প্রেমের নিকটে  
 হিন্দু-মুসলমানে নাথ ? নিজে প্রেমময়  
 জগদীশ, প্রেম ঐক্য সব ধর্ম হতে ।  
 হিন্দু মুসলমান ক'রে সৃজ'ছে কি বিধি  
 জীব ঐক্য মানবেরে, —তোমারে আমারে ?  
 আমরা মানব মূর্খ পড়ি জ্ঞানি ঘোরে  
 সৃজিয়াছি জাতিভেদ ধ্বংসের কারণ  
 হিংসা বশে, ভাবিতে তা' হৃদয় শিহরে ।"  
 আত্মার্থীর বন্ধে নির রাখিয়া হিরণ  
 পাড়াইলা উভয়েই আশ্রহারা প্রেমে  
 নাহি সংজ্ঞা, যেন দৌছে প্রকৃত মুরতি ।  
 প্রেমোন্মত্ত আত্মার্থীর অধর যুগল  
 অজ্ঞাতে পড়িল হু'রে ধীরে-ধীরে-ধীরে  
 হিরণের রক্তবর্ণ অধর-কুমুদে,  
 উভয়েই আশ্রহারা, নাহি বাহু জ্ঞান ?  
 উভয়ের প্রাণ যেন এ বিশ্ব ছাড়িয়া

চলি গেছে কোন্ দেশে, উভয়ে তখন  
 দেখিতে লাগিলা কত প্রেমের স্বপন ।  
 আত্মার্থীর তুরঙ্গম উঠিল চীৎকারি  
 তেন কালে, সেই রবে উঠিলা চমকি  
 হু'ও জন, ভেঙ্গে গেল সে প্রেম-স্বপন  
 উভয়ের, উভয়েই শুনিলা স্মৃরে  
 কে জানি গাইছে এই করুণ সঙ্গীত  
 মর্মভেদী, বনভূমি করি আকুলিত  
 সুধাতানে, প্রকৃতিরে করি আশ্রহারা—

মায়ের কাজে লে'গে যা ভাই  
 আর কতকাল থাক'বি বুঝে ?  
 মা যে মোদের অনাধিনী  
 ঐ প'ড়ে ভাই আছে ভুঝে ।

মোহিয়া এ বনভূমি—বন-বিহগিনী,  
 ছড়া'য়ে তটিনী, বন্ধে মুক্তা রাশি রাশি  
 আবার,—আবার স্বর ভাসিল গগনে ।

মা যে মোদের মর্ম দুঃখে,  
 প'ড়ে আছে বলিন বুঝে,  
 অনাহারে নীর্ণ বুকে  
 স্বরে অশ্রু নয়ন কোণে ।  
 মা তোদেরে ডাকছেরে ভাই,  
 গোণ করিসুনে—আয় ছু'টে বাই,  
 মায়ের দুটি চরণ চুঝে ।

সদানিব ঐ মায়ের বুকে  
 বসিয়ে দিন ভীষণ ছোরা ।  
 এই কি তোদের মাতৃভক্তি ?—  
 —ব'লে ব'লে দেখিসু জোরা ?

আর ছুটে ভাই—ঐ মা বোদের  
চে'রে আছে তোদের পানে ।  
মায়ের কাছে লে'গে যা ভাই  
আর কত কাল থাক'বি বুনে ?

শোধিতে সে মাতৃধন

পার'বি কি তুই এ জীবনে ।  
মা তোদেরে ডাকছে রে ভাই  
গৌণ করিসনে—আয় ছুটে যাই  
মায়ের দুটি চরণ চুমে ।

দুঃখিনী মা'র নয়ন জলে,  
কঠিন পাথর যায় বে গলে,  
তোরা ভাই তা' কেমন কবে  
সয়ে আছিস কোমল প্রাণে ।  
মায়ের কাছে লে'গে যা ভাই  
আর কত কাল থাক'বি বুনে ?

শত ছিন্ন বসন পরা  
অঙ্গে মাখা ধূলা বালি ।  
দেখলে তারে হৃদয় ফাটে  
কাপড় ভরা কালি ছালি ।  
মা যে বোদের কাজালিনী  
ঐ প'ড়ে ভাই আছে ভুমে ।  
মায়ের কাছে লে'গে যা ভাই  
আর কত কাল থাক'বি বুনে ?

মা যদি মোর ম'রে যায় ভাই,  
সে দুঃখ রাখেতে পাবিনে ঠাই,  
কেউ রলি ভাই বুনের ঘোরে,  
কেউ রলি ভাই খেলার বুনে ।  
মায়ের কাছে লে'গে যা ভাই,  
আর কত কাল থাক'বি বুনে ?

তনিরা এ মর্মভেদী সঙ্কর গীতি  
আত্মা'র আঁণ ঘেন উধাও হইয়া

চলি গেল কোন্ নূরে,—ভাবিলা আত্মা'র  
এ নির্জন বন মাঝে এ সুধা-সঙ্গীত  
কে গাইছে ? বোধ হয় কোন দেব-বালা  
রমণীর প্রেমে মোরে হেরি আত্মহারা  
ভে'বেছে কর্তব্য ভ্রষ্ট হইয়াছি আমি ।  
ভাই বুঝি আজি এই সঙ্কর স্বরে  
গাইছে এ সুধাগীতি ভৎসনার ছলে ।  
আত্মা'র হৃদিমাঝে অশান্তি ঝটিকা  
বহিতে লাগিল বেগে, উন্মাদের প্রায়  
প্রাণের আবেগ ভরে কহিতে লাগিলা  
“আরনা—আরনা আমি চলি হিরণ,  
পারিনে থাকিতে আর প্রেমের কুহকে  
ভুলে আজি, ছিঁড়ে ফেল সকল বন্ধন ।  
অই হের—অই হের স্বজাতি আমার  
ডুবে গেছে পানিপথে—রক্তের সাগরে ।  
অই হের আমার সে দুঃখিনী জননী  
অন্যভূমি কেঁদে কেঁদে উন্মাদিনী প্রায়  
এলোকেশে ছিন্ন বেশে ডাকিছে আমারে  
মর্ম দুঃখে বন্ধ তার ফে'লেছে ছিঁড়িয়া  
মহারাত্রি দম্মাদল তীক্ষ্ণ শেলাঘাতে ;  
মা আমার ডুবে গেছে রক্তের সাগরে ।  
অই শোন—অই শোন ঘোর আর্তনাদ,  
আরনা, বিদায় দেও হিরণ আমার,  
এই দেখা শেষ দেখা জনমের মত ।”  
মুহুর্তে উঠায়ে হস্ত আকাশের দিকে  
দেখাইয়া আর্ত স্বরে কহিলা আত্মা'র  
অই উদ্বে—আকাশের অই নীলিমায়  
আবার হইবে দেখা মরণের পর  
জীবনের পরপারে—গোলাপ-কাননে ।  
হিরণ,—হিরণ, তুমি কহিও আমারে

যাই হবে।” বলে যোর উন্নতের প্রায়  
 এক লক্ষ অন্তরে উঠিয়া বীরেন্দ্র  
 ছুটিল বিদ্যাৎ বেগে অরণ্য ভেদিয়া।  
 নিরখি এ দৃশ্য, হায় বিহ্বল হৃদয়ে

অভাগিনী এক দৃষ্টে রহিল চাহিয়া  
 হুই বিন্দু অক্ষ তার করিল নয়নে  
 আকুল প্রাণের রুদ্ধ বেদনা লইয়া ;—  
 —হঃখিনী সে অক্ষয়ল মুছিল বসনে।

---

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

ସହାୟନ

ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଂଶ





## প্রথম সর্গ

### পানিপথ প্রাস্তর

[মহম্মদ ও মুসলমান শিবির]

“হার পানিপথ দারুণ প্রাস্তর,  
কেন ভাগা সনে হলিনে অস্তর  
হেমচন্দ্র ।

কল্পনে লো, অকস্মাৎ কেন এ ক্ষয়  
উঠিল কাঁপিয়া ? প্রাণ হ’ল আতঙ্কিত ?  
এ কি লো, চরণ কেন উঠেনা আমার  
এবে আর ? অগ্রসর হইব কেমনে  
এ দূর গন্তব্য পথে ? কেন লো স্বপ্ননি,  
সহসা এ ভাব আজি হঠাৎ আমার ?  
বিদেশী পথিক আমি চিনি না এ দেশ,  
কোথায় আনিলি মোরে ভুলাইয়া পথ ?  
এ যে দেখি মরু প্রায় মহাভয়ঙ্কর  
তরুশূন্য, সীমাশূন্য, বিশাল প্রাস্তর ।  
—কি বলিলি, লো কল্পনে কোবিদ সজিনী  
এই সেই পানিপথ ?—দারুণ প্রাস্তর ?

এই সেই স্থান ?—সেই ভীষণ শ্মশান ?  
যেই স্থানে লক্ষ লক্ষ ভারত সন্তান  
দিয়াছিল ধর্মবুদ্ধে আপনার প্রাণ ?  
যেই স্থানে অগণিত হিন্দু-মুসলমান  
নিজিত জনের মত ; ভীষ কণ্ঠ জোণ  
মিশিয়া গিয়াছে যার ধূলা বালি সনে ?—  
—এই সেই স্থান ? হার রঞ্জিত যে স্থান  
উত্তরার হৃদি রত্ন সুভদ্রার প্রাণ  
অভিমত্যা জনের তরল শোণিতে

সুপরিচয়,—এই সেই ভীষণ শ্মশান ?  
যেই স্থানে পৃথ্বীরাজ ভীষণ সংগ্রামে  
হ’য়েছিল পরাজিত ? হিন্দুর সৌভাগ্য  
ডু’বেছিল যেই স্থানে পৃথ্বীরাজ সনে  
কাদায়ে সমগ্র হিন্দু এ জনের মত ?  
যেই স্থানে বীরশ্রেষ্ঠ সম্রাট বাবর  
ধ্বংসিয়া পাঠান সৈন্ত মোগল সাম্রাজ্য  
ক’রেছিল প্রতিষ্ঠিত, বালক আকবর  
যে স্থানে হিন্দুরে বুদ্ধে করি পরাজিত  
সেই ভিত্তি ক’রেছিল আরো দৃঢ়তর ।  
পাঠানের শেষ আশা, অস্তিমের আলো  
হিন্দুর সৌভাগ্য সনে যে রণ-প্রাঙ্গণে  
হ’য়েছিল নির্বাপিত জনমের মত  
এই সেই স্থান ?—সেই ভীষণ শ্মশান ?

পানিপথ, কোথা তব সে শক্তি ভীষণ ?  
যে শক্তি প্রভাবে তুমি কত যে সাম্রাজ্য  
করি ধ্বংস, নব রাজ্য ক’রেছ স্বজন ?  
আজন্ম পালিত তুমি ভারতের বৃকে,  
ভারতের রক্ত মাংসে শরীর তোমার  
পানিপথ, হার তুমি নিশ্চয় ক্ষয়  
দম্ব্য প্রায় বল দেখি ধ্বংসিলে কেমনে  
ভারতের কীর্তিস্তম্ভ ? ধ্বংসিলে কেমনে  
ভারতের কোটি কোটি বীরেন্দ্র সন্তানে ?  
হ’লনা সমতা কি হে যুদ্ধের তরে

তব ক্ষমে ? যার অগ্নে জীবন তোমার,  
তার সর্বনাশ তুমি সাধিলে কেমনে ?  
নহে একবার, কিংবা নহে দুই বার,  
কতবার তুমি ঘোর নৃশংসের মত  
ধরি উগ্রযুষ্টি, দন্তে কাঁপাইয়া ধরা  
রণরঙ্গে সাধিয়াছ প্রলয় ভীষণ ।  
ঋংসিয়াছ তুমি সেই আজন্ম হুঃখিনী  
ভারতের কোটি কোটি বীরেন্দ্র সম্মানে ।  
ঋংসিয়াছ তুমি সেই বীরকুলবর্ভ  
ভীষ্ম জ্ঞাণ ভারতের জীবন্ত গৌরব ।  
ঋংসিয়াছ তুমি সেই—বলিতে সে কথা  
বিদরে হৃদয় হায়—হুঃখিনী ভদ্রার  
সুবর্ণ-কুমুদ সম নীর পুতুল  
অভিমুখ্য, বেড়ি তারে সপ্তরথী জালে  
কুরঙ্গ শিশুর মত অস্তায় সমরে ।  
আরো ঋংসিয়াছ তুমি পাঠান বংশের  
সেই চির হতভাগ্য শেষ সম্রাটের  
ঋণ-রাজ্য, সেই রক্তে হৃদয় তোমার  
রঞ্জিয়া ধ'রেছ তুমি কি যুষ্টি ভীষণ ।  
হা ধিক তোমারে, তুমি কৃত্রিম পামর,  
ছুইলে তোমারে এই মানব জীবন  
হয় চির কলঙ্কিত, অরিলে তোমারে  
পাপী নর, হি হি তুমি অম্পৃশ্য ঘনিত ।

প্রথম প্রহর নিশি ; সুনীল শিবিরে  
বাহাও বসিয়া এক ঋণ সিংহাসনে  
চিন্তাময় ; বামপার্শ্বে যশোবন্ত রাও ;

দক্ষিণে বিদ্যাস, \* আরো কত সভাসদ  
বসি এক ধারে, কোণ্ডে মলিন বদন ।  
সম্মুখে সন্ন্যাসী এক ভীষণ মূর্তি  
জটাধারী, হস্তে এক ত্রিশূল ভীষণ  
নির্ম্মিত মানব করে রক্ত বিষণ্ণিত  
সন্ন্যাসীর নেত্র-বুগ অনলের ধনি  
ভরফর, ধক্ ধক্ অলিছে নিবিছে  
ধেকে ধেকে বিনাশিতে সৃষ্টি বিধাতার ।  
সন্ন্যাসী ব্যাকুল চিন্তে ভাবিছে হৃদয়ে  
“এত যত্ন এত চেষ্টা হ'ল কি বিফল ?  
সমস্ত সৈনিকে আজি সংগ্রামের তরে  
করিয়াছি উত্তেজিত, নিশ্চয় তাহার।  
যুঝিবে মোদের সনে রজনী প্রভাতে ;  
কই তার।, এখনো যে নাহি এল হেথা ?  
নাহি জানি কি বিভ্রাট ঘটেছে আবার,  
তবে কি তাহার। বুদ্ধ করিবে না আর ?”  
এইরূপ কত কথা ভাবিছে হৃদয়ে  
যোগীবর ; পলে পলে যাইছে বহিরা  
নিশীথিনী অতীতের সমাধি গহবরে ।  
নীরব বীরেন্দ্রবৃন্দ, নীরব শিবির ;  
কিছুক্ষণ পরে ধীরে ভাজি নীরবতা  
রোবে কোণ্ডে যশোবন্ত কহিতে লাগিল।  
“কত দিন বন্দী ভাবে রহিব পড়িয়া  
এই স্থানে ? অনশনে সমস্ত সৈনিক  
মৃত্যু প্রাণ, কে যোগাবে রসদ এখন ?  
অগণিত সৈন্তসহ অস্তায় সমরে  
গোবিন্দ পণ্ডিত † হত । পাষাণ মোদের

\* বিদ্যাস রাও ও বিদ্যনাথ রাও একই ব্যক্তি, ইনি পেশবার পুত্র ।

† একজন মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি, ইনি কোরা, কটাছ, এটোয়া, সেকোয়াবাদ প্রভৃতি মহকুমার কর আদায়  
কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, ইনি মুসলমানদের রসদ সংগ্রহ কার্যে এরূপ বাধা প্রদান করিয়াছিলেন যে মোটা আটা  
টাকান্তে চারি সের নরেন্দ্র বিক্রীত হইয়াছিল। আহমদ শাহ দোরাণী এজন্য ক্রোধান্বিত হইয়া আতা খাঁ নামক একজন

পঞ্চভ্রাতৃ মহারাষ্ট্র সৈনিক \* সকলে  
বধিয়া, নিরাহে লুটি তরুর মত  
অর্থ ও রসদরাশি—কি ক'রেছি তার ?  
হৃদ্যন্ত নজিবদৌল। বধিয়াছে হায়  
বীরশ্রেষ্ঠ বলবন্ত, † মরিলে সে কথা  
হৃদয় শিহরি উঠে, হায় বলবন্ত  
মহারাষ্ট্র-রত্ন তুমি, হারানু তোমারে  
হেলায় অদৃষ্ট দোষে মোসলেম সমরে ।  
তোমার বীরত্ব-গাথা শুনিলে হৃদয়ে  
কি এক অনল-স্রোত হয় প্রবাহিত ।  
হৃদয়ের রক্তে রক্তে শিরায় শিরায়  
কি এক তড়িৎ স্রোত সঞ্চরিয়া বেগে  
যুহুর্ন্তে মাতা'য়ে তুলে এ নিখৌব প্রাণে,

বীর মদে, ইচ্ছা হয় তোমারি মতন  
স্বংসিয়া মোসলেম বৃন্দে সমুখ সমরে  
দিতে প্রাণ অশ্রুত্মি জননীর তরে ।  
ভীষণ বিক্রমে ক্ষুদ্রি বধিয়া পাবণ  
খলিলুর রহমানে, \* শেষে কি না হার,  
কাঁদাইয়া মহারাষ্ট্র এ জনের মত  
ঘুমাইলে বীরবেশে সমর প্রাঙ্গণে ।  
বড় হুঃখ, সৃষ্টিময় মোসলেম সৈনিক  
বিংশতি সহস্র ভীম মহারাষ্ট্র সৈন্য  
বধিয়াছে, ‡ কে যোগাবে রসদ এখন ?”  
নীরবিলা যশোবন্ত, কহিলা রঘুজী  
“চারিদিকে কুলক্ষণ অশাস্তি কেবল  
পদে পদে, এ বিপ্লবে কে জানে বিধির

বীরপুরুষকে গোবিন্দ পণ্ডিতের মৃত্তু আনিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন । আত্মার দশ সহস্র অনিরমিত অশ্বা-  
রোহী সৈন্যসহ এক রাতেই ৪০ কোশ পথ অতিএম করিয়া প্রত্যুষে অতি ভীষণ বিক্রমে গোবিন্দ পণ্ডিতের শিবির  
আক্রমণ করিয়া তাহাকে বিধ্বস্ত করেন । এই বীরপুরুষ চতুর্থ দিবসে আহমদ সাহা আফগানীকে গোবিন্দ পণ্ডিতের  
মৃত্তু উপহার দিয়া বিশেষরূপে পুরস্কৃত হইয়াছিলেন । Asiatic Society, Researches Vol III.

\* গোবিন্দ পণ্ডিতের হত্যার পরে অর্ধের অনটন বশতঃ সদানিব ডাও দিল্লীর শাসনকর্তা নারায়ণের নিকট  
হইতে অর্থ আনিবার জন্য দুই সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য দিল্লী প্রেরণ করেন । উহারা প্রত্যেকে দুই হাজার টাকার  
তোড়া লইয়া রাত্রিকালে পোপনে অব্যবহৃত পথে আসিতেছিল, রাত্রি ঘোর অন্ধকার থাকায় উহারা পঞ্চভ্রাতৃ হইয়া  
মহারাষ্ট্র শিবির ভানে মুসলমানশিবিরে উপস্থিত হইলে মুসলমান-সৈন্যগণ উহাদিগকে হত্যা করিয়া ঐ অর্থ গৃহণ  
করিয়াছিলেন । Asiatic Society, Researches Vol III.

† ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে সদানিবের শাসক বলবন্ত রাও নজিবদৌলকে পানিপথ  
প্রান্তরে অসহায় অবস্থায় পাইয়া একপ ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিয়াছিল যে, পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী সৈন্য বাতীত  
নজিবদৌলার সমস্ত সৈন্য হরতল হইয়া পলায়ন করিয়াছিল । নজিবদৌলা এই অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া অতি  
কৌশলে বুদ্ধ করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে সাহায়া আসিয়া পহঁছিলে উভয় দলে ঘোরতর সংগ্রাম বাধিয়া যায় । রাত্রি ৯  
ঘটিকা পর্যন্ত এই প্রাণান্তকারি ভীষণ যুদ্ধে নজিবদৌলার তিন সহস্র সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল । নজিবদৌলার  
শিষ্য খলিলুর রহমান ও মহারাষ্ট্র সেনাপতি বলবন্ত রাও এই ভীষণ যুদ্ধে প্রাণদান করিয়াছিলেন । Asiatic  
Society, Researches. Vol III.

‡ নজিবদৌলার শিষ্য ।

+ আহমদ সাহা আফগানীর আদেশ মুসলমান সৈন্যগণ দিবারাত্রি পাহারা দিয়া মহারাষ্ট্রীদের রসদ  
সংগ্রহ কার্যে একপ বাধা প্রদান করিতে লাগিল যে, রসদ ও দানা ঘাস অভাবে তাহাদের বিষম কষ্ট হইতে  
লাগিল, একদিন রাতে বিংশতি সহস্র মহারাষ্ট্রী সৈন্য ঘাস ও ইক্ষু প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার জন্য কিছু দূর অগ্নিস্র  
হইয়া হঠাৎ একটি নিকটস্থ বনভূমিতে উপস্থিত হইলে সাহাপন্থন খাঁ ইহা টের পাইয়া পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য-  
সহ উহাদিগকে বেষ্টিত করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন । প্রত্যন্তে আহমদ সাহা সোরাণী এই সংবাদ পাইয়া বহু পাত্র-  
বিশ্রম হইয়া যুদ্ধে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, মত দেহতলি পর্বতাকারে রহিয়াছে । Asiatic Society, Rese-  
arches. Vol. I. I.

কি বাসনা? নিতি নিতি এ ক্ষুদ্র সমরে  
কেবলি সৈনিক কর, ও নাহি জানি শেষে  
কি আছে অদৃষ্টে হার অর পরাজয়।  
কতবার সন্ধি আশে পাঠাইছ দূত  
মোস্লেম শিবিরে, কিন্তু সকলি নিফল  
একমাত্র নজিবের বুদ্ধির কোশলে।  
এখনো সময় লিলা করি পরিহার  
বাই যদি মহারাজে, বাইবে ঘুচিয়া  
এ ঘোর বিপদ রাশি। “বিপদ কিসের?”  
বাধা দিয়া সদাশিব কহিল। গর্জিয়া  
জুড়ভাবে “কাপুরুষ মোস্লেম সংগ্রামে  
লুকাইব তবে বুঝি রমণী-মহলে?  
হ’ক সন্ধি, কতি নাই, অস্তথা নিশ্চয়  
যুঝিয়া বীরের মত সম্মুখ সমরে  
ধ্বংসিব মোস্লেম বৃন্দে কি তার মরণে?  
উত্তরে হিমালয়, আর দক্ষিণে সমুদ্র,  
এ বিস্তৃত ক্ষেত্রে বীরেন্দ্র এমন  
কে আছে, যুঝিবে দর্পে মহারাজী সনে?”  
“জয়াজ তোমরা” হেসে কহিল। রাঘব  
“আকালীর মত বোকা কে আছে ভারতে?  
নির্বোধ তোমরা, বল যুঝিবে কেমনে  
ভাহার কুটিল নীতি? তে’বে দেখ মনে  
কি বীরত্ব কি গাভীরা করিয়া ধারণ  
এ সমরে, ধ্বংসিতেছে মহারাজী-সেনা।

দিন দিন, কণকরে নহে চকল;  
তোমরা চকল চিত্ত, যুহুর্থে যুহুর্থে  
এ ভারত উদ্ধারিতে করনা জরনা  
করি’ কত, ধ্বংসিতেছ শক্তি আপনার।  
পেরেছ কি তিন মাসে যুহুর্থের তরে  
ধ্বংসিতে মোস্লেম সৈন্ত? আকালীর কতি  
পেরেছ কি করিতে এ সুদীর্ঘ সমরে?  
হি হি লজ্জা, ভাবিতেও ঘৃণা হয় মনে,  
কোন্ মুখে বীর ব’লে দেও পরিচয়?  
পারিবে না—পারিবে না সম্মুখ সমরে  
যুঝিতে দোরাণী সনে? সুজার মন্ত্রনা  
অতি সাধু, দূর কর যুদ্ধের বাসনা,  
যাও চলি মহারাজে, চির অত্যাশিত  
লুণ্ঠন, হনন ভিন্ন সম্মুখ সমর  
অবিধেয়, পারিবে না মোস্লেমের সনে।  
আমাদের সৈন্ত মাঝে এমন বীরেন্দ্র  
নাহি কেহ, যুঝিবে যে সম্মুখ সমরে  
চুর্চুর্ব দোরাণী সনে।” উঠিল। গর্জিয়া  
এত্রাহিম, “কে বলিল নাহি হেন বীর।  
অনেক বীরেন্দ্র আছে, তুচ্ছগণে গ্রাণ  
নখর জগতে, যুদ্ধ ব্যবসা মোদের,  
আমরা কি ডরি কতু সম্মুখ সংগ্রামে?  
দেহ আজ্ঞা, এইদণ্ডে শত্রুর শোণিতে  
রঞ্জিব এ অসি ময়, অস্তথা নিশ্চয়

\* প্রায় তিন মাসকাল মহারাজীয়েতা ও মুসলমানগণ পার্শ্ববর্তীভাৱে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতে-  
ছিল। প্রায় প্রত্যহই ইফাকার মধ্যে জুর জুর যুদ্ধ হইত। কিন্তু তিনটি মাস গতকর হইরাছিল। প্রথম, ১৭৬০  
খ্রীষ্টাব্দ ২৯শে অক্টোবর; এই তারিখে পঞ্চদশ সহস্র মহারাজীয়েতা ইফাকার দিক দিয়া একজন উজিরের দ্বারা  
অস্ত্রাশয় করিয়া প্রায় বিদায় করে, এমন সময়ে মহারাজী বাহাদুর সাহসে আগিয়া উত্তর দিকে যুযুত যুদ্ধ বাধিয়া  
যায়। মহারাজ সন্মুখ যুদ্ধে সৈন্ত প্রত্যাহন করিয়া মোহাম্মদী সৈন্যদের পশ্চাতে প্রেরিত হইয়া অনেক  
হত্যা করিয়াছিল। এই দিনের যুদ্ধে উত্তর দিকের চারি সহস্র সৈন্য হত হয়। দ্বিতীয়, ২৩শে ডিসেম্বর; এই  
তারিখের যুদ্ধের কথা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় বারের যুদ্ধও এইরূপ হইরাছিল। Asiatic Society,  
Researches. Vol. III.

ওইব সময়ক্ষেত্রে —ভরি না শমনে ?”  
 মুহূর্তেকে সমসের উঠিল। নজিয়া  
 “শত্রুরে ভরিব কেন ? যুধিব সমরে,  
 বা থাকে অদৃষ্টে হ’বে, জয় পরাজয়  
 বিধাতার ইচ্ছা। সবি, আমরা কেমনে  
 কিরাইব লিপি তার ? জীবন মরণ  
 তারি ইচ্ছা, তবে কেন এত ভয়াতুর ?  
 উঠ সবে, খোল অসি হও অগ্রসর  
 দেখিব কেমন বীর দোরাণী বর্ষর ?”  
 অমনি ভীষণ স্বরে কহিল। জাহ্নজী  
 “মহারাত্রি বীর শস্য, নহি মোরা ভীক  
 কি ভয় মরণে বল সম্মুখ সংগ্রামে ?  
 বীর মোরা, বক্ষ পাতি লইব হাসিয়া,  
 ইশ্বের ভীষণ বজ্র, লইব হাসিয়া  
 কামানের অগ্নিময় গোলা ভয়ঙ্কর,  
 আমরা ভরি না কত দুর্জয় মোসুলেমে।”  
 “মোসুলেমের ভয় ?—কেন ?” কহিল। বিশ্বাস  
 “তারা কি মানুষ নহে আমাদের মত ?  
 তারা ত দেবতা নহে, অথবা অমর,  
 আমরা কি হীন বীৰ্য্য ? তবে কোন্ গুণে  
 ভরিব আমরা সেই দুর্জয় মোসুলেমে ?  
 কেন তবে —কেন তবে আলস্ত নিজায়  
 আজিও নিদ্রিত ?—উঠ, খোল তরবার,  
 ভাসাও ভারত-বক্ষ রক্ত-প্রস্রবণে।”  
 আবার গভীর স্বরে কহিল। রাঘব  
 “পারিবে না, তোমাদের বৃথা আফালন  
 কাপুরুষ নহে তারা, দোরাণী সৈনিক  
 তোমাদের সৈন্তাপেক্ষা বীরেন্দ্র ভীষণ।  
 যুদ্ধিলে তাদের সনে সম্মুখ সংগ্রামে

পরাজয় ভিন্ন জয় হ’বে না কখন।”  
 অমনি ঘুগার স্বরে কহিল। সন্ন্যাসী  
 “বাহাও, বীরেন্দ্র তুমি কেন চিন্তাকুল ?  
 পাশাণে হৃদয় বাঁধ কি ভয় তোমার ?  
 চামুণ্ডা সহায় তব, এ ধর্ম সমরে  
 ঋংসিয়া বিধর্ম্যবৃন্দে কর সংস্থাপিত  
 ধর্ম রাজ্য, পাশাচারে পূর্ণ এ ভারত।  
 জননীর স্বপ্নাদেশে শিষ্যদল মম  
 যোদ্ধৃবেশে রণাঙ্গণে ঋংসিবে মোসুলেমে।  
 ভাসিবে এ পানিপথ মানব-রুধিরে,  
 সেই স্রোতে পাপরাশি যাইবে ধুইয়া  
 ভারতের, মহাতীর্থ হইবে অচিরে  
 পানিপথ, ভারতের মহাপুণ্য স্থান।  
 এই দেখ কি পবিত্র ত্রিশূল,\* ভীষণ  
 নিশ্চিত মানব করে ; বৈজয়ন্তী-শিরে  
 শোভিবে যখন ইহা এ রণ-প্রাঙ্গণে  
 মহাহবে, সেই দিন ঘটিবে প্রলয় ;  
 ত্রিদিবে দেবতারূপ হইবে চঞ্চল,  
 গর্জিবে ইশ্বের বজ্র, কাপিবে তখন  
 ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, উঠিবে নাচিয়া  
 শব্দ চক্র গদা আর ত্রিশূল ভীষণ।  
 উঠিবে নাচিয়া সেই অশুর মর্দিনী  
 দিগম্বরী, বিনাশিতে মোসুলেম অশুরে।  
 সেই মহারণাঙ্গণ হইবে শ্মশান  
 মোসুলেমের ; সেই ক্ষেত্রে —সে মহাশ্মশানে  
 হিন্দুর রাজত্ব-কিঙ্কি হইবে স্থাপিত  
 পুনর্বার, ভয় কারে ধর্ম-সমরে ?”  
 নীরবিলা ফোণীশ্রেষ্ঠ ; নিবির-বাহিরে  
 উঠিল ভীষণ রোল, প্রবাহের প্রায়

\* রক্ত-অশুরের দুই হস্তের দ্বারা যে ত্রিশূল নির্মিত হইয়াছিল, এ সেই ত্রিশূল।



অসংখ্য সৈন্তের শ্রোত পশিয়া শিবিরে  
 চাহিল সমর আভা, একটি সৈনিক  
 কহিল গর্জিয়া “ধিক এই বীরবেশে,  
 শত ধিক এ ভীষণ শল্য তরবারে  
 মহারাষ্ট্রে, শক্তিহীনা রমণীর মত  
 আছি ব’সে, না পারিহু সন্মুখ সমরে  
 বধিতে অরাতিবন্দে, করিতে পরীক্ষা  
 ভারতের ভয় ভাগ্য বিধর্মী সমরে।”  
 গর্জিয়া সৈনিক অন্ত “এ কেমন নীতি ?  
 বিনা যুদ্ধে ভীকপ্রায় বসিয়া নীরবে  
 কেন ডুবাইছ সবে ধ্বংসের সাগরে ?  
 আজীবন বন্দীপ্রায় ছাউনির মাঝে  
 রাখিবে কি সৈন্তবন্দে ? বিপক্ষের সনে  
 দিবে না কি একবার যুদ্ধিতে সমরে ?  
 এতই অক্ষম যদি, কেন এ’সেছিলে  
 পানিপথে ?—অনাহারে ধ্বংসিতে সকলে ?  
 আর না—আর না, বাধা মানিব না আর,  
 নিশ্চয় যাইব যুদ্ধে দেখিব অদৃষ্টে  
 কি অদ্বিত ?—তুনিব না নিবেধ কাহার,  
 মোসলেমের তপ্ত রক্তে করিব তর্পণ ;  
 নিবেধিলে জ্বালাইব বিজোহ-অনল,  
 সে অনলে তস্মীভূত করিব সকলে,  
 ডুবাইব মহারাষ্ট্রে অনল-সাগরে,  
 ভারতের শেষ আশা হ’বে নির্বাণিত।  
 নহে একদিন, কিংবা নহে দুই দিন,  
 তিন মাস অনাহারে কাঁদাইছ সবে,  
 মানবের প্রাণে বল কত জ্বালা সহে ?  
 আর না, অসহ্য এবে, দেহ রণে আভা  
 অবিলম্বে, এই দণ্ডে পশিব সমরে।”

হেরি এ ভীষণ দৃশ্য শুদ্ধিত বাহাও,  
 শুদ্ধিত সেনানীবন্দ ; যুদ্ধের পরে  
 কহিলা বাহাও ধীরে সুগভীর স্বরে  
 “তথাস্তু—শিবিরে যাও, নিশি অবসানে  
 প্রদানিও এ জীবন সন্মুখ সংগ্রামে ;  
 আজি যাও, রণ-ভেরী বাজিবে প্রভাতে।”

শান্ত হ’ল মহাসিদ্ধ, থামিল ঝটিকা,  
 একে একে সৈন্তবন্দ চলি’ গেল ধীরে  
 স্ব স্ব স্থানে, একে একে বিদাইয়া সবে  
 ক্ষুণ্ণ প্রাণে, বহুক্ষণ ভাবিলা বাহাও  
 কত কথা বসি সেই নির্জন শিবিরে।  
 ভাবিলা হৃদয়ে “বৃথা কি হ’বে চিন্তিলে ?  
 অবশ্য করিব যুদ্ধ হইবে না সন্ধি  
 সুনিশ্চিত, নরাধম নজিবের দোষে  
 সকলি হইবে ব্যর্থ, বৃথা কাল ক্ষয়ে  
 আমাদেরি মহাক্রতি, নহে সুসঙ্গত  
 রাঘবের পরামর্শ, কাপুরুষ প্রায়  
 কেন যা’ব মহারাষ্ট্রে ? হয় হ’বে সন্ধি,  
 নহিলে নিশ্চয় মোরা সন্মুখ সংগ্রামে  
 বধিব বিপক্ষে, কিংবা মরির সমরে।”  
 সদাশিব ক্রিষ্ট হস্তে লিখিতে লাগিলা  
 শেষ পত্র অতি ত্রস্তে সূজার নিকটে,  
 “পারিনে—পারিনে আর সহিতে যন্ত্রণা,  
 পরিপূর্ণ পাত্র এবে, বিন্দুমাত্র স্থান  
 নাহি আর ; \* যা কর্তব্য করিবে এখনি।  
 কিছুক্ষণ পরে আজি যে ভীষণ কড়  
 উঠিবে এ রণক্ষেত্রে, হার সে সমরে  
 কহিবার তুনিবার কণমাত্র আর

রহিবে না অবসর, জনমের মত  
 সে অনলে অভাগিনী ভারতের ভাগা  
 যাইবে অলিয়া, হায় যাইবে ডুবিয়া  
 ভারত-সৌরব-সূর্য্য অতল সাগরে ।  
 আমরা উত্তরজাতি হিন্দু মুসলমান  
 ভারতের প্রিয়পুত্র, তুচ্ছ স্বার্থ তরে  
 অন্ধ হ'য়ে, না বুঝিয়া বুঝা রক্তপাতে  
 দিন দিন ধ্বংসিতেছি শক্তি আপনার ;  
 আমাদেরি কার্য্য-দোষে অচিরে জননী  
 হইবে শূন্যলাবন্ধ, মহিমা-মণ্ডিত  
 মাথার মুকুট তার পড়িবে ধসিয়া  
 বিদেশীর \* পদতলে জনমের মত ।  
 মানিলাম তর্কহলে এ মহাসমরে  
 আমাদেরি পরাজয়, মহারাষ্ট্র-রবি  
 যদিও ডুবিয়া যায় চির অন্ধকারে,  
 ভারতীয় মোসলেমের কি লাভ তাহাতে ?  
 বিদেশী আকালী সাহা, চরণে তাহার  
 লুপ্তিবে ভারতবর্ষ জনমের তরে ।  
 ভারতীয় মুসলমান পাইবে কি কত  
 ভারতের সিংহাসন ? ভারত-মুকুট  
 শোভিবে নিশ্চয় সেই আকালীর শিরে ।  
 না বুকে হুয়াশা হলে কেন অধঃপাতে  
 যাইতেছ ? ভারতীয় মোসলেমের সনে  
 সন্ধি সূত্রে থাকি বন্ধ, ভাই ভাই মত  
 এক যোগে এ ভারত করিব শাসন ।  
 আকালী সাহার সনে বাদ বিসম্বাদ  
 নাহি আমাদের, তিনি স্বদেশে আপন  
 যান চলি' এই ইচ্ছা আমাদের মনে ।  
 বা' ইচ্ছা এখনি মোরে করিবে জ্ঞাপন ;

\* আফগান সাহু আকালী (কাবুলের অধিপতি) ।

উত্তরের অপেক্ষায় কিছুক্ষণ আর  
 তিষ্ঠিব, রজনী অস্তে সময় প্রাক্ষণে  
 আলিব যে সংগ্রামের অনল ভীষণ,  
 শিখা তার শত জিহ্বা করিয়া বিস্তার  
 উঠিবে গগন-পথে, ডুবিব ডুবিবে  
 সে ভীষণ নভঃস্পর্শী অনল সাগরে  
 চিরতরে, ডুবায়ে ছঃধিনী ভারতে ।  
 ভারতের শেষ আশা হ'বে ভস্মীভূত ।  
 সে অনলে—পানিপথ হইবে শ্মশান ।  
 অতি ত্রস্তে পত্রখানি নিজ দূত সহ  
 পাঠাইলা সদাশিব, চিন্তার তরঙ্গ  
 বহিতে লাগিল হৃদে, উন্মত্তের মত  
 'গেলা ছুটি ক্ষতবেগে বিশ্বাস-শিবিরে ।  
 মুহুর্তের পরে পুনঃ আসিলা ফিরিয়া ;  
 ভাবিতে লাগিলা বীর “দিগ্নু শেষ পত্র,  
 যা' থাকে অদৃষ্টে,—হ'বে।—ভয় কি তাহাতে ?  
 হ'ক সন্ধি, বিলক্ষণ, অন্তথা নিশ্চয়  
 মোসলেমের মুণ্ডপাত করিব প্রভাতে  
 রণস্থলে, দেখাইব মহারাষ্ট্র বীৰ্য্য  
 অস্ত্রাঘাতে, দেখাইব এ ভূজ বিক্রম  
 কত ধরে, ধ্বংসি সেই পাবণ সকলে ।”

ভাণ্ডের পত্র নিয়া চলি গেলা দূত  
 বিদ্যাত গতিতে সেই সূজার শিবিরে ।  
 তখনি নবাব সূজা পঠিয়া সে পত্র  
 গেলা চলি ক্ষতবেগে আকালী শিবিরে ।  
 আকালী শুনিয়া উহা কহিলা সূজারে  
 “সে দিনি ত' বলিয়াছি, কেন বুঝা আর  
 পুনঃ পুনঃ সেই কথা ? তুমি ত বালক,

কেমনে বুঝিবে তুমি চাকুরী এদের ?  
 বিপদে পড়িয়া এরা তোমার সাহায্যে  
 উদ্ধার পাইতে চাহে, আমি চলে গেলে  
 আবার এ দস্যুদল ধ্বংসিবে মোসলেমে ।  
 না বুঝিয়া উহাদের এ ঘোর চাকুরী  
 অনর্থক অনুরোধ কেন কর মোরে ?  
 উহাদের বিষদন্ত সম্মুখ সমরে  
 না তালিলে, অব্যাহতি নাহি তোমাদের ।  
 কই দূত ? ডাক তারে ।” যুদ্ধে সে দূত  
 প্রণমিয়া তারে, তথা দাঁড়াইল আসি ।  
 কহিল আদালী তারে “বল যে’য়ে তুমি  
 সদাশিবে, দেবী নাই—শীঘ্র হবে সন্ধি,  
 প্রস্তুত থাকিতে বল ; মোরাও প্রস্তুত ;  
 সন্ধি-পত্র লিখা হবে সময় প্রাপ্তরে ।—  
 —কাগজে কলমে মোরা করিব না সন্ধি,  
 সন্ধির কাগজ হবে অই রণ-ক্ষেত্র,  
 লেখনী হইবে মোর ভীকর তরবারি,  
 মসি হবে বীরদের উত্তম শোণিত,  
 সে মসিতে—সে কাগজে—সেই লেখনীতে—  
 লিখা হবে যেই সন্ধি এ রণ প্রাপ্তরে,—  
 —সেই সন্ধি আমাদের বাহনীর এবে ।  
 অস্ত কোন সন্ধি শর্তে নাহি প্রয়োজন ।  
 রাজ নাই বাও বাবা, ত’রে থাক যে’য়ে,  
 আমিও বাইব এবে নমাজ পড়িতে ।”  
 অতঃপর সূজাউদৌলা বিদাইয়া দূত  
 গেলা চলি ক্রতবেগে আপন শিবিরে ।

বাহাও আকুল চিত্তে বসি কিছুক্ষণ  
 আপন শিবির মাঝে কত কি ভাবিলা,  
 তারপর দাঁড়াইয়া উন্নতের মত

কিছুক্ষণ অসি সেই নির্জন শিবিরে  
 ক্লান্ত হৃদে, ধীরে ধীরে পর্য্যটকের পরে  
 শুইলা যাইয়া বীর, ধীরে-ধীরে-ধীরে  
 নিজার কোমল ক্রোড়ে লভিলা বিজ্ঞাপন ।  
 ধীরে ধীরে শান্তি দেবী আইলা কুতলে ;  
 বিভাবরী ধীরে ধীরে চলিল বহিরা  
 নীরবে অতীত পানে কালের সাগরে ।

কিছুক্ষণ পরে দূত এ’লে সে শিবিরে  
 জাগাইয়া সদাশিব কহিতে লাগিলা  
 সব কথা আদালী বা’ বলেছিল তারে ;  
 শুনিয়া তা সদাশিব উঠিল অলিয়া  
 অগ্নি প্রায়, ক্রোধ ভরে কহিল গর্জিয়া  
 “ভাল কথা, কালি প্রাতে দেখা যাবে সব ;  
 বজ্রবর্ষী কামানের গোলার সম্মুখে—  
 কত শক্তি ধরে সেই আদালী পামর ।  
 ভারতের বক্ষ হতে করিব নিশ্চিহ্ন  
 সমগ্র মোসলেমে, চিহ্ন রাখিব না আর  
 তাহাদের ; এ প্রতিজ্ঞা—শোণিতে তাদের  
 বহাইব রক্ত-গজা কালি পানিপথে ।  
 দেখা’ব মারাঠা-বীর্ষ্য,—দস্যু নহে তারা,  
 বীর জাতি, রণক্ষেত্রে তোপের সম্মুখে  
 দাঁড়া’ব এ বক্ষ পাতি বধিতে মোসলেমে ;  
 অতথা বীরের মত ধ্বংসিয়া তাদের  
 চির নিজা যাব মোরা এ রণ-প্রাপ্তরে ।”  
 হেনকালে পাশীগুলি উঠিল কুজিয়া  
 দূরে-দূরে বন-প্রান্তে বিটপীর শাখে  
 বিজ্ঞাপিয়া “নিশি এবে তৃতীর প্রহর ।”

সূর্য প্রাপ্তর প্রান্তে সরস্বতী তীরে

কানন-কালীন্ডর মন্দিরের মাঝে  
 ধ্যানমগ্ন যোগী প্রায় বসি এক বালা  
 চামুণ্ডার পদ প্রান্তে, তবু হৃদয়ে  
 পূজিছে সে দেবী মূর্তি, কক কেশরাশি  
 আবরি সুবর্ণ-গণ্ড ভূজগিনী প্রায়  
 ছলিতেছে পৃষ্ঠ দেশে চুখিয়া ছতল।  
 পরিধানে পট্টবস্ত্র অতি মনোহর,  
 কণ্ঠে রজাক্ষের মালা, সিন্দূর ললাটে,  
 চন্দনে চর্চিত অঙ্গ। সজ্জিত স্তন্য  
 চন্দন নৈবেদ্য ধূপ পুষ্প রাশি রাশি  
 চামুণ্ডার পদতলে, সিন্দূর মণ্ডিত  
 স্মৃতীকৃত কৃপাণ এক ঝলিছে স্তন্য  
 দীপালোকে চামুণ্ডার চরণ সমীপে।  
 পশ্চাতে অশ্বখ বৃক্ষ যুড়ি বহুদূর  
 শোভিছে চাঁদোয়া সম, তারি উপশাখে  
 বাঁধিয়া একটি অশ্ব, এক বীর যুবা  
 স্তম্ভজিত রণ-সাজে আছে দাঁড়াইয়া  
 কানন-কালীন্ডর সেই মন্দিরের দ্বারে  
 বালিকা মূদিত নেত্রে গাইতে লাগিলা  
 ধ্যানিত করিয়া সেই কালীকা-মন্দির

অরুণ-রজিনী—

বিশ্ব বিনাশিনী,

কালী করালিনী শাশা।

হর হৃদি বোধিনী,

ত্রিভুবন ভারিণী,

বুঝে মানিনী বাবা।

ভক্তি যম যম কণ্ঠে কহিলা বালিকা  
 চামুণ্ডার পানে চে'রে সজল নয়নে,  
 “জীবনের সব সাধ যাবে কি জননী  
 এই ভাবে? আজন্ম গুজ'ছি তোমারে

—দে মা বর, তোমার এই স্মৃতীকৃত কৃপাণে  
 বিশ্বশ্রী মোসলেম বুলে করিয়া সংহার  
 মসজিদ মিনারগুলি করি ধূলিসাৎ,  
 তোমারি জয়ধ্বনি যেন পারি বিবোধিতে।”  
 ভক্তিতরে চামুণ্ডারে প্রণমিয়া বালা  
 দেবীর চরণ হ'তে পুষ্প এক তুলি  
 দিলা গুজি যুবকের সুবর্ণ-মুকুটে।  
 আকিলা “ত্রিশূল” এক চন্দন তুলিয়া  
 দেবী-পদ হ'তে সেই বীরের ললাটে।  
 ভক্তি উল্লসিত হৃদে প্রণমিয়া বামা  
 দেবী মূর্তি তুলি সেই স্মৃতীকৃত কৃপাণ  
 দিলা যুবকের করে—কহিলা গভীরে  
 “এই অসি,—চামুণ্ডার তীক্ষ্ণ অসি  
 দিহু আজি তব করে হে বীর কেশরী  
 বিশ্বনাথ। যাও আজি সমর প্রাঙ্গণে  
 মায়ের পবিত্র নাম করিয়া শরণ  
 হৃদি মাঝে, মা তোমারে রক্ষিবে সতত  
 অগ্নি মাঝে—তোমার সে বজ্র বরিষণে।  
 ভেবে দেখ, বলিতেও বিদরে হৃদয়,  
 পাষণ্ড মোসলেমগণ শত্রু ভারতের  
 তাহারাই দিবা দিশি পাশব আচারে  
 করিতেছে অর্জরিত ভারত-সন্তানে।  
 মারাঠার বীরজ্যেষ্ঠ শিবাজীর অস্ত্রে  
 যে পবিত্র হিন্দুরাজ্য হ'রেছে স্থাপিত,  
 হৃদ্যন্ত মোসলেমগণ ধ্বংসিতে সে রাজ্য  
 সমুদ্রত, তাহাদের স্মৃতীকৃত কৃপাণে  
 বুঝি সে গৌরব-সূর্য্য হয় অন্তর্ভিত।  
 সে দৃষ্ট কেমনে তুমি দেখিবে নয়নে?  
 আমি যে অবলা নারী, তাবিত্তেও তাহা  
 শিহরে হৃদয় মম, বিহ্যতের বেগে

হৃদে বস রক্ত ধারা উঠে উঠলিয়া।  
 যাও নাথ। যাও সেই সময় প্রাঙ্গণে  
 বধি তাহাদেয়ে এই ভীষণ কৃপাণে  
 রক্ষা কর কৃত প্রায় হুঃখিনী ভারতে।  
 বীর তুমি,—বীর বেশে বরিস্ত তোমারে  
 বিশ্বনাথ। আজি এই মায়ের মন্দিরে।  
 যাও যাও, বিলম্বের নহে এ সময়  
 বধি সে পাষাণ দলে নিবাও আমার  
 প্রতিহিংসা-বহি সেই তরল শোণিতে।  
 অস্ত্রধা তোপের অগ্নি লইয়া হৃদয়ে  
 চির নিজা যেও তুমি সে রণ-প্রাঙ্গণে;  
 সার্থক হইবে তবে সাধনা আমার,  
 চিরদাসী তোমার এ হুঃখিনী কৌমুদী  
 বাপিলে যোগিনী বেশে সাঁরাটি জীবন  
 কেঁদে কেঁদে তোমার সে পবিত্র শ্মশানে।”  
 “আর না কৌমুদী” বলি উঠিয়া গর্জিয়া  
 বিশ্বনাথ, “চলিলাম সে রণ-প্রাঙ্গণে,  
 যদি না ক্ষমিতে পারি পাষাণ মোস্লেমে,  
 কিরিব না গৃহে আর, এই দেখা শেষ,  
 কমিও জন্মের মত মিনতি আমার।”  
 উভয়ের প্রাণ যেন উধাও হইয়া  
 চলি গেল সেই দণ্ডে কোন্ সুরপুরে।  
 উভয়েই মৃৎপ্রাণে নবশক্তি লাভি  
 অসম্ভব দীপক সুরে উঠিল গাইয়া।

জর রণ বধিনী,  
 বিদু বিনাশিনী,  
 কালী করালিনী প্যাবা।  
 হর হুদি মোহিনী  
 ত্রিভুবন জারিনী  
 নুনুও মালিনী বাবা।

উভয়েই ভক্তি ভরে সজল ময়নে  
 কানন-কালীর মূর্তি করিলা প্রণাম।

সহসা সে নৈশাকাশ করিয়া প্রাবল্য  
 মহারাষ্ট্র সৈন্তবৃন্দ উঠিল গর্জিয়া  
 “হর হর মহাদেও” জাগিল গগনে  
 প্রতিধ্বনি, বিশ্বনাথ বিদ্যুৎ গতিতে  
 এক লক্ষ অশ্ব পরে উঠি শশব্যস্তে  
 লক্ষ্য করি সেই স্বর ছুটিলা তখনি।  
 হুঃখিনী কৌমুদী বাই অনিমেষ নেত্রে  
 রহিলা চাহিয়া সেই বীরেন্দ্রের পানে  
 সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি, মন্দির প্রাচীরে  
 পৃষ্ঠ রাখি, মান মুখে গাইতে লাগিলা  
 একটি করুণ গীত মনের বিষাদে।

জননি ভারত ভূমি কি দুঃখে কাঁদিছ হায়।  
 কেন বা ও মুখ তোর অশ্রুজলে ভেসে যায়।  
 ধূলায় লুপ্তিও কেন এ চারু চিকণ কেন।  
 কেন বা এ স্বর্ণ-দেহে এ জীবন মলিন বেশ।  
 উঠ বা আমার, উঠ, কেঁদনা কেঁদনা আর,  
 হৃদয়ের রক্ত দিয়ে শোধিব বা তব ধার।  
 ডাকে বা সম্মান তোর, লও বা তাহারে কোলে,  
 উঠ বা আমার, উঠ, তোষ সে মধুর বোলে।  
 ভিখারিনী বেশে মাগো কে আজি সাজালো তোরে  
 তোর সেই রাজ-বেশ বন্ বা কে নিল কেঁড়ে।  
 এলো কেশে ম্লান বেশে কত কাল পড়ে রবে,  
 বন্ বা হৃদয় কাঁদে, বন্ বা জাগিবি কবে?  
 কোটি কোটি পুত্র তোর এখনো থাকিতে হুদে,  
 কি দুঃখে এ জীবন বেশে তুই বা বরিস্ কেঁদে?  
 হৃদয় পুড়িয়ে মাগো হইল শ্মশান প্রায়  
 উঠ বা আমার, উঠ, উঠ বা আমার হায়।  
 সম্মুখে ভীষণ বুদ্ধ, কালাতক মহানল,  
 আমার থাকিতে তুই কেন বা ডরিস্ বন্।  
 আররে ভারতবাসী, আর নবে দলে দলে,  
 ভাগিছে জননী এই নীহার-নয়ন জলে।  
 হাত ধরে উঠা তারে ম'ছে দে নয়ন জল,  
 হাসিয়া উঠুক মাতা মতিয়া নুতন বল।  
 আশিসিয়া সেহময়ী তখনি কহিবে সবে,  
 “বা বাছা বোসেন-বুড়ে ‘জর মহাদেও’ হবে।”  
 তখনি উঠিবে জে'গে যুগন্ত দেবতা দল,  
 গর্জিয়া উঠিবে সবে আসমুদ্র-গিরিতল।  
 প্রান্তে প্রান্তে সেই স্বর ছুটিবে পবন ভরে,  
 গাইবে ভারত মাতা “জর মহাদেও” ধরে।



## দ্বিতীয় সর্গ

### পানিপথ—যুদ্ধ ক্ষেত্র

[ মহারাষ্ট্র ও মুসলমানের মহাসমর ]

সুযুগ্ত বসুধা ; শুক প্রকৃতি সুন্দরী  
মহাতড়ে, জীব জন্তু ঘোর অচেতন  
নিজার কোমল ক্রোড়ে, বিশ্ব চরাচর  
স্পন্দহীন, পানিপথ গভীর নীরব ।  
নাহি শব্দ, নৈশ বায়ু রহিয়া রহিয়া  
সঞ্চরিছে ; নিশি প্রায় চতুর্থ প্রহর ।  
প্রাস্তরের ছই পার্শ্বে অসংখ্য শিবির  
শ্রেণীবদ্ধ, স্থানে স্থানে প্রহরী নিচয়  
ভীমমূর্তি, তরুতলে মুক্ত অসি হস্তে  
তদ্রাবেশে স্কুমিতেছে, পত্রের পতনে  
কভু বা শত্রুর ভয়ে উঠিছে চমকি ।  
শিবিরের অভ্যন্তরে অগণিত সৈন্য  
সেনাপতি ভীমবাহু গভীর নিদ্রিত ।  
উত্তরে মোসলম খবজা “অর্ধচন্দ্র” সহ  
উড়ি গর্বভরে অই সুনীল গগনে  
বিজ্ঞাপিছে ইস্রামের অনন্ত গৌরব ।  
দক্ষিণে পতাকা এই “ত্রিশূল” অঙ্কিত  
উড়িছে অস্তরে ঘোষি পবনের স্বরে  
মহারাষ্ট্র শৌর্য্য বীৰ্য্য অনন্ত অজয় ।

চতুর্থ প্রহর নিশি, নীরব অবনী,  
—নাহি শব্দ, হেনকালে একটি রমণী  
আলুলায়িত কুন্তলা, সন্ন্যাসিনী বেশে  
গৈরিক বসনপরা কণ্ঠে ফুলমালা,  
—গাইছে সঙ্গীত এক, সে স্বর লহরী

পড়িল ছড়া'য়ে নৈশ নিথর গগনে,  
—সুদূর প্রাস্তর প্রান্তে—শুক পানিপথে

আয় ছুটে ভাই মায়ের কাছে  
মায়ের সন্তান কে কে তোরা ।  
মোথুম এসে মায়ের বুকে  
বসিয়ে দিল ভীষণ ছোরা ।\*

মায়ের দুঃখ দেখে আজি  
কাঁদছে কত বনের পাখী ।  
কোন্ প্রাণে তা দেখিস্ তোরা  
বুছে যে ভাই মায়ের আঁখি ।

মায়ের শত্রুর বক্ষ চিড়ে  
পান কর্ তার রক্ত-ধারা ।  
আয় ছুটে ভাই গৌণ করিস্নে  
ঐ দাঁড়িয়ে আছে তারা ।

মায়ের কাণ্ডা শুনে আজি  
সবাই জেগে উঠছে ভবে ।  
তোরা কেন ঘুমিয়ে রনি ?—  
—বল্ না জেগে উঠবি কবে ?

মায়ের আশীস্ মাথায় নিয়ে  
আয় ছুটে ভাই পানিপথে ।  
আজ বিধবীর রক্ত দিয়ে  
খেল্ আবার পথে পথে ।

অতিধ্বনি নৈশাকাশে উঠিল জাগিয়া

আজ বিধবীর রক্ত দিয়ে  
খেল্ আবার পথে পথে

\* ভৈরব রানীনীতিতে গের।



তুনি এ সঙ্গীত-ধ্বনি শুক পানিপথ  
কাণিতে লাগিল ভরে ; নৈশ সমীরণ  
পাইল বিবাদে যেন “হর হর” রবে

আজ বিশ্বস্তর রক্ত দিয়ে  
খেলব আবার পথে পথে

উৎসাহে বিহ্বল কুল পাথে পাথে বসি  
এক করে বনপ্রান্তে উঠিল কুজিয়া

আজ বিশ্বস্তর রক্ত দিয়ে  
খেলব আবার পথে পথে

এলয়ের শিলা সম এ সঙ্গীত-ধ্বনি  
কি এক আতঙ্ক যেন দিল ছড়াইয়া  
চারিদিকে, নিয়োখিত শুধু প্রকৃতি  
উঠিল কাণিয়া ভয়ে সে ভীষণ করে ।  
প্রান্তে প্রান্তে সেই বর উঠিল, জাগিয়া,  
উঠিল জাগিয়া মরি মস্ত মুগ্ধ প্রায়  
মহারাত্রি সৈন্তবৃন্দ, উঠিল জাগিয়া  
সদাশিব, আর যত বীরেন্দ্র নিচয় ।  
উৎসাহে সৈনিকবৃন্দ উঠিল গর্জিয়া  
“হর হর মহাদেও” আবার প্রকৃতি  
উঠিল কাণিয়া ভয়ে, আবার গগনে  
উঠিল জাগিয়া মরি প্রতিধ্বনি তার  
“মহাদেও”, পানিপথ কাণিল সতরে ।  
স্বপ্নে মোহময় সৈন্ত উঠিল জাগিয়া  
সেই করে, প্রহৃত্তরে উঠিল ছকারি  
“দীন দীন” পানিপথ কাণিল সতরে ।  
কাণিল সতরে পুনঃ প্রকৃতি স্তম্ভরী,  
কাণিল সতরে পুনঃ শুক বিভাবরী,

কি এক আতঙ্ক যেন উঠিল ভাগিয়া  
আবার গগন কোলে, ভরে বিভাবরী  
ভাজিয়া এ পানিপথ পলাইল হায়  
দেখিতে দেখিতে মরি ভরে ভরে যেন  
প্রকৃতির কৃকমুর্তি হল রূপান্তর ।

দিনমণি ভয়ে ভয়ে উদয় অচলে  
উঠিলেন, পানিপথ করিয়া রঞ্জিত  
বর্ণ করে, ভয়ে ভয়ে জাগিল ধরনী  
জাগিল সৈনিকবৃন্দ, যুদ্ধের মাঝে  
সাজিল সমর সাজে, উঠিল বাজিয়া  
ভীষণ সমর বাজ ঘন ঘন-রোলে  
কাপাইয়া জলহল কাপায়ে অবনী ।  
বাজিল দামামা ভেরী, বাজিল হুন্দুতি ;  
সৈন্তদের হুহুকারে কোদণ্ড টঙ্কারে  
আফালনে, মুহমূহ অসির বজারে  
কাণিতে লাগিল ভয়ে সমর প্রাঙ্গণ ।  
মহারাত্রি-সৈন্তবৃন্দ “হর হর” রবে  
আঁমিল ছুটিয়া মস্ত মাতঙ্গের মত  
কাপাইয়া পানিপথ, দেখিতে দেখিতে  
মোহময় সেনানী বৃন্দ উঠিল সাজিয়া  
বীর সাজে, আকালীর ভীষণ আদেশে ।  
গর্জিয়া বিহ্বলবেগে ছুই দিকে হার  
দাড়া'ল উভয় সৈন্ত, যুদ্ধের মাঝে  
লক্ষ লক্ষ তরবার উঠিল বলিয়া  
নির'পরে বালার্কের প্রভাত-হিরণে ।  
যুদ্ধে যুদ্ধে কত কামান ভীষণ  
উদগারিল শত শত গোলা ভরভর  
কাপাইয়া দিগন্তর, যুদ্ধে যুদ্ধে  
অসংখ্য সৈনিকবৃন্দ পড়িতে লাগিল

রণভূমে, সে ভীষণ রক্ত বিমণ্ডিত  
রণক্ষেত্র মুহূর্হ কাঁপিতে লাগিল  
বজ্রবর্ষা কামানের ভীষণ গর্জনে।  
সদাশিব ক্রোধভরে গর্জিতে লাগিল।  
“অগ্রসর, অগ্রসর—আরো অগ্রসর,  
পরীক্ষার দিন আজি, দেখাও জগতে  
মহারাত্রী ভীক নহে,—নহে কাপুরুষ,  
আনন্দে হৃদয় পে’তে লইবে অশনি।  
সমগ্র জগত আজি, দেখুক চাহিয়া  
মহারাত্রী ভীক কিংবা বীর প্রসবিনী।  
সাক্ষী ত্রিকা-বিষ্ণু-শিব এ রণ প্রাঙ্গণে  
করিলু প্রতিজ্ঞা,—গৃহে ফিরিব না আর  
না ধংসিয়া—না বধিয়া পাষণ্ড মোস্লেমে।  
অগ্রসর, অগ্রসর—আরো অগ্রসর।”

মহারাত্রী সৈন্তদল গর্জিলা আবার  
“হর হর মহাদেও” কাঁপিল প্রান্তর ;  
আবার মোস্লেমবৃন্দ উঠিল গর্জিয়া  
“দীন দীন” সেই সঙ্গে আবার, আবার,  
গর্জিল অশনি মস্ত্রে “ক্রম ক্রম ক্রম”  
অসংখ্য অনলবর্ষা তোপ তয়ঙ্কর ;  
সেই সঙ্গে স্বর্গ-মর্ত্য করিয়া কম্পিত  
মোস্লেমের রণ বাজি উঠিল বাজিয়া  
অলস্ত দীপক সুরে করিয়া বর্ষণ  
তপ্তবহ্নি মোস্লেমের হৃদয়-কন্দরে।  
মুহূর্হ রণভেদরী গাইতে লাগিল

আর মুসলমান—শিয়া সূন্নি বোগল পাঠান একই সাথে  
ইসলাম ধর্মের ডাক পড়েছে যুদ্ধ আজি পানিপথে।\*

ভুলে যা আজ হিংসা বিষেয় দূর করে দে দলাদলি।  
আয় ছুটে আয় সব মুসলমান “আল্লা—আল্লা—আল্লা” বলি।

কাকেরের ঐ ভীক ছোরা বুকের বাবে ল’লা হেসে।  
খুলেছে ঐ স্বর্গের দুরার থাকবি সেখা রাজার বেশে।  
আর মুসলমান—শিয়া সূন্নি বোগল পাঠান একই সাথে।  
ইসলাম ধর্মের ডাক পড়েছে যুদ্ধ আজি পানিপথে।

সেখ সৈয়দ বোগল পাঠান শিয়া সূন্নি একই জাতি।  
ভুলে যা এই জাতি বিভাগ সবাই মোরা সবার সাথী।  
জাতি ভেদ আর অহংজ্ঞান কেন মিছে করিস্ তোরা।  
আয় ছুটে আয়—ভয় কিরে ভাই হাতে ল’রে ভীক ছোরা।

ধর্মের জন্য আপন মাথা লুটিয়ে দে আজ খোদার নামে।  
আয় ছুটে ভাই—সব মুসলমান কে বাবি অই স্বর্গ বাবে।  
আর মুসলমান—শিয়া সূন্নি বোগল পাঠান একই সাথে।  
ইসলাম ধর্মের ডাক পড়েছে যুদ্ধ আজি পানিপথে।

প্রলয়ের শিলা সম মোস্লেমের ভেরী  
এ রক্ত দীপক তানে কাঁপাইয়া ধরা,  
কাঁপাইয়া গিরি গুহা সমুজ্জ গগন  
পশুপাখী দেব দৈত্যে করি সন্ত্রাসিত  
ছড়াইল রাশি রাশি অনলের কণা।  
আবার—আবার অই মাতারে মোস্লেমে  
রণাঙ্গনে, রণ-ভেরী উঠিল গাইয়া—

ধর্মের যুদ্ধে মৃত্যু হ’লে স্বর্গে বাবি শহিদ সনে।  
“মারুব কিংবা মরুন রপে” এই প্রতিজ্ঞা করুন মনে।  
খোদার আশীর্ মাধার নিরে আয় ছুটে আয় পানিপথে।  
আজ আমাদের ধর্ম যুদ্ধ বেঁধে গেছে হিন্দুর সাথে।

নুরনবী ভাই বাদেব সহায় ভর কিরে আজ তাদের রপে।  
আল্লার নামে প্রাণটি দিবে স্বর্গ তোরা নে ভাই কিনে।  
আর মুসলমান—শিয়া সূন্নি বোগল পাঠান একই সাথে।  
ইসলাম ধর্মের ডাক পড়েছে যুদ্ধ আজি পানিপথে।

\* ভেরব সানিগীতে দেয়

ইসলাম সহ হিন্দু ধর্মের বেঁধে গেছে ভীষণ রণ ।  
হিন্দুদের প্রাণ সংহারিতে ইসলামের আজ জীবন পণ ।  
এগুয়ে পড়--এগুয়ে পড় সে আছে ঐ সাথে সাথে ।  
আজ্বে তাহার বনু-পরীক্ষা হবে যে ঐ পানিপথে ।

নুরনবী ঐ স্বর্গ হ'তে আনীন্ করে সদয় মনে ।  
খোদার আনীন্ মাঝার নিয়ে লাফিয়ে পড় ঐ রণাঙ্গনে ।  
আর মুসন্মান--শিয়া সূরি বোগল পাঠান একই সাথে ।  
ইসলাম ধর্মের ডাক প'ড়েছে যুদ্ধ আজি পানিপথে ।

রণ হুমুভির এই দীপক সজীতে  
উন্নত মোস্তেম সৈন্ত কৃতান্তের মত  
ছুটিল তৈরব নাদে করিয়া কম্পিত  
রণক্ষেত্র, বালার্কের তরুণ কিরণে  
অসি গুলি কক ককে বলিতে লাগিল  
চারিদিকে, শত্রু সৈন্ত করিয়া নিধন ।

মহাবাহু এব্রাহিম অথ আরোহণে  
বিদ্রোহ গতিতে যে'য়ে বাহাও সম্মুখে  
কহিল। “সুধীর স্রোত, চাহিলে বেতন  
কত যে কি ভাবিয়াছ, ভাবনি তখন  
—এ বাহু তোমারি তরে, রাখিতে তোমার  
ধনমান সিংহাসন জাতীয় গৌরব,—  
এ বাহু তোমারি তরে এ মহাশ্মশানে  
অজ্ঞাতের রক্তে আজি করিবে তর্পণ ।  
এ ঘোর ভীষণ যুদ্ধ তোমারি কারণে  
আজি এ অধম হেসে তাজিবে জীবন ।”  
মুহূর্ত্তেক এব্রাহিম ভীষণ বিক্রমে  
আক্রমিল। হুন্দিরী ও হাকেক রহমতে  
ছুটি ব্যাটেলেন সৈন্ত লাগিল রক্তিতে  
হুই পার্শ্ব, অবশিষ্ট ব্যাটেলেন  
চড়াইয়া ব্যারোনেট বন্দুকের পরে

আক্রমিল। হুন্দিরী ভীম সৈন্তদলে ।†  
বাধিল ভীষণ যুদ্ধ ; অসংখ্য কপাল  
বলিতে লাগিল উর্ধ্বে বিদ্রোহের মত  
কক ককি ; পলে পলে উঠিয়া পড়িয়া  
কি এক ভীষণ দৃষ্ট সৃজিল তখন ।  
সেই সঙ্গে শত শত সৈনিকের যুগ  
পড়িতে লাগিল ভূমে, রক্ত-প্রস্রবণ  
উঠিল কুটিয়া যেন সমর প্রান্তরে ।  
এব্রাহিম কিপ্র বেগে উন্নতের মত  
বধিতে লাগিল। কত রোহিলা সৈনিকে  
ধমুর্ধর, শো শো রবে ভূজঙ্গের মত  
সুতীক কলমকুল দংশিতে লাগিল  
বীরবরে ভেদি বর্ষ, শোণিতের স্রোত  
বহিল প্রাবিয়া দেহ, না করি ক্ষেপ  
সে দিকে, বীরেন্দ্র প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে  
মস্ত মাতঙ্গের মত হইতে লাগিল।  
অগ্রসর, সিংহপ্রায় গর্জিয়া তৈরবে ।  
সে ভীষণ মহাযুদ্ধে বড় ব্যাটেলেন  
হইল উচ্চর প্রায়, এব্রাহিম-দেহে  
বন্দুকের গুলী এক লাগিল সজোরে ।  
তথাপি উন্নত প্রায় ভীম পরাক্রমে  
“সম্মুখে সম্মুখে” বলি গর্জিতে লাগিল।  
বীরবর ; অবশিষ্ট হুই ব্যাটেলেন  
ধ্বংসিতে লাগিল বহু মোস্তেম সেনানী  
বীরদর্পে, আত্মজীও যুটিল আসিয়া  
এব্রাহিম-পার্শ্বে ধ্বংস করিতে মোস্তেমে ।  
সে ভীষণ পরাক্রমে, অস্ত্রের ঘূর্ণনে  
অগণ্য মোস্তেম সৈন্ত পড়িতে লাগিল  
রণক্ষেত্রে, পড়ে যথা বিস্তৃত পল্লব

\* Asiatic Society, Researches Vol. III.

† Asiatic Society, Researches Vol. III.

অসংখ্য ঝটিকা মুখে পবন ডাড়নে।  
হাকেকের সৈন্তবৃন্দ না পারি সহিতে  
সে বিক্রম, বায়ুবোনে পলাইল সবে।

অমনি ভীষণ স্বরে কহিল গর্জিয়া  
হুন্দিখা “কোথায় যা’স রে মূর্খ অধম,  
কিরে আয়, পলাইলে বাঁচিবি কি তোরা  
নরাদম? আকালীর ক্রোধ-হত্যাশনে  
সমস্ত রোহিলা আজি হারাবে জীবন।  
কিরে আয়, ওরে মূর্খ পলাবি কোথায়  
আজি এ দুর্দিনে? হায় পলাইলে তোরা  
এ জন্মের মত যাবে স্বাধীনতা ধন,  
এ জন্মের মত হবি দাসধম তোরা,  
রবে না মোস্লেম-করে দিল্লী-সিংহাসন।  
কেন তবে যা’স মূর্খ? আয় কিরে সবে,  
ধরু আসি বজ্র মুঠে “দীন দীন” রবে  
কাঁপাইয়া স্বর্গ-মর্ত্য, কাঁপাইয়া ধরা  
দে সবে সম্মুখ যুদ্ধে আহুতি জীবন।”  
ফিরিল রোহিলা সৈন্ত, গর্জিল আবার  
“দীন দীন” মুহূর্ত্তেক ভীষণ বিক্রমে  
আক্রমিল শত্রুগণে, কপাণে কপাণে  
আবার বাঁধিল যুদ্ধ, আবার গগনে  
বিনা মেঘে চমকিল চপলা ভীষণ।  
মুহূর্ত্তে হুন্দিখা বীর দেখিলা সম্মুখে  
একটি ভীষণ মূর্ত্তি সাক্ষাৎ শমন।  
দেখিলা সম্মুখে এক আসি ভয়ঙ্কর  
উত্তোলিত শির’পরে বিকট দর্শন।  
এক লক্ষে বীরবর সরিলা পশ্চাতে,  
ব্যর্থ হ’ল সে আঘাত, কহিল গর্জিয়া  
“মোস্লেম কুলের রানি রে মূর্খ বর্বর,

মোস্লেম সম্ভান তুই, মোস্লেম বিশপকে  
কেমনে ধরিলি আসি? শত ধিক তোরে,  
শত ধিক জন্মে তোর নিল’জ পামর,  
স্বর সেই দরাময়ে অস্তিম সময়ে।”  
এতেক বলিয়া শল্য মারিলা সজ্ঞারে  
বীরবর, এতাহিম অদ্বুত কোশলে  
নিবারিলা সে আঘাত, কহিল গর্জিয়া  
“এই নেরে প্রতিশোধ পাবও বর্বর।”  
পড়িল ভীষণ অস্ত্র হুন্দিখার শিরে  
বলমলি, মহাবলী সে ভীম আঘাত  
নিবারিলা, মুহূর্ত্তে ঘুরিয়া ফিরিয়া  
যুঝিতে লাগিলা দৌড়ে উদ্যতের মত!  
অগণিত সৈন্তদল ঘোর ছত্ৰধারে  
মস্ত মাতঙ্গের মত যুঝিতে লাগিলা  
প্রাণপণে, শত্রু সেনা করিয়া সংহার  
রঞ্জিলা শোণিত স্রোতে সমর প্রাণ,  
রঞ্জ-যথা অস্তগামী ক্রান্ত দিবাকর  
স্বর্ণ-করে সায়াহ্নের পশ্চিম গগন।

সদাশিব সৈন্ত সহ “হর হর” রবে  
কাঁপাইয়া দিগন্তর ছুটিলা সবেগে  
উজিরের সৈন্ত পানে, কাঁপিল প্রান্তর,  
ছুটিলা মোস্লেম সৈন্ত “দীন দীন” রবে  
স্তম্ভিয়া বসুধা, শুক দিক্‌দিগন্তর।  
হুই দিকে হুই সৈন্ত বিছাডের বেগে  
আসিলা ছুটিয়া, যেন হুই দিক হ’তে  
হুইটি অগ্নির বড় ভীমপরাক্রমে  
ছুটিল গর্জিয়া ধ্বংস করিতে অবনী।  
সেই সঙ্গে মুহূর্ত্ত ভীষণ কামান  
গর্জিতে লাগিল অগ্নি করি উদগীরণ।

দেখিতে দেখিতে মরি মিলিল আগিয়া  
হ'ল দল, সে কবার ভীম সংঘর্ষে  
ভীষণ ভরস এক উঠিল গর্জিয়া ;  
সহস্র সহস্র সৈন্য সে ভীষণ বড়  
এ অস্ত্রের মত হায় হারা'ল জীবন ।  
কিন্তু শাঙ্গিলের প্রায় বীরেন্দ্র আতর্ষা  
বিনাশি বিপক্ষ দলে ভীষণ বিক্রমে  
ছুটিল। বিছাত বেগে “দীন দীন” বলি  
অসি হস্তে মহারাষ্ট্র সৈন্যের সাগরে ।

শুভীক কৃপাণ হস্তে হর্ষাক্রমের মত  
বীরেন্দ্র-শুজাউদ্দৌলা বধিতে লাগিল  
বিপক্ষ সৈনিক দলে বামে ও দক্ষিণে  
দণ্ডে দণ্ডে পানিপথ করিয়া রঞ্জিত  
রক্ত-স্রোতে ; কণ পরে পশ্চাৎ হইতে  
মারাঠা সৈনিক এক বধিতে শুজারে  
তুলিল কৃপাণ উর্ধ্বে, নাহিক বিলম্ব  
পড়িতে সে ভীক অসি মস্তকে তাহার,  
অমনি সে পার্শ্ব হস্তে সৈনিক একটি  
উত্তরের মধ্যে আসি দাঁড়াল মুহূর্তে  
শুজারে পশ্চাতে ফেলি ; চক্ষের নিমিষে  
উত্তরের ভীক অস্ত্র তেদিয়া কলক  
উত্তরেরি বক্ষ দেখে পড়িল সজোরে ;  
উত্তরেই ধরাডলে হ'ল নিপতিত  
মুহূর্তে ; নবাব শুজা কিরিয়া পশ্চাতে  
নিরখি সে কবিরাক্ত মোস্লেম সৈনিকে  
উঠিলা চমকি, মুখ নিরখিয়া তার  
বিবানে মলিন মুখে কহিলা বিষয়ে  
“সেলিনা,—এখানে তুমি ? ও কোমল মেহে  
এ দারুণ অত্যাচার সহিলে কেমনে

প্রিয়তমে ?” কীণ হাসি হাসিয়া সেলিনা  
উত্তরিল। “দাসী আমি, তোমার লাগিয়া  
মরিলাম, ইহা হস্তে সৌভাগ্য কি মোর  
প্রিয়তম ? তুমি যবে ফেলিয়া আমারে .  
একাকিনী, এসেছিলে এ রণ প্রাঙ্গণে,  
দাসী আমি, এ প্রতিজ্ঞা করেছিলাম মনে  
সত্তত তোমার পার্শ্বে থাকিয়া সমরে  
রক্ষিব তোমারে আমি শত্রু আক্রমণে  
প্রাণপণে,—সে বা—সনা পূর্ণ এ—ত দি—নে  
বাক্য না হইতে শেষ হুঃখিনীর প্রাণ  
অনন্তে মিশিয়া গেল ; অযোধ্যা-দৈবর  
মুছিয়া আখির জল করিলা আদেশ  
পার্শ্বচরে “নিয়ে যাও শিবিরে আমার  
বেগমের মৃতদেহ তুলি শিবিকায়  
সম্মানে বর্জিজন সৈনিকের সহ ।”  
তার পর বীরবর সজল নয়নে  
তাজিয়া প্রাণের মায়া উন্মত্তের মত  
যধিতে লাগিলা বহু মারাঠা সৈনিকে ।  
শুজার সৈনিক বৃন্দ হেরিয়া নবাবে  
রণোত্তম, কিপ্র বেগে ছুটিল সকলে  
সিংহ প্রায়, শত্রু-সেনা করিয়া সংহার  
ভীম বলে, রক্ত-স্রোতে ভাসা'য়ে ধরণী ।

মস্ত মাতঙ্গের মত ঘুরিয়া কিরিয়া  
চারিদিকে, ভীকধার অসির আঘাতে  
সদাশিব কিপ্র হস্তে কত যে বধিলা  
মোস্লেম সৈনিকগণে, কে পারে বলিতে ?  
দেখিলা অদূরে এক মোস্লেম সেনানী  
ভীমকায়, দণ্ডে দণ্ডে হুকারি ভৈরবে  
কংসিছে বিপক্ষ সৈন্য ; উজ্জল কৃপাণ



নাচিতেছে চারিদিকে ঘুরিয়া কিরিয়া  
 কড়বেগে, বক বক বিছাড়ের মত ।  
 সদাশিব বড়বেগে চলিয়া ছুটিয়া  
 সেই দিকে, মেঘ-মস্ত্রে কহিলা গর্জিয়া  
 “কে রে তুই নরাদম পাগিষ্ঠ হুর্জন  
 বধিলি আমার বহু বীরেন্দ্র সৈনিকে ?”  
 উত্তরিল। ভীম করে সে বীর কেশরী  
 “যে জন চলিঞ কোশ অতিক্রম করি  
 এক রাজ্যে, মহাবুদ্ধে করিয়া নিখন  
 তোদের সে বীর শ্রেষ্ঠ গোবিন্দ পণ্ডিতে,  
 এনেছিল যুগ যার আদালী শিবিরে  
 আমি সে আতর্থা, মূর্খ চিনিস্ নে মোরে ?”  
 “চিনেছি” ভীষণ করে কহিলা গর্জিয়া  
 সদাশিব মহাক্রোধে “এত দিন পরে  
 রে পাষণ্ড নরাদম পেয়েছি সংগ্রামে  
 আজি তোরে, আয় পাণি হৃদয় চিড়িয়া  
 পিইব শোণিত তোর,—সমগ্র পৃথিবী  
 তোর অঙ্গুলে আজি ধরে যদি আসি,  
 তথাপি জানিস্ মূঢ় রক্ষা নাই তোর ।  
 মুসলমান হয়ে তুই ছিলি যোগাঙ্গমে  
 হিন্দু বেশে, তাহে পুনঃ হিন্দু বালিকারে  
 এনেছিস ভুলাইয়া কতনা কোশলে ।  
 তব্বরের মত তুই অন্তায় সমরে  
 ব’ধেছিস্ বীরশ্রেষ্ঠ গোবিন্দ পণ্ডিতে,  
 আজি তার প্রতিশোধ নেরে নরাদম ।”  
 মুহূর্তে শাণিত বড়গ মারিলা সজোরে  
 সদাশিব, এক রাত্রে উঠিলা সেনানী  
 বহু উর্দ্ধে “আল্লা আল্লা” বলিয়া জৈরবে ।  
 ব্যর্থ হ’ল সেই লক্ষ্য, শাঙ্গুলের মত

কাপাইয়া রণস্থল গর্জিলা বীরেন্দ্র  
 “অম্পৃষ্ঠ কাকের, আজি গোবিন্দের মত  
 বধি তোরে, পাঠাইব ভীষণ নরকে ।  
 তোর সেই সমস্তকে স্নান করি আজি  
 নিতাইব কোষ-বহি ; এই পদাঘাতে  
 চূর্ণিব মস্তক তোর পাষণ্ড বর্বর ।”  
 “কি বলিলি নরাকুতি কুকুর অধম  
 চূর্ণিব মস্তক মোর ? দেখিব এখনি  
 রে পাষণ্ড, কোন্ বাপে রকে আজি তোরে ?  
 একটি একটি করি দস্তগুলি তোর  
 উৎপাটিব নরাদম অম্পৃষ্ঠ পামর ;  
 হৃদয়ের রক্তে তোর নিবারিবে কুধা  
 হিংস্র জন্ত, মাংসপিণ্ডে শকুনি গৃধিনী ।”  
 “এত স্পর্ধা ?—রে হুর্জতি দম্ভা নরাদম,  
 অম্পৃষ্ঠ কুকুর তুই তোর মুখে কিরে  
 সাজে এই কথা, মূর্খ পাষণ্ড বর্বর ।  
 ভারতের রাজা তোরা ছিলি কোন্ কালে  
 নরাদম ? তবে কেন এত বড় কথা ?  
 সামান্ত বামন হ’য়ে চন্দ্রমা ধরিতে  
 সাধ তোর ? রে ঘৃণিত তব্বর অধম ;  
 সামান্ত তব্বর তুই, তব্বরের বেশে  
 এসেছিস্ এই স্থানে জানিস্নে মূঢ়  
 কার সনে বুদ্ধ আজি ?—আমি সে আতর্থা  
 যার নামে মহারাষ্ট্র কাপে ধর ধরি ।  
 আয় দেখি অর্ধগুরু বিধর্মী পামর,  
 হৃদয়ের রক্ত তোর পিবই এখনি ।”  
 মুহূর্তে স্তম্ভীকৃত অসি মারিলা বীরেন্দ্র  
 সদাশিব, সে আঘাত নিবারি কোশলে  
 সদাশিব, ভীমবলে মারিলা তখনি



তরবার, তেদি চর্ম আতর্ধার করে  
 লাগিল সে অজ্ঞাঘাত, ঝাড়িলা সে চর্ম  
 বীরবর, যুহুত্তে'কে শত খণ্ড হ'য়ে  
 পড়িল ছিটিয়া সেই অসি ভয়ঙ্কর !  
 আহত শাঈন প্রায় ভীষণ বিক্রমে  
 মারিলা স্ত্রীতীক্ষ্ণ অসি সন্ধানিব-শিরে,  
 তেদি চর্ম ভীমা অসি বিছাড়ের বেগে  
 ছুঁল যুহুত্তে' ঘেরে ভাঙ-কর্ণমূলে ;  
 এক লক্ষে সন্ধানিব মরিলা পশ্চাতে  
 রক্তে তার তেসে গেল সাজে'য়া বসন ।  
 আবার ভীষণ বেগে মারিলা কুপাণ  
 আতর্ধা, যুহুত্তে' অব পড়িল ভূতলে  
 ছিন্ন ঐবা, সন্ধানিব প্রতর্জন বেগে  
 দাঁড়াইলা, হেনকালে পশ্চাৎ হইতে  
 দিলীপ আসিয়া তথা বিছাৎ গতিতে  
 মারিল ভীষণ খড়্গ আতর্ধার শিরে ;  
 যুহুত্তে' সে ছিন্ন মুণ্ড পড়িল ভূতলে  
 রঞ্জিয়া সমর ক্ষেত্রে শোণিত প্রাবনে ।  
 সন্ধানিব হেরি ইহা উৎফুল্ল হৃদয়ে  
 “হর হর হর” রবে উঠিলা গর্জিয়া  
 কাঁপাইয়া রণস্থল ; কাঁপাইয়া ধরা  
 মহারাষ্ট্র সৈন্ত বৃন্দ উঠিলা গর্জিয়া,  
 “হর হর” “দীন দীন” উঠিলা গর্জিয়া  
 মোসলেম সৈনিক বৃন্দ,—কাঁপিল অবনী ।  
 দূর হতে নিরখিয়া এ দৃশ্য করণ  
 মারুবেগ কিপ্র হতে নিক্ষেপিলা কোরে  
 স্ত্রীতীক্ষ্ণ বিবাক্ত শর দিলীপের বৃকে ।  
 যুহুত্তে' সে হতভাগা পড়িল ভূতলে  
 গতপ্রাণ, রক্ত-লোতে ভাসিল ধরনী ।

বাধিল ভীষণ যুদ্ধ, উলল কুপাণ  
 নাচিতে লাগিল প্রতি যুহুত্তে' যুহুত্তে'  
 শির' পরে বলমণি রঞ্জিত কথিরে  
 ভয়াবহ, যে বাহারে পাইলা সমুখে  
 অজ্ঞাঘাতে, শেলাঘাতে কেহিলা ভূতলে  
 ঘোরনাদে, পানিপথ কাঁপিতে লাগিল  
 দণ্ডে দণ্ডে ; দণ্ডে দণ্ডে অদৃষ্ট-সুন্দরী  
 নাচিতে লাগিল মরি হাসিয়া তৈরবে  
 হ'ও পক্ষে—কার জয় নাহি সুনিশ্চিত ।  
 এই মোসলেমের জয়, না না পরাজয়,  
 নিরাশে মোসলেম সৈন্ত চাহি উদ্ধ'পানে  
 দেখিলা পতাকা অই হাসিছে অধরে  
 ধরি হৃদে “অচ্চল” মোসলেম-গৌরব ।  
 যুহুত্তে' আবার হৃদে দ্বিগুণ সাহস  
 উপজিল “দীন দীন” উঠিলা গর্জিয়া  
 পূর্ণবীৰ্য্যে, মহারাষ্ট্র উঠিলা গর্জিয়া  
 “হর হর মহাদেও” সে ভীষণ স্বরে  
 কাঁপিল সে রণস্থল, কাঁপিল অবনী ।  
 সরোবে উভয় সৈন্ত বিপুল বিক্রমে  
 যুঝিতে লাগিলা শত্রু করিয়া সংহার  
 প্রাণপণে, মহাহবে সৈন্ত অগণিত  
 হৃদয়ের উকরিতে দেশের কল্যাণ  
 সাধিতে উন্নত আজি,—ভীষণ দর্শন ।  
 সৈন্তদের হৃদহারে, কোদণ্ড চকারে  
 কামানের যুহুহু তৈরব গর্জনে  
 কাঁপিতে লাগিল বিধ ঘোর ভূকম্পনে  
 কাঁপে যথা বনুছরা, জীবজন্তুগণ  
 উদ্ধ'বাসে পলাইল, মরি কি ভীষণ,—  
 প্রকৃতি সক্রোবে যেন সাধিতে প্রলয়  
 অসি হতে সাজিয়াছে ঘোর উদ্যাদিনী ।

বিধনাথ অর্থ' পরে সিংহ পরাক্রমে  
 ধ্বংসিতে লাগিল মরি অসংখ্য মোসলেমে।  
 মহাবাহু সাহাবুরি পদাতিক বেশে  
 আবরি সমস্ত দেহ স্পৃষ্ট কবচে  
 যুঝিতে লাগিলা যত মাতঙ্গের যত  
 ধ্বংসিয়া পায়গা সৈন্ত ভীম পরাক্রমে।  
 মুহূর্তে মুহূর্তে ভীমা অসির আঘাতে  
 অসংখ্য সৈনিকবৃন্দ পড়িতে লাগিলা  
 রণস্থলে, রক্ত-স্রোতে ডালিল যেদিনী।  
 পায়গা \* ভীষণ বীর্যো "হর হর" রবে  
 কাঁপাইয়া অসংখ্য ধ্বংসিতে লাগিলা  
 অসংখ্য মোসলেম সৈন্ত, হেরিলে সে দৃষ্ট  
 প্রাণের ভিতরে বহে ঝটিকা ভীষণ  
 পায়গার ভীম বীর্য না পারি সহিতে  
 উজিরের সৈন্তদল ছ' একটি করি  
 ধীরে ধীরে রণস্থল ত্যজিতে লাগিলা।  
 উজির বিধগ্ন হৃদে কহিলা গর্জিয়া  
 "কোথা যাও সৈন্তবৃন্দ ত্যজি রণস্থল ?  
 ভে'বেছ কি পলাইয়া যাইবে স্বদেশে ?  
 বুঝা সে বাসনা, হায় নারিবে যাইতে,  
 নিশ্চয় ত্যজিবে প্রাণ বিধর্মীর হাতে ;  
 ভেবে দেখ বহুদূর তোমাদের দেশ,  
 কেমনে যাইবে তথা ? হ'লে পরাজিত  
 যুদ্ধান্তে হইবে বন্দী, হারায়ে জীবন  
 অস্পৃষ্ট কাকের করে—এ দূর বিদেশে।  
 এ'স তবে পুনর্বীর, ধর ভীমা অসি,  
 হও রণে অগ্রসর "দীন দীন" রবে

ধ্বংসিয়া কাকের বৃন্দে ভীম অজ্ঞাঘাতে,  
 দেও প্রাণ বীর বেশে এ ধর্ম সমরে ;  
 মরিলে যাইবে স্বর্গে ; স্বর্গের ছয়ার  
 খুলিয়া যাইবে তবে তোমাদের ডরে  
 অই হের, ত্রিদিবের রক্ত সিংহাসনে  
 বসিয়া সম্রাট বেশে ইসলাম-ভাস্কর  
 মোহাম্মদ † হেরিতেছে যুদ্ধ তোমাদের ;  
 তাহারি ওষ্মত ‡ হ'য়ে ছিছি কোন্ মুখে  
 পলাইছ সবে আজি কাকেরের ডরে ?  
 কলঙ্ক-কালিমা কেন করিছ লেপন  
 পবিত্র ইসলাম ধর্মে এ জন্মের ডরে ?  
 তু'লেছ কি আজা তার ? তু'লেছ কি আজি  
 কোরানের সেই বাক্য—কত শাস্তিপ্রদ  
 যত্না মুখে বিধর্মীর কপাণের তলে ? x  
 মনে নেই সেই কথা ?—খড়্গের ছায়াতে  
 জামাত + জীবন দিলে ধর্মের সমরে  
 এ'স সৈন্তগণ, এ'স বিধর্মী কাকেরে  
 করিব বিধ্বস্ত আজি এ মহা আহবে ;  
 তোমরা জীবন্ত জাতি, বীর পুত্র হ'য়ে  
 কার ডরে—ছি-ছি আজি পলাইছ সবে ?  
 এ জীবণ অগ্ন্যায়ী, জন্মিলে মরণ  
 সূনিশ্চিত, চির দিন কে বেঁচেছে তবে ?  
 এ'স সবে ধর্মযুদ্ধে, ভয় করে তবে।"  
 ফিরিল উজির সৈন্ত "আল্লা আল্লা" রবে  
 কাঁপাইয়া স্বর্গ মর্ত্য, সমগ্র মোসলেম  
 "দীন দীন দীন" বলি উঠিলা গর্জিয়া।  
 মিলিল উভয় সৈন্ত, বাধিল আবার

\* পায়গা—মহারাজ্ঞী পাকের অতি দুর্বল সৈন্য। ই'হার সনানিবের আদেশ বাতীত অন্য কাহারও আদেশ মানিত না।

† মুসলমানগণ তাঁহার নামে দরুল পাঠ করিবে।

‡ ওষ্মত—শিখা।

x অল জামাতে তাহু তা সেনানে জরকে—স্বর্গ তরবারের ছায়াতে প্রতিবিম্বিত।

+ জামাত—স্বর্গ।

মুহুর্তে ভীষণ যুদ্ধ পারগার সনে ।  
রক্তাক্ত কৃপাণগুলি উঠিয়া পড়িয়া  
কলিতে লাগিল মরি বিহ্যাতের মত  
শির পরে শত্রু সেনা করিয়া সংহার ।

ধীরে ধীরে বেলা যত বাড়িতে লাগিল  
রণক্ষেত্র তত হায় করিল ধারণ  
উগ্র মূর্তি, অথ গজ সৈন্ত সেনাপতি  
পড়িতে লাগিল ক্রমে মুহুর্তে মুহুর্তে  
কামানে কৃপাণে বাণে ; সমর প্রাঙ্গণে  
অকস্মাৎ কোথা হতে বিহ্যাতের বেগে  
ভীষণ সন্ন্যাসীদল আসিল ছুটিয়া  
সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ হস্তে “হর হর” রবে  
কাঁপাইয়া দিগন্তর, কাঁপাইয়া ধরা  
কাঁপাইয়া সে ভীষণ সমর প্রান্তর ।  
তুনি সে ভৈরব রব, দিগন্ত উৎসাহে  
মহারাত্রি সৈন্তবৃন্দ উঠিল গর্জিয়া  
“হর হর মহাদেও” উঠিল গর্জিয়া  
সমগ্র মোসলেম সৈন্ত “দীন দীন দীন ।”  
দিগন্ত উৎসাহে এবে মহারাত্রি সৈন্ত  
আক্রমিল শত্রু দলে, উগ্রস্তের মত  
ভীষণ সন্ন্যাসীদল বধিতে লাগিল  
অগণ্য মোসলেম সৈন্তে “হর হর” রবে  
সুতীক্ষ্ণ কৃপাণাঘাতে, দিগন্ত উৎসাহে  
টঙ্কারিল ঘোরনাদে ধমু ভয়ঙ্কর  
ধমুর্ধর, শব্দ শব্দ ছুটিল সবগে  
ভীষণ কলহ কূল কুজলের মত  
বিষজিহ্ব ; তেনি চন্দ্র মুহুর্তে মুহুর্তে  
অসংখ্য মোসলেম সৈন্তে ধ্বংসিতে লাগিল  
মহারাত্রি ; বজ্রনাদে গর্জিল কামান

বর্ষিয়া উপর্যুপরি গোলা ভয়ঙ্কর ।  
আতঙ্কে মোসলেম সৈন্ত দেখিল চাহিয়া  
মহারাত্রি পতাকার দক্ষিণে ভীষণ  
সন্ন্যাসীর ভীষণরূপ রক্ত বিমণ্ডিত  
হাসিছে বিকট হাসি, শীর্ষদেশে তার  
ত্রিশূল একটি, ছিন্ন মানবের করে  
নির্ম্মিত সম্ভ্রত পুষ্প, বৈজয়ন্তী-হৃদে  
শস্তুর ভৈরব মূর্তি, দীর্ঘ জটা শিরে,  
কৃতান্তের চির সঙ্গী তীব্র বিষধর  
উর্ধ্ব কণা—উত্তরীয় বন্ধের উপরে ।  
ছই পার্শ্বে স্বল্প বেড়ি’ ছই বিষধর  
উঠিয়াছে শিরদেশে আকালিয়া কণা,  
সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি ভয়, চুল চুল আঁধি,  
ব্যাঘ্র চন্দ্র পরিধানে—কি দৃশ্য ভীষণ !  
এবীণ সন্ন্যাসী এক ধরি সে পতাকা ।  
“হর হর মহাদেও” গর্জিছে ভৈরবে ;  
গলে রজাক্ষের মালা, ভীষণ মূর্তি,  
পৃষ্ঠদেশে দীর্ঘ জটা, বিভূতি কপালে ।  
হেরি সে ভৈরব মূর্তি ভয়ে ও বিস্ময়ে  
মোসলেম সৈন্তের হৃদি উঠিল কাঁপিয়া  
হুক হুক, আতঙ্কের প্রবল প্রাবনে  
সমস্ত সাহস আশা নিল ভাসাইয়া  
মুহুর্তেকে, একে একে সম্বন্ধিত প্রাণে  
অসংখ্য মোসলেম সৈন্ত ত্যজি রণভূমি  
ছুটিল শিবির পানে ; তুনি এ সংবাদ  
বীরেন্দ্র আকালী সাহা উঠিল অলিয়া  
অগ্নি প্রায়, উত্তোলিত কৃপাণ ত্রাহার  
হইল অচল, রোবে উঠিল গর্জিয়া  
সিংহ প্রায়, পানিপথ কাঁপিতে লাগিল

ধরধরি, আদেশিলা নিমকোটি\* দলে  
 “বীরবৃন্দ, এই দণ্ডে যাও চারিদিকে  
 অসি হস্তে, যে পায়ণ্ড ত্যজিবে সন্তয়ে  
 রণক্ষেত্র, খড়গাঘাতে ফেলিবে তাহারে  
 ধরাতলে, নাহি দিবে যাইতে শিবিরে  
 একটি সৈনিকে আজি থাকিতে জীবন।  
 অস্ত্রাশ্র পাষণ্ডগণ ত্যজি রণস্থল  
 গিয়াছে যাহারা ভয়ে শিবিরের দিকে,  
 আদেশিবে সে কৃত্রিম কাপুরুষ সবে  
 যাইতে সমর ক্ষেত্রে, অস্ত্রধা তখনি  
 তাদের ছিন্নমুণ্ড ফেলিবে ভূতলে  
 অস্ত্রাঘাতে, † এ আদেশ যুহুর্ভের তরে  
 উপেক্ষিবে যেই জন, প্রতিজ্ঞা আমার  
 বৃদ্ধান্তে বহন্তে আমি বধিব তাহারে।  
 যাও সবে ক্রতবেগে।” অমনি গর্জিয়া  
 নিমকোটি সৈন্তবৃন্দ ছুটিলা সবেগে  
 চারিদিকে, রণক্ষেত্রে পাঠাইল পুনঃ  
 সহস্র সহস্র সৈন্ত; পথ আগুলিয়া  
 দাঁড়াইলা দলে দলে কৃতান্তের মত  
 দীপ্ত তরবারি হস্তে, যে কোন মোস্লেম  
 পলাইল ক্রতবেগে যাইলা ছুটিয়া  
 সেই দিকে, রোধি পথ ভীষণ বিক্রমে  
 কহিলা গর্জিয়া “ভীক কেমনে আসিলি  
 ত্যজি যুদ্ধ? কোন্ মুখে বীরেন্দ্র সমাজে  
 যাবি মৃত? যা’ এখনি সমর প্রান্তরে  
 অসি হস্তে, অস্ত্রধা এ ভীম অস্ত্রাঘাতে  
 এখনি মস্তক তোর চুবিবে ধরনী।”  
 বস্তা প্রবাহের মত অসংখ্য মোস্লেম

ছুটিলা সমর ক্ষেত্রে, গভীর কল্লোল  
 উঠিল আবার যেন সৈন্তের সাগরে  
 প্রাসিতে বসুধা, রোষে কহিলা গর্জিয়া  
 আমেন আকালী সাহা, আগের কুধর  
 উঠিল কাটিয়া যেন সমর প্রান্তরে  
 ঘোর নামে “সৈন্তবৃন্দ হও অগ্রসর  
 মোস্লেম নিকরীয়া নহে, ধর্মের সমরে  
 মোস্লেমের রক্ত বিন্দু বিছাণ্ডের মত  
 বহে ক্ষুদ্রে প্রদানিতে নব্বয় জীবন।  
 যুহুর্ভ ডরে না তারা, তবে কেন আজি  
 ভয়াকুল? পৌত্তলিক সন্ন্যাসীর দল  
 কি করিবে? যুহুর্ভকে হ’বে ভয়ীকৃত  
 এ সমরে, যোগ বল যাইবে উড়িয়া  
 দেখিতে দেখিতে ঘোর কুয়াশার মত  
 ঈশ্বরের সুপবিত্র নামের গৌরবে।  
 খোল অসি, বিধর্মীর অস্পৃশ্য শোণিতে  
 ডুবাও এ রণস্থল, এ ধর্ম সমরে  
 কারে ভয়?—মোস্লেমের সহায় ঈশ্বর।”  
 ধায় যথা স্তরে স্তরে ঝটিকা ডাড়নে  
 অসংখ্য বালুকাকণা সমুদ্রের জলে  
 আধারিয়া বেলা তুমি, তেমতি ছুটিলা  
 অগণ্য মোস্লেম সৈন্ত আকালী ডাড়নে  
 ভীরবেগে মহারাষ্ট্র সৈন্তের সাগরে।  
 আবার ভীষণ করে গর্জিলা আকালী  
 “নিদানিত অসি হস্তে যাও সাহাবরি  
 পূর্ণবেগে, পত্রবৃন্দে কর আক্রমণ  
 পান্না পান্নি, যতবার আক্রমিবে তুমি  
 ভীরবেগে, ততবার বিছাড গতিতে

\* নিমকোটি—আহমদ সাহ আকালীর নিজের অতি দক্ষিণ সৈন্য, তাহার আহমদ সাহ আকালীর আদেশ ছিল  
 অন্য কাহারও আদেশ মানিত না।  
 † Asiatic Society, Researches Vol. III.

নজীব ও সাপহন বিপদের পার্শ্ব  
আক্রমিবে কিপ্রভাবে নগর অসি করে।” \*

আবার বিহ্বল বেগে অসংখ্য মোস্তেম  
আক্রমিলা শত্রুরূপে “দীন দীন” রবে  
উন্নত শাফীল প্রায় ; অসংখ্য কামান  
গর্জিতে লাগিল ঘন গভীর ঘর্ষরে  
কঁপাইয়া দিগন্তর কঁপায়ে মেদিনী ।  
ছুটিল অনলপূর্ণ গোলা ভরহর  
রাশি রাশি ; কত সৈন্য পড়িলা কুতলে ।  
অবিচ্ছিন্ন ধূমে ধূমে ছাইল গগন,  
হায় যথা ঘন-ঘটা ঝটিকার কালে ;  
তাহে দীপ্ত তরবার বিহ্বাতের মত  
ঝলিতে লাগিল সেই আধার গগনে  
মুহূর্হ ; মহাক্রোধে আকালী তখন  
উন্নত সিংহের প্রায় গর্জিয়া তৈরবে  
হুই হতে ল’য়ে হুই ভীক্ তরবার  
দশনে ধরিয়া বজা বিহ্বাত গতিতে  
ছুটাইল ভীম অথ কৃতান্ত সদৃশ  
রণোন্নত মহারাষ্ট্র সৈন্তের সাগরে ।  
প্রজ্বলিত অনলের উজ্জ্বল প্রায়  
রণক্ষেত্রে মহাবলী ঘুরিয়া কিরিয়া  
কাটিতে লাগিল বহু মহারাষ্ট্র-সৈন্য  
সম্মুখে পশ্চাতে আর দক্ষিণে ও বামে ।  
শবের উপরে শব পড়িতে লাগিল  
তার সেই ভীক্ ধার অসির আঘাতে  
দণ্ডে দণ্ডে ! দেব দৈত্য দানব মানব  
শঙ্কিত হইল তার ভীষণ বিক্রমে ।  
বিহ্বাতের মত তার ভীক্ তরবার

রক্তমাখা, মুহূর্হ উঠিয়া নামিয়া  
ঝলিতে লাগিল তার মাথার উপরে ।  
মহাবলী বজ্রনাদে “আল্লা আল্লা” বলি  
ধ্বংসিলা অসংখ্য সৈন্য মুহূর্হে মুহূর্হে  
কঁপাইয়া পানিপথ—কঁপায়ে ধরনী ।  
তার সেই হুহুকারে—এচও বিক্রমে  
“আল্লা-আল্লা” কর্ণভেদী তৈরব গর্জনে  
মহারাষ্ট্র-সৈন্য বৃন্দ পলা’তে লাগিল  
ভীহার সম্মুখ হতে আতঙ্কিত প্রাণে ।

অস্তান্ত মোস্তেম সৈন্য,—বীর সেনাপতি  
ভাজিয়া প্রাণের মায়া ঘোর হুহুকারে  
কঁপাইয়া পানিপথ—কঁপা’য়ে ধরনী  
ধ্বংসিতে লাগিল সেই মারাঠা সৈনিকে ।  
সে এচও আক্রমণ সহিতে না পারি  
মহারাষ্ট্র-সৈন্য বৃন্দ পলা’তে লাগিল  
দিকে দিকে ভ্রুজি সেই সময় প্রাণণ ।  
হেরি সে যুদ্ধের গতি—বীৰ্য্য মোস্তেমের  
মারাঠার সে চুর্চর সেনাপতিগণ  
প্রমাদ গণিলা মনে, তবু প্রাণপণে  
ঝুঁকিতে লাগিলা তারা ধ্বংসিয়া মোস্তেমে ।  
বীর জেষ্ঠ এব্রাহিম দেখিলা অদূরে  
কোহরা বেগম তার পুরুষের বেশে  
ধ্বংসিছে মারাঠা সৈন্য শতীক্ শায়কে  
মুহূর্হ, হেরি তার ক্রোধাক্ত মূর্তি,  
সে দিকে না বেঁয়ে বীর, ছুটাইল অথ  
অস্ত দিকে, তাসাইয়া সমর-প্রাণণ  
বজ্রাতির রক্ত-প্রোতে ; আকালী তখন  
আক্রমিলা ভীম বলে বীরেন্দ্র নজিবে ।



হু'ওজন মহাক্রোধে যুঝিতে লাগিল।  
 ভীম অস্ত্রে, রক্ত-ধারা চলিল বহিরা  
 উভয়েরি কত দেহে ; বাত প্রতিঘাতে  
 অলিঙ্গলি ভর হ'রে পড়িল ছুটিয়া  
 চারিদিকে, অকস্মাৎ দীপ্ত তরবার  
 বলিয়া উঠিল উর্ধ্বে, নামিল যখন,  
 জাহ্নবী তুরঙ্গ হতে পড়িল। কৃতলে  
 শোণিতার্ঘ্য, “দীন দীন” উঠিল। গর্জিয়া  
 উৎসাহে নজীবদৌলা, উঠিল। গর্জিয়া  
 সমগ্র মোস্তেম সৈন্ত কাঁপায়ে আন্তর  
 “দীন দীন,” বসুন্ধরা কাঁপিল সত্যে ।  
 সমগ্র মোস্তেম সৈন্ত যুঝিতে লাগিল।  
 বীর দর্পে লক্ষ লক্ষ মহারাষ্ট্রী সনে ।  
 কুপাণ পরশু খড়্গ পরিষ ভীষণ  
 পরস্পরে পরস্পর হানিতে লাগিল।  
 ভীমবলে, রক্তস্রোতে ভাসিল ধরণী ।

দূর হতে আদালী সাহু দেখিল। চাহিয়া  
 হু'পক্ষের অগণিত গোলন্দাজ সৈন্ত  
 অসংখ্য কামান আর বন্দুক লইয়া  
 যুঝিতেছে প্রাণ পণে উন্নতের মত ।  
 তাহানের অগ্নিবর্ষী অসংখ্য কামান  
 বর্ষিতেছে রাশি রাশি গোলা তরঙ্গর  
 অগ্নিপূর্ণ—বজ্র সম তৈরব গর্জনে  
 কাঁপা'য়ে সে পানিপথ—কাঁপা'য়ে বসুধা  
 যুহু'হু ; সে ভীষণ অগ্নি-বৃষ্টি-মাঝে  
 পড়িতে লাগিল ভূমে কাকে-কাকে-কাকে  
 হু'পক্ষের কত সৈন্ত—কত সেনাপতি ।

ভীষণ কোদণ্ড হতে কৃতান্তের মত  
 মারুবেগ হস্তী গূঠে বলিয়া সক্রোধে

বর্ষিতে লাগিল। বহু মহারাষ্ট্র-সেনা  
 স্তূভীকৃত বিবাক্তবাণে, শব্দ শব্দ করি  
 ভীষণ লিঙ্গক রাশি ভূজঙ্গের মত  
 বিষজিহ্বা প্রতিপলে দংশিতে লাগিল  
 অগণিত পরাক্রান্ত পায়গা সৈনিকে ।  
 সে ভীক্রে অক্লিষ্ট শর কালকূট ভরা  
 গর্জিয়া তৈরবে বহু মারাঠা সৈনিকে  
 অথ সহ যুদ্ধিকায় করিল অধিত ।  
 কি আশ্চর্য্য লিঙ্গা তার, কি রণ কৌশল  
 সাধ্য কি মানব বৃন্দ যুঝিবে সমরে  
 তার সনে, যক্ষরক্ষঃ দেবতা দানব  
 না পারে তিষ্ঠিতে যার ভীম আক্রমণে  
 রণক্ষেত্রে,—মহারাষ্ট্রী যুঝিবে কেমনে ?  
 স্তূভীকৃত বিবাক্ত বাণে করি বিমর্দিত  
 বিপুল পায়গা সৈন্ত, কুঞ্জর লইয়া  
 মারুবেগ ধীরে ধীরে হইতে লাগিল।  
 অগ্রসর পানিপথ করিয়া রঞ্জিত  
 মহারাষ্ট্র সৈন্তদের তরল শোণিতে ।  
 দেখিল। সে রণস্থলে ভীষণ বিক্রমে  
 পেশবার প্রিয়পুত্র বীরেন্দ্র কেশরী  
 বিশ্বনাথ সংহারিছে যুহু'র্ধ্বে যুহু'র্ধ্বে  
 অসংখ্য মোস্তেম সৈন্ত স্তূভীকৃত কুপাণে ।  
 হেরি সে ভীষণ দৃশ্য উঠিল। গর্জিয়া  
 মারুবেগ, ক্রোধভরে ছুটিলা সৈনিকে  
 বিমুর্ছিয়া মহারাষ্ট্র সৈন্ত পরাক্রান্ত  
 রাশি রাশি বিষজিহ্ব বাণ বরিষণে ।  
 মহাবীর ক্রুদি মাঝে ভাবিতে লাগিল।  
 “এইবার পাইরাছি পাপাঙ্গা কাকেরে,  
 আরো কিছু অগ্রসর হইয়া এখনি  
 পাঠাইব নরাধমে শমন-সদনে



পাখির উড় রক্তে স্নান করি আজি  
 প্রতিহিংসা-বহি মম করিব নিৰ্ধারন।”  
 মহাক্রোধে বীরবর ছুটিল সৈনিকে,  
 বহিরা অসংখ্য সৈন্য বিপুল বিক্রমে,—  
 —সেইদিকে বিশ্বনাথ উন্নতের মত  
 সংহারিছে রাশি রাশি মোস্তেয় সৈনিকে।

বীরেন্দ্র নজীবদৌলার নিরখিলা দূরে  
 সন্মর প্রাঙ্গণে, কিন্তু হৃদয়কের মত  
 বিশ্বনাথ মুহূর্তে গর্জিয়া ভৈরবে  
 কংসিছে মোস্তেয় সৈন্য ; কৃপাণ তাহার  
 বিছাডের মত সদা ঘুরিছে কিরিছে  
 চারিদিকে, সংহারিয়া অসংখ্য মোস্তেয়ে।  
 অমনি নজীবদৌলা ছুটিল সে দিকে  
 কড়বেগে, অকস্মাৎ একটি কলঘ  
 দংশিল ভীষণ বেগে উন্নতের মত  
 পেশবা পুত্রের বাম চক্ষের উপরে।  
 সজোরে বীরেন্দ্র শর কেলিলা উপাড়ি’  
 ক্রোধভরে, হুকারিয়া ভীষণ বিক্রমে  
 আক্রমিলা অস্ত্র এক মোস্তেয় সৈনিকে,  
 উলঙ্গ ভীষণ অসি উঠিল বলিয়া  
 উর্ধ্বদেশে, মুহূর্তেকে মস্তক তাহার  
 পড়িল ভূতলে, বীর উঠিলা গর্জিয়া  
 “হর হর মহাদেও,” প্রত্যুত্তরে তার  
 সরোবে নজিবদৌলা উঠিলা গর্জিয়া  
 “দীন দীন” ; বিশ্বনাথ প্রহরন বেগে  
 আক্রমিলা সিংহ প্রায় বীরেন্দ্র নজিবে।  
 উভয়ে ভীষণ বেগে যুঝিছে লাগিলা  
 উন্নত হুঙ্কার প্রায়, উলঙ্গ কৃপাণ

বলিতে লাগিল উর্ধ্ব বিছাডের মত  
 বক্মকি, হেনকালে কালকূট ভরা  
 আবার একটি শর বিশ্বাসের ডালে  
 বিঁধিল আসিয়া বেগে, সে ভীষ আঘাতে  
 কাড়র হইলা বলী, না করি অক্ষেপ  
 সেইদিকে, ভীক্ষ শর কেলিলা উপাড়ি  
 কিপ্র হস্তে, মহাক্রোধে উন্নতের মত  
 বীরবর, ভীম বলে মারিলা কৃপাণ  
 ভীক্ষধার, সে আঘাত লইলা কলকে  
 মুহূর্তে নজিবদৌলা ইরশ্বদ বেগে  
 মারিলা ভীষণ খড়গ, অমনি সে অসি  
 ভেদিয়া শূন্য চক্ষু বিশ্বাসের কছে  
 পশিল, মুহূর্তে বলী পড়িল ভূতলে।  
 আহত বিশ্বাস-দেহ লইলা তুলিয়া  
 সৈন্তদল বাহাওয়ারে মাতঙ্গ উপরে।  
 নিরখি এ শোচনীয় দৃশ্য সঙ্কর  
 সদাশিব সিংহ প্রায় উঠিলা গর্জিয়া  
 “হর হর মহাদেও,” সে ঘোর হুকারে  
 কাঁপিল মোসলেম হিয়া—কাঁপিল অবনী।  
 কিপ্র হস্তে বীরবর কংসিতে লাগিলা  
 অসংখ্য উজির-সৈন্ত, বন্দুকের গুলি  
 সহসা লাগিল আসি অশনির মত  
 বাহাওয়ারে অশ-শিরে, পড়িল ভূতলে  
 মুহূর্তে সে বীর অশ “হর হর” রবে  
 এক লক্ষে সদাশিব উঠিলা আফালি  
 ভূমি হ’তে, অস্ত্র অশে করি আরোহণ  
 সেই দণ্ডে, খড়গাঘাতে বধিছে লাগিলা  
 উজিরের সৈন্তদলে ; আকালী তখন  
 ছুটাইলা ভীম অশ, কংসিরা সরোবে

মহারাজ্ঞ-সৈন্যবৃন্দে,—কি দৃষ্ট ভীষণ ।  
—হুইলিকে অগ্নিপূর্ণ গোলা তরঙ্গর  
গর্জিতেছে পলে পলে, না করি অক্ষণ  
সে দিকে, আকালী সাহা আসিলা ছুটিয়া  
সেইখানে, যেই স্থানে উন্নতের মত  
সদাশিব কিপ্রহস্তে ধ্বংসিছে মোসলেমে ।  
ভীষণ বিক্রমে বীর মহারাজ্ঞ-সৈন্যে  
সংহারিয়া আক্রমিলা সদাশিব শূরে ।  
মহাক্রোধে সদাশিব গঞ্জিলা তৈরবে  
“এজ্বিনে পাউরাছি রে দম্ভ্য অধম,  
বদেশ ছাড়িয়া যুঁচ কেন এসেছিস  
এ ভারতে ? মূৰ্খ তুই, বুধা প্রলোভনে  
কেন ভুলেছিস ?—আর পাবও আক্‌গান ।”  
প্রত্যুত্তরে মহাবীর কহিলা গঞ্জিয়া  
“এত স্পর্ধা রে পাবও ? বুঝিবি কেমনে  
সামান্য মশক হ’য়ে কুঞ্জরের সনে ?  
কে তোরে রক্ষিবে যুঁচ এ বিপত্তি কালে  
রণক্ষেত্রে ?—দম্ভ্য আমি ? কোন্ মুখে পাপি  
বলিলি এ পাপ কথা ? লজ্জা নাই তোরে ?  
তরুর অধম তুই হিন্দুকুলগ্রানি,  
দম্ভ্যতা ব্যবসা তোরে, বীরত্বের গর্ব  
সাজে না রে তোরে মূৰ্খ, কুপের মণ্ডুক  
পড়ে যদি হুদে, করে কত আফালন,  
তেমতি রে তুই পাপী, পার্শ্বত্যা মূষিক  
শিবাজী বিজোহ-নেতা, তারি বংশধর  
দম্ভ্য তোরা, বুধা গর্ব করিস্ নে যুঁচ  
মোর কাছে ।” উত্তরিলা সক্রোধে তখন  
সদাশিব “চিনি তোরে অস্পৃহ পায়র,  
বুধা অভিমানে তোরে, জানিস্ নে যুঁচ  
এ কুলে বিক্রম কত ? তোরে মত বীরে

তুণ ফুলা গনি আমি, কাপুরুষ আর  
ব’ধেছিল্ বহুসৈন্য, প্রতিপোধ তার  
পাবি আজি নরাধম ; উক রক্তে তোরে  
শীতলিব এ প্রাণের যন্ত্রণা ভীষণ ।”  
হাসিয়া বিকট হাসি কহিলা আকালী  
“তোরে মত কত বীরে এক পদাঘাতে  
বধিয়াছি, কখনরে দেখিবি পাবও  
রক্তে তোরে পানিপথ করিব রঞ্জিত,  
আয় দেখি নরাধম” । যুহুর্ন্তে বীরেন্দ্র  
শুভীকৃত কৃপাণ এক মারিলা সক্রোধে  
সদাশিবের লক্ষ্য করি, সরিলা পশ্চাতে  
সদাশিব, ব্যর্থ সেই আঘাত ভীষণ ।  
সাহসারে সদাশিব কহিলা গঞ্জিয়া  
“কেমন রে নরাধম ব’ধেছিল্ মোরে ?  
সদাশিব নারী নহে, নহে কাপুরুষ,  
শৃগাল দেখিলে ডরে পলিবে দিবরে ।  
তুই মূৰ্খ, তোরে মত কে আছে নির্বোধ  
ধরাধামে ? তেয়াগিয়া আশ্রয় বজন  
মক-মরীচিকা যুঁচ কুরঙ্গের মত  
এসেছিস্ এ বিদেশে বুধা প্রলোভনে ।  
নবাব ওমরাহগণে করি উত্তেজিত  
ধর্ম্মযুদ্ধে, বুঝি যুঁচ ভেঁবেছিস্ মনে  
মহারাজ্ঞ-শক্তি তুই করি উৎপাটিত  
ভারতে নূতন রাজ্য করিবি স্থাপন ?  
বুধা সে বাসনা, আশা পূরিবে না তোরে  
এ জনমে, সদাশিব থাকিতে জীবিত  
কি সাধ্য আক্‌গান দম্ভ্য তিষ্ঠিবে ভারতে ?  
দম্ভ্য তুই, প্রতিফল পাইবি পাবও  
এই দণ্ডে, সদাশিব নহে শক্তি হীন  
ক্রীড়নক, শক্তি তার দেখ্ নরাধম ।”

সরোবে আকাশী সাহা করিলা গর্জিয়া  
 “কি বলিলি বর্ষজ্যোহী কাকের বর্ষর,  
 পার্শ্বতা সুবিক ভূট, যথা আকাশন  
 সাজে না আমার কাছে—এ যে রণাঙ্গণ,  
 শক্তি থাকে আর পানি সমুখ সমরে  
 কুকুরের মত কেন করিস্ গর্জন।  
 বজ্রতার স্থান নহে এ মহাপ্রান্তর,  
 এ যে রণ-ক্ষেত্র, হেথা অস্ত্রের বর্ষারে,  
 লক্ষ লক্ষ জনের উত্তল রথিরে  
 স্বাধীনতা-রত্ন হয় সত্তত বিক্রীত।”  
 “বটে মূঢ় ?” সদানিব গর্জিয়া তৈরবে  
 মারিলা ভীষণ অসি আকাশীর শিরে  
 পূর্ণ বলে, নিবারিয়া সে ভীষণ প্রহার  
 মুহূর্তে আকাশী সাহা মারিলা হুকারি  
 তরবার ; হুঁওজন প্রচণ্ড বিক্রমে  
 যুঝিতে লাগিলা ; অশ্ব পড়িল ভূতলে  
 উত্তরের ছিন্ন মূণ্ড ; ঝটিকার মত  
 বোম্বুয় মুহূর্তে কে নামিয়া ভূতলে  
 কড় উঠি কড় বসি, কড় জাহ্নুপাতি  
 ঘুরিয়া কিরিয়া মস্ত মাতঙ্গের মত  
 যুঝিতে লাগিলা দৌছে ; ঘাত প্রতিঘাতে  
 অসি গুলি শত ধণ্ডে পড়িল ছিটিয়া  
 রণস্থলে ; কি ভীষণ সমর-কৌশল  
 উত্তরের, নিরখিলে কাপে বীর হিয়া,  
 এই দাঁড়াইয়া দৌছে, এই হাঁটু পেঁড়ে  
 যুঝিতে লাগিলা মরি ভীষণ বিক্রমে ;  
 উত্তরের রক্তমাখা অস্ত্রের বর্ণনে  
 হুহুকারে, রণস্থল হইল কম্পিত  
 দণ্ডে দণ্ডে, রক্ত-স্রোত বহিল করীরে  
 যেদোপম রণবজ্র করিয়া রজিত।

বহুক্ষণ পরে বীর “আয়া আয়া” বলি  
 উঠিলা গর্জিয়া রোবে, সেই সঙ্গে হার  
 স্তীকৃত কৃপাণ এক উঠিল বলিয়া  
 বক্ বক্, মুহূর্তে কে পড়িলা ভূতলে  
 সদানিব, পড়ে যথা ভূধরের চূড়া  
 মহাশয়ে বরাপৃষ্ঠে ঘোর কুকম্পনে।  
 মুহূর্তে তুরঙ্গে এক আরোহিয়া শূর  
 হুকারিলা “দীন দীন”, দেখিলা অপূরে  
 যশোবন্ত সিংহ প্রায় গর্জিয়া তৈরবে  
 ধ্বংসিতেছে অগণিত মোস্তফা সৈনিকে ;  
 অমনি বিদ্যাত বেগে ছুটিলা দারাবী  
 সেই দিকে, পূর্ণবলে আক্রমিলা শূর  
 যশোবন্তে, হুঁও জন যুঝিতে লাগিলা  
 বীর মর্পে, উত্তরের ঘোর হুহুকারে  
 রণস্থল মুহূর্তে কাঁপিতে লাগিলা  
 আতঙ্কে, শোণিত ধারা চলিল বহিয়া  
 উত্তরের বীরদেহে ; মুহূর্তে আকাশী  
 মারিলা স্তীকৃত অসি যশোবন্ত শিরে,  
 কি শিক্রা—ভীষণ অসি নামিল যখন  
 অত্যাগা তুরঙ্গ সহ পড়িলা ভূতলে  
 বিধগিত, “দীন দীন” উঠিলা গর্জিয়া  
 সমগ্র মোস্তফা সৈন্য কাঁপারে প্রান্তর।  
 উত্তরের মত শূর চলিলা ছুটিয়া  
 ধ্বংসিয়া বিপক্ষ সৈন্য, ভীষণ কৃপাণ  
 ঘুরিতে লাগিল তার বিদ্যাতের মত  
 চারি দিকে, বীরবর ঘোর হুহুকারে  
 কাঁপাইয়া রণস্থল করিলা বিধ্বস্ত  
 বহু মহারাষ্ট্র সৈন্য ; দেখিলা সমুখে  
 সমস্তের পূর্ণ বেগে ধ্বংসিছে কখনো  
 মোস্তফা সৈনিক সবে, অমনি বীরেন্দ্র

কড়াভের আর বেয়ে এচও বিক্রমে  
 আক্রমিলা রণোন্নত সমসের শূরে,  
 আদালীর সে ভীষণ এচও বিক্রম  
 নারিলা সহিতে বীর, পড়িলা যুহুস্তে  
 ধরা পৃষ্ঠে সে ভীষণ পরও প্রহারে ।  
 চলিলা ছুটিয়া শূর বামে ও দক্ষিণে  
 কাটিয়া অসংখ্য সৈন্য, আক্রমিলা যেয়ে  
 মহাদর্পে সেনাপতি স্নেহে পাটলে ;  
 হুঁও জন বহুজন যুঝিলা কপাণে  
 পূর্ণবলে, আদালীর ভীষণ প্রহারে  
 জর্জরিত হ'য়ে বীর পড়িলা ভূতলে !  
 গর্জিয়া ঝটিকাবেগে চলিলা ছুটিয়া  
 মহাবলী, আক্রমিল বলজী জাহ্ননে  
 পূর্ণবীৰ্য্যে, উভয়ের ভীষণ কপাণে  
 জলন্ত অনল কণা উঠিল বলিয়া  
 মুহূর্হু সে ভীষণ ঘাত প্রতিঘাতে ।  
 আদালী ভীষণবীৰ্য্যে উঠিলা গর্জিয়া  
 “আল্লা আল্লা” যুহুস্তেকে বিছাড়ের মত  
 উলঙ্গ ভীষণ অসি উঠিল বলিয়া  
 শির' পরে, ধরা পৃষ্ঠে পড়িল অমনি  
 জাহ্ননের ছিন্ন মুণ্ড , সমগ্র মোস্লেম  
 মহাদর্পে “দীন দীন” উঠিলা গর্জিয়া ।  
 উন্নত দোরানী সাহা চৌদিকে ঘুরিয়া  
 কিন্তু শাঙ্গিলের মত ভীষণ বিক্রমে  
 সংহারিলা অগণিত বীর সেনাপতি  
 বিপক্ষের, তীক্ষ্ণ ধার অসির আঘাতে ।  
 সহস্র সহস্র সৈন্য চলিলা কাটিয়া  
 বীরবর, দণ্ডে দণ্ডে সম্মুখে পশ্চাতে ।  
 দেখিলা বীরেন্দ্র দূরে ধ্বংসিছে বিক্রমে

হৃর্ধ্ব সন্ন্যাসীকুল অসংখ্য মোস্লেমে ।  
 তখনি গর্জিয়া বেগে ছুটিলা দোরানী  
 সন্ন্যাসী সৈন্যের পানে, ভীম অজ্ঞাঘাতে  
 সংহারিলা বহুসৈন্য । মহারাষ্ট্র-সৈন্য  
 উৎসাহে ভীষণ করে উঠিলা গর্জিয়া  
 “হর হর মহাদেও,” “বম বম হর”  
 উঠিলা গর্জিয়া সেই সন্ন্যাসী সকল ।  
 শুনি সে ভৈরব রব দিগুণ প্রভাবে,  
 ডুবাইয়া সেই স্বর ভীম কোলাহলে,  
 কঁপাইয়া রণস্থল ভৈরব হকারে  
 মুসলমান পূর্ণবীৰ্য্যে উঠিলা গর্জিয়া  
 “দীন দীন ।” রক্ত-স্রোতে ভাসিল ধরনী  
 যোদ্ধাদের হৃৎকারে—অস্ত্রের কণনে,  
 বজ্রবর্ষী কামানের ভীষণ গর্জনে  
 কঁপিতে লাগিল ভয়ে দানব মানব  
 যক্ষ রক্ষ, রণ-ক্ষেত্র টলমল করি  
 কঁপিল, বসুধা যথা কঁপে ভূকম্পনে ।  
 হুঁও দল কিপ্রহস্তে তীক্ষ্ণ তরবারে  
 বিনাশিয়া শত্রু সংখ্যা সমস্ত দিবস  
 কঁপাইলা পানিপথ ভীষণ বিক্রমে  
 “দীন দীন” “হর হর মহাদেও” রবে  
 ধ্বনিত করিয়া সেই ভীষণ প্রান্তর ।

যুদ্ধান্তে বাহাও • উঠি বিছাড় গতিতে  
 ধ্বংসিলা অসংখ্য সৈন্য ; অন্তের দোবে  
 একে একে মহারাষ্ট্র-সৈন্য-সেনাপতি  
 পড়িতে লাগিলা ভূমে, মোস্লেম সৈন্যের  
 অজ্ঞাঘাতে অগ্নিবর্ষী তোপের সম্মুখে  
 মহারাষ্ট্রী কণ মাত্র না পারি তিষ্ঠিতে

তেরাগিয়া রণস্থল, করিলা প্রস্থান  
 বড় বেগে ; সে গভীর সন্ধ্যা সময়ে  
 সমাধির খুল হস্তে হটিতে লাগিলা  
 পশ্চাতে বিবর ছদে ; \* বিজয়ী মোস্তেম  
 “দীন দীন” আলা আলা গর্জিতে লাগিল  
 মুহূর্ত্ত রণক্ষেত্র করিয়া কম্পিত ।  
 অসংখ্য মোসলেম সৈন্য ছুটিল সববেগে  
 বিনাশিতে পলায়িত মহারাষ্ট্র সেনা ।  
 স্থানে স্থানে ভীষণতর হুগাণী সৈনিক  
 মহারাষ্ট্র সৈন্যবৃন্দে কাটিতে লাগিলা  
 তীক্ষ্ণ অস্ত্রে মুহূর্ত্ত গর্জিয়া তৈরবে ;  
 হুগাণী সৈনিকগণ গভীর আনন্দে  
 আনন্দহারা ; অনেকই বলিতে লাগিলা  
 অসি হস্তে “এতদিনে পূরিল বাসনা,  
 যাত্রাকালে কন্যা আয়া জননী ভগিনী  
 ক’রেছিল। অমুরোধ সমুখ সময়ে  
 বিধর্মী কাকেরবৃন্দে করি পরাজয়  
 প্রাণ পণে, তাহাদের প্রত্যেকের নামে  
 দিতে বলি কতগুলি পাবণ কাফের  
 পূর্ণার্থে, সে ইচ্ছা আজি হইল পূরণ ।”  
 মুহূর্ত্তে আদালী সাহা আসিলা ছুটিয়া  
 সেই স্থানে, রণোত্তম মোস্তেম নিচর  
 “দীন দীন” “আলা আলা” উঠিল গর্জিয়া ।  
 নিরখি এ শব্দরাশি সন্তপ্ত ছদয়ে  
 নিষেধিয়া বীর খেঁচ হুগাণী সৈনিকে  
 কহিলা ভৎসনা করি এ নহে বীরত্ব,  
 —পরাজিত সৈন্যবলে হত্যা করা প্রাণে ?  
 বরার উপরে খাড়া ? —কোন্ পাজি আছে ?  
 পরাজিত সৈন্য পরে করে যে আঘাত

পশু সে, মানব নহে ; এ পশু বিধান  
 পবিত্র ইসলাম ধর্ম নাহি কোন কালে ।  
 বীর যে, সে কত নাহি করে অত্যাঘাত  
 রমণী বালক বৃদ্ধ পরাজিত জনে ।  
 সাবধান, পরাজিত সৈন্যের উপরে  
 কেহ যদি অত্যাঘাত কর পুনর্বার,  
 বিনা দণ্ডে অব্যাহতি পাবেনা নিশ্চয় ।  
 ইহাই আদেশ মোর, নিরোক্ষেদ করি  
 উপযুক্ত শাস্তি আমি প্রদানিব তারে ।

সন্ধ্যা সমাগমে হায় দেখিলা আদালী  
 নাহি মহারাষ্ট্র-সৈন্য, গভীর শ্মশান  
 পানিপথ, ভূপাকারে র’য়েছে পড়িয়া  
 শবের উপরে শব, শব ভারপ’র ।  
 কি হিন্দু কি মুসলমান একত্র পতিত  
 রণস্থলে ; স্তরে স্তরে সমুখে পশ্চাতে  
 শব রাশি, রণস্থল যেন প্রেত-ভূমি ।  
 চারি লক্ষ শবদেহে সে রণ প্রাঙ্গণ  
 সমাক্রম, ক্রধিরাঙ্ক শব-শৈল রাশি  
 চারিদিকে নরহৃদে কত বিভীষিকা  
 করিতেছে প্রদর্শন, রক্ত-নির্ঝরিত  
 বহিতেছে শতধারে করিয়া বেটন  
 শব-শৈল রঞ্জিয়া সে শ্মশান প্রাঙ্গণ ;  
 কত উড়ু কত অধ কত যে যাতক  
 ভূপাকারে, স্থানে স্থানে আহত সৈন্যের  
 আত্মনাশে ভীষণতা করিছে বর্ধন ।  
 ডাকিনী বোগিনী যেন নাচিছে তৈরবে  
 নর-শোণিতের লোভে, বৃক্ক মালিনী  
 হানিতেছে খল খল এ মহাশ্মশানে

শব পার্শ্বে সংহারিয়া সৃষ্টি বিধাতার  
জ্বর প্রাণে, কি ভীষণ দৃশ্য শোচনীয় ।  
মোস্তেম মৈনিকবন্দ্য সৃষ্টিতে লাগিল  
অগণিত ধন রত্ন, লভিলা অসংখ্য  
দাস দাসী, অয়োদ্ধাসে পুরিল গগন ;  
সেই জয় হবে, সেই বিকট হুঙ্কারে  
খাদীনতা-লক্ষ্মী দেবী আতঙ্কিত প্রাণে  
এ জন্মের মত হায় মুদিল নয়ন ।

আর কি ?—কুরাল সব এ জন্মের মত  
পানিপথে, মহারাষ্ট্রে ডুবিল সাগরে ।  
ভারতীর মোস্তেমের শেষ বীৰ্য্য বহি  
অলিয়া ভীষণ বেগে, তন্মিয়া বিপক্ষে  
স্তম্ভিত করিয়া বিশ্ব ঘোর হুঙ্কারে  
নিবিল জন্মের মত এ মহা প্রাস্তরে !  
ডুবিল জন্মের মত ভারতের ভাঙ্গা  
অনন্ত জলধি গর্ভে অনন্ত আধারে ।\*

\* এই যুদ্ধের পর মহারাষ্ট্র শক্তি একবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহাদের আর উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তি ছিলনা । মুসলমানগণ যদিও এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন বটে, তথাপি তাঁহারা এত দুঃখল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, আহমদ সাহ্ সোরাণী কাবুলে চলিয়া যাওয়ার পর বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে ভারত সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার শক্তি আর তাঁহাদের ছিলনা । এই যুদ্ধই ভারতে ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি পত্তনের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল ।



## তৃতীয় সর্গ

[ পানিপথ, মুসলমান শিবির ]

খামিয়াছে মহাবড় ;—একটি গভীর ।

স্পন্দহীন রণক্ষেত্র, দৃশ্য ভয়ঙ্কর,—

লক্ষ লক্ষ মহাযোদ্ধা মহা সেনাপতি  
ভীমবাহ, লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান  
বীর সিংহ, ভূপাকারে র'য়েছে পড়িয়া  
ইতস্ততঃ ; ভয় গদা, ভয় তীর ধনু,  
কামান কুপাণ খড়্গ, ভয় অসি রাশি  
চারিদিকে ; লক্ষ লক্ষ তুরঙ্গ মাতঙ্গ  
নিপতিত রণক্ষেত্রে পর্বতের মত  
কবিরাজ ; শবদেহ বেড়িয়া চৌদিকে  
শকুনি গৃধিনী কঠ শৃগাল কুকুর  
অমিতেছে দলে দলে সেই স্তূপ'পরে ।  
কড়ুবা ভুজিছে শব, কড়ুবা কলহ  
করিছে প্রলুক চিস্তে ভীষণ চীৎকারে  
আতঙ্কিত করি সেই ভীষণ প্রান্তর ।

শূন্য প্রান্তরে অই মোসলেম-শিবিরে  
উঠিছে আনন্দ-ধ্বনি, বাজিছে রবাব,  
বাজিছে মৃদঙ্গ বীণা কত রঙ্গে ভঙ্গে  
ভাসাইয়া মধ্যাহ্নের নীরব গগন ।  
কেহবা গাইছে, কেহ হাসিছে উল্লাসে  
লভিয়া লুপ্তিত জ্বা রত্ন অগণন ।  
আমোদ আফ্লাদে আজি এ রণ প্রান্তর  
মুখরিত, চারিদিকে সজীভের ধ্বনি,  
অরোজাসে সৈন্তদের মহাস্ত বদন ।

এই যে দোরানী সা'র শিবির উপরে  
উড়িতেছে “অর্ধচন্দ্র” মোসলেম গৌরব ।  
শিবিরের অভ্যন্তরে বসি স্বর্ণাসনে  
আমেদ আদালী সাহা বলিতে লাগিল  
“বর্খোদার !—কোথা সেই বন্দী রাজা বাবু ?  
কোথা সে জাহাজী ?—তুমি কবে এ'নে দিবে ?  
এ নহে উচিত তব, বল কি সাহসে  
লুকায়ে রে'খেছ তুমি রাজ-বন্দী সবে ?”  
মুহূর্তে দোরানী সাহা নিমকো ৩ সৈন্তে  
আদেশিল “বীর বৃন্দ যাও ১০ জন সবে  
বর্খোদার গৃহ মাঝে পাইবে বাহারে  
আনিবে এখনি তারে আমার নিকটে ।”  
চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিব এখনি  
আমি তার, হ'ক না সে শত্রু আমাদের  
কি ক্ষতি ? আহত জনে করিব শুশ্রূষা  
রীতিমত, শত্রু ব'লে কড়ু তার প্রতি  
করিব না অবহেলা, বিধাতার রাজ্যে  
শত্রু মিত্র নির্বিশেষে করিব সাহায্য  
আন্ত'জনে, ইহাই যে অঙ্গ ইস্তামের ।  
যুদ্ধান্তে সে দিন মোরে মাজল্য নজর  
দিয়াছিল কত সৈন্ত কত সেনাপতি ;  
মুহূর্তের ভরে আমি করিনি অক্ষিপ  
সে সকল ধন রত্ন র'য়েছে পড়িয়া  
অযত্নে শিবির মাঝে, আজি কিনা হি হি  
বর্খোদার মত উচ্চ রাজ কর্মচারী

\* নিমকোটি সৈন্যসংখ্যা বরখোদারদারের শিবিরে পহুঁছবার পূর্বেই বরখোদারদারের ইজিত মত তাহার কর্মচারী  
উহাদিগকে গোপনে হত্যা করিয়া প্রোথিত করিয়াছিল । Asiatic Society, Researches. Vol. III.

ধন লোভে রাখিয়াছে লুকা'য়ে শিবিরে  
মহারাজী বন্দী-ঘরে \* এ লজ্জার কথা  
শুনিলে শিহরে জ্বলি কোবে অঙ্গ অলে।  
তার পর চাহি বীর বর্খোদার পানে  
কহিল। বিরক্তি ভরে “ভাল নহে ইহা  
বর্খোদার, এইবার কমিছু তোমায়ে ;  
সাবধান, ভবিষ্যতে হবে অমঙ্গল।  
পানীর প্রেশর নাই আকালীর কাছে।  
হুটের দমন আর শিটের পালন  
এই নীতি নিয়া আমি চলি ধরাধামে।”

অদূরে সুজাউদৌলা-শিবির সম্মুখে  
অসংখ্য দোরানী সৈন্য কহিতে লাগিল।  
ইব্রাহিম † আমাদের অসংখ্য সৈনিকে  
বধিয়াছে, আজি মোরা প্রতিশোধ তার  
লইব, বধিয়া সেই পাপিষ্ঠ হুর্জনে ;  
বিশ্বাসের মৃত দেহ দিয়াছি ছাড়িয়া  
সকলের অহুরোধে, অনর্থের মূল  
মতিলাল, ‡ সে যদি সে শব দেহটিরে  
হেঁড়ে দিত, শুকাইয়া তুণ ভরি তাহে  
অদেশে যে'তেম নিয়া, দেখিত সকলে  
কাকেরের অধিপতি পাষণ্ড বর্বরে।+  
সে আশা হ'য়েছে দূর, আজি মোরা আর  
শুনিব না কারো কথা, কোথা এব্রাহিম  
ব'লে দেও, এই দণ্ডে বধিব তাহারে।

নতুবা আশ্রয় দাতা বল কে উহার  
দেখিব তাহারে মোরা কত শক্তি ধরে।”  
মুহূর্ত সুজাউদৌলা কোথা হুদয়ে  
মৃত্যু কৃপাণ হস্তে উঠিল। গর্জিয়া  
“এই আমি উপস্থিত আছি এই স্থানে  
মৃত বিশ্বাসের দেহ আমারি ইঙ্গিতে  
মতিলাল সংকারার্থে দিয়াছে ছাড়িয়া  
হিন্দু হস্তে, কি অজ্ঞায় হ'য়েছে তাহাতে ?  
যুঁকিব বীরের মত জীবিতের সনে ;  
মৃত সনে আমাদের কি আছে শত্রুতা ?  
মৃত দেহ সব শাস্ত্রে সম্মানের অতি।”  
বাধিল বিষম গোল : হুরানী সৈনিক  
মহাক্রোধে অসি হস্তে উঠিল গর্জিয়া।  
শুনি এই গণ্ডগোল বিচ্যুত গতিতে  
আসিল। হুরানী সাহা, সাহাবরি সহ  
সেই স্থানে, একে একে শুনে সব কথা  
মহারীর কোধতরে কহিল। গর্জিয়া  
“কেনরে পাষণ্ডগণ মোস্তেম হইয়া  
পাপ কার্যে এত লিপ্ত ? জানিসনে তোরা  
ইসলাম ধর্মের বিধি ? স্নেহ ও মমতা  
দয়া ধর্ম সব কিরে হয় তেয়াগিতে  
যুদ্ধার্থে সৈনিক ত্রুত করিলে এহন ?  
কতদিন যুদ্ধকালে বলেছি তোদেরে  
করিস্ নে অত্যাচার পরাজিত জনে।  
রমণী বালক আর মৃত দেহ পরে

\* জাহুজী এবং রাজা বাবু গভিত (সদাশিবের কর্মচারী)

† মহারাজার পক্ষের প্রায় চল্লিশ সহস্র সৈন্য বন্দী হইয়াছিল, তন্মধ্যে প্রায় সাত সহস্র সৈন্য নবাব সুজাউদৌলার শিবিরে আশ্রয় পায়। নবাব সুজাউদৌলার দোরানী সৈন্যদের হস্ত হইতে উহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অনেক সৈন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এব্রাহিম খাঁ কাদিও এই সৈন্য বন্দী হইয়াছিলেন। Asiatic Society, Researches, Vol. III.

‡ মতিলাল—একজন মুসলমান সর্কার কর্মচারী (বরখোদার দপ্তর দেওয়ান)।

+ বিশুনাথের (বিশ্বাস রায়) শবদেহ মতিলালের নিকটে ছিল। নবাব সুজাউদৌলার প্রতিবাদে এই দেহ দোরানী সৈন্যদের নিকটে না দিয়া মহারাজার পক্ষের সৈন্যের নিকটে সংকারার্থে দেওয়া হইয়াছিল।

করিস্ নে অত্যাচার, পরাজিত বেশে  
করিস্ নে প্রতীড়িত নিরীহ প্রজারে।  
তাহাদের শস্ত ক্ষেত্র, কলবান ভর  
করিস্ নে নষ্ট কর, নিস্ নে লুটিয়া  
ধন রত্ন, সে কথা কি গিয়াহিস্ তুলে ?”  
খামিল হুসানী সৈন্য, নিবিল অনল,  
য য স্থানে সকলেই গেল চলি ধীরে,  
বহিল শান্তির বায়ু সবার অন্তরে।  
সাহাবরি পরশিয়া পবিত্র কোরাণ  
নিয়ে গেলা এতাহিমে সপ্তাহের তরে।

সুজাউদ্দৌলা যান যুখে বসিয়া শিবিরে  
কহিলা সজল নেত্রে নিজ পার্শ্বতরে  
যে রত্ন হারায়ে গেছে এ জনের মত  
পানিপথ যুদ্ধক্ষেত্রে—সরস্বতী তীরে।  
আর না পাইব তাহা ; যুদ্ধে জয়ী হই  
তাহাতে কি লাভ মোর ? ভিখারীর মত  
ভয় প্রাণ নিয়ে আমি চলিছু স্বদেশে।  
সব শূন্য মোর কাছে, শূন্য মোর হৃদি,  
শূন্য গৃহ, শূন্য মোর রাজ-সিংহাসন।  
এ শূন্য কি দিয়া আমি করিব পূরণ ?  
সেলিনা ছিল এ জন্মে অধিষ্ঠাত্রী দেবী  
হুখে হুখে সাথী মোর ; সেলিনা বিহনে  
কেমনে করিব এই জীবন ধারণ ?  
বহুক্ষণ পরে সুজা আকালী আহ্বানে  
গেলা চলি ক্ষুণ্ণপ্রাণে রাজ দরবারে।

ভাণ্ডারের দ্রুত দেহ করিতে সন্ধান  
অসংখ্য মোস্তেম সৈন্য হইল প্রেরিত  
নানাস্থানে, সুজাউদ্দৌলা করিলা প্রতিজ্ঞা

যে জন আনিবে শব, বহু ধন রত্ন  
প্রদানিব সেই জনে, ছুটিল সবেষে  
মোস্তেম সৈনিকবৃন্দ শব অন্বেষণে  
পানিপথে—ভারতের সে মহাশয়শাসনে।

সুদূরে নিবিড় বন, পার্শ্ব সরস্বতী  
প্রবাহিতা, এক তীরে অসংখ্য বিটপী  
অবিচ্ছিন্ন অন্য তীরে ভীষণ প্রান্তর।  
কাননের এক প্রান্তে তটিনী সৈকতে  
বিশাল অশ্বখ বৃক্ষ যুড়ি বহু দূর  
ছত্রাকারে ; অগণিত দীর্ঘ বাহ গুলি  
প্রসারি শ্রামল ছত্র ; বৃক্ষের সম্মুখে  
অর্দ্ধ ভগ্ন, উচ্চ চূড় একটি মন্দির  
পুরাতন, অত্যন্তরে বৃক্ষশ্যামলিনী  
ভয়ঙ্করী, হুই পার্শ্ব ডাকিনী যোগিনী ;  
পদ তলে বিরূপাক—কি দৃষ্ট ভীষণ।  
মন্দিরের পার্শ্বদেশে বৃক্ষের সম্মুখে  
অলিছে ভীষণ চিতা, অলস্ত অনলে  
একটি বীরেন্দ্র মূর্তি ভস্ম শেষ প্রায়।  
একটি যোগিনী অই চিতার সম্মুখে  
দাঁড়াইয়া, অক্ষপূর্ণ যুগল নয়ন ;  
বিবাদে মলিন মুখ, পরিবেশ বস্ত্র  
শোণিতাক্ত, যোগাইছে চিতার ইচ্ছন।  
দেখিতে দেখিতে সেই বীরেন্দ্রের দেহ  
হ'ল ভস্মীভূত ; অগ্নি নিবিল যখন  
চিতা পার্শ্ব অত্যাগিনী বসিয়া বসিয়া  
হত্যাণ জ্বরে কত করিলা কন্দন।  
জ্বরের তরে তরে প্রাণের ভিতরে  
বহিতে লাগিল বেগে বটিকা ভীষণ।  
কৈবে কৈবে অত্যাগিনী বলিতে লাগিলা

“বিধনাথ, যৌবনের প্রথম প্রত্যাহে  
কে জানিত ছেঁড়ে যাবে ? না হতে পূরণ  
জীবনের সাধগুলি কে জানিত হার  
ভেঙ্গে যাবে আমার সে প্রেমের স্বপন ।  
তুমি ত চলিয়া গেলে, এ ভয় হৃদয়ে  
প্রদানিবে শান্তি-সুখা কে আর এখন ?  
কে মুহুর্তে স্নেহভরে নয়নের জল  
প্রাণনাথ, মর্ষ হুঁখে করিলে রোদন ?  
কত দিন হুঁখিনীর চিবুক ধরিয়া  
বলেছিলে কত কথা, আদর করিয়া  
ক’রেছিলে হাসিমুখে কত সম্ভাষণ ।  
আজি তাহা প্রাণনাথ তুলিলে কেমনে ?  
—তুলিলে কেমনে সেই আজন্ম হুঁখিনী  
মাতৃহীনা অসহায় বালিকা কুমুমে ?  
যে জন তোমারে নাথ স’পেছে জীবন ?  
তুমিই ত স্নেহভরে আদর করিয়া  
“কৌমুদী কুমুম” বলে ডাকিতে আমার,  
সে কথা কি প্রাণনাথ এ জন্মের মত  
ভুলে গেলে, আজি কি তা হয় না স্মরণ ?  
নিকুঞ্জে বাহার সনে ভ্রমিয়া সন্তত  
করিতে কতনা গল্প, কতনা আদরে  
সাজাতে কবরী যার কুটুম্ব কুমুমে ?  
কত বা সরসী তীরে নিকুঞ্জ কুটীরে  
যার কণ্ঠ ধরি নাথ করিতে ভ্রমণ ?  
এ জন্মের মত হার তুলিলে কি তারে  
প্রাণনাথ ? কোন্ দোষে করিলে বর্জন ?  
সে প্রেম সে ভালবাসা তুলিলে কেমনে ?  
তুলিলে কেমনে সেই জীবন-সঙ্গিনী  
যারে তুমি প্রাণ-সম করিতে বতন ?  
অভাগিনী আমি, হার সন্তত তোমারে

ক’রেছিহু উদ্বেজিত, পরিণামে তার  
কলিল কি এই কল ? অদৃষ্টে আমার  
পড়িল ভীষণ বজ্র, হারাহু তোমারে  
অসময়ে, এ ভীষণ সংগ্রাম-সাগরে  
এ জন্মের মত তোমা দিহু বিলম্বন ।”  
অভাগিনী বহুক্ষণ রহিল। চাহিয়া  
নীরবে শ্মশান পানে ; উদ্ভাসিনী আর  
গেলা ছুটি ক্ষতবেগে শ্মশান উপরে,  
নীরবে শ্মশান-ভস্ম মাখিল। হৃদয়ে,  
মাখিল। ললাটে গণ্ডে,—কি দৃষ্ট করণ ।  
সাজিল হুঁখিনী এবে ঘোর উদ্ভাসিনী  
চিতা ভস্মে, রক্ত কেশ উড়িতে লাগিল  
থেকে থেকে মুহু মুহু পবন দিলোলে ।  
সে চারু চটুল নেত্র শোক-নিখরিনী  
ঢালিল শোকাঙ্ক ধারা অনন্ত প্রাবনে  
ভাসাইয়া হুঁখিনীর-মলিন বদন ।  
অভাগিনী কেঁদে কেঁদে বলিতে লাগিল।  
“প্রাণনাথ, আজি আমি করিহু পূরণ  
সে প্রতিজ্ঞা, আজি সেই বিবাহ আমার  
করিহু সমাধা এই শ্মশান উপরে ।”  
সহসা পশ্চাত হ’তে একটি সরাসী  
ডাকিল। “কৌমুদি”, বামা দেখিল। বিষয়ে  
পশ্চাতে সে যোগীশ্রেষ্ঠ মহারাষ্ট্র-গুরু  
দাড়াইয়া, অভাগিনী উঠিল। কাদিয়া  
উচ্চৈঃস্বরে “হার পিতঃ কি দেখিতে আজি  
আসিয়াছ ? আমার সে প্রাণের দোসর  
হৃদয়-কৌন্তত রক্ত নয়নের মণি  
অই চিতা-ভস্মে আজি সিরাহে মিশিয়া  
অই চিতানলে দেব জীবনের আশা  
শ্রীতি তত্ত্ব, মর্ষ কর্ম স্নেহ ভালবাসা

জীবনের সব সাধ, সব বৃত্তিগুলি  
এ অশ্বের মত হার গিয়াছে অগ্নিরা।  
তোমারি আদেশে দেব, সত্য তাহারে  
ক'রেছি উত্তেজিত, আজি কল তার  
পাইলাম, হার পিতঃ এ জীবনে আর  
তুলিতে নারিব তাহা, হৃদয়ে আমার  
অলিল ভীষণ চিত্তা জনমের মত।”  
হুহু হ'ল কঠোর, কাদিতে লাগিল।  
অভাগিনী, বর বর পড়িল করিয়া  
অজ্ঞানতা আশ্রয়ের বারিধারা প্রায়।  
স্নেহে মধুর বাক্যে কহিল। সন্ন্যাসী  
“সকলি বিধির ইচ্ছা, নিয়তি তাহার  
কে থাণ্ডাবে? তাঁর কার্যে অনন্ত মঙ্গল।  
মঙ্গল আকর তিনি, এ বিশ্ব জগতে  
জীবের মঙ্গল হেতু ধ্বংস ও সৃজন  
তাহারি রহস্য, নর বুধা দেখে তারে  
না বুঝিয়া সৃষ্টি-তত্ত্ব; ভেবে দেখ বাছা  
ধ্বংস বিনা এ জগতের সৃষ্টি অসম্ভব;  
এ নীতি দেখ বাছা জড় ও অজড়  
সর্বত্র সমান, অই দীর্ঘ মহীকুহ  
শোভিত জামল পত্রে কেমন সুন্দর।  
এই পত্র না শুকালে হিমালী প্রভাতে  
কেমনে জন্মিবে বল পত্র অস্তিত্ব?  
এই দেখ পুষ্পগুলি র'য়েছে কুটির।  
মনোহর বৃক্ষপরে, সৌরভে সৌন্দর্য্যে  
বিমুগ্ধ দেবতা নর, কও দেখি বাছা  
এই পুষ্প না করিলে, কেমনে কুটিবে  
এই সই তরু শিরে পুষ্প অস্তিত্ব?  
তাই বলি না বুঝিয়া এ গুঢ় রহস্য  
কেন বাছা অকারণে দোষ বিধাতারে?

ভেবে দেখ, এ জগতে কেহ নহে কার,  
মায়ামুগ্ধ জীবগুলি তুলিয়া কর্তব্য  
ধর্ম পথ হাড়ি, বাছা অশ্বের পথে  
করে সদা বিচরণ, বুকেও বুকে মা,  
কেনেও জানেনা, তারা মোহ-মারা বশে  
আপনার ধ্বংস-গুহা করিছে খনন।  
বার্ধ বার্ধ করি ভবে নৃশংসের প্রায়  
এক জন অস্ত্র জনে করিছে হনন।  
কে মাতা কে পিতা, কে স্বামী কে জায়া,  
সকলি ভোজের বাজী, মায়ার জগতে  
সকলি মায়ার খেলা, না বুকে মানব  
মায়াতে জড়িত হ'য়ে, বালকের প্রায়  
খেলিছে পুতুল খেলা, স্ব স্ব কন্ম'দোষে  
জীবগুলি পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি-রঙ্গ-ভূমে  
করিতেছে অভিনয়, ভ্রমাক্ষ মানব  
বোঝে না তা' এ জগৎ নিশার স্বপন।  
অদৃষ্টে যা ছিল বাছা হ'য়েছে সকলি,  
কি কল রোদনে আর? চল সেতারার  
রাজরাণী তুমি, এই ভিখারিনী বেশ  
সাজেনা তোমার, উঠ, উঠমা কৌমুদী,  
চল যাই সেতারার, সেই পুণ্যস্থানে  
পবিত্র নিকায় ধর্ম'করিও সাধন।  
আর্দ্রে আশ্রয় দিও, দরিদ্রেরে অন্ন,  
ভিখারীর বস্ত্র, সেবা করিও রোগীর,  
বিপন্নের অজ্ঞান করিও মোচন।”  
“গুরুদেব” কেঁদে কেঁদে কহিতে লাগিল।  
হঃখিনী কৌমুদী বাসি “আর কেন মোরে  
আশার মোহিনী ময়ে তুলিও এখন?  
আমার অদৃষ্ট পিতঃ অই চিত্তানলে  
এ অশ্বের মত হার গিয়াছে অগ্নিরা।



জীবনের সুখ শাস্তি ভালবাসা আশা  
 এই ভয় সনে হার গিয়াছে মিশিয়া।  
 আশার ক্ষয় মম, আশার জীবন,  
 তোমারি আদেশে পিতঃ যে অগ্নি ভীষণ  
 জালিলুম সমর ক্ষেত্রে, নাহি জানিতাম  
 সে অনলে অভাগীর সুখ শাস্তি আশা  
 এ জন্মের মত হার যাইবে জালিয়া ?  
 তোমারি আদেশে পিতঃ বিশ্বনাথ সনে  
 আসিলাম পানিপথে, পূজিলাম দেব  
 জগন্নাথ। চামুণ্ডারে প্রাণের শোণিতে  
 উভয়ে ভক্তি ভরে গভীর নিশীথে।  
 গাইলুম সঙ্গীত আমি জাগাইতে হায়  
 মহারাষ্ট্র সৈন্তবৃন্দে, জাগাইতে হায়  
 সুযুগ্ম ভারতলক্ষ্মী, কিন্তু ভাগা দোষে  
 নিফল হইল সব, জাগিল না আর  
 ভাগা-লক্ষ্মী, ভারতের হইল পতন  
 পানিপথে, হুঃখিনীর সুখ শাস্তি আশা  
 এ জন্মের মত পিতঃ হইল নিক্সাণ।  
 যে জন্ত বাঁধিয়েছিলাম এ মহা সমর,  
 সকলি তা কুরিয়েছে,—কেন তবে আর  
 আশার মোহিনী মন্ত্রে ভুলিব এখন ?  
 লক্ষ লক্ষ মানবের প্রাণের শোণিতে  
 যেই পাপ অজিয়াছি, প্রায়শ্চিত্ত তার  
 করিব এখন পিতঃ মহেশ্বরের পদে  
 আপনার সুখ ছুঃখ করি বলিদান।  
 কেন বার সেতারায়—সেই মরুভূমে ?—  
 —সে দেশে আমার পিতঃ কে আছে এখন ?  
 বিপদের অশ্রু মুছি—আর্তের সেবার  
 বাপিব জীবন আমি এ মহাশ্মশানে।  
 এই শ্মশানের পরে গড়িব মন্দির

সুপবিত্র, অভ্যস্তরে করিব স্থাপন  
 শিব মূর্তি, নাম তার রাখিব যতনে  
 “বিশ্বনাথ” ভক্তি ভরে পূজিব তাহারে  
 দিবা নিশি, এই মূর্তি দিবে জাগাইয়া  
 আমার বিশ্বত স্মৃতি, অতীত জীবন।  
 সেই স্মৃতি, গুরুদেব করিবে বর্ষণ  
 অমৃত সতত এই যোগিনী ক্ষণে।”  
 অভাগিনী ভয় প্রাণে রহিলা চাহিয়া  
 সন্ন্যাসীর পানে, স্থির নয়ন যুগলে  
 ছই বিন্দু অশ্রু আহা শোভিল সুন্দর  
 প্রভাত শিশির যেন কুটস্থ কমলে !  
 কিছুক্ষণ উর্দ্ধ নেত্রে রহিলা চাহিয়া  
 তপস্বী, সে শূণ্য দৃষ্টি ভেদিয়া গগন  
 উঠিল যে কত উর্দ্ধ কে পারে বলিতে ?  
 ত্যজিলা নিশ্বাস এক, নামিল নয়ন,  
 সন্মুখে কহিলা “বাহা আশীর্বাদ করি  
 তোমারে, রমণীকূলে তুমি পূণ্যবতী,  
 তোমার প্রেমের স্মৃতি বর্ষিবে সতত  
 সুধা রাশি প্রেমিকের শ্মশান ক্ষণে”।  
 তপস্বীর স্নেহ-বাক্যে হুঃখিনীর প্রাণে  
 জাগিল নৈশব-স্মৃতি, আবার হুঃখিনী  
 শ্মশানের ভয় রাশি মাখিলা ক্ষণে।  
 আবার কাঁদিলা বামা, আবার সন্ন্যাসী  
 বলিলা সন্মুখে “হিছি কেঁদনা কৌমুদী,  
 কণিকের সুখ ভরে কেন মা এমন ?  
 আপনাকে ভুলে যাও, বিশ্বের কল্যাণে  
 ভগবানে প্রাণ মন কর সমর্পণ।”

দেখিলা উভয়ে দূরে তরঙ্গিনী-তীরে  
 জলিছে অসংখ্য চিতা, কত বীর-দেহ



ভারতের হিতরতে পানিপথ কেন্দ্রে  
 যুদ্ধের তৈরবে, আজি শ্মশান-অনলে  
 ভরীকৃত, মহাকীর্তি করিয়া স্থাপন।  
 চিত্তা পার্শ্বে বহু লোক দাঁড়ারে নীরবে  
 বশে হতে, দগ্ধা প্রায় ভীষণ দর্শন।  
 কিছু দূরে দীর্ঘ এক মহীকূহ পরে  
 যদি এক উষ্মাশ্রিতী হাসিয়া কাদিয়া  
 হেরি এ শ্মশান দৃষ্ট গভীর বিষাদে  
 গাইছে সঙ্গীত এক, তুনি সে সঙ্গীত  
 কৌমুদী আকুল চিত্তে ভাবিতে লাগিলা  
 এ যে রক্তজীর গীত, এ বন প্রদেশে  
 কে গাইছে সে সঙ্গীত? স্পন্দহীন দেহে  
 পাব্যপের মূর্তি প্রায় দাঁড়ারে কৌমুদী  
 তুনিতে লাগিলা গীত, সে অর-তরঙ্গ  
 ধীরে ধীরে সারাজেহর নিখর গগন  
 প্রাবিরা পীযুষ ধারা করিল বর্ষণ  
 সরস্বতী-তীরে সেই নির্জন কাননে।

১

কেন বিধি করিলে সৃজন?  
 এমন অশান্তির মানব জীবন।  
 জীবনের সুখ দুঃখ হাসি কান্না আশা,  
 সুখের প্রীতি ভক্তি গৌহ ভালবাসা  
 এই বুলা বানি সহ,  
 মিশে যদি অহরহ  
 কেন বিধি করিলে সৃজন?  
 এমন কুহেলির মানব জীবন?

২

কেন বিধি করিলে সৃজন?  
 বহু-বরীচিকা প্রায়, সবি যদি কৌকি হয়,  
 সবি যদি এ অগতে মিশার স্বপন।  
 সবি যদি ধূলা-বেলা, সবি যদি সারা-বেলা  
 সবি যদি এ অগতে আশার ছন্দন।

অগতের বত নর, সবি যদি পর ধর,  
 আত্মীয় বান্ধব যদি নহে কোন জন।  
 নাহি দয়া নাহি স্নেহ, নাহি কৃতজ্ঞতা-দ্বারা,  
 হত্যা ব্যভিচার যদি ধরার নিয়ম।  
 কেন তবে করিলে সৃজন?  
 এমন কলুষময় মানব জীবন।

৩

জীবনের গৌহ সাধ আকাঙ্ক্ষার নদী,  
 এই শ্মশানের ভগ্নে মিশে যায় যদি।  
 ঐ বৃহদেবের মত,  
 কুটে মিশে অবিরত  
 কি কাজ তাহ'লে প্রভু করিয়া সৃজন।  
 এমন গরল মাখা  
 ছলনা চাতুরি চাকা,  
 এমন কণ্টকময় মানব জীবন।  
 আলোয়ার আলো প্রায়,  
 আঁধারে ডুবাতে হয়,  
 কেন বিধি সৃজিলে এ সারার সুপন?  
 ফোটে ফুল যেরে ফল  
 নদী করে “কল কল”  
 আকাশে স্রবাস্তে রবি বরষে কিরণ।  
 শিশু নাচে, গায় পাখী,  
 পুষ্পের সৌরভ মাখি  
 ধীরে ধীরে বহে গিঁথু বলয় পবন।  
 শ্যামল জনক-কোলে  
 চক্সা দামিনী খেলে,  
 বসুধা কাঁপারে বহে ঝটিকা ভীষণ।  
 সবি কি উদ্দেশ্য হীন,  
 সবি কি অনিত্য কীর্ণ,  
 তোমার এ লীলা খেলা সবি পণ্ডিত?  
 কেন তবে করিলে সৃজন।  
 উদ্দেশ্য বিহীন এই মানব জীবন?

৪

কেন বিধি করিলে সৃজন?  
 এত সন্দের যদি মানব জীবন?  
 এত হিংসা, এত ঘেণ,  
 এত শোক এত ক্রন্দ,  
 এত হাহাকার, এত অশ্রু বরিষণ।

এত সাধ, এত আশা  
এত স্নেহ ভালবাসা  
সকলি কি ছায়াবাদী ? সকলি স্বপন ?  
আহা হা ভগবান,  
কেন এত অনুষ্ঠান,  
কেন এত গ্রহ তারা শশাঙ্ক উপন ?  
কেন এত ফুল ফল,  
কেন রৌদ্র, বৃষ্টি জল  
কেন এত শীত গ্রীষ্ম অনল পবন ।  
উদ্দেশ্য বিহীন যদি মানব জীবন ।

৫

প্রেম নাই, প্রীতি নাই,  
বাগনার তৃপ্তি নাই,  
প্রাণের ভিতরে শুধু অতৃপ্তি ভীষণ ।  
যত পাই বাড়ে আশা  
মিটে না প্রাণের তৃষা  
স্বার্থ স্বার্থ ব'লে শুধু মন উচাটন  
জাতি নাই, ধর্ম নাই,  
স্বর্ণ ব'লে মাখি ছাই,  
ভাবিনে বারেক বিশ্বে কেন আগমন  
নাহি সুখ নাহি শান্তি,  
সবি যেন ভুল ভ্রান্তি,  
পাপ পুণ্য ব'লে কিছু হয় না স্মরণ ।  
বিকারের রোগী প্রায়,  
তুনেও তুনিতে হাস,

উর্দ্ধে বরণের ভড়া ভীষণ গর্জন ।  
কেন বিধি করিলে সৃজন ।  
এমন অশান্তিময় মানব জীবন ?

সন্ন্যাসী বিমূঢ় হৃদে শুনি এ সঙ্গীত  
ফেলিল নিখাস এক ; কৌমুদী-নয়নে  
ঝর ঝর অশ্রু বিন্দু ঝরিতে লাগিল  
উজ্জল মুকুতা প্রায় ; চলিল সন্ন্যাসী  
আশীমিয়া চুঃখিনীরে ; সেই বন-পথে  
কিছু দূর অগ্রসরি দেখিল সন্মুখে  
একটি অশ্বখ বৃক্ষে এক উন্মাদিনী,  
শিরে জটা, হস্ত কাটা সোণার প্রতিমা  
ভয়ে আচ্ছাদিত যেন, নিরখি এ দৃশ্য,  
সন্ন্যাসীর তথ্য প্রায় হৃদয় মন্দিরে  
একটি ভীষণ বজ্র হইল পতিত ।  
বিষাদে অক্ষুট স্বরে কহিল সন্ন্যাসী  
“হা লবঙ্গ ।” সন্ন্যাসীর উদাস নয়নে  
ছুই বিন্দু অশ্রুবাবি পড়িল ঝরিয়া  
অতীতের কত কথা করিয়া স্মরণ ।

## চতুর্থ সর্গ

[ পানিপথ—দুরানী শিবির ]

পানিপথ ; ভারতের সে মহাশ্মশানে  
অসংখ্য শিবির প্রাণী, ঘোবারিকগণ  
ঝারে ঝারে অসি হস্তে ভীষণ দর্শন !  
মোস্তেম সৈনিকগণ প্রহর আননে  
অমিতেছে ইতস্ততঃ, প্রাণের আনন্দ  
উঠেছে কুটিয়া যেন বদন-দর্পণে ।  
এক প্রান্তে রক্ত বর্ণ একটি শিবির  
মনোহর, শীর্ষে তার হুলিছে পবনে  
“অর্ধচন্দ্র” বিখচিত পতাকা সুন্দর ।  
অত্যন্তরে অত্যাচ্ছন্ন সুবর্ণ আসনে  
সমাসীন ইন্দ্র প্রায় মোস্তেম গৌরব  
আমেদ আকালী সাহা, সম্মুখে তাহার  
একটি রক্ত পাত্রে রক্ত বিমণ্ডিত  
ভাণ্ডের \* ছিন্ন মুণ্ড, অদূরে দাঁড়িয়ে  
একটি সশস্ত্র ঘোড়া মলিন বদন ;  
হল হল আঁখি দুটি যেন কোন ঘোর  
মর্ধ্যান্তিক বাতনায় বিবাদিত মন ।  
চারিদিকে অগণিত সেনা, সেনাপতি  
চে’রে আছে এক দৃষ্টে যুবকের পানে ।  
নীরব বীরেন্দ্র বৃন্দ, নীরব শিবির,  
একটি প্রাণীর মুখে নাহি বাক্য শ্রুতি,  
ভাবিয়া এ নীরবতা দেবেস্ত্রের প্রায়  
আকালী স্নেহের স্বরে কহিলা যুবকে  
“মারুবগ, ধন্য তুমি, ধন্য জন্ম তব,  
বড় ভালবাসি আমি তোমার বীরেন্দ্র,  
উজিরের পদে আমি বসিব তোমারে ;

কাবুলে আমার সনে যাইবে কি তুমি ?”  
“আহাপনা” মারুবগ কহিলা বিনয়ে  
“পথের ভিখারী আমি, এত বড় পদ  
শোভে না আমারে, আমি দরিদ্রের বেশে  
যাপিব জীবন মম, ধর্মের লাগিয়া  
ধরেছি অসি, কার্য্য ফুরায়েছে মোর,  
বিশ্বস্ত কাকের বৃন্দ ধর্মের সমরে ।  
কেন আর পাপ রাশি অজীব সংসারে ?  
বেঁচে যদি থাকি যাব মক্কা তীর্থধামে  
—সেই স্থানে, সে পবিত্র কাবার মসজিদে  
জগদীশে কায়মনে করি আরাধনা  
কাবার সে ধূলি-কণা লইয়া মস্তকে  
যাইব মদিনা তীর্থে, নয়ন ভরিয়া  
নিরখিব হজ্জরতের † পবিত্র সমাধি,  
হৃদয়ে স্বর্গীয় ভাব উঠিছে উছলি’ ;  
সংসারের সুখ দুঃখ রহিবে না মনে ।  
রোজার ‡ সে ধূলি-কণা মাখিয়া হৃদয়ে  
লুটাইব এ পরাণ জনমের মত  
হায় সেই সুপবিত্র স্মৃতিকার সনে ।”  
তার পর যাব আমি কার্বালা প্রান্তরে  
নিরখিতে হোসেনের পবিত্র সমাধি,  
সংসারের সাধ আর নাহি মোর মনে ।  
নীরবিলা যুবা, পুন কহিলা দুরাণী  
“কোন্ পুরস্কার তবে চাও বীরবর ?—  
—অর্থ চাও ?—যাও তবে উজিরের কাছে  
সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা পাইবে এখনি ।”

\* সঙ্গাশিব রাও ভাণ্ডার । † হজরত মোহাম্মদ রহুমোবার (দঃ) । ‡ হজরত মোহাম্মদের (দঃ) সমাধি ।

“জাহাপানা” করযোড়ে কহিল। বীরেন্দ্র  
 “সমর ক্ষেত্রের সেই প্রতিজ্ঞার কথা  
 আছে মনে ? রণস্থলে বলেছিলে তুমি  
 যুঝিয়া সম্মুখ যুদ্ধে বীরেন্দ্রের মত  
 ভাওয়ের মুণ্ড অঁনি যে জন তোমারে  
 প্রদানিবে উপহার, চাহিবে সে জন  
 যাহা কিছু, নিরাপত্ত্যে দিবে তাহা তুমি।”  
 “আছে মনে” শ্রিতমুখে কহিল। আকালী  
 “যা চাহিবে তাই দিব প্রতিজ্ঞা আমার  
 হইবে না ব্যর্থ কভু থাকিতে জীবন।  
 নিঃশঙ্কোচে বল তুমি কি চাও বীরেন্দ্র  
 মম কাছে, এখনি তা করিব প্রদান।”  
 উত্তরিল। মার্মুবেগ “বন্দী এতাহিম  
 মৃত প্রায়, কারা মুক্তি প্রার্থনা তাহার  
 তব কাছে, ইহা ভিন্ন নাহি কোন আশা।”  
 “কেন মার্মু ইমামের শত্রু যে প্রধান,  
 কারা মুক্তি তার কেন প্রার্থনা তোমার ?”  
 বলিল। গম্ভীর ভাবে কাবুল-ঈশ্বর।  
 কর যোড়ে মার্মুবেগ বলিল। আবার  
 “সে আজি মুহূর্ত্ত প্রাণ, তার সনে হিংসা  
 ইমাম ধর্ম্মের বিধি নহে জাহাপানা।  
 আজি কিংবা কালি তার মৃত্যু সুনিশ্চিত,  
 বিশেষতঃ সে আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।  
 মত্নাকালে পদ সেবা করিব তাহার  
 এই মম আকিঞ্চন, দেহ এ অমূল্য  
 জাহাপানা, সমর্পিতে বন্দী এতাহিমে  
 মম করে, এ মিনতি চরণে তোমার।”  
 “অবশ্য, প্রার্থনা তব হইবে পূরণ”  
 বলিল। আমেদ সাহা সহাস্ত বদনে।  
 একজন নিমকোটি সৈনিকে ডাকিয়া

কহিল। কাবুল-পতি “যাও ক্ষুদ্র বেগে  
 এতাহিম বন্দী ভাবে যেই কারা গৃহে  
 আছে বন্ধ, বল ধৌরে ধৌবারিকে তার  
 এতাহিমে সমর্পিতে এই যুবা করে।  
 যাও শীঘ্র, জানাওগে এ আদেশ যোর  
 কারাধ্যক্ষে।” আবার সে কাবুল-ঈশ্বর  
 কহিল। স্নেহের স্বরে সে বীর যুবকে  
 “মার্মুবেগ, বল দেখি বধিলে কেমনে  
 এ হৃদ্বর্ষ রাজজোহী দম্মা সদানিবে ?”  
 সসজ্জমে মার্মুবেগ কহিতে লাগিল।  
 “সমগ্র মারাঠা সৈন্য, সেনাপতি সব  
 হইল বিধ্বস্ত যবে এ মহা সংগ্রামে,  
 সদানিবে শূল হস্তে ছুটিতে লাগিল।  
 বিষাদে পশ্চাৎ দিকে, নীরবে পায়ণ  
 ত্যজিয়া সমর ক্ষেত্র প্রবেশিল বনে।  
 হুইজন অখারোহী মোসেম সৈনিক  
 হেরি সে পায়ণে, বেগে ছুটিল পশ্চাতে,  
 নরাদম উত্তরেতে ভীম শূলাঘাতে  
 বধিল যুঝিয়া সেই নিশ্চরন কাননে।  
 আমিও বিহ্বাত বেগে পশ্চাতে তাহার  
 ছুটিলাম বন মধ্যে করিয়া প্রবেশ  
 পাইলু তাহারে, পাপী আক্রমিল যোরে  
 ভীষণ শার্দূল প্রায়, আমিও তাহারে  
 আক্রমিলু পূর্ণ বলে, কপাণে কপাণে  
 বধিল ভীষণ যুদ্ধ, বিহ্বাতের মত  
 অসিগুলি মুহূর্ত্তে ঘুরিতে লাগিল  
 চারিদিকে অগ্নি-কণা করিয়া বর্ষণ।  
 বহুকণ বীর-মদে মাতিয়া পায়ণ  
 করিল ভীষণ যুদ্ধ, ঘাত প্রতি ঘাতে  
 মৃত্যুক কপাণ গুলি খণ্ড খণ্ড হয়ে

পড়িল হিটিয়া তুমি, সে রণ-কৌশল  
 কেমনে বণিব আমি হে বীর কেশরী ।  
 কিছুতেই পরাজিতে নারিনু পায়ণে  
 স্মৃতিস্ত কপাণাঘাতে উভয়েরি দেহ  
 হইল বিকৃত, রক্ত ঝরিতে লাগিল  
 শত ধারে, ক্রোধভরে কপাণে কপাণে  
 যুঝিলাম বহুকণ, পাণিষ্ঠের অস্ত্র  
 ভেদি চন্দ্র, হস্তে মম লাগিল সজোরে ।  
 সে যজ্ঞণা সে বেদনা সহিতে নারিয়া  
 হইল উদ্ভ্রান্ত প্রায়, “আল্লা আল্লা” বলি  
 কিন্তু হস্তে নারিয়া সে বিপদ ভঞ্জে  
 মারিলু স্মৃতিস্ত অসি, বিদ্রোহের মত  
 চমকিয়া সেই অসি, নামিল যখন,  
 পায়ণের হির সুও পড়িল ভূতলে  
 মুহূর্ত্তেকে, যত্ন ভরে লইলু তুলিয়া  
 শূলাগ্রে, দিয়াছি শূর আজি তা’ তোমারে ।  
 বহু পূর্বে এ প্রতিজ্ঞা করেছিলু আমি  
 হে বীর কেশরী, যুঝি সম্মুখ সমরে  
 সদাশিব বিশ্বনাথে শমন-সদনে  
 প্রেরিব, অথবা যুদ্ধে ত্যজিব জীবন ।  
 জাঁহাপানা আমার সে প্রতিজ্ঞা ভীষণ

পূরিয়াছে এত দিনে ।—সম্মুখ সমরে  
 ছুইটি ভীষণ শর মারিয়া সে দিন  
 বিশ্বনাথ-তালে আমি বধিয়াছি তারে  
 রণস্থলে, পুনঃ এই সম্মুখ সদাশিবে  
 করিয়াছি সঙ্গী তার জনমের মত ।  
 ‘যথা ধর্ম তথা জয়’ চির সত্য ভবে ;  
 বিধাতার রাজ্যে কেহ পাপ অনুষ্ঠান  
 করে যদি, বিধাতার সূত্র সুবিচারে  
 অবশ্যই সেই জন হইবে দণ্ডিত ।  
 মারাঠা পিশাচ গণ বৃথা অহঙ্কারে  
 ক্ষীণ হয়ে, ভারতীয় মোস্লেম সকলে,—  
 —মোস্লেম রুমণী বৃন্দে ঘোর অত্যাচারে  
 করেছিল নির্ধ্যাতিত দিবস রজনী ।  
 আজি তারা প্রতিকূল পেয়েছে তাহার ;  
 কোথা র’ল সেই দণ্ড ? বিধাতার সূত্র  
 সুবিচারে আজি তারা হইল দণ্ডিত  
 চির তরে, প্রগল্ভতা কম জাঁহাপানা,  
 যাই’এবে, দেখি যেয়ে কারা গৃহ মাঝে  
 হতভাগ্য এব্রাহিম আছে কি জীবিত ।”  
 সমস্ত্রমে প্রণমিয়া ছুরাণী সাহারে  
 চলি গেলা মারুবগ কারাগৃহ পানে ।

## পঞ্চম সর্গ

### কারাগৃহ

[ পানিপথ ; মোস্লেম শিবির ]

তৃতীয় প্রহর নিশি ; নীরব ধরনী ;  
নাহি জাগে জীব জন্তু ; না বহে পবন ;  
স্তব্ধ প্রায় উদাসিনী প্রকৃতি সুন্দরী  
নীরবে চাহিয়া আছে মেলিয়া নয়ন ।  
স্পন্দহীন পানিপথ, প্রস্তরের প্রায়  
তরু রাজি ; জয় দৃশ্য সৈনিক সকল  
নিজার কোমল কোড়ে পেঁতেছে আসন ।  
মোস্লেমের অগণিত শিবির নিচয়  
শ্রেণী মত কি সুন্দর ; দ্বৌবারিক দল  
অসি হস্তে দ্বারে দ্বারে ভীষণ দর্শন ।  
ছাউনির এক প্রান্তে কারা গৃহ মাঝে  
এব্রাহিম যুত প্রায়,—ঘোর অচেতন ;  
সমস্ত শরীর তার ক্ষত অশ্রাবাতে ।  
যন্ত্রণায় বীরবর করিতেছে ঘোর  
আর্তনাদ, পদ প্রান্তে জোহরা বেগম  
সজল নয়নে চেয়ে আছে তার পানে ।  
থেকে থেকে অশ্রুজল মুছিছে অকলে  
অভাগিনী, ভয় প্রায় হৃদয়ে তাহার  
বহিছে তুমুল ঝড়, পড়িতেছে মনে  
অতীতের কত কথা—বিগত জীবন ।  
পড়িতেছে মনে সেই কৈশোর সময়ে  
প্রবীণ সন্ন্যাসী এক দীর্ঘ জটাধারী  
আনার কলির সেই নিছত নিকুঞ্জে  
বসেছিল। তারে যেই ভবিষ্যত-বানী,  
আজি তাহা বর্ণে বর্ণে কলিয়াছে হার ।

হুঃখিনী আঁচলে পুনঃ মুছিলা নয়ন ।

এব্রাহিম সংজ্ঞা লভি কিছুক্ষণ পরে  
সুধাইলা জোহরারে মধুর বচনে  
“জোহরা, কেমনে তুমি আসিলে এখানে ?”  
উত্তরিল। স্নান মুখে জোহরা বেগম  
“সম্মুখ সমরে আমি বধি সদাশিবে  
দিয়াছিলাম মৃত এনে হুসানী সাহারে,  
তাই তিনি দয়া ক’রে’হে প্রাণ বল্লভ  
দিয়াছেন মুক্তি তব, কিন্তু ভাগ্য-দোষে  
বুধা সব, বুঝি হায় তোমারে লইয়া  
নারিব যাঁহিতে নাথ স্বদেশে আবার ।  
তোমার এ দশা দেখে বুক কেঁটে যায়  
প্রাণ নাথ । একে একে পড়িতেছে মনে  
অতীতের বহু কথা, উভয়ে সানন্দে  
আনার কলির সেই পুষ্পিত কাননে  
কত সুখে কাটিয়াছি শৈশব জীবন  
লাহোরে দিল্লীতে আর সাহরাণপুরে  
কত সুখে তব সনে করেছি অমণ !  
তার পর ?—তার পর বিবাহ-বন্ধনে  
বাধিলে আমারে তুমি, অরিলে সে কথা  
প্রাণের ভিতরে বহে ঝটিকা ভীষণ ।”  
স্বামী হৃদিশা হেরি জোহরা সুন্দরী  
বিকারের রোগী প্রায় কহিতে লাগিল।  
অতীতের বহু কথা প্রলাপের মত ।



“আছে মনে ?—কুল-সাজে হইয়া সজ্জিত  
 একদিন তব সনে ডাকের মন্দিরে  
 ছিন্ন বসি, তুমি মোরে ডাকিয়া নিকটে  
 মোমুতাজ ও সাজাহান সমাধি যুগল  
 দেখাইয়া ব'লেছিলে মধুর বচনে  
 কেমন পবিত্র প্রেম । জীবনে মরণে  
 এ প্রেমে বিচ্ছেদ নাই, মরণের পরে  
 এই দেখ সাজাহান আছে সুমাইয়া  
 কত সুখে যদি পাশে লইয়া মোমুতাজে ।  
 আমিও এমনি প্রেম লজিলে বারেক  
 এখনি মরিতে পারি, যদি মম হৃদে  
 আমার সে কুল-রাশী থাকে সুমাইয়া  
 এই ভাবে দিবা-নিশি ।” বলিয়া তখনি  
 স্তম্ভীকৃত কটাক-বাণ করিলা বর্ষণ  
 মম পানে, কি করিব আমি অভাগিনী  
 লাজে প্রেমে কেন জানি মম-যুগ্ম প্রায়  
 হাসিয়া ফেলিলু নাথ তব পানে চাহি ।  
 তুমিও তখনি মোরে ধরিয়া সজোর  
 করিলে অগ্নরে মোর প্রগাঢ় চুম্বন ।  
 লাজে ভয়ে আমি নাথ, জড়সড় হ'য়ে  
 করিলু তোমার বকে আশ্রয় সমর্পণ ।  
 আরো এক দিন নাথ পড়িতেছে মনে  
 পরেছিলু আমি এক বস্ত্র মনোহর  
 রঞ্জিত কুমুদ কুলে, গৌর বর্ণে মোর  
 লাপি সে বস্ত্রের দাগ, ইয়েছিল নাথ  
 কপোল এ দেহ মোর রঞ্জিত সুন্দর  
 বর্ণ-রাগে, তুমি মোরে করিয়া আদর  
 ডেকেছিলে গিন্টি করা ?’ তখনো বালিকা  
 আমি নাথ, কুটিলতা নাহি ছিল মনে,  
 সরমে সরলভাবে করিলু উত্তর

“কি ?” তখনি তুমি উচ্চ হাসি হেঁসে নাথ  
 করিলে কপোলে মোর স্নেহের চুম্বন ।  
 আমি নাথ লাজে ভয়ে রহিলু পাড়ারে  
 তব পাশে, প্রভুর মূর্তি যেমন ?  
 আজি তুমি কোন্ প্রাণে চ'লেছ ছাড়িয়া  
 হৃৎখিনীয়ে, সে কথা কি হয়না স্মরণ ?  
 হায় সেই যৌবনের প্রথম প্রভাতে  
 প্রেমের মলয় বান্ধু বহিল মধুরে  
 যদি মাঝে—কামনার পূর্ণ শশধর  
 ছড়াইল রাশি রাশি বিমল জ্যোত্স্না  
 চারি ধারে এ প্রাণের পরতে পরতে ।  
 হইলাম আশ্রহারা, উঠিল কুটিয়া  
 স্মৃতি কুমুদ পুঞ্জ হৃদয়-নিকুঞ্জে  
 বিতরি সৌরভ-সুখা এ মরু জীবনে ।  
 নিতি নিতি নব সুখে, নব প্রেমালোকে  
 প্রাণনাথ মুগ্ধপ্রাণে কাটিলু জীবন  
 তব সনে, তিন বর্ষ হইল অতীত  
 এই ভাবে, নাহি জানি কোন্ মহাপাপে  
 সে সুখে পড়িল বাজ, অদৃষ্টের দোষে  
 অবস্থার স্রোতে পড়ি গেলাম ভাসিয়া  
 হুই দিকে হুই জন সংসার-সাগরে ।  
 অভাগীর ভাগ্য দোষে গেলে চলি তুমি  
 দাক্ষিণাত্যে, ভেঙ্গে গেল এ যদি আমার ;  
 হিন্দুর দাসত্ব তুমি করিয়া গ্রহণ  
 ভুলে গেলে এ দাসীরে জনমের মত ।  
 সন্ন্যাসীর অভিষেক করিল তখন  
 বর্ষে বর্ষে, প্রাণনাথ আছে কি স্মরণ  
 শৈশবের সেই কথা ? ইন্সান বিরুদ্ধে  
 ধরিয়া ভীষণ অস্ত্র করিলে যে পাণ  
 প্রাণনাথ, প্রকাজিতে শোণিতে তা' মোর

পুরুষের বেশে হায় হইয়া সজ্জিত  
ধরিলু এ অস্ত্র আমি ইস্রায়েলের পক্ষে  
রণস্থলে, ভেবেছিহু কলঙ্ক তোমার  
আমার জীবন দিয়া করিব মোচন,  
অথবা এ যুদ্ধে যদি জয়ী হই মোরা,  
হুরানী সাহার কাঁছে করিয়া প্রার্থনা  
তোমারে লইব চাহি, করাইয়া কমা  
তোমার এ অপরাধ, সে আশা আমার  
এতদিনে ডুবে গেল অতল সাগরে।  
আমারে একাকী হায় ফেলি এ নরকে  
তুমিত চলিলে নাথ এ জন্মের তরে।  
হুঃখিনী আমার মত কে আছে জগতে  
প্রাণনাথ ? যেই কষ্টে সারাটি জীবন  
যাপিয়াছি, যে অনল প্রাণের ভিতরে  
অলিতেছে নিশিদিন, বিচ্ছেদে তোমার  
যে যন্ত্রণা ভুগিতেছি অশনে বসনে,  
আজি তা দ্বিগুণ হ'ল অদৃষ্টের দোষে।  
কতদিন কতবার চরণে তোমার  
ধরিয়া কাতর ভাবে কত অশ্রুজল  
করেছিহু, ফেলেছিহু কত অশ্রুজল  
তোমার চরণপ্রান্তে, স্মরিলে সে কথা  
হৃদয় কাটিয়া যায়, অদৃষ্টের দোষে  
হ'য়েছিহু উপেক্ষিত। চরণে তোমার।”  
নীরবেঁচাচলে চকু মুছিয়া হুঃখিনী।  
এব্রাহিম স্নেহভরে এসারিয়া কর  
ধরিল। সে হুঃখিনীরে, কহিল। কাতরে  
“মরিতে একটু হুঃখ নাহি এ হৃদয়ে,  
যুবির। বীরের মত সন্মুখ সমরে  
মরিহু, সহস্র ধন্য দেই বিধাতারে  
এই জন্ত, কিন্তু এক বিবাদের হারা

হৃদয়ে লইয়া গেহু, এই হুঃখ মনে।  
মোয়েস সন্তান হ'য়ে মোয়েস বিপক্ষে  
ধরিয়া ভীষণ অসি অসংখ্য মোয়েসে  
বধিয়াছি, কণতরে ভাবিনি হৃদয়ে  
পাপ ইথে, সেই হুঃখে হৃদয় আমার  
বাইছে কাটিয়া গিয়ে, অধর্মের তরে  
যদি আজি শত্রুবন্দে করিয়া সাহার  
মরিতাম রণস্থলে, হৃদয়ে আমার  
বহিত আনন্দ-ধারা, অর্গ মুখ গিয়ে  
ভুক্তিতাম আজি এই অস্তিম সময়ে।  
নরকের কীট আমি, ত্রিদিবে আমার  
নাহি স্থান, প্রাণে মোর যাতনা ভীষণ।”  
রুদ্ধ হ'ল কণ্ঠ, অশ্রু কপোল বহিয়া  
পড়িল গড়ায়ে ধীরে শব্দ। উপাধানে।  
কিছুক্ষণ পরে শূর লতিয়া বিজ্ঞান  
বলিতে লাগিল। পুনঃ অতি ক্ষীণ স্বরে  
“জোহরা। চলিহু আমি এ জন্মের মত  
ছেঁড়ে তোমা, ব'ল সব মোয়েস আত্মারে  
পবিত্র ইস্রাম ধর্ম অটল বিশ্বাস  
ছিল মম, কিন্তু সেই ধর্মের বিধান,—  
হারাম খাইতে নাই, কাফেরের অঙ্গে  
এ দেহ বর্জিত মম, শোধেছি সে অণু  
হৃদয়ের রক্ত দিবে, নিমক হারাম  
নাহি আমি, ধর্ম সাকী, তারা যেন মোরে  
কমা করে,—এই ভিক্ষা তাদের চরণে।  
আমার আশ্রয় জন্ত করিও প্রার্থনা  
ঈশ কাছে, আমি পাপী ঘোর নরাধম ;  
আর কি বলিব গিয়ে ? কথা বলিবার  
নাহি শক্তি, বাস যেন রুদ্ধ করে এল।”  
মুহূর্ত্তেকে এব্রাহিম লইল। টানিয়া।

জোহরা বেগমে কত বকের উপরে ।  
 কিছুক্ষণ পরে শূর বলিল। আবার  
 “তোমার প্রেমের ঋণ নারিছ শোধিতে  
 প্রাণময়ি, কি করিব উদরার তরে  
 পরের দাসত্ব ত্রুত করিয়া। এহণ  
 উপেক্ষা করেছি তোমা, হায় প্রিয়তমে  
 তোমার পবিত্র প্রেম অতুল জগতে ;  
 স্বর্গীয় জিনিস তাকা, এ পাপ জগতে  
 সে প্রেমের প্রতিদান পাঠবে কেমনে ?  
 ক্ষমা কর অভাগারে, তুমি না ক্ষমিলে  
 নরকেও স্থান মোর হবে না নিশ্চয় ।  
 তোমার পবিত্র প্রেম স্মরিলে হৃদয়ে  
 জীবনের গ্রন্থি গুলি ছিঁড়ে যায় মোর ;  
 পাপী আমি, কণ্ড প্রিয়ে ক্ষমবে না তুমি ?  
 বিধাতার অনুগ্রহে স্বর্গে যাই যদি  
 সেই স্থানে—হায় সেই সুপবিত্র ধামে  
 তোমাতে হৃদয়ে ধরি এ প্রাণ তরিয়া  
 হেরিব তোমার অই সুধেন্দু বদন ।  
 তোমাতে হৃদয়ে ধরি মিটাইব প্রিয়ে  
 মনের সমস্ত দুঃখ যাতনা ভীষণ ।  
 আর ত পারিনে প্রিয়ে কে জানি সজোরে  
 আমার এ বক্ষ কণ্ঠ ধরিল চাপিয়া,  
 কি বিকট মৃতি, প্রাণ কাঁপিছে আমার  
 আতঙ্কে—চলিছ হায় ক্ষমিও আমারে  
 জোহরা, অন্নের মত বিদায় এ-খ-ন !”  
 রক্ত হ’ল কণ্ঠ, বাক্য সরিল না মুখে,  
 সংজ্ঞা শূন্য ভাবে শূর ধরিল জড়ায়ে  
 জোহরা বেগমে, রক্ত ছুটিল সবধে  
 কত বকে, অভাগিনী গুলিলা তখন  
 এতাহিম প্রতি খালে স্বর্গের নাম

জপিতেছে, ক্রমে ক্রমে অবস্থা তাহার  
 ভীষণ—ভীষণতর, দেখিতে দেখিতে  
 নেত্র যুগ উদ্ধ দিকে উঠিল তখন ।  
 নীতল কপোল বেয়ে ছই অশ্রুধারা  
 পড়িল গড়ায়ে যেন পুত মন্দাকিনী ।  
 ত্যজিয়া সংসার মায়া আত্মীয় স্বজন  
 অনন্তে মিশিয়া গেল প্রাণ বায়ু তার  
 এ দেহ-পিঞ্জর ছাড়ি, হুঃখিনী জোহরা  
 উঠিলা কাঁদিয়া ঘোর হাহাকার করি  
 উঠেছরে, ছিন্ন হৃদে কহিলা চিৎকারি  
 “প্রাণেশ্বর । এ দাসীকে কাহার নিকটে  
 রেখে গেল ?—এ জগতে কে আছে আমার ?  
 কে মোরে আশ্রয় দিবে ? বিপদে পড়িয়া  
 কাঁদিলে, এ আশি-জল কে দিবে মুছায়ে ?  
 তোমার বিচ্ছেদ-বহ্নি তিলাছ এখন  
 সহিতে নারিব আমি, জীবন আমার  
 দুর্ব্বহ, প্রাণের গ্রন্থি গিয়াছে ছিঁড়িয়া ।  
 চির অভাগিনী আমি, জানিনে জীবনে  
 সুখ কি ? তোমার প্রেমে ছিন্ন আত্মহারী ;  
 তোমারি মঙ্গল আশে জনমের মত  
 জীবনের সুখ শাস্তি ত্যজিয়া সকল  
 পুরুষের বেশে অসি করিয়া সহায়  
 বনে বনে মাঠে মাঠে ভূধরে কন্দরে  
 রণস্থলে যাপিরাছি এ দীর্ঘ জীবন ।  
 তুমি মোর এক মাত্র ছিলে ঐব তার ।  
 এ নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন হৃদয় গগনে ।—  
 —তুমিও চলিয়া গেল ; কোন্ আশে আর  
 এ দাসী এ ধরাধামে থাকিবে বাঁচিয়া ?  
 আরনা, সকল সাধ মিটেছে আমার  
 সঙ্গে নেও প্রাণনাথ তব এ দাসীকে ।”

মুহূর্তে চিংকার দিয়ে জোহরা বেগম  
পড়িলা ঢলিয়া তার বন্ধের উপরে ।  
হঃখিনীর প্রাণ বায়ু অনন্ত আকাশে  
ডুখনি উড়িয়া গেল, দেহ খানি তার  
রহিল পড়িয়া স্বর্ণ-প্রতিমার প্রায়  
গত প্রাণ স্বামীর সে বন্ধের উপরে ।

না কুটিতে হয় এই সোনার মুকুল  
অকালে কালের গ্রাসে পড়িল ঝরিয়া ।  
এহেন কোমল পুষ্পে — সুবর্ণ-কোরকে  
কেন পশেছিল কীট ? — হা দারুণ বিধি ।  
এ বিধি তোমার যদি, কেন গড়ে'ছিল  
এ কুমুম ? যদি তাহা দেবতার কাজে\*  
না লাগিল, — হয় তারে কি ফল গড়িয়া  
হেন কালে গুরে — অতিদূরে প্রান্তরের  
এক প্রান্তে, ক্ষীণপ্রাণা সরস্বতী তীরে

\* স্বামীর সংসারে ।

ভাসিয়া উঠিল এক সঙ্গীত লহরী  
বামা কণ্ঠে, কঁপে কঁপে করুণ উচ্চ্বাসে

কত যে জনম কাটিয়া গেল,  
তবু না হইল দেখা ।  
স্বপনের মত মনে পড়ে মোর  
স্মৃতির মলিন রেখা ।

কোন্ জনমের প্রিয় সে আমার,  
ভুলিতে পারিনে মুখানি তাহার,  
প্রাণ ফে'টে মোর বহে অশ্রুধার  
প্রাণের পরতে লেখা ।  
কত যে জনম কাটিয়ে গেল,  
তবু না হইল দেখা ।

জনমে জনমে পিছে পিছে তার,  
আগি যাই আমি কত বার বাব,  
দেখা ত হল না কোন পথে আর,  
কেমনে খানিক এবা ।  
কত যে জনম কাটিয়ে গেল,  
তবু না হইল দেখা ।

## ষষ্ঠ সর্গ

### পানিপথ ; কুলমহামদের গোরস্থান

[ সরস্বতী নদী তীর, পুষ্পবন, আতারা, সেলিনা, এব্রাহিম কার্দি ও জোহরা বেগমের সমাধি মন্দির ]

বহিছে বসন্ত-বায়ু বুরু বুরু বুরু  
কাঁপাইয়া কচি কচি পল্লব সুন্দর ।  
ফুটিয়াছে কুল কুল গুঞ্জরিছে অলি,  
কঙ্কারিছে চারিদিকে বিহগ নিকর ।  
বসন্তের আগমনে সাজিয়াছে ধরা,  
নবীন বৌবন তার উঠিছে উছ'লে ।  
শুভ প্রায় তরু রাজি লতা মনোহরা  
সাজিয়াছে নানাজাতি সুবাসিত ফুলে ।  
মালতী মতিয়া ঘুই অলির সোহাগে  
সরমে সরমে মরি আঁখি নাহি মেলে,  
সমীরের চুমো খে'য়ে নব বধু প্রায় ।  
মুখখানি চাকিতেছে পাতার অঞ্চলে ;  
চারিদিকে কত শোভা—প্রেমের ফোয়ারা ।  
কে জানি নন্দনে তুলে এ'নেছে ভূতলে ;  
গাইছে কোকিল-বধু মাতাইয়া ধরা,  
সহকার সাজিয়াছে নবীন মুকুলে ।

সরস্বতী নদী তীরে মধু কুঞ্জ বনে  
অসংখ্য সমাধি, বহু মোস্তফা-সেনানী  
পানিপথ মহাযুদ্ধে প্রাণের শোণিতে  
সাধিয়া ইসলাম-হিত,—জাতীয় গৌরব,  
নিজিত জগ্নের মত এ কুঞ্জ কাননে ।  
চারিদিকে খাউ গাছ তমাল বকুল  
শোভিতেছে কি সুন্দর, মধ্যে সরোবর,  
তিন পার্শ্বে অতি সুজী মসজিদেদি মত

তিনটি সমাধি গৃহ, চারিদিকে তার  
অগণ্য পুষ্পিত তরু, কুসুমিতা লতা  
শোভিতেছে অশীমত নয়ন-রঞ্জন ।  
মল্লিকা মালতী চাঁপা গোলাপ চামেলী  
নানাজাতি পুষ্পগুলি রয়েছে ফুটিয়া  
বৃন্তে বৃন্তে ছড়াইয়া সৌরভ মাধুরী ।  
সরসীর পূর্বদিকে সমাধি মন্দিরে  
শায়িত জগ্নের মত চির প্রেমময়ী  
সুজার হৃদয়-রাণী সেলিনা সুন্দরী ।  
সরসী পশ্চিমে শুভ্র সমাধি মন্দিরে  
এব্রাহিম কার্দি, পার্শ্বে জোহরা বেগম  
বীৰ্য্যময়ী, পতি সনে নিজিত গভীর ।—  
—ছইটি কুসুম যেন আলোকিয়া ধরা,  
ছিল কঠে শোভাময়ী প্রকৃতি রাণীর ।  
সরসী দক্ষিণে অন্য সমাধি মন্দির  
বেষ্টিত লতিকা জালে—একুটিত ফুলে ।  
মন্দিরের অভ্যন্তরে সমাধি শয্যায়  
শায়িত জগ্নের মত বীরেন্দ্র কেশরী  
আতারা, বিক্রমে যার কাঁপিত ধরনী ।

বসন্ত পূর্ণিমা নিশি, চন্ড্রের কিরণে  
স্নাত এ নিকুঞ্জ বন, স্নাত তরু রাজি,  
মৃদু মৃদু বহিতেছে নৈশ সমীরণ ।  
কর্ম ক্রান্ত জীবগণ লভিতে বিজ্ঞান  
নিদ্রার কোমল কোড়ে পে'তেছে আসন

অমুপম শোভাময়ী প্রকৃতি সুন্দরী  
কি এক শাস্তির রাজ্য করে'ছ স্থাপন ।  
কুটম্ব কোমলী রাশি প'ড়েছে ছড়ারে  
পত্রে পত্রে ফুলে ফুলে তটিনীর জলে  
ধরণীর চারু বক্রে শোভা অমুপম ।

এস গো করনে দেবি এ'স ধীরে ধীরে  
সম্বর্পনে, এ'স এই নিকুঞ্জ কাননে,  
অই হের সুবিমল চন্দ্রের কিরণে  
একটি বালিকা যেন স্থিরা সৌদামিনী,  
গৈরিক বসন পরা, কণ্ঠে ফুল-মালা,  
সাজিয়াছে কি সুন্দর যৌবনে যোগিনী ।  
করনে লো, বল সখি এ ঘোর নিশীথে  
কে এ বালিকা?—এ কি কোন দেবতা-নন্দিনী?  
কিংবা কোন পরী-কন্যা? সৌন্দর্য্য জগতে  
এ যে দেখি প্রাণময়ী সোণার নলিনী ।  
অথবা কি ঋষি-কন্যা পথ ভ্রাস্ত হ'য়ে  
এ ঘোর নিশীথে আজি এসেছে এখানে?  
না, না, না, করনে আমি চিনেছি ইহারে  
এ যে বহু পরিচিতা হিরণ হৃঃখিনী ।  
অভাগিনী ধীরে ধীরে ভ্রমি ফুল-বনে  
সুগন্ধি কুসুম বহু করিলা চয়ন ।  
উপরে সৌন্দর্য্য তার হৃদয় মাতানো,  
অন্তরে অনল-কুণ্ড সজল নয়ন ।  
ধীরে ধীরে অভাগিনী মন্দিরের পানে  
চলিলা সঙ্গীত করে ভাসা'য়ে গগন

জীবন ত শেষ হ'ল

সে ত আর আসিল না

বালিকার কণ্ঠস্বরে উঠিল কুটিয়া

অমৃতের উৎস সেই তটিনী মৈকটে ।  
নীরব ধরণী তল, নীরব তটিনী,  
সমীরের ছলে যেন শর শর করি  
কেলিলা নিখাস দীর্ঘ প্রকৃতি যোগিনী ।  
তরঙ্গে তরঙ্গে স্বর উঠিয়া নামিয়া  
কি যে এক মাদকতা দিলত ছড়াইয়া  
আকাশ ভরিয়া গেল সে মধুর গানে ।

১

জীবন ত শেষ হ'ল  
সে ত আর আসিল না ।  
মালা গাঁথা বুধা হ'ল  
সে ত ভাল বাসিল না ।  
সারাটি জীবন ভরে  
গেঁথেছি কত মালা ।  
আশা ছিল এক দিন  
দিব তারে প্রেম-ভালা ।  
সে আশা বিফল হল,  
সে ত মালা লইল না ।  
জীবন ত শেষ হ'ল,  
সে ত আর আসিল না ।

২

কত নিশি কত দিন  
এই ভাবে কেটে গেল ।  
যার আশে বসে আছি  
সে ত আর নাহি এল ।  
পাষাণ হৃদয় তার,  
সে ত প্রেম বুঝিল না ।  
চরণে দলিয়া গেল,  
ভবু ভাল বাসিল না ।  
সারাটি জীবন মোর  
কেটে গেল হা হতাশে  
সে ত আর আসিল না—

—মালা গাঁপি বার আশে ?



৩

বাগার সে কুল গুলি  
 একে একে করে পল।  
 স্মৃতি টুকু হার হার  
 শুধু মোর হৃদে বল।  
 নিরাশা ব্যথিত প্রাণ  
 অশ্রু নীরে সদা ভাসি।  
 সে করিল প্রত্যাখ্যান  
 আমি যারে ভালবাসি ?  
 আমার এ দুঃখ আলা  
 কেউ ত যে বুঝিল না।  
 জীবন ত শেষ হ'ল  
 সে ত আর আসিল না।

৪

সেই স্মৃতি টুকু হার  
 ল'য়ে আমি হৃদি পরে।  
 স্বপ্না ফুল তুলে নিয়ে  
 কেঁদেছি জীবন ভ'রে।  
 আমার সে শোক দুঃখ  
 আজো হয় বুটিল না।  
 কত সাধিনাম তারে  
 সেত ভাল বাসিল না।  
 তারি প্রতীক্ষায় মোর  
 কেটে গেল এ জীবন  
 সে ত আর আসিল না।  
 কঠিন তাহার মন।

সহসা বকুল শাখে "কুহু কুহু কুহু"  
 কুহরিল পিক বধু, নৈশ সমীরণ  
 সুর সুর সঞ্চারিল কাঁপাইয়া ধীরে  
 নব কুসুমিতা লতা কানন বঙ্গরী।  
 চুপিয়া মোহাগ ভরে নব মুকুলিত  
 পুষ্প-কলি, সুশ্রামল মাধবী-মঞ্জরী।  
 বালিকা বিবর হৃদে গাইতে লাগিল।

সে যদি না আসে পুনঃ  
 কি আর করিব আমি।

জীবনে বরণে হার

সে মোর প্রাণের স্বামী।  
 তারি কথা মনে ক'রে  
 নিঃস্বপ্ন গরাধি তুমে।  
 কত যুগ যুগান্তর  
 রহিব পড়িয়া বুঝে ?  
 সে যদি বারেক এসে  
 করে অশ্রু বরিষণ।  
 জীবন লভিয়া আমি  
 দিব তারে আলিঙ্গন।

সমাপি সঙ্গীত বালা মলিন বদনে  
 প্রবেশিলা আত্মার সমাধি মন্দিরে।  
 নিরখিলে এ সমাধি মুহূর্তের ভরে  
 অতীতের কত স্মৃতি জে'গে উঠে প্রাণে।  
 মন্দিরের অভ্যন্তরে ভিত্তির উপরে  
 অগণিত পুষ্প রাশি রয়েছে পড়িয়া  
 ইতস্ততঃ ; মধ্যস্থলে প্রস্তর-সমাধি  
 সুসজ্জিত নানা জাতি কুসুমের হারে।  
 কুটুম্ব কুসুম গুচ্ছ স্তবকে স্তবকে  
 রয়েছে পড়িয়া সেই সমাধির পরে।  
 এক পার্শ্বে দীপাধারে কাঁপিয়া কাঁপিয়া  
 আলিছে প্রদীপ এক, হিরণ ছাঁখিনী  
 সুগন্ধি কুসুম গুলি বাছিয়া বাছিয়া  
 সাজাইলা আত্মার সমাধি যতনে।  
 বিমল চন্দ্রমালোকে, ফুলের সৌরভে  
 বসন্তের মধুমাখা স্নিগ্ধ সমীরণে  
 কি যে এক সঙ্করণ সৌন্দর্য্য মহান্  
 কুটিয়া উঠিল সেই সমাধি ভবনে।  
 হিরণের ভগ্ন প্রাণে নীরবে নীরবে  
 বহিল ভীষণ কড়, অনন্ত হৃদয়ে  
 গাইলা বালিকা পুনঃ সঙ্করণ করে

কত নিশি কত দিন  
এই ভাবে কে'টে গেল ।  
যার আশে বসে আছি  
সে ত আর নাহি এল ।  
পাষণ ছদ্ম তার  
সে ত প্রেম বুঝিল না ।  
চরণে দলিয়া গেল  
তবু ভাল বাসিল না ।

হুঃখিনীর নেত্র কোণে ছুই বিন্দু অজ্ঞ  
পড়িল গড়া'য়ে, বালা গাইলা আবার

সারাটি জীবন মোর  
কে'টে গেল হা হতাশে  
সে ত আর আসিল না  
মালা গাঁধি যার আশে ?

অভাগিনী বহুক্ষণ কাঁদিল নীরবে ।  
অতীতের কত স্মৃতি জাগিল তাহার  
হৃদি মাঝে, এক দৃষ্টে হেরিয়া সমাধি  
কিছুক্ষণ, দীর্ঘশ্বাস ফেলিল নীরবে ।  
ধীরে ধীরে আঁখি ছুটি মুছিয়া অকলে  
আবার গাইলা বালা গভীর বিষাদে ।

তারি কথা মনে ক'রে  
নির্জ্ঞান সমাধি ভূমে ।  
কত যুগ যুগান্তর  
রহিব পড়িয়া ধূমে ।

শেষ না হইতে গীত হুঃখিনী হিরণ  
হাট ফেল্ হয়ে হায় মুহূর্তের মাঝে  
ঢলিয়া পড়িল সেই সমাধির বুকে ।  
ভেঙ্গে গেল স্বপ্ন তার—কুরাইল সব ;  
পাখী গুলি কাঁদিয়া উঠিল দিকে দিকে ।

হেন কালে কুঞ্জ হতে শেফালী বকুল  
অসংখ্য স্মৃতি গুল্ম করিয়া চরন  
আসিল ছুটিয়া সেই মন্দির ভিতরে,  
অদূরে সমাধি বক্ষে করিল দর্শন  
হুঃখিনী হিরণ বালা এলো খেলো বেশে  
সংসারের সূঁচ হুঃখ শ্রীতি ভালবাসা  
ভেয়াগিয়া চিরতরে হ'য়েছে নিষিদ্ধ,—  
—সোণার প্রতিমা যেন ভূতলে লুপ্ত ।  
অথবা কুমুম গুচ্ছ সমাধির বুকে ।  
নিরখি এ শোক-দৃশ্য শেফালী বকুল  
উন্মাদিনী প্রায় হায় সজল নয়নে  
'হা হিরণ—হা হিরণ' বলি উঠেছরে  
কাঁদিতে লাগিল সেই নির্জন কাননে ।  
শ্মশানের উচ্ছ্বল তপ্ত নৈশ বায়ু  
“হা হিরণ—হা হিরণ” বলিয়া বিষাদে  
কাঁদিয়া বহিয়া গেল সে নৈশ গগনে ।

কত বর্ষ কত যুগ হইয়াছে গত,  
আজিও প্রকৃতি দেবী প্রদোষ প্রভাতে  
গাইছে সে শোক-গাথা বিহগ কুঞ্জে,  
কাঁদিয়ে নীহার ছলে গভীর নিশীথে  
কি বসন্তে কি শরতে আকুলিত মনে ।  
রাখাল বালক বৃন্দ জাগারে সে স্মৃতি  
আজিও গাইছে হায় সে মহাশ্মশানে ।

“তার কথা মনে ক'রে  
নির্জ্ঞান সমাধি ভূমে ।  
কত যুগ যুগান্তর  
রহিব পড়িয়া ধূমে” ?

## মণ্ডম সঙ্গ

### বিশ্বনাথের সন্ধান

[ পানিপথ ; সরস্বতী নদী তীর, যোগিনী মূর্তি ]

শরৎের শান্ত রবি ধীরে ধীরে ধীরে  
যাইতেছে অস্তাচলে ; ধীরে ধীরে ধীরে  
যাইছে বহিরা নিবা অনন্তের তীরে ।  
শীতল সুশ্রিত বায়ু বহিছে হিরোলে  
চুহিরা কুমুমকলি ধীরে ধীরে ধীরে ।  
ধীরে ধীরে তরঙ্গিনী যাইছে বহিরা  
একতানে, সুললিত মধুর সঙ্গীতে  
বহিরা শিব-ধারা সৈকত কাননে ;  
অসংখ্য বৃক্ষ রাশি মুকুতার মত  
উঠিছে মিশিছে নীরে ধীরে ধীরে ধীরে ।

তটিনীর পর পাড়ে স্তম্ভামল তীরে  
বিশাল প্রান্তর প্রান্তে একটি বদরী  
দাঁড়াইরা সঙ্গীহারা পথিকের মত  
চিত্তাকুল, পার্শ্বে দুটি ক্ষুদ্র তাল তরু  
নীরব নিম্পন্দ তাঁত সজ্জা সমাগমে ।  
চুহিরা সে তরুত্রয় দীর্ঘ রাজপথ  
গিয়াছে রেখার মত ভেদিয়া প্রান্তর  
বকর, তরু পার্শ্বে কুবক নিচয়  
বসি ব ব ক্ষেত্র মাঝে একাগ্র হৃদয়ে  
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলগুলি ফুলিছে বতনে ।  
একটি কুবক উঠি সেবিল নীরবে  
স্বকাকর্ষি রাখিরা কুতলে  
সুশ্রিত ফুলি পশ্চিম গগনে  
সুশ্রিত ফুলিছে কান্ন রক্তিম বরণ ।

এ পাড়ে নির্জন বন ; কত বন-মুখ  
ডাকিতেছে বৃক্ষ বৃক্ষ ; কোথা বা বউরী  
কোথা মূলমূলি, কোথা ডিয়া কাকাতুরা  
গাইতেছে ধেঁকে ধেঁকে সুললিত স্বরে ।  
সম্মুখে অশ্বখ বৃক্ষ, অদূরে একটি  
অর্ধভগ্ন পুরাতন কালিকা মন্দির,  
অসংখ্য বনজ বৃক্ষ প্রাচীর ভেদিয়া  
উঠিয়াছে শীর্ষদেশে, কানন-কপোত  
নির্বসিছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোটরে তাহার ।  
মন্দিরের শীর্ষদেশে একটি গহ্বরে  
ভীষণ তরু এক থাকিয়া থাকিয়া  
চীৎকারিছে তার স্বরে করি বিকম্পিত  
বনভূমি, পার্শ্বদেশে অশ্বখ ছায়ায়  
একটি অনুচ্চ মঠ, অভ্যন্তরে তার  
একটি ত্র্যম্বক মূর্তি, দ্বারের সম্মুখে  
প্রস্তর সোপান শ্রেণী চুহিছে ধরনী ।  
সেই সোপানের পরে একটি যোগিনী  
অঙ্গরা নন্দিনী প্রায়, মুক্ত কেশরাশি  
থাকে থাকে কি স্তম্ভের প'ড়েছে হুলিয়া  
পৃষ্ঠ দেশে—সে স্তম্ভে নিভয় উপরে ।  
পূর্ণিমার চন্দ্রপ্রায় সে মুখ সন্নিভ  
ভয়ে আচ্ছাদিত, কণ্ঠে রক্তাক্তের মালা,  
সর্বদা বিমূর্তি, বামা ত্রিশূলধারিণী  
দেবী মূর্তি ; পরিধানে মৌরিক বসন ।  
অদূরে সোপান নিরে দুইটি বদরী

বরষায়সী, দারিজোর প্রতিবৃষ্টি যেন ।  
 একজন ভক্তিরে কহিতে লাগিল  
 “মা আমার অরপূর্ণা তুমি এ কাননে ;  
 তোমারি প্রসাদে মাগো বনবাসী মোরা  
 ভীল কোল আজিও যে জীবিত জগতে ।  
 রক্ষিতে মা আমাদের এ নির্জন বনে  
 আগমন তব, শুধু তোমারি কপায়  
 ধনে জনে সুখী মোরা ; তোমারি কপায়  
 পুত্রহীন পায় পুত্র, ভাৰ্য্যা পায় পতি ।  
 তব আশীর্বাদে মাগো বনবাসী যত  
 আনন্দে বিভোর আজি, তাই দলে দলে  
 আসে এই বনে মাগো পুজিতে তোমারে ;  
 এ বিশ্বে মানবীৰূপে তুমি যে মা দেবী ।  
 আজি প্রায় মাসাধিক পুত্রটি আমার  
 শয়্যাগত, কি যে ব্যাধি বাছারে আমার  
 ক’রেছে মা আক্রমণ, না পারি চিনিতে  
 আমি অভাগিনী, কায় দিন দিন যেন  
 বাছা মোর শক্তিহীন, উঠিতে বসিতে  
 অসমর্থ, রাহুগ্রস্ত যেন নিশামণি ।  
 দেহ বর মা আমার, তুমি যে বরদা  
 এ কাননে, তব বর পাইলে এখনি  
 বাঁচিয়া উঠিবে মোর নরনের মণি ।”  
 নীরবিলা অভাগিনী, সজল নয়নে  
 আরম্ভিল অশ্রু বামা হার এ সংসারে  
 “আমি মা হুঃখিনী বড়, এক কড়া যিনে  
 নাহি এ জগতে কেহ, বিদরে জ্বলয়  
 অগ্নিতে সে কথা মাগো মূর্ত্তের ভরে ।  
 জানি না মা কোন্ পাতালে যে কলার কার্য

জনমিয়া তিন পুত্র, তাজি মাড় স্তম্ভ  
 মরিল স্মৃতিকা ঘরে, জামাতা আমার  
 সেই হুঃখে আজি মাগো সংসারবিরাগী ;  
 যদিও অনেক যত্নে এনেছিহু তারে  
 গৃহ মাঝে, কিন্তু সেই জামাতা আমার  
 গিয়াছে ত্যজিয়া মম হুঃখিনী কড়ারে ।  
 আজি প্রায় একপক্ষ কত যে সন্ধান  
 করিহু তাহার, কিন্তু না পাইহু কোথা  
 আর সেই গৃহত্যাগী জামাতা আমার ।  
 বিধাতার অমুগ্রহে, তব আশীর্বাদে  
 হুঃখিনী কড়াটি মোর পুনঃ-গর্ভবতী ;  
 দেহ বর তুমি মাগো জগত-জননী,  
 তোমারি কপায় সেই হুঃখিনী সন্তানে  
 সমর্পিতে পারি যেন চরণে তোমার ।  
 আশীর্বাদ কর গো মা পাই যেন পুনঃ  
 আমার সে জামাতারে ।” মূর্ত্তের রমণী  
 যোগিনীর পদ ধূলি লটলা মস্তকে ।  
 কহিল যোগিনী “মাগো আমি অভাগিনী  
 মানবী, দেবতা নহি, দেবতার কার্য  
 কেমনে সাধিব আমি ? অসাধ্য আমার  
 তোমাদের মনোবাছা করিতে পূরণ ।  
 ডাক মা তোমরা সেই বিপদ ভঞ্জন  
 বিশ্বনাথে, অবশ্যই বাইবে সূচিয়া  
 সমস্ত বিপদ আহা সে নাম-প্রভাবে”  
 অমনি রমণী বর সজল নয়নে  
 যোগিনীর পদপ্রান্তে পড়িল লুটিয়া ;  
 পশিলা যোগিনী ত্রস্তে মন্দির ভিতরে,  
 হুইটি পদাঙ্গ পূস করিলা সূচিয়া ।

বিশ্বনাথ পদ হ'তে, আসিয়া বাহিরে  
 দিলা সেই পুষ্প হুটি ছাড়নের করে।  
 আদেশিলা একজনে “এ পবিত্র পুষ্প  
 একটি কবচে তারি তত্ত্বপূর্ণ হৃদে  
 দিও মা তোমার সেই কস্তাটির গলে।”  
 আদেশিলা অপর জন “তারিয়া কবচে  
 দিও মা এ পুষ্প তব পুত্রটির তুঙ্গে।  
 কিছুকণ পরে আমি যাব তব গৃহে  
 দেখিতে তোমার সেই রক্ত পুত্রটিরে।”  
 প্রণমিয়া যোগিনীয়ে সে পবিত্র পুষ্প  
 বাধিলা-আচলে দৌড়ে, আনন্দের উৎস  
 উঠিল হুটিয়া যেন দৌহার অন্তরে।  
 হেনকালে আরো এক হুঃখিনী রমণী  
 আইলা সেখানে, কঁদে কহিতে লাগিলা  
 “আজি মা সন্তান মোর ভীষণ কাতর ;  
 প্রবল বিকার আরে ঘোর অচেতন,  
 আজি তুমি নাহি গেলে দেখিতে তাহারে  
 অ ভাগা সন্তান মোর ডাকিবে জীবন।”  
 “অবশ্য যাইব আমি,” কহিলা যোগিনী  
 সন্তোহ বচনে, “আমি সঁপেছি জীবন  
 পর হিতব্রতে, মম নাহি কোন আশা,  
 নাহি স্বার্থ, নাহি কোন কামনা বাসনা,  
 নিকাম ধরম মোর, বিশ্বের মঙ্গল  
 কেবলি উদ্দেশ্য মম - এ ক্ষুদ্র হৃদয়  
 একমাত্র ভগবানে ক'রেছি অর্পণ,—  
 কর্মকল তারি প্রাণা ; আলো অন্ধকার,  
 দুখ দুঃখ মম কাছে সকলি সমান।  
 সুদৃষ্ট প্রাণাদে কুণ্ডে কিংবা তরুতলে  
 কি প্রভেদ মম কাছে ? অন্তরে বাহিরে  
 আমি যে সর্বত্র দেখি তাহারি বরান।

কাননে ভূধরে শূণ্ডে অনলে সাগরে  
 সর্বস্থানে সততই স্নেহ কোল পে'তে  
 সে আমারে পলে পলে করিছে আহ্বান।  
 কেন না যাইব আমি দেখিতে তোমার  
 পুত্রটিরে ? সে যে মোর কস্তব্য প্রদান।  
 বিশ্বের সমগ্র জীব পুত্র কস্তা মম,  
 মা হ'য়ে কেন না আমি তাদের সেবায়  
 সঁপে দিব আমার এ তুচ্ছ জীবপ্রাণ।  
 অবশ্য যাইব আমি, ভয় নাই বাহা,  
 স্মর সেই বিশ্বনাথে একাগ্র হৃদয়ে,  
 তারি পরে একমাত্র কর মা নির্ভর,  
 বিপদ ভঞ্জন তিনি, রক্ষিবে নিশ্চয়  
 তোমার সে পুত্রটিরে।” মুহূর্তে সে বামা  
 যোগিনীর পদধূলি লইল মস্তকে।  
 কহিলা কাতর স্বরে “কোন্ দেবী তুমি  
 মা আমার ? আসিয়াছ এ নির্জর্ন বনে  
 রক্ষিতে এ বনবাসী দরিদ্র সন্তানে ?  
 তুমি কিমা ভগবতী, কিংবা সরস্বতী  
 পুরাইতে তরু আশা আবির্ভাব তব  
 এইস্থানে ? কও মাগো শুনি সেই কথা  
 পবিত্র হইবে এই হৃণিত জীবন।”  
 সন্তোহে মধুর স্বরে কহিলা যোগিনী  
 “সামান্য মানবী আমি, নহি মা দেবতা,  
 জন্ম মম সেতারায়, জনক জননী  
 আদরে “কৌমুদী” ব'লে ডাকিত আমারে।  
 পেশবার প্রিয়পুত্র বিশ্বনাথ রাও  
 আমার আরাধ্য স্বামী, তারি দাসী আমি,  
 পঞ্চাশিক বর্ষ আজি হ'য়েছে অতীত,  
 পানি পথ মহাবৃক্ষে ঘোরেঘের করে  
 হত মম প্রাণেশ্বর, তাহারি স্মরণে



গড়িয়াছি এ মন্দির, সেই চিত্তা ভয়ে  
নিখাইয়া শিবমূর্তি, তক্তির কুশুমে  
পূজিতেছি দিবানিশি, সেই প্রেম-স্মৃতি  
বর্ষিতেছে শান্তি-সুখা এ মরু মরমে,  
নহি মা দেবতা আমি, সামান্ত মানবী ।”  
নীরবিলা তপস্বিনী, হুই বিন্দু বারি  
কুটিল নয়নে তার ; আইল গোখুলি,  
তিল তিল করি ভাঙ্গু ডুবিল গগনে !  
অদূর কানন প্রান্তে তটিনী সৈকতে  
কে জানি গাইল এক সঙ্গীত মধুর  
আগাইয়া প্রতিধ্বনি নিস্তব্ধ কাননে ।  
ভাবিল সে সুধাস্বর সায়াহ্ন-অম্বরে  
মোহিয়া এ শোভাময়ী নির্জন প্রকৃতি,  
মোহিয়া এ শোভাময়ী কানন-সঙ্গিনী ।

নিবাও প্রাণের আশা,      নিবে যা'ক ভালবাসা  
         কেন সখা নিতি নিতি এত জানা সবে ।  
নিবে যা'ক রবি শনী,      নিবুক তারকা হাসি,  
         আঁধার—আঁধার শুধু ভবে ।

নীরবিলা স্বর ; যেন সে মুখ প্রকৃতি  
ভুলিয়া সমগ্র বিশ্ব বিহ্বল হৃদয়ে  
মুহূর্তে ভুবিয়া গেল সে সঙ্গীত স্বরে ।  
মুহূর্তে মন্দির পার্শ্বে বিছাডের বেগে  
আইলা ছুটিয়া এক ঘোর উন্মাদিনী ;  
পরিধানে শত ছিন্ন মলিন বসন,  
শিরে কক কেশগুচ্ছ আরণ্য-কুশুমে  
সুশোভিত, কণ্ঠদেশে ধূতুরার মালা ।  
এক হস্তে ভয় হকা, অস্ত্র হস্ত ছিন্ন,  
ধূলি ধূসরিত অঙ্গ কর্দম মণ্ডিত ;  
ঘোর উন্মাদিনী মূর্তি নিবল মলিন ।

কত হাসে, কত কাদে, কত উর্ধ্ব মুখে  
“হর হর মহাদেও” ডাকে উচ্চৈশ্বরে ;  
কত ক্রুদ্ধ, কত হুটে, কত সন্ন্যাসিত,  
ঘোর উন্মাদিনী বামা । মনের আনন্দে  
গাইছে অনন্ত মনে এ সুখা সঙ্গীত—

নিবাও প্রাণের আশা,      নিবে যা'ক ভালবাসা,  
         কেন সখা নিতি নিতি এত জানা সবে ।  
নিবে যা'ক রবি শনী,      নিবুক তারকা হাসি  
         আঁধার—আঁধার শুধু ভবে ।

তপস্বিনী স্নেহ স্বরে করিলা আহ্বান  
হৃঃখিনীয়ে ; উন্মাদিনী হেরি কিছুক্ষণ  
সন্ন্যাসিনী পানে, পুনঃ উঠিলা হাসিয়া  
খল খল, মুহূর্তেকে গম্বইলা আবার—

কেন তুমি এসেছ সখা      কেন এসে দিলে দেখা  
         মরু মাঝে কেন সুধারানি ?  
কে তুমি নিঠুর সখা,      আঁকিলে এ প্রেম-রেখা  
         শুকনো কমলে কেন হাসি ?

উন্মাদিনী হি হি হি হি হাসিলা আবার  
চাহিয়া আকাশ পানে, মুহূর্তে অমনি  
এক বিন্দু অশ্রুজল পড়িল করিয়া  
যাতনাব্যাক্ত সেই উদাস নয়নে ।  
উন্মাদিনী পুনর্বার গাউতে লাগিলা,—

ভাল ত আছেহে সখা,      কেন এসে দিলে দেখা  
         এত দিন এত বর্ষ পরে !  
কত দিন কত বার      দিয়া অশ্রু উপহার  
         পূজিয়াছি প্রাণের ভিতরে ।

উন্মাদিনী নেচে নেচে গাউতে লাগিলা  
চাহি উর্ধ্বদিকে, হস্ত করি উত্তোলন ।



সে কথা কি হবে আছে, হার সখা এস কাছে  
 হেরি এই চাকু মুখ খানি ।  
 পাগল সদর বোর, তোমারি প্রেমেতে ভোর  
 তুমি বোর প্রাণাধিক স্বামী ।

উদ্ভাসিনী উচ্চৈঃস্বরে কাদিতে লাগিল।  
 চাহি তপস্বিনী পানে, মুহূর্ত্তের পরে  
 হাসিলা, ধরিল। পুনঃ সঙ্কল্প তান ।

এত দিন ছিলে কোথা, কেন দিলে এত বাধা  
 দয়া কি হ'লনা প্রাণেশ্বর ।  
 এত কি কঠিন প্রাণ, বুক ভরা অভিমান  
 আপন চইয়া তুমি পর ?

তপস্বিনী স্থির নেত্র উদ্ভাসিনী পানে  
 নিরখিয়া কিছুক্ষণ, বিস্মিত হৃদয়ে  
 ডাকিল। “লবঙ্গলতে ! এ দশা তোমার  
 কেন বোন্ ? কে কাটিল নিশ্চয়ম হৃদয়ে  
 হস্ত তব ? কেন তুমি হেন উদ্ভাসিনী ?  
 কও বোন্ এত দিন কোথা ছিলে তুমি ?”  
 উদ্ভাসিনী পুনর্বার গাইতে লাগিল।—

যাও সখা, যাও যাও দুঃখিনীর মাথা বাও  
 এস না—এস না আর কাছে ।  
 এচিন্ত যে মনভূমি, কি সুখ পাইবে তুমি,  
 কাদিয়া জীবন বাবে পাছে ?

উদ্ভাসিনী হিহি হিহি হাসিয়া আবার  
 কহিল। “কে তুমি সখা ?—রত্নজী আমার ?  
 এস তবে এ হৃদয়ে, এস প্রাণেশ্বর  
 দুঃখিনী তোমারি দাসী ।” বিছাড়ের বেগে  
 যোগিনীর পদযুগ ধরিল। দুঃখিনী  
 কাদিতে লাগিল।, স্নেহে তুলিয়া যোগিনী

দুঃখিনীরে, প্রবোধিলা মধুর বচনে  
 “লবঙ্গ, আইস তরি রহিব হৃদয়ে  
 এক সঙ্গে, এ নিশ্চয় পবিত্র মন্দিরে ।  
 জীবনের সুখময় মধুর প্রভাতে  
 কত যে উন্মাদে দৌড়ে করেছি ভ্রমণ  
 নানা স্থানে, কত সুখে খেলেছি ছজন  
 এক সঙ্গে, সে কথা কি পড়ে আজি মনে ?  
 না কুরাতে শৈশবের সেই অভিনয়  
 কে জানিত আমাদের অন্তরে এমন  
 ঘটিবে বিপ্লব ? বোন্, এস এ মন্দিরে  
 হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাসে তপ্ত অক্ষজলে  
 প্রক্ষালিব মহেশ্বরের পবিত্র চরণ ।  
 স্থিরনেত্রে তপস্বিনী রহিল। চাহিয়া  
 লবঙ্গের মুখপানে, দেখিল। সে মুখ  
 প্রভাতের প্রভাহীন নক্ষত্রের মত,  
 নাই সেই রূপরাশি সৌন্দর্য্য মাধুরী  
 নাই সেই মধুমাখা হৃদয় মাতানো  
 জ্যোৎস্না বিধৌত স্নিগ্ধ কুটুম্ব লাবণ্য  
 প্রেমময়, নাই সেই চটুল নয়নে  
 অতৃপ্তি-মদিরাপূর্ণ অকুরন্ত হাসি  
 শ্রগয়ের,—মনোহরা চপলা চঞ্চল ।  
 ভাবিলা যোগিনী হায় কি নিষ্ঠুর বিধি  
 বিধাতার, স্নেহ-বিন্দু নাহি কি সে মনে ?  
 এ দৃশ্য মুহূর্ত্ত মাত্র হেরিলে নয়নে  
 আতঙ্কে নিহরে যদি, যে বিধির স্নেহে  
 পাষণে সুধার উৎস, সে বিধির বিধি  
 এ হেন কোমল পুষ্প কীটের বসতি ?  
 এ স্নিগ্ধ লাবণ্যময়ী কুটুম্ব বালিকা  
 আজি কি করণ মূর্ত্তি ? কবে অজ্ঞানিত  
 সুবর্ণ কুসুম, কিংবা কোহিনুর মণি !

আশ্বহারা তপস্বিনী ; যুহুর্ভের পরে  
রোদনাস্তে উদ্যাদিনী রহিলা চাহিয়া  
যোগিনীর মুখপানে, তখনি আবার  
কে জানে কি ভেবে হৃদে ভুজঙ্গিনী প্রায়  
উঠিলা আশ্বাশি, রোষে কহিলা গর্জিয়া  
“কে তুই ?—সিন্দূরী ? সেই ভীষণ রাক্ষস ?  
সর সব নরাধম, ছুসনে আমারে,  
সব তুই ।” উদ্যাদিনী পশিলা তখনি  
বিদ্যাতের বেগে সেই নির্জ্বল কাননে ।  
যুহুর্ভে সে কণ্ঠ ধ্বনি ভাসিল আবার  
সাক্ষা সমীপে স্তরে করিয়া কম্পিত  
সে বিমুক্ত মনোহর নিস্তরক প্রকৃতি,

নিবাও প্রাণের আশা,      নিবে যাক্ ভানবাসা  
কেন সখা নিতি নিতি এত আশা সবে ।  
নিবে যাক্ রবি শনী,      নিবুক ভানকা হাশি  
যাঁধার—যাঁধার শুধু ভবে ।

নীরবে অনন্ত মনে দাড়ায়ে যোগিনী  
শুনিল। সে গীত, স্বর মিশিল যখন  
অনন্ত গগন কোলে, ভাজিল চমক,  
দেখিলা সে বামাঙ্কুর গিয়াছে চলিয়া ;  
নীরব নিস্তরক বন, শুধু অন্ধকার  
বিরাজিছে চারি দিকে স্পর্শিয়া গগন ।  
তপস্বিনী ক্ষুণ্ণ প্রাণে প্রতিমার মত  
দাড়াইয়া একাকিনী সে নির্জ্বল বনে  
কত কথা একে একে ভাবিতে লাগিলা,  
কত স্মৃতি হৃদি মাঝে উঠিল জাগিয়া,  
বাহ্য প্রকৃতির মত দেখিলা অস্তুরে  
অবিচ্ছিন্ন তমঃরাশি, হায় অভাগিনী  
নিষাদে ব্যথিত চিত্তে সজল নয়নে  
একটি নিশ্বাস তাজি পশিলা মন্দিরে  
কর্ণে যেন অতিশ্রান্ত রাজিতে লাগিল

নিকে যাক্ রবি শনী      নিবুক ভানকা-হাশি,  
যাঁধার—যাঁধার শুধু ভবে ।”